Contents

যাদুল মাআদ

যাদুল মাআদ

প্রথম খণ্ড

আল্লামা
হাফিজ ইবনে কাইয়িম

Contents

আল্লামা হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম

যাদুল মাআদ

পরকালের পাথেয়

প্রথম খণ্ড

অধ্যাপক আখতার ফারূক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

যাদুল মাআদ ঃ পরকালের পাথেয় (প্রথম খণ্ড)। মূল ঃ আল্লামা হাফিজ ইবনু কাইয়িম। অনুবাদ ঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক।

অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ প্রকাশনা ঃ ৫২। ই. ফা. বা. প্রকাশনা ঃ ১৫৩৬। ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.৬৩। প্রকাশকাল ঃ চৈত্র ১৩৯৪ ঃ রজব ১৪০৮ ঃ মার্চ ১৯৮৮। প্রকাশক ঃ মুহম্মদ মুনসুর উদ-দৌলাহ্ পাহ্লোয়ান; সম্পাদক ঃ অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০। মুদ্রাকর ঃ তাওয়াক্কাল প্রেস, ৯/১০ নন্দলাল দত্ত লেন, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০। বাঁধাইকার ঃ বাঁধাই ঘর, ১০৭ উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

মূল্য- ৪৫০.০০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

ZADUL M'AAD (Parakaler Patheyo) : Virtuous Accumulation for the Next World written by Allama Hafiz Ibne Qualyeem in Arabic, translated by Prof. Akhter Farooq into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka.

IFB/87-88/P-4272-3250/16.3.1988

Contents

পরিচালকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ্। আল্লামা হাফিজ ইব্‌ন কাইয়্যিম রচিত ও জনাব আখতার ফারূক অনূদিত 'যাদুল মাআদ'-এর প্রথম খণ্ড আমরা জাতির সামনে পেশ করিতে সমর্থ হইলাম। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ আরবী, ফারসী, উর্দু ও ইংরাজী ভাষার অমূল্য সম্পদগুলির বাংলা অনুবাদ বাংলা ভাষাভাষী ভাইদের খিদমতে পেশ করার যে গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে, 'যাদুল মাআদ' প্রকাশের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব কিছুটা পালন হইল বলিয়া আমরা মনে করি।

যাদুল মাআদ অর্থ পরকালের পাথেয়। ইহা চার খণ্ডে সমাপ্ত। মূলত এই বিরাট গ্রন্থটিতে আখেরী নবী রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর পূর্ণাংগ জীবন ও জীবনাদর্শ বিধৃত হইয়াছে। ফলে ইহাতে শরীআতের মাসআলা মাসায়েলও সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। এই প্রেক্ষিতে ইহার 'যাদুল মাআদ' নামটি যথার্থই সার্থক ও সুন্দর হইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে, মহান গ্রন্থকার হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী। তাই স্বভাবতই মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি নিজ মাযহাবের উপর জোর দিয়াছেন। আমরা সেক্ষেত্রে আমাদের মাযহাবই শ্রেয় মনে করি। তাই শুধু মহানবী (সঃ)-এর জীবনী ও জীবনাদর্শ হিসাবেই আমরা গ্রন্থটি পড়িব। গ্রন্থটি এই বিষয়ে একক ও অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে বলিয়াই আমাদের দীনী জ্ঞানের পরিধি সম্প্রসারণের জন্য ইহা প্রকাশ করা হইল।

আমরা গ্রন্থটির বহুল প্রচার আশা করিতেছি।

পরিশেষে আমাদের প্রার্থনা, আল্লাহ্ পাক আমাদের এই নগণ্য খিদমতটুকু কবুল করুন। আমীন।

ফরীদ উদ্দীন মাসউদ
পরিচালক,
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

Contents

প্রকাশকের কথা

মানব জাতির হিদায়েত তথা মানবসভ্যতার ক্রমিক প্রগতি ও সমৃদ্ধির স্বার্থে ও লক্ষ্যে আল্লাহ্ প্রেরিত নবী-রসূলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কুরআনুল করীমে তিনি আখ্যায়িত হয়েছেন 'উসওয়াতুন হাসানা'—সর্বোত্তম আদর্শরূপে। বস্তুত আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যাঁকে সর্বোত্তম আদর্শরূপে অভিহিত করেছেন, তিনি যে তামাম দুনিয়ার সর্বকালীন মানবমন্ডলীর জন্যই উজ্জ্বলতম ধ্রুব আদর্শ হবেন, তা একান্তই স্বাভাবিক। এজন্যেই স্বভাবত হিদায়েতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকারূপে তিনি জ্বলজ্বল করছেন। 'হেরা' গিরিগুহায় রিসালাতের দীপশিখার যে প্রথম আকস্মিক উদ্ভাসন হয়েছিল, বলা যায়, দুরন্ত মরুঝড়ের মতোই 'সে আলো ছড়িয়ে গেল সবখানে'। মরুদেশ থেকে সর্বদেশে—সেকাল থেকে সর্বকালে। তাই, স্বভাবতই, তাঁর সমরকাল থেকেই, তাঁর জীবন, আদর্শ, সংগ্রাম, চরিত্র তথা তাঁর সামগ্রিক জীবনসাধনা বিশ্বমানবের অপার বিস্মিত অনুসন্ধিৎসার উদ্রেক করেছে। মরুদেশ থেকে উত্থিত একজন মানব সামগ্রিক বিশ্বেতিহাসে যে মহাবিপ্লব সাধন করলেন, যাঁর এ মহাবিপ্লব বিশ্বমানব-সভ্যতায়ও প্রভূত আলোড়ন ও পালাবদল ঘটিয়েছে, তাঁর সম্পর্কে এই সন্ধানী মনোযোগ ও কৌতূহল খুবই স্বাভাবিক। এজন্যেই বিশ্বজ্ঞানভান্ডারে সীরাতে রসূল (সঃ) বিষয়ক এক মহাসমুদ্র সংযোজিত হয়েছে এবং এখন পর্যন্ত এই সমুদ্র মন্থন বর্তমান। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কি অপার কুদরত, এই সমুদ্র মন্থনের বুঝি শেষ নেই।

আল্লামা হাফিজ ইবনে কাইয়িমের বিখ্যাত গ্রন্থ 'যাদুল মাআদ' এই জ্ঞানসমুদ্রেরই এক রত্নদ্বীপ বিশেষ। বিপ্লবী জ্ঞানতাপস আল্লামা ইবনে তায়মিয়ার প্রধান শাগরিদ ও উত্তরাধিকার আল্লামা হাফিজ ইবনে কাইয়িম রচিত চার খন্ডে সমাপ্ত এই বিশালকায় গ্রন্থকে রসূল-চরিতের এক সবিস্তার আলেখ্যরূপে অভিহিত করা যায়। বিশুদ্ধ সূত্রভিত্তিতে রসূল মুহাম্মদ মুস্তফার (সঃ) জীবন ও আদর্শ বিশদরূপে এতে বর্ণিত। তাঁর কথাবার্তা, চালচলন, আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, গুণ ও জ্ঞান—এক কথায় তাঁর প্রাত্যহিক ও সামগ্রিক জীবনের সব খুঁটিনাটি বিষয়াবলীই এ মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও প্রবীণ লেখক-সংবাদিক অধ্যাপক আখতার ফারুক অনূদিত 'যাদুল মা'আদ'—পরকালের পাথেয়—পরিচয়বাহী এ মহগ্রন্থের প্রথম খন্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ থেকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের খিদমতে পেশ করার যে সুযোগ আমরা লাভ করেছি, পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তার জন্যে আমাদের লাখো শুকরিয়া এবং তাঁর প্রিয় হাবীব (সঃ)-এর জন্যে লাখো দরূদ ও সালাম।

এখানে একটি বিষয়ে আমরা সম্মানিত পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করি: যেহেতু এ মহান গ্রন্থের জ্ঞানতাপস গ্রন্থকার আল্লামা হাফিজ ইব্‌ন কাইয়িম তাঁর শায়খ আল্লামা ইব্‌ন তায়মিয়ার মতোই হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, সেহেতু মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর নিজ মাযহাবকেই গুরুত্ব দিয়েছেন এবং তাঁর মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকেই এ বিষয়ক প্রায়োগিক সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন; সেক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অনুসারীরূপে আমাদের নিজ মাযহাবকেই আমরা শ্রেয় মনে করি এবং সেহেতু আমাদের মাযহাবের দৃষ্টিকোণ ও সিদ্ধান্তই আমাদের জন্য চূড়ান্তরূপে গ্রহণীয়। তবে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন, আদর্শ ও সংগ্রামকে এই মহান গ্রন্থে যেভাবে ধারণ করা হয়েছে, তা সত্যিকার অর্থেই আমাদের জন্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপ এবং কালের সীমারেখা পার হয়ে মিল্লাতের জন্যে তা আলোকসঞ্চারী অবদান রেখে যাবে। এই বিবেচনাবোধ থেকেই বাংলাভাষী পাঠকদের সম্মুখে এই অমূল্য সওগাত পেশ করার জন্যে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি।

পরিশেষে প্রার্থনা, আল্লাহ্ আমাদের এই নগণ্য খিদমতটুকু কবুল করুন এবং সত্যানুসন্ধিৎসু কওম ও মিল্লাত এই গ্রন্থটিকে গ্রহণ করুন।

সকল হাম্দ বিশ্বজাহানের রব আল্লাহ্‌র জন্যে। আমীন।

মুহম্মদ মুনসুর উদ-দৌলাহ পাহ্‌লোয়ান
সম্পাদক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

ঢাকা
পহেলা চৈত্র ১৩৯৪
১৫ মার্চ ১৯৮৮

Contents

উৎসর্গ

শর্ষিনার মরহুম হযরত পীর সাহেব কিবলা
মাওলানা নেছারউদ্দীন আহমদের
পবিত্র আত্মার মাগফিরাত কামনায় নিবেদিত

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ্ পাকের লাখ লাখ শোকর। অজস্র দরূদ মহানবী মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) ও তাঁর আল-আসহাবের ওপর। প্রায় পঁচিশ বছর পরে হলেও 'যাদুল মাআদ'-এর প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ বের হল। এ অধম বান্দার বড়ই সাধ ছিল নবী মুস্তফা (সঃ)-এর পূত জীবন চরিত লেখার। উদ্যোগও নিয়েছিলাম বড় এক প্রকাশকের প্রেরণায় আল্লাহ্ পাক তা মঞ্জুর করেননি। তিনি মঞ্জুর করলেন এক মহান লেখকের লেখা মহানবী (সঃ)-এর জীবনালেখ্যের অনুবাদ করা। জীবনভর তাঁর শোকর আদায় করেই শেষ করা যাবে না। দুধের সাধ অন্তত ঘোলে মিটল বলে আমি আপাত তৃপ্ত। এও তো কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে আমি এর অর্ধাংশ (দু'খণ্ড) অনুবাদ সম্পন্ন করার পর অনিবার্য কারণে অনুবাদ কার্য স্থগিত থাকে। বাংলাদেশোত্তর কালে বাংলা একাডেমী ধর্মীয় গ্রন্থ প্রকাশে অনীহা প্রকাশ করায় আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শরণাপন্ন হই। ইসলামিক ফাউন্ডেশন সাগ্রহে এর প্রকাশের দায়িত্ব নেয়ায় অবশেষে গ্রন্থটি আত্ম-প্রকাশের সুযোগ পেল। এ জন্য অবশ্যই ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

'যাদুল মাআদ' মহানবী (সঃ)-এর সবিস্তার জীবনালেখ্য। সুন্নাতে নববীর এক পূর্ণাংগ চিত্র এতে বিবৃত। এতে বিশুদ্ধ সূত্রের বর্ণনার ভিত্তিতে মহানবী (সঃ) এর জীবন ও আদর্শ সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে। এ ধরনের জীবনালেখ্য এটাই প্রথম, তাই অনন্য। গ্রন্থটি চারখণ্ডে বিভক্ত। পয়লা খণ্ডে মহানবী (সঃ)-এর জীবন-চরিত ও ইবাদত সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। কুরআন, হাদীছ, উসূল, ফিকাহ্, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদি সার্বিক বিষয়ের সমন্বয়ে আলোচনাটি অপূর্ব ও সুসমৃদ্ধ হয়েছে। প্রসংগত এতে মক্কা মুআজ্জামার ফযীলত, লায়লাতুল কদর ও শবে মি'রাজের রহস্যাবলী ও হজ্জে আকবরের বর্ণনাও এসে গেছে। মহানবী (সঃ)-এর জীবনীপর্বে রিসালাতের প্রয়োজন, রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্য ও তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি সব কিছুই পুংখানুপুংখরূপে পর্যালোচিত হয়েছে। বিশেষত মহানবী (সঃ)-এর বিভিন্ন নামের এক মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ইবাদত পর্বে প্রতিটি ইবাদতের উৎস, গুরুত্ব ও রহস্যাবলী সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইবাদতের মাসআলা-মাসায়েলও এতে তুলে ধরা হয়েছে। তবে তা তুলে ধরা হয়েছে হাম্বলী মাযহাবের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাই তা আমাদের জন্য অনুসরণ-যোগ্য নয়। আমরা এ গ্রন্থ পাঠ করবো মহনবী (সঃ)-এর গোটা জীবনের সুবিস্তৃত কার্যকলাপ জানার জন্য। মহানবী (সঃ)-এর জীবনই যে শরীআত, এ গ্রন্থ থেকে এ সবকই হাসিল করব। কিন্তু শরীআতের মাসআলা-মাসায়েল অনুসরণের জন্য আমরা স্বভাবতই নিজ মাযহাবের অনুসারী হব।

Contents

বায়

যেহেতু আমি এ গ্রন্থের অনুবাদক মাত্র, সম্পাদক নই, তাই যেখানে যেভাবে যা আছে আমি তাই অনুবাদ করেছি। তাতে এমনকি কোন মন্তব্য বা টীকা-টিপ্পনীরও সংযোজন ঘটাইনি। কারণ, তা আমার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই আমার সবিনয় নিবেদন, গ্রন্থটি পাঠের সময় পাঠকবৃন্দ শুধু এর বিতর্কমুক্ত দিকগুলোই গ্রহণ করবেন এবং বিতর্কিত দিকগুলো আল্লামা ইবনে কাইয়িমের দায়িত্বে রেখে এড়িয়ে যাবেন। তা হলেই এ গ্রন্থ আমাদের জন্য কল্যাণবহ হবে। আর কল্যাণ আহরণের মত এতে অনেক কিছু আছে বলেই অন্য মাযহাবের হওয়া সত্ত্বেও আমরা গ্রন্থটি অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনও একই কারণে এর প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে।

প্রথম খন্ডের এ পয়লা সংস্করণে মুদ্রণ প্রমাদ থাকা খুবই স্বাভাবিক। তা ছাড়াও কিছু কিছু তাড়াহুড়োজনিত ভুলচুক রয়ে গেছে। সহৃদয় পাঠকবৃন্দ আশা করি তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। ইনশা আল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন হয়ে যাবে আশা করি। তা ছাড়া আমার অজ্ঞতা ও অযোগ্যতার কারণে যদি কোন ভুল বিজ্ঞ পাঠকমন্ডলীর দৃষ্টিতে পড়ে যায়, মেহের-বানী করে তা আমাকে নির্দেশ করলে সকৃতজ্ঞচিত্তে তা শুধরে নেব।

এ মহান গ্রন্থটির নাম 'যাদুল মাআদ' বা পরকালের পাথেয়। আল্লাহ্ পাক যখন এর অনু-বাদ আমাকে মঞ্জুর করলেন, তখন মেহেরবানী করে যদি তিনি এটাকে আমার পরকালের পাথেয় করে দেন তো নিজকে সবচাইতে ভাগ্যবান ভাবব। আমার সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে আমি মনেপ্রাণে এ দু'আই কামনা করছি। মহানবী (সঃ)-এর এ পূত জীবনালেখ্য আমাদের জীবনকে আলোকময় করুক এটাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা। আমীন।

বিনীত

আখতার ফারূক

Contents

গ্রন্থকার পরিচিতি

এ পবিত্র গ্রন্থের মহান গ্রন্থকার সারা বিশ্বে সাধারণত আল্লামা হাফিজ ইব্‌ন কাইয়িম জাওযিয়া নামে-খ্যাত। তাঁর আসল নাম হচ্ছে শামসুদ্দীন আবু আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইব্‌ন বকর ইব্‌নে আইয়ুব সা'দ যরঈ দামেশকী। তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিকাহ্‌ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। মাযহাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন হাম্বলী। তিনি সার্বিক বিচারে ছিলেন পূর্ণাঙ্গ এক মুজতাহিদ। তা ছাড়া ভাষাতত্ত্ব ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁর পান্ডিত্য ছিল অনন্য।

৬৯১ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বয়প্রাপ্তির সাথে সাথে তিনি শায়েখ তকীউদ্দীন ইব্‌ন তায়মিয়া (রঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দীনী ইলমের প্রতিটি শাখায় এমনকি সংশ্লিষ্ট বৈষয়িক বিদ্যায়ও তিনি অশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ইলমে তাফসীরে তাঁর দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ মনীষা সর্বকালের এক বিস্ময় হয়ে রয়েছে। ফিকাহ্‌ শাস্ত্রের সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। আধ্যাত্মিক জ্ঞানেও তাঁর গভীরতা ছিল অপরিসীম। নিজ ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনে ছিলেন আপোষহীন এক সংগ্রামী সাধক। এ জন্য তাঁকে জেল-জুলুমের যাঁতাকলেও নিষ্পেষিত হতে হয়েছে। তিনি কেবলমাত্র কা'বার যিয়ারতের উদ্দেশ্য ছাড়া এমনকি রওযা পাকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যেও পা রাখা বৈধ ভাবতেন না। তাঁর এ চরম একত্ববাদী আকীদার জন্য তাঁকে যথেষ্ট খেসারত দিতে হয়েছে।

ইবাদত-বন্দেগীতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার ছিল। সমসাময়িককালে তাঁর মত আবিদ ও যাহিদ আর কেউ ছিল না। তাঁর নামাযে তন্ময়তা ও তাহাজ্জুদে একনিষ্ঠতা যে কোন বুযুর্গের ঈর্ষার বস্তু ছিল। নিষ্পাপ তাঁকে বলার অবকাশ নেই বটে, কিন্তু তাঁর মত নিষ্কলুষ জীবনের অধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য এ বিশ্বে খুব কম লোকেরই ঘটেছে। কঠিনতম কণ্টকর মুহূর্তেও তাঁর ললাটে অসন্তোষ বা বিরক্তির ন্যূনতম ছায়াপাত ঘটত না। তাঁর শায়েখ ইমাম ইব্‌ন তায়মিয়া (রঃ)-এর সাথে একই দুর্গে পৃথক কক্ষে বন্দীজীবন কাটিয়ে সেখানে শায়েখের ইন্তিকালের পরে তিনি মুক্তিলাভ করেন। এ দীর্ঘ সময় তিনি কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআনের গবেষণায় নিজকে সর্বতোভাবে সমর্পণ করেন। তারই ফলশ্রুতিস্বরূপ আমরা তাঁর থেকে দীনী ইলমের অনেক অমূল্য সম্পদ লাভ করেছি। আল্লাহ্‌ পাক তাঁর বন্দী জীবনকে নিজ বান্দাদের জন্য বরকত ও কল্যাণের এক অফুরন্ত ভান্ডাররূপে গড়ে দিয়েছেন।

তিনি জীবনে কয়েকবার হজ্জ করেন। মক্কা শরীফে অনেকদিন অবস্থানও করেন। মক্কাবাসিগণ তাঁর অসংখ্য তাওয়াফ ও অজস্র ইবাদত দেখে বিস্মিত হতেন। বিপুল সংখ্যক লোক তাঁর থেকে শরীআত ও মা'রিফাতের জ্ঞান ও কল্যাণ অর্জন করেন। তাঁর শায়েখের জীবদ্দশায়ই তিনি এ

মর্যাদা লাভ করেন এবং শায়েখের ইন্তিকালের পরেও তাঁর এ মর্যাদা অধিকতর ব্যাপ্তির সাথে অব্যাহত থাকে। মোট কথা, তাঁর মত সার্বিক জ্ঞানের অশেষ ভাণ্ডারের অধিকারী আর কেউ ছিলেন বলে জানা যায় না।

তাঁর রচনাবলীর ভেতর 'তাহজীবে সুনানে আবু দাউদ', 'ঈযাহে মুশকিলাত' 'সফরে হিজরাতাইন' 'মারাহিলুস সাএরীন' 'আল কালিমুত তাইয়েব' 'যাদুল মুসাফিরীন' ও 'যাদুল মাআদ (চার খণ্ড)' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃএটি অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের গ্রন্থ।

এ ছাড়াও রয়েছে 'নাকদুল মানকুল' কিতাবু ইলামিল মাওকাতাইন মিন রব্বিল আলামীন' (তিন খণ্ড)' কিতাবু বাদাএ'ল ফাওয়াএদ' 'আস সাওয়াইকুল মুরসালা আলাল জুহমিয়া' 'হাবিউল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল আফরাহ' 'নুযহাতুল মুশতাকীন' 'কিতাবুদ দাই ওয়াদ দাওয়াই' ও 'কিতাবু মিফতাহিদ দারিস সাআদাহ।' শেষোক্তটি এক বিশালকায় গ্রন্থ। তদুপরি তিনি 'কিতাবুত তুরুকিল হুকমিয়া' কিতাবু ইন্দাতুস সাবেরীন' কিতাবু আগাছাতুল লুহফান', কিতাবুর রূহ' কিতাবুস সিরাতিল মুসতাকীম 'আল ফাতহুল কুদসী' 'আততুহফাতুল মক্কিয়া' মাদারিজুস সালেকীন ইলা মানাযিলে ইয়্যাকা না'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাস্তাঈন' ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেন।

এ মহান গ্রন্থকার ৭৫১ হিজরীর রজব মাসে ইন্তিকাল করেন। বাবে সগীরের কবরস্তানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর জানাযার নামায পর পর কয়েক জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়।

এ জ্ঞানতাপস ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ)-এর শুধু শ্রেষ্ঠতম শিষ্যই ছিলেন না, ছিলেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত ও সকল জ্ঞানের উত্তরাধিকারী। তিনি ইমাম ইবনে তায়মিয়া (র)-এর ত্রিশ বছরের ছোট ছিলেন এবং তাঁর জীবনকাল ছিল ষাট বছর। তাঁর পিতা 'আল মাদরাসাতুল জাওযিয়া'র অধ্যক্ষ ছিলেন, তাই তাঁর নামের সাথে জাওযিয়া সংযুক্ত হল, তাঁর শায়েখ ও উস্তাদ ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ)-এর কারণেই তিনি হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হন।

আল্লামা ইবনে কাইয়িম মূলত ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ)-এর ইলমে ও মাযহাবের ধারক ও বাহক ছিলেন। পরন্তু তিনি তার প্রচার ও প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি সেদিকেই সবাইকে ডেকেছেন এবং সে মতকে প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য আপ্রাণ প্রয়াস পেয়েছেন। হাম্বলী মাযহাবের প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য তিনি পর্যালোচনা ও সমালোচনার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। মোট কথা, ইমাম ইবনে তায়মিয়া(রঃ)-এর ফিকাহের প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের জন্য তিনি গোটা জীবনের সাধনাকে নিয়োজিত করেন। 'ইলামুল মাওকাআইন' ও "যাদুল মাআদ" গ্রন্থে তিনি ইবনে তায়মিয়া (রঃ)-এর মাযহাবকেই সর্বত্র তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। অবশ্য তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে উস্তাদের মত ছেড়ে স্বাধীন মতও ব্যক্ত করেছেন। বিভিন্ন জ্ঞানে অসাধারণ পাণ্ডিত্যই তাঁকে এ স্বাধীন মতামতের অধিকারী করেছিল। তাঁর সহপাঠী হাফিজ ইবনে কাছীর

বলেন—ইব্‌ন কাইয়িম হাদীছ শাস্ত্র আরম্ভ করেছেন এবং জীবনের মোটা অংশ জ্ঞানচর্চায় ব্যয় করেছেন। তিনি বিভিন্ন জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। বিশেষ করে হাদীছ ও তাফসীর শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান ছিল।

তাঁর ব্যক্তি চরিত্র সম্পর্কে আল্লামা ইব্‌ন কাছীর বলেন: "ইব্‌ন কাইয়িমের বহুবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বিনয়ী অথচ দৃঢ়চেতা ছিলেন। সবার সাথেই বন্ধুত্ব ছিল, শত্রুতা ছিল না কারো সাথেই। পরনিন্দা কিংবা কারো প্রতি সন্দেহ পোষণ থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। আমার সাথে তার গভীর বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের যুগে তাঁর মত ইবাদতগার আর কেউ ছিল না। তার নামায অত্যন্ত দীর্ঘ হত। তার রুকু-সিজদাও বেশ লম্বা হত। তা নিয়ে বন্ধু-বান্ধবরা তাঁকে অনেক বিদ্রূপ করত। তিনি তাঁর কোন জবাব দিতেন না, তা বলে তিনি তাঁর সে অভ্যাসও ছাড়তেন না।"

হাফিজ ইব্‌ন কাইয়িমের রচনা ছিল অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি তাঁর শায়খের মত কঠোর সমালোচক ছিলেন না। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নিজ নিজ মতামত তুলে ধরতেন। অবশ্য জ্ঞানের গভীরতা ও যুক্তি প্রমাণের বিশালতায় তা ভরপুর হত। তিনি সরল সহজ ও সাবলীল ভাব ও ভাষার মাধ্যমে নিজের বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর রচনার সর্বত্রই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ছাপ বিদ্যমান। মাদারিজুস সালেকীন, ইদ্দাতুস সাবেরীন ও মিফতাহু দারিস সাআদাহ গ্রন্থে তিনি দর্শন শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তির চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

মূলত তাঁর রচনায় আধ্যাত্মিক জ্যোতি ও জ্ঞানগত দীপ্তির সংমিশ্রণ ঘটেছে। তাই তা এক অপূর্ব মহিমায় বিমণ্ডিত ও ভাস্বর হয়ে রয়েছে।

Contents

গ্রন্থ পরিচিতি

'যাদুল মাআদ' চারখণ্ড সম্বলিত এক বিশালকায় গ্রন্থ। একে যদি মহানবী (সঃ)-এর পূত জীবনচরিত ও মহান জীবনাদর্শের ইনসাইক্লোপেডিয়া বলা হয়'তো বিন্দুমাত্র বাড়াবাড়ি হবে না। মহানবী (সঃ)-এর কথাবার্তা, চালচলন, আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, গুণ ও জ্ঞান এক কথায় তাঁর প্রাত্যহিক ও সামগ্রিক জীবনের সব খুঁটিনাটি ব্যাপারই এ মহাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। মহানবী (সঃ) সম্পর্কিত প্রতিটি তত্ত্ব ও তথ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ ও যাচাই-বাছাই যেমন এতে রয়েছে, তেমনি প্রতিটি দলীল-প্রমাণের সূত্রগুলো তন্ন তন্ন করে খতিয়ে দেখা হয়েছে।

এটা সুস্পষ্ট যে, এত কিছু ঘেটেঘুটে যে গ্রন্থ রচিত হয় তার আয়তন ক্ষুদ্র হবার নয়। তাই তা হয়ও নি। এত দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার বৃহদায়তন গ্রন্থে কিছু ভুল ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। অথচ সামগ্রিক বিচারে এ গ্রন্থ অনন্য ও অতুলনীয়। এর আগে আরবী ভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর একটিও রচিত হয় নি।

আল্লামা ইবনে কাইয়িম এ গ্রন্থ সাধারণ পাঠকের জন্যে লিখেন নি, লিখেছেন সেই সব অনুসন্ধিৎসুর জন্য যারা মহানবী (সঃ)-এর জীবন চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চান। এ জীবন-চরিতে কুরআনের তাফসীর রয়েছে, হাদীছের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে, হাদীছ বর্ণনাকারীদের সমালোচনা রয়েছে, এমন কি ফিকাহের মাসআলা-মাসায়েলও রয়েছে। তেমনি মহানবী (সঃ)-এর মক্কী-মাদানী জীবন ও যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাসও তাতে পূর্ণাংগরূপে বিধৃত হয়েছে। মোট কথা, মহানবী(সঃ)-এর জীবনকে সামনে রেখে তাঁর সমগ্র 'উসওয়ায়ে হাসানা'র সুপ্রমাণিত রূপ এতে অতি সুন্দরভাবে সবিস্তারে চিত্রিত হয়েছে।

গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে কাইয়িম অন্যতম হাম্বলী ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ)-এর প্রধান শিষ্য। এ শিষ্যত্বের জন্য তিনি গর্বিত ছিলেন। তাই তিনি স্বভাবতই সাধারণত সব ক্ষেত্রে উস্তাদের মতামতকেই প্রাধান্য দিতেন। যে মাসআলারই মতপার্থক্য রয়েছে, তাতে তিনি অন্যান্য মত তুলে ধরে তুলনামূলকভাবে তাঁর উস্তাদের মতের যৌক্তিকতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে তৎপর হয়েছেন। হোকনা সে মতটি যতই দুর্বল। এতবড় পণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ অন্ধ গুরুভক্তি একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে তেমনি অনুসরণযোগ্য। বিস্ময়কর এ জন্য যে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মাসআলায়ই ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ)-এর মত অধিকাংশ ইমামের পরিপন্থী। অথচ সে সব ক্ষেত্রেও তিনি অন্যান্য ইমামের অভিমত নামমাত্র উল্লেখ করে শুধু তাঁর শায়খের অভিমতের সপক্ষেই

দলীল-প্রমাণ উপস্থাপনের প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে অন্যান্য ইমামদের প্রতি তিনি সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছেন। পক্ষান্তরে, তাঁর এ ভূমিকা অনুসরণযোগ্য এ কারণে যে, ইমাম-মুকাল্লিদ ও উস্তাদ-শাগরিদের সম্পর্ক ঠিক এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আল্লামা ইবনে কাইয়িমের রচনারীতি সহজ সরল সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী। কিন্তু যেখানেই ভাষাতত্ত্ব, তাৎপর্য বিশ্লেষণ, মাসআলার মারপ্যাঁচ ও দর্শনের লীলাখেলা জমে উঠেছে, সেখানে রচনাও সূক্ষ্ম সালংকার হয়ে গেছে। তবে সেরূপ ব্যাপার তেমন ব্যাপক হয়ে দেখা দেয়নি। যতটুকু দেখা দিয়েছে তাও সংক্ষেপে শেষ করা হয়েছে।

সন্দেহ নেই, গ্রন্থকার তথ্যজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান দুটোয়ই সমান পারদর্শী ছিলেন। তাই তিনি নিজ মতের সপক্ষে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। নিঃসন্দেহে তাঁর দলীলগুলো জোরদার, গুরুত্বহ ও শক্তিশালী। তবে তিনি তা পেশ করতে গিয়ে প্রতিপক্ষের বেলায় এমন সব কর্কশ ও অশোভন ভাষা ব্যবহার করেছেন যা এযুগে কল্পনা করাও কঠিন। অবশ্য তাঁর সমসাময়িক যুগে এ সবের এরূপ বহুল প্রচলন ছিল যে, তুলনামূলকভাবে তাঁকে অত্যন্ত সংযত ও শালীন না বলে উপায় থাকে না।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ)-এর মাযহাব, আকাইদ ও মাসলাকের হুবহু অনুসারী ছিলেন আল্লামা ইবনে কাইয়িম। তাই তিনি ঠিক শায়েখের মতই সুন্নাতের ছিলেন অনুসারী ও বিদআতের অন্ধ বিরোধী। ফলে যাতেই সুন্নাতের গন্ধ পেতেন তাই অনুসরণ, করতেন আর যেখানেই বিদআতের গন্ধ পেতেন সেখানেই রুখে দাঁড়াতেন। এর কোন ক্ষেত্রেই বিন্দুমাত্র শৈথিল্য বা সংশয়বাদিতা বরদাশত করতেন না। তাঁর এ অন্ধ আবেগের সামনে যত বড় ব্যক্তিত্বই দাঁড়াক না কেন, কেউই তার লেখনীর সুতীব্র খোঁচা থেকে রেহাই পেতেন না।

তবে তিনি তাঁর শায়খের মতই ছিলেন নবীপ্রেমে উৎসর্গিত ও নির্ভেজাল তাওহীদবাদী। এ দু'টি ক্ষেত্রে তাঁদের আতিশয্য সব আইম্মায়ে কিরাম ও শাসকবর্গের জন্য ছিল বড়ই বিব্রতকর। ফলে তাঁদের দু'জনকেই নজরবন্দী, বন্দী, নির্বাসন ইত্যাকার সব ধরনের নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এতকিছু সত্ত্বেও তাঁদের মতামতের ক্ষেত্রে তাঁরা বিন্দুমাত্র আপোষ করেন নি। 'যাদুল মাআদ'-এর বিভিন্ন ক্ষেত্রেও গ্রন্থকারের এ আপোষহীন ধ্যান-ধারণা ও আকীদা-বিশ্বাসের সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে।

এ কারণেই অন্যান্য মতাবলম্বীরা 'যাদুল মাআদ' পাঠ করছেন শুধুমাত্র মহানবী (সঃ)-এর জীবন চরিত ও জীবনাদর্শের খুঁটিনাটি সকল কিছু অবহিত হবার জন্যে, গ্রন্থকারের এ মতামত অনুসরণের জন্য নয়। মহানবী (সঃ)-এর জীবনকে সর্বতোভাবে কুরআন হাদীছ ও আছারের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গরূপে সাজিয়ে গুছিয়ে দাঁড় করানোর যে বিস্ময়কর সাফল্য গ্রন্থকার

দেখিয়েছেন, তা সত্যিই তুলনাহীন। আর না হোক, কেবলমাত্র এ কারণেও 'যাদুল মাআদ' এ বিশ্বে অমর হয়ে থাকবে। তা ছাড়া এই গ্রন্থে হাদীছ, তাফসীর, উসূল, ফিকাহ, ফালসাফা, তাসাউফ নাহু, সরফ, ইতিহাস, তাওহীদ, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমরনীতি, চিকিৎসা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান এক কথায় সার্বিক জ্ঞানের সমাহার গ্রন্থটিকে অনন্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত ও বহুল প্রচারিত হয়েছে। এরূপ একখানি গ্রন্থ যে কোন জাতির জ্ঞানভান্ডারের জন্য শুধু এক অমূল্য সম্পদ নয়, অপূর্ব সংযোজনও।

Contents

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

হযরত (সঃ)-এর জীবনালেখ্য

Contents

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত (সঃ)-এর ইবাদত

Contents

একুশ

Contents

বাইশ

Contents

প্রথম অধ্যায়

●

হযরতের (সঃ) জীবনালেখ্য

প্রারম্ভিকা

●

আমার প্রভু এ অধম দাসের কঠিন দায়িত্ব সহজতর করুন। হে মহান খোদা! এ অক্ষম ভৃত্যকে সাহায্য কর। আর আমাদের মহান নেতা মুহাম্মদ আল আমীনের (সঃ) ওপরে করুণা বর্ষণ কর।

গোটা সৃষ্টি জগতের মহান প্রতিপালকের জন্যেই সব প্রশংসা। খোদাভীরু লোকেরই পরিণাম মংগলকর। আর যারা জালিম, ধ্বংস তাদের জন্যে অপরিহার্য। তুমি ছাড়া কেউ প্রভু নেই। তুমিই অতীত ও ভবিষ্যতের সবার প্রভু। আকাশ ও পৃথিবী জুড়ে আছ তুমি। প্রতিদান দিবসের তুমিই মালিক।

তাঁর আনুগত্য ছাড়া না কোন উদ্দেশ্য সফল হতে পারে, না পারে কোন কাজ চলতে। তাঁর প্রতাপের সামনে দুর্বলতা প্রকাশ ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাঁর আলো (হিদায়েত) ছাড়া কোথাও পথ মিলবেনা। তাঁর ইচ্ছাতেই জীবন ধারণ আর তাঁর নৈকট্যেই পুরস্কার রয়েছে। আত্মার সংস্কার ও কল্যাণ তাঁরই হয়ে থাকার ভেতরে নিহিত; তাঁরই সান্নিধ্য সাপেক্ষ। যখন তাঁর আনুগত্যের সৌভাগ্য হয়, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে আর কোন ভুল করে বসলে তওবা বা ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

তাঁকে ডাকা মাত্র তিনি জবাব দেন। পুণ্য করলে পুরস্কারের আশা রাখবে। নিখিল সৃষ্টি যার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বয়ে চলছে, সব প্রশংসাই তাঁর জন্যে। সব সৃষ্টিই তাঁর প্রভুত্বের সামনে মাথা পেতে দিয়েছে। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনিই একমাত্র আল্লাহ এবং তিনি ছাড়া আর কেউ উপাস্য নেই।

তাঁর সৃষ্টি বৈচিত্র্য কত বিস্ময়কর! তাঁর নিদর্শনগুলো কত আশ্চর্যজনক! তিনি যত সব আশ্চর্য কলাকৌশলপূর্ণ বস্তু সৃষ্টি করেছেন। আমি তাঁর অন্যতম সৃষ্টি হিসেবে এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর আসন ও বাণীর আলোক-সীমা পর্যন্ত তাঁর প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করছি। সেই একক খোদা ভিন্ন কোনই প্রভু নেই। তাঁর প্রতিপালনব্রতের ক্ষেত্রে যেরূপ তাঁর কোন মন্ত্রণাদাতা নেই, তেমনি তাঁর প্রভুত্বের ক্ষেত্রেও কারুর অংশ নেই। তাঁর সত্তা, গুণাবলী ও কার্যধারার কোন তুলনা নেই। তিনিই সবার বড়।

তাই ভূয়ষী প্রশংসা পাবার যোগ্য তিনিই। সকাল সন্ধ্যায় তাঁরই প্রশংসা গীত হয়ে থাকে। আকাশ ও তার পরিমন্ডল, পৃথিবী ও তার বাসিন্দা, সমুদ্র ও তার মৎসাদি, এক কথায় নক্ষত্র হোক কিংবা পর্বত, বৃক্ষ হোক বা চতুষ্পদ, পার্বত্য এলাকা হোক বা মরুভূমি, সব শুষ্ক ও সজীব, জীবিত ও মৃত তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনায় মুখর। এ সপ্তর্ষি মন্ডল, এ পৃথিবী এবং এ দুয়ের যত সৃষ্ট বস্তু, সবার মুখেই তাঁর প্রশংসা চলে। এমন কিছুই নেই যা তাঁর গুণগানে নিমগ্ন নয়। তোমাদের কান হয়ত তা শুনতে অপারগ। নিশ্চয়ই তিনি শিক্ষাদাতা ও ক্ষমাশীল।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি ছাড়া অন্য কোন প্রভু নেই। তাঁর কেউ অংশীদার নেই। কেননা এ পৃথিবী সেই একটি মাত্র নামের বদৌলতে প্রতিষ্ঠিত আছে। নিখিল সৃষ্টি তাঁরই সত্য প্রকাশের জন্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ নাম নিয়েই সব নবী (আঃ) দুনিয়ায় এসেছেন, ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, শরিআতও রচিত হয়েছে। তার স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির জন্যে মীযান রাখা হয়েছে। বেহেশত-দোযখের ব্যবস্থা রয়েছে। শরিআতের মানদণ্ডে মানুষ মুমিন ও কাফিরে বিভক্ত হয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি, বিধি-বিধান, আর পুরস্কার ও শাস্তি রয়েছে।

এই সেই প্রভু যাঁর জন্যে এ সৃষ্টির লীলা। তাঁকে কে মানল, কে তাঁর প্রতি কর্তব্য পালন করল বা না করল, তারই হিসেব হবে। এ ভিত্তিতেই কিবলা প্রতিষ্ঠিত আর জাতির ভিত্তিও তাই। এই সেই মহান নাম যা উঁচে তোলার জন্যেই তরবারি কোষমুক্ত হয়। সব বান্দার ওপরেই খোদার অধিকার প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের মন্ত্র এটাই আর শান্তির আগারের এটাই চাবী। অতীত ও ভবিষ্যতের সব জাতির মানুষের কাছেই এ কলিমা (তাওহীদ) নিয়ে প্রশ্ন করা হবে।

যতক্ষণ বান্দা দুটি প্রশ্নের জবাব না দিবে, ততক্ষণ পা বাড়াতে পারবেনা।

প্রথম ঃ তোমরা কার উপাসনা করতে ?

দ্বিতীয় ঃ নবীদের ডাকের তোমরা কি জবাব দিয়েছ ?

প্রথম প্রশ্নের জবাব হবে, আশ্‌হাদু আন্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হবে, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সঃ) খোদার ভৃত্য ও প্রেরিত পুরুষ। খোদার ওহীর তিনি সত্য বাহক। তাঁর সৃষ্টির সেরা এবং তাঁর দাসদের ভেতরে প্রেরিত দূত। তিনি সত্যধর্ম ও সরল পথ নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিখিল সৃষ্টির জন্যে শান্তি দূত এবং খোদাভীরুদের জন্যে অবিসম্বাদিত নেতা করে পাঠিয়েছেন। গোটা সৃষ্টির সামনে খোদার এক প্রমাণ হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর ওপরে এসে নবী প্রেরণের ধারা নিঃশেষিত হয়েছে।

তিনি এসে আমাদের চলার পথের নির্দেশ দিয়েছেন এবং জীবনের প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের ওপরে তাঁর আনুগত্য, সাহায্য, সম্মান ও ভালবাসা অপরিহার্য করেছেন। তাঁর প্রতি কর্তব্য আদায় করতে শিক্ষা দিয়েছেন। বেহেশতের কোন পথই তাঁর অনুসরণ ব্যতীত মুক্তি পাবে না। খোদা তাঁর বক্ষ-বিদারিত করেছেন এবং তাঁর স্মরণকে মর্যাদা দান করেছেন। তাঁর দায়িত্ব খোদা হাল্কা করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি তাঁর বিরোধিতা করেছে, তার লাঞ্ছনা ও অবমাননার একশেষ হয়েছে।

মুসনাদের ভেতরে হযরত আবু মুনীব জাওশী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ

আমাকে কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে তরবারি দিয়ে পাঠানো হয়েছে যেন একমাত্র খোদারই ইবাদত হয়। তাঁর কোনই শরীক নেই। আমার আহার্য আমার নেযার ছায়ায় লেখা হয়েছে। আমার বিরোধীদের লাঞ্ছনা ও পরাজয় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। আর যে ব্যক্তি যেই জাতির সাথে তাল মিলিয়ে চলবে, তাকে তাদেরই একজন ধরে নেয়া হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

●

কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যা

হযরতের (সঃ) বিরোধীদের জন্যে যখন লাঞ্ছনা নির্ধারিত হল; তখন মর্যাদা ও উন্নতি কেবল তাঁর অনুসারীদের জন্যেই নির্দিষ্ট হয়ে গেল। বস্তুত, আল্লাহ পাক ঘোষণা করলেন :

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥

"অনন্তর নিরুৎসাহ হয়োনা কিংবা চিন্তিত হবারও কিছু নেই। আদপে তোমরাই উন্নত মস্তকে থাকবে। অবশ্য যদি তোমরা যথার্থ ঈমানদার হও।"

অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ٥

অর্থাৎ : মর্যাদা তো কেবল আল্লাহ আর তাঁর রসূল এবং যাঁরা ঈমানদার তাদেরই জন্যে।

আল্লাহ পাক আরও বলেন :

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ٥

অর্থাৎ : নিরাশ হয়োনা এবং ইসলামের দিকে ডাকতে থাক। তোমরাই মাথা তুলে দাঁড়াবে। কারণ আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন।

তিনি আবার বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ -

"হে নবী! তোমার ও তোমার অনুসারী ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট।"

অর্থাৎ রসূলের জন্যে সহায়ক হিসেবে খোদাই যথেষ্ট। তেমনি তাঁর অনুসারীদের বেলায়ও তাঁর সহায়তাই যথেষ্ট। অপর কারুর কাছে সাহায্যের জন্যে হাত পাততে হবে না।

এখানে দুটো ব্যাপার নিহিত রয়েছে। একটি হচ্ছে সংযোজক শব্দ হিসেবে' ওয়া'কে গ্রহণ। এক শব্দটিকে তখন 'সংযুক্ত' ও 'কা' সর্বনামকে তখন 'সংযোক্তা' ধরা হয়। ব্যাকরণবিদদের কাছে এটিও পসন্দনীয় পদ্ধতি যে, দ্বিতীয়বার 'যের' দায়ক অক্ষর ব্যবহার না করে শুধু আগের-টির সাথে সংযোগ রেখে 'যের' দেয়। এরূপ উদাহরণ অসংখ্য।

আরেকটি হচ্ছে 'ওয়া' কে 'মা'আ' (সহিত) অর্থে গ্রহণ। তখন 'জবর' দায়ক ধরে 'হাসবু' শব্দের সাথে সংযুক্ত করা হবে। সেক্ষেত্রে 'হাসবুকা' অর্থ হবে 'কাফীকা' (তোমার সাহায্যের জন্যে যথেষ্ট)। অর্থাৎ খোদা তোমার জন্যে যথেষ্ট এবং যারা তোমার অনুসারী, তাদের জন্যেও যথেষ্ট।

আরবরা যেমন বলে থাকে ঃ

حَسْبُكَ وَزَيْدًا دِرْهَمٌ ٥

অর্থাৎ তোমার ও যায়েদের জন্যে এক দিরহাম যথেষ্ট।

কিংবা আরব কবি বলেন ঃ

اذا كانت الهيجاء وانشقت العصا
فحسبك والضحاك سيف مهند

অর্থাৎ "রণাংগন যখন ভীষণ উত্তেজনাপূর্ণ হল, তখন তোমার আর যিহাকের জন্যে ভারতীয় অসি যথেষ্ট বটে।" দুটোর ভেতরে শেষেরটাই সঠিক উদাহরণ।

এখানে তৃতীয় একটি দিকও বলা হয়ে থাকে। 'মান' শব্দটিকে 'পেশ দায়ক' উদ্দেশ্য ধরে নিয়ে 'আল্লাহ' শব্দের সাথে সংযুক্ত করা হয়। তখন তার অর্থ দাঁড়ায়—তোমার খোদা ও অনুসারীরা তোমার সাহায্যের জন্যে যথেষ্ট।

যদিও কিছু লোক চতুর্থ আরেকটি মর্ম উদঘাটন করেছে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভুল। উপরে আয়াতের যেভাবে অর্থ করা হয়েছে, এটাই উপযোগী ও যথাযথ। কারণ, কোন ব্যাপারে যথেষ্ট হওয়ার গুণ তো কেবল খোদারই হতে পারে। যেমন, তাঁর ওপরে ভরসা করা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর ইবাদত করা বান্দার জন্যে যথেষ্ট। খোদা যেমন বলেছেন ঃ

وَاِنْ يُّرِيْدُوْا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ٥

অর্থাৎ—যদি তারা তোমাকে ধোকা দিতে চায়, তা হলে আল্লাহ তোমার জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ তো তোমাকে ও ঈমানদারদের জয়ী হতে সাহায্য করেছেন।

এখানে 'হাস্‌ব' ও 'আইয়্যাদা' শব্দ দুটোর পার্থক্য বলে দেয়া হয়েছে। এবং 'হাস্‌ব' শব্দটিকে নিজের বিশেষ গুণ রূপে দেখানো হয়েছে। আর 'তাঈদ' গুণটি বান্দা ও প্রভুর ভেতরে সাধারণ গুণ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ওপরে নির্ভরশীল তাওহীদ পন্থী বান্দাদের গুণই এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, তারা খোদাকেই যথেষ্ট মনে করেন। যেমন ঃ

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ۝

অর্থাৎ—"সবাই যাদের বলল, তারা তোমাদের জন্যে হাতিয়ার সরঞ্জাম নিয়ে সমবেত হয়ে রয়েছে, তাই তাদের ভয় কর, এ কথা শুনে তাদের ঈমানী শক্তি বেড়ে গেল এবং তারা বলল, (আমাদের জন্যে) আল্লাহ্ই যথেষ্ট এবং তিনি কত উত্তম কার্য সম্পাদনকারী।"

তারা এ জবাব দেয়নি যে, আমাদের জন্যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যথেষ্ট। যখন তারা এরূপ জবাব দিল, খোদা তখন এ কারণেই তাদের প্রশংসা করলেন। যেখানে খোদা নিরংকুশ একত্ববাদের আকাংখী, কি করে সেখানে তিনি রসূলকে বলতে পারেন যে, তোমার জন্য খোদা ও তোমার অনুসারীদের সাহায্য যথেষ্ট ? অথচ তাঁর অনুসারী সাহাবারাও যথেষ্ট ভাবার বেলায় একমাত্র খোদাকেই ভাবতেন। এমনকি খোদার সাথে সেক্ষেত্রে রসূলকেও শরীক ভাবতেন না। সেক্ষেত্রে সেই সাহাবারা কি করে রসূলের জন্যে যথেষ্ট হবার মর্যাদা পেতে পারেন আর এক্ষেত্রে খোদার শরীক হতে পারেন ? এটাতো একেবারেই অদ্ভুত ও ভ্রান্তিপূর্ণ কথা।

এর আরেকটি উদাহরণ এই। খোদা বলেন ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗ اِنَّا اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ ۝

অর্থাৎ আল্লাহ্ ও আল্লাহর রসূল যা কিছু দিয়েছেন, তা নিয়েই যদি তারা তৃপ্ত হয়ে যায় এবং বলে—'খোদাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট ; শীঘ্রই খোদা ও তাঁর রসূল তাদের অবদানে ধন্য করবেন; নিশ্চয়ই আমরা খোদার দিকেই মনোনিবেশকারী।'

লক্ষ্য করুন, এখানে দানের ব্যাপারটিকে খোদা ও তাঁর রসূলের গুণ বলে প্রকাশ করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে এসেছে ঃ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ -

অর্থাৎ—রসূল তোমাদের যা দান করেন, তা গ্রহণ কর। পক্ষান্তরে 'হাস্‌বু' শব্দটিকে নিজের বিশেষণ করে নিয়েছেন। তাই এরূপ বলেন নি ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ـ

অর্থাৎ—আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদের জন্যে যথেষ্ট। বরং যথেষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে খোদা নিজকেই বলেছেন। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে 'নিশ্চয়ই আমরা খোদার দিকেই মনোনিবেশকারী' বলেছেন। অথচ এখানে রসূলকে নিজের সাথে জড়ান নি। কারণ মনোনিবেশ যে শুধু তাঁরই জন্যে নির্ধারিত থাকবে এটাই বুঝানো হয়েছে। তাই তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ

"যখন তুমি অবকাশ পাও, তখনও পরিশ্রম কর এবং নিজ প্রভুর দিকে মনোনিবেশ কর।" সুতরাং মনোযোগ তাঁর দিকেই দিতে হবে। নির্ভরতা তাঁর ওপরেই চলবে। ফলাফল তিনিই দিতে পারেন। আর যথেষ্ট তাঁকেই মনে করা যেতে পারে। এ চারটি তাঁরই বিশেষ গুণ। যেমন, ইবাদত, তাকওয়া ও সিজদা শুধু খোদার জন্যেই বৈধ এবং মানত ও শপথ শুধু তাঁরই নামে চলতে পারে; এও তেমনি। এর উদাহরণ কুরআন পাকে রয়েছে ঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ـ

"আল্লাহ তা'আলা কি বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন ?"

হাসবু শব্দও 'কাফী' অর্থই প্রকাশ করে। তাই খোদা যখন সতর্ক করে দিয়েছেন যে, দেখ, তিনি একাই বান্দাকে সাহায্য করার জন্যে যথেষ্ট, তা হলে এটা কি করে হয় যে, যথেষ্ট হবার জন্যে তিনি আবার হযরতের (সঃ) অনুসারীদেরও শামিল করে নিয়েছেন ? এ ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বাতিল প্রমাণ করার জন্যে আমাদের কাছে অসংখ্য দলীল রয়েছে। তা সবিস্তারে উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখানে বুঝবার শুধু এতটুকু যে, হযরতের (সঃ) অনুসরণেই পথ প্রাপ্তি, আত্মশুদ্ধি ও সফলতা লাভ হয়। তেমনি খোদার তরফ থেকে ইজ্জত, কিফায়েত ও মদদ কেবল রসূলের অনুসরণের মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

সুতরাং উভয় লোকের কল্যাণ বা অকল্যাণ খোদা তাঁর রসূলের আনুগত্য ও নাফরমানীর সাথে জুড়ে রেখেছেন। তাই তাঁর অনুসারীদের জন্যে উভয় লোকে পথপ্রাপ্তি, নিরাপত্তা, সফলতা, মর্যাদা, তৃপ্তি, সহায়তা, কর্মতৎপরতা, সাহায্য ও জীবনের পরম পরিতৃপ্তি নির্ধারিত রয়েছে। পক্ষান্তরে তাঁর বিরোধীদের জন্যে উভয় লোকে রয়েছে লাঞ্ছনা, অবমাননা, বিভ্রান্তি, অকল্যাণ ও দুর্ভাগ্য। রসূলে খোদা (সঃ) শপথ করে বলেছেন ঃ

"তোমাদের কেউ ততক্ষণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না নিজ প্রাণ, সন্তান, মা-বাপ ও অন্য সবার চাইতে আমাকে বেশী ভালবাসবে।"

আর আল্লাহ তা'আলাও শপথ করে বলেছেনঃ 'যে ব্যক্তি মতানৈক্য ও ঝগড়া-বিবাদে রসূলকে মীমাংসাকারী না মানে, সে ঈমানদার নয়।' তাঁর দেয়া হুকুম সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া অপরিহার্য। যেরূপ মীমাংসাই তিনি করুন না কেন, তাতে কারুর অন্তরে বিন্দুমাত্র দ্বিধা দেখা দিতে পারবেনা। অন্তরের সাথে তাঁর রায় মেনে নিবে এবং তাঁর নেতৃত্ব সর্বতোভাবে স্বীকার করবে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ .

"কোন ঈমানদার নর কিংবা নারীর এ অধিকারই নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত করে দিলে তা অমান্য করবে।"

এখানে তো আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও রসূলের নির্দেশের সামনে কারুর কিছু বলারই অধিকার রাখেন নি। তাই রসূলের (সঃ) কোন অভিমত জানার পরে কোন ঈমানদারের কিছু বলারই থাকতে পারে না। যখনই তিনি কোন হুকুম জারী করলেন, অমনি তা একটি অপরিহার্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

অবশ্য তিনি ছাড়া আর যে কোন ব্যক্তির মতামতের ব্যাপারে সর্বদাই অধিকার থাকবে। কারণ, তাদের ব্যাপার তো অস্পষ্ট। যেমন, কুরআন ও হাদীছে অভিজ্ঞ কোন আলিম বা ইমাম। এখানে [illegible] এসেছে, তাতে রসূল ভিন্ন অন্য মানুষের অনুসরণ অপরিহার্য নয়, বরং ইচ্ছাধীন। তাই যদি কেউ রসূল ছাড়া কোন মানুষের অভিমত অমান্য করে, তাকে আল্লাহ-রসূলের অমান্যকারী হবার পাপে জড়িত হতে হবে না।

এখানে ভাববার বিষয় এই, মানুষের ওপরে অ-রসূলের আনুগত্য ফরজ ও বিরোধীতা হারাম বলা যেতে পারে কি ? প্রত্যেকের জন্যে অপরিহার্য হচ্ছে, রসূলের বাণী পেঁছার পরে যে কোন [illegible] মতামতকে অগ্রাহ্য করবে। কারণ, তাঁর মতের সামনে অন্য কারুর মতের দাম নেই। তাঁর কথার পরে না কারুর কথা স্বীকার্য, না কারুর পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য।

অ-রসূলের অনুসরণ কেবল রসূলের নির্দেশের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই সম্ভব। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ বিবেক-বুদ্ধি অনুসারে রীতি-নীতি প্রবর্তন ও আইন-কানুন প্রণয়ন করে, তা যদি খোদা ও রসূলের হুকুম আহকামের সাথে সংগতি না রাখে, তাহলে তা অনুসরণ করা জায়েয হবে না। কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী সব কিছুই বর্জনীয় ও গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। যদি তা বিরোধী কি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিশ্চিত না হওয়া যায়, সেখানে চুপ থাকতে হবে। এ

ব্যাপারে উত্তম মত হল এই, মওকুফ মসআলার মত তাকে জায়েয বা না জায়েয যে কোন ফতোয়া দেয়া চলে।

আরেক কথা এই, আল্লাহ্ তা'আলা নিখিল সৃষ্টির একমাত্র স্রষ্টা এবং সব কিছুর একমাত্র অধিকারী। যেমন তিনি নিজেই ঘোষণা করেন ঃ

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ .

অর্থাৎ—"তোমার প্রভু যা কিছু চান, সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা পসন্দ করেন।"

এখানে ইরাদা ও এখতিয়ার মুতাকাল্লিমীনদের বর্ণিত অর্থে নয় যে, খোদা 'ফা'এলে মুখতার' (যা ইচ্ছে তাই করার অধিকারী)। যদিও তিনি 'ফা'এলে মুখতার'—কিন্তু, এখানে এখতিয়ার অর্থ তা নেয়া হয়নি। কারণ 'মাশাআ' শব্দের ভেতরেই তো এখতিয়ার অর্থ রয়ে গেছে। তিনি নিজ এখতিয়ার অনুসারেই যা চাহেন সৃষ্টি করেন। ইচ্ছা আর এখতিয়ার তো একই।

আদপে এখানে এখতিয়ার অর্থ ইজতেবা বা ইসতাফা অর্থাৎ বেছে নেয়া বা পসন্দ করা। মানে সৃষ্টির পরে এখতিয়ার করেন; সৃষ্টির আগে নয়। সুতরাং এখানে এখতিয়ার সাধারণ অর্থে নয়; বরং বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 'শাআ' শব্দের ভেতরের এখতিয়ার সৃষ্টি কার্যে ব্যাপক এখতিয়ার বুঝিয়েছে। আর পরবর্তী 'এখতিয়ার' শব্দে সৃষ্টির ভেতর থেকে এখতিয়ার করা বুঝিয়েছে। ওপরের মত দুটির ভেতরে সঠিক মত হল এই,—'য়্যাখতারু' শব্দের ভেতরের এখতিয়ারে শুধুমাত্র খোদারই এখতিয়ার রয়েছে বলে প্রকাশ করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে যেখানে 'মা কানা লাহুমুল খিয়ারাতু' বলা হয়েছে, সেখানে সৃষ্টির এখতিয়ারকে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে। কারণ, 'এখতিয়ার' গুণটি শুধু খোদারই সাথে সীমাবদ্ধ। যেভাবে তিনি স্রষ্টা হিসেবে অনন্য, তেমনি 'এখতিয়ার' করার ব্যাপারেও একক। সুতরাং সৃষ্টি করা বা এখতিয়ার করা অন্য কারুর ক্ষমতার বাইরে। তা শুধু খোদারই কাজ। তিনি কি এখতিয়ার করতে হবে বা না হবে, তা ভালভাবেই জানেন। আর কিসে যে তিনি রাজী তাও ভালভাবে বুঝেন। খোদ মোখতার হবার জন্যে যে সব গুণের দরকার তা তাঁর মত আর কারুর নেই।

যাদের কোন কিছু তলিয়ে বিশ্লেষণের শক্তি নেই, তারা এ ভাবে অর্থ করে থাকেন যে, 'মা কানা লাহুমুল খিয়ারাতু' এ 'মা' শব্দ 'মওসুলা' এবং বাক্যটি 'মাফউল।' সুতরাং 'খিয়ারাতু' বলতে অর্থ এই দাঁড়ায়—'যাদের এখতিয়ার রয়েছে, তারা নিজ এখতিয়ারে কাজ করে।'

ঐ অর্থটি কয়েকটি কারণে বাতিল প্রমাণিত হয়। একটি কারণ এই, এমন কোন স্থান নেই যেখানে যমীরের 'মার্যা' (সর্বনামের নাম) উহ্য থাকতে পারে। তা ছাড়া যখন একই অর্থবোধক 'সেলা' ও 'মাওসুলা' যেরদায়ক অব্যয় দ্বারা 'মাজরূর' হয়, তখনই কেবল যেরপ্রাপ্ত শব্দটি মাহজূফ হতে পারে।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ○

"তোমরা যা খাও, তাই খায় এবং যা পান কর, তাই পান করে।" এ ভাবে অন্য অনেক উদাহরণ রয়েছে।

বৈয়াকরণদের মতে এটা বলা ভুল যে ঃ

جَاءَنِي الَّذِي مَرَرْتُ بِهِ وَرَأَيْتُ الَّذِي رَثَبْتُ ـ

এর মতই এখানে হবে ঃ যদি এ ভাবের মর্ম নেয়াও হয়, তখন 'আল খিয়ারাত' কে মানস্‌ুব করতে হবে এবং 'সেলা'র ক্রিয়াটি এমন যমীরের সাথে সংযুক্ত হবে যা মাওস্‌ুলের দিকেই 'রাজে' রয়েছে। তখন কালামটি দাঁড়ায় এই ঃ

وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ ـ

অর্থাৎ ঃ তারা সেটাই এখতিয়ার করে যার ওপরে তাদের এখতিয়ার রয়ে গেছে। মানে, সত্যি-কারের এখতিয়ার বলতে যা ব্ঝায় তা তাদের ছিল না। অথচ এর্‌ুপ পাঠ তো কার্‌ুর থেকেই শোনা যায় না। তার ওপরে এর্‌ুপ মর্ম মেনে নিলে কয়েকটি অস্‌ুবিধায় পড়তে হয়।

প্রথমত, আল্লাহ তা'আলা নিম্ন আয়াতে কাফিরদের সম্পর্কে তাঁরই অর্পিত ইচ্ছা ও এখতিয়ারের অপব্যবহারের অভিযোগ করছেন এবং এ এখতিয়ারের ব্যাপারটি যে তাঁর সম্প্‌ূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার, তাই জানিয়ে দিচ্ছেন। যেমন ঃ

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ـ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ○

অর্থাৎ ঃ "তারা বলল, কেন এই বড় দ্‌ুটি শহরের আর কার্‌ুর ওপরে কুরআন অবতীর্ণ হল না? তারা কি তাদের প্রভুর অন্‌ুগ্রহ বণ্টনকারী? আমিই পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বণ্টন করে রেখেছি। একদলকে অপরদলের ওপরে মর্যাদা দিয়েছি যেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে একে অপরের থেকে উপকৃত হতে পারে। তারা যা কিছ্‌ু জমিয়েছে, তার চাইতে তোমার প্রভুর অন্‌ুগ্রহ অনেক উত্তম।"

এখানে যেন খোদা পাক তাদের এখতিয়ারের দিকটি অস্বীকার করছেন। এবং পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন, এ গুণটি তো তাদের নয়; বরং যিনি তাদের জীবিকা বণ্টন করেন এবং যিনি ভাল বা মন্দ সব জানেন বলেই একদলকে আরেক দলের ওপরে মর্যাদা দান করেন, নিজ অনুগ্রহ বণ্টনের ব্যাপারটিও শুধু সেই খোদারই; আর কারুর নয়।

দ্বিতীয়ত, এ ভাবে যে আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্রষ্টা ও ইচ্ছাকর্তা হিসেবে নিজের অনন্যতা বর্ণনা করেছেন, সেটাও বিবেচ্য। কারণ, কাকে পসন্দ করা ভাল বা ভাল নয়, শুধু খোদারই সে ব্যাপারে পুরোপুরি খবর রয়েছে। তৃতীয়ত, এভাবে তিনি কাফিরদের আগমন ও তাদের আপত্তি-গুলো আলোচনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللهِ - اَللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ○

অর্থাৎ ঃ "তারা বলল ঃ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রসূলকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা আবার আমাদের না দেয়া হবে, ততক্ষণ আমরা ঈমান আনবনা। খোদা ভালভাবেই জানেন তাঁর নবুওত কোথায় সমর্থিত হতে পারে। এবং আল্লাহ তা'আলাই কেবল নবুওত বা মর্যাদার লোক নির্বাচ-নের অধিকার রাখেন; আর কেউ নয়।"

চতুর্থ, একটি ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, খোদা মুশরিকদের অধিকার ও স্বেচ্ছাচারের ফলে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে নিজকে পবিত্র বলে ঘোষণা করছেন। তাই এভাবে বলেছেন ঃ তাদের কোন অধিকার নেই; বরং আল্লাহ তা'আলা মুশরিকরা যে স্বেচ্ছাচার চালাচ্ছে তা থেকে পবিত্র। অবশ্য তাদের শিরকের উদ্দেশ্য এ ছিলনা যে, গায়রুল্লাহকে তারা স্রষ্টা ভাবত। তথাপি খোদা সেরূপ শিরক থেকেও নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। এটা ভাববার বিষয় বটে। বেশ সুক্ষ্ম একটি রহস্য রয়েছে এখানে।

পঞ্চম, একটি ব্যাখ্যা এও হতে পারে যে, সূরা হজ্জের আয়াতে বর্ণনাকৃত একটি উদাহরণের সাথে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। খোদা বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ - ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ○

"নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর কাছে প্রার্থনা জানায়, সে প্রভুরা একটা মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না। এমনকি তারা সব একত্র হয়েও পারে না। যদি তাদের থেকে একটি মাছি কিছু ছিনিয়েও নেয়, তাও ফিরিয়ে নিতে পারে না। কত দুর্বল এই প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনা গ্রহণকারী দল। এরা আল্লাহকে যথাযথ মূল্য দিল না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সর্বশক্তিমান ও সর্বজয়ী।"

তিনি আরও বলেন ঃ

اَللّٰهُ يَصْطَفِىْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ - يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

"আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা ও মানুষদের ভেতর থেকে দূত নির্বাচন করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সব দেখেন ও শোনেন। যা কিছু অতীতে ঘটেছে ও সামনে ঘটবে, তা সবই জানেন। সব ব্যাপারই খোদার কাছে গিয়ে গড়াবে।"

এ ধরণের একটা উদাহরণ সূরা কাসাসেও রয়েছে ঃ

وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُوْرُهُمْ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ۝

"তোমার প্রভু তাদের অন্তরে লুকানো কথা জানেন। আর যা তারা প্রকাশ্যে বলে, তাও জানেন।"

সূরা আনআমেও একটা উদাহরণ মিলছে ঃ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ -

"কোথায় রিসালাত অর্পন করতে হবে, আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন।"

এ সব উদাহরণেই খোদা তা'আলা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, নির্বাচনের স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়ার জ্ঞান তাঁর রয়েছে। কেন নির্দিষ্ট হবে, সে বুদ্ধিও তিনি রাখেন। কারণ, তাঁর জানা রয়েছে, অমুকের চাইতে অমুক বেশী উপযুক্ত এবং কেনইবা উপযুক্ত। এ সব আয়াতের ওপরে যখন আপনি চিন্তা করবেন, তখন আপনি অনুভব করবেন যে, এখানে এ মর্মটিই স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। খোদাই সর্বজ্ঞ।

ষষ্ঠ, একটা অর্থ এও হতে পারে যে, আয়াতটি আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতের পরে বর্ণনা করছেন ঃ

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ
عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ -

"তিনি যেদিন তাদের ডেকে বলবেন, রসূলদের ডাকে তোমরা কি জবাব দিয়েছিলে ? সেদিন সবকিছু তাদের কাছে অন্ধকার মনে হবে। তাই তাদের আর কিছু জিজ্ঞেস করা হবে না। তারপর যারা তওবা করেছিল, ঈমান এনেছিল এবং ভাল কাজ করেছিল, শীঘ্রই তারা মুক্তিপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে। এবং তোমার প্রভু যা চান সৃষ্টি করেন ও বেছে নেন।"

যেভাবে আল্লাহ তা'আলা একাকীই সবাইকে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তাদের ভেতরে যারা নতি স্বীকার করে তওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও ভাল কাজ করেছে, তাদের তিনি মুক্তির জন্য বেছে নিয়েছেন। এভাবে পুণ্যবানরা তাঁর বান্দাদের ভেতরে পসন্দনীয় ও সৃষ্টির ভেতরে নির্বাচিত হয়েছে। আর এ এখতিয়ার (নির্বাচন) খোদার হিকমত ও ইলমের দলীল স্বরূপ। এটা তারই ব্যাপার যার অধিকার রয়েছে। সেই মুশরিকদের এখতিয়ার নয়। সুতরাং তারা যার সাথে তাকে অংশী করেন, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধে। যে কোন শিরক থেকে তিনি মুক্ত ও পবিত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

●

যখন আপনি স্রষ্টার সৃজনশীলতা নিয়ে ভাববেন, তখন আপনি অনুভব করবেন যে, এ মনোনয়ন ও বৈশিষ্ট্যদানই আল্লাহর অনন্য প্রতিপালন লীলা বা পরিপূর্ণ কলা-কৌশল ও জ্ঞান এবং পূর্ণ ক্ষমতার প্রমাণ দিচ্ছে। নিঃসন্দেহে তিনিই আল্লাহ তা'আলা। তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁর সৃজনশীল ক্ষমতা থেকে তিনি একাই সব সৃষ্টি করে থাকেন। নিজ এখতিয়ারে তাদের থেকে বেছে নেন। নিজ বিচক্ষণতা থেকে উপায় বের করে নেন। তাই সেই বিচক্ষণতাসুলভ নির্বাচন ও নির্দিষ্টকরণের প্রভাব গোটা জগতের ভেতরে তাঁর প্রতিপালন কার্যের বিরাটতম নিদর্শন ও শ্রেষ্ঠতম সাক্ষী হয়ে দাঁড়ায়। রসূলের সততার ভেতরে তাঁর গুণাবলীর পূর্ণতা প্রকাশ পায়। সর্বত্র তাঁর জ্যোতির বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

এক্ষনে আমি নিজ দাবী ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই। একটি রিওয়ায়েতে আছে, 'আল্লাহ তা'আলা সাত আসমান সৃষ্টি করে সবার ওপরেরটি বেছে নিলেন নিজ নিকটতম বান্দা ও ফেরেশতাদের বসবাসের জন্যে। সেখানে নিজ আরশ ও কুরসী স্থাপন করলেন এবং নিজ পসন্দ মোতাবেক কিছু সৃষ্টি করে সেখানে থাকতে দিলেন। নিঃসন্দেহে এ আকাশটিকে অন্য সব আকাশের ওপরে বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এ যদি নাও হয়, [illegible] সান্নিধ্য লাভের মর্যাদা ও গৌরব তার রয়েছে। যদিও অন্য সব আকাশের [illegible] একই উপাদানে এটাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার এই মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য খোদা পাকেরই পূর্ণ কলা-কৌশল ও ক্ষমতা প্রকাশ করে। এটাও একটা দলীল যে, তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তার ভেতর থেকে যাকে ইচ্ছা পসন্দ করে থাকেন।

তিনি এভাবে জান্নাতুল ফিরদাউসকে অন্য সব জান্নাতের ওপর বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। আর জান্নাতুল ফিরদাউসের ছাদ নিজ বিছানা দিয়ে তৈরী করেছেন। কোন কোন হাদীছে এসেছে, খোদা তা'আলা সে জান্নাতে নিজ পবিত্র হাত লাগিয়েছেন এবং নিজ সৃষ্টির ভেতর থেকে বাছাই করা লোকদের সেখানের জন্যে নির্বাচিত করেছেন।

এভাবে আল্লাহ তা'আলা হযরত জিব্রাঈল, হযরত ইস্রাফীল, হযরত মিকাঈল (আঃ) প্রমুখ ফেরেশতাদের অন্যান্য ফেরেশতাদেয় থেকে বেছে নিয়েছেন। এমনকি হযরত (সঃ) প্রার্থনার ভেতরে বলতেন ঃ

اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات
والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما

كانوا فيه يختلفون - اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك
انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم ◎

"হে আল্লাহ! হে জিব্রাইল, মিকাঈল ও ইস্রাফীলের প্রতিপালক! হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা! হে দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সর্বজ্ঞ প্রভু! তুমিই তোমার বান্দাদের মতানৈক্যের মীমাংসা করে দাও। তাদের মতানৈক্যের ভেতরে সত্য কিছু থাকলে তোমার অনুমোদন সহকারে আমাকে সে পথে চালাও। নিঃসন্দেহে তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর।"

হযরত (সঃ) এ তিন ফেরেশতাকে খোদার সান্নিধ্য লাভের বৈশিষ্ট্য ও তাঁর নির্বাচন লাভের মর্যাদা অর্জনের জন্যেই উল্লেখ করেছেন। আকাশে আরও অনেক ফেরেশতা রয়েছে। কিন্তু, এ তিনজন ছাড়া তো আর কারুর নাম নিলেন না। কারণ, জিব্রাঈল (আঃ) ওহী বয়ে থাকেন, যার জন্যে আত্মা ও জীবন সজীব ও সতেজ থাকে। আর মিকাঈল (আঃ) সেই মেঘ চালক যা থেকে মাটি, জীব-জন্তু ও গাছপালা জীবন পায়। আর ইস্রাফীলের (আঃ) হাতে শিঙ্গা রাখা হয়েছে। যখন তিনি ফুঁকবেন, তখন খোদার ইচ্ছায় মৃতরা জীবন লাভ করবে এবং কবর থেকে বেরিয়ে আসবে।

ঠিক এভাবেই আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানদের ভেতরে নবীদের নির্বাচিত করেছেন। তাদের সংখ্যা হল এক লাখ চব্বিশ হাজার। তারপর সেই রসূলদের ভেতর থেকেও বেছে নিয়েছেন একদলকে। তাঁদের সংখ্যা ইমাম আহমদ ও ইবনে হাব্বান তাঁদের সংকলনে হযরত আবু জর গিফারীর এক রিওয়ায়েত থেকে তিনশ তেরজন দেখিয়েছেন। তারপর সেই বাছাই করা নবীদের থেকে আবার পাঁচজন বাছাই করেছেন। সূরা আহযাব ও সূরা শোআরায় তাঁদের উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে ঃ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ -

অর্থাৎ—"আর যখন আমি নবীদের থেকে কঠিন শপথ নিলাম এবং তা নিলাম তোমার থেকে, নূহ থেকে, ইব্রাহীম থেকে, মূসা ও ঈসা ইবনে মরিয়াম থেকে।"

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা আবার বলেন ঃ

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ

وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ -

অর্থাৎ "তোমাদের জন্য সেই দ্বীনকেই বিধিবদ্ধ করলাম যা নূহকে অসিয়াত করেছিলাম এবং যা তোমার কাছে ওহীরূপে পাঠিয়েছি। এভাবে ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসার কাছেও এই অসিয়াতই করেছি যে, একই দ্বীন কায়েম রাখবে যেন তাতে ভাংগন না ধরে।"

তাঁদের ভেতর থেকে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) বন্ধু হিসেবে মনোনীত করলেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা বণী আদমের ভেতর থেকে হযরত ইসমাঈলের (আঃ) বংশকে মনোনীত করলেন। তার ভেতর থেকে বণু খুজাইমার অন্তর্ভুক্ত বণু কেনান গোত্র বেছে নিলেন। কেনানদের থেকে কুরায়েশ ও কুরায়েশদের থেকে হাশিম-কে এবং বণু হাশিম থেকে গোটা মানব জাতির সর্বাধিনায়ক হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) নির্বাচিত করলেন। এভাবে সমগ্র পৃথিবীর ভেতরে তাঁর সাহাবায়ে কিরামদের মনোনীত করলেন। তাঁদের ভেতরে প্রথমে যাঁরা ইসলাম কবুল করেছেন, তাঁদের সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। তারপর বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ও বাইআতে রেদোয়ানে যাঁরা শরীক ছিলেন তাঁদের বেছে নেন। আর তাঁদের জন্যে সব চাইতে উত্তম ধর্ম, শ্রেষ্ঠ শরীআত ও পবিত্রতম ও সুন্দরতম চরিত্র চয়ন করেছেন। আর হযরতের (সঃ) জন্যে সর্বোত্তম উম্মত মনোনীত করেছেন। মুসনাদে ইমাম আহমদ ও অন্যান্য হাদীছ সংকলনে রইস ইবনে হাকাম ইবনে মুআবিয়া ইবনে জুন্দাহ নিজ পিতা এবং সে তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন—হযরত (সঃ) বলেছেন, তোমরা সত্তরটি উম্মতের সমান। খোদার কাছে তোমরা সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আলী ইবনে মাদীনী ও ইমাম আহমদ বলেন—রইস ইবনে হাকাম তার বাপ থেকে ও সে তার বাপ থেকে যে বর্ণনা শুনেছেন, তা সহীহ্ এবং খোদা তা'আলার এ মনোনয়নের প্রভাব তাঁদের কার্যকলাপ, চরিত্র ও একত্ববাদিতায় সুস্পষ্ট। জান্নাতেও তাঁদের মর্যাদা মিলবে। অন্যসব উম্মতের তুলনায় তারা উন্নততর ও উত্তম স্থান লাভ করবে।

তিরমিজী শরীফে বুরাইদা ইবনে হাসীব আসলামী (রাঃ) বর্ণনা করেন—হযরত (সঃ) বলেন, জান্নাতবাসীদের একশ বিশটি দল হবে। তাদের ভেতরে আশীটি দল হবে উম্মতে মুহাম্মদী আর বাকী চল্লিশটি হবে অন্য সব নবীর উম্মতদের। ইমাম তিরমিজী (রঃ) বলেন, এ হাদীছটি 'হাসান' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

আবু সাইদ খুদরী (রাঃ) হযরত (সঃ) থেকে এক রিওয়ায়েতে বলেছেন—যেই অদ্বিতীয় প্রভুর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি চাই যে, তোমরা জান্নাতেরই একটি অংগ হয়ে যাও। এরপর আর কিছু বলেন নি।

মহানবীর (সঃ) এ বাণীটির যে অর্থ এখানে প্রকাশ করা হয়েছে, হয়তো এটাই হবে। এটাই অপেক্ষাকৃত সঠিক মত। তা না হলে এই হবে যে, হযরতের (সঃ) এটা আকাংখা ছিল। তাই খোদা তা'আলা বলে দিলেন, একশ বিশ কাতার জান্নাতবাসীর আশী কাতারই তোমার উম্মত হবে। এক্ষনে আর রিওয়ায়েত দুটোর মধ্যে বৈষম্য থাকল না।

এ উম্মতদের মর্যাদা ও মনোনয়ন লাভের কারণ হচ্ছে এই, তিনি তাদের এত জ্ঞান ও ধৈর্য দান করেছেন যে, অন্য উম্মতদের এতখানি ছিলনা। মুসনাদে বাযার ও অন্যান্য কিতাবে আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—আমি আবুল কাসিমকে (সঃ) বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি ঈসা ইবনে মরিয়ামকে বলেছি যে, তোমার পরে এমন এক উম্মত আমি সৃষ্টি করব যারা পসন্দনীয় কিছু পেলেই খোদার প্রসংশা ও কৃতজ্ঞতায় মুখর হবে এবং কষ্টকর কিছু ঘটলে ধৈর্য ধারণ করবে। অথচ তাদের না আছে শিক্ষা, না সহ্য। তখন ঈসা (আঃ) আরজ করলেন—হে খোদা ! আদৌ জ্ঞান ও ধৈর্য নেই কি ? আল্লাহ তা'আলা বললেন—তাদের আমি নিজ জ্ঞান ও সহ্য থেকে দান করব।

এ ভাবে আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে গৃহ ও শহর নির্বাচন করা হয়েছে। খোদা মক্কা শহরকে সর্বোত্তম বলে নির্ধারিত করলেন। কারণ, এ শহরকেই তিনি তাঁর প্রিয় নবীর জন্যে মনোনীত করেছেন। নিজ বান্দাদের জন্যে হজ্জ আদায়ের কেন্দ্র করে দিয়েছেন। দূর দূরান্ত থেকে অনেক কষ্টকর পথ পেরিয়ে তাদের এখানে আসা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এখন তারা বিনয় ও নম্রতার সাথে এখানে হাজির হয়। তাদের নগ্ন শির ও দীন হীন বস্ত্রে তারা এখানে উপস্থিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা'আলা এ শহরকে 'হারাম' আখ্যা দিয়েছেন এবং নিরাপত্তার স্থান করেছেন। এখানে নরহত্যা, গাছ-পালা কাটা কিংবা শিকার করার অনুমতি নেই। এমন কি দূর্বা বা পাতা পর্যন্ত উপড়ানো বা ছেড়ার হুকুম নেই। এখানে পড়ে থাকা বস্তুরও কেউ মালিক হতে পারে না।

যারা এখানে আসে, তাদের উদ্দেশ্য হয়, অতীতের পাপ মার্জনা এবং যে সব ভুল ভ্রান্তি ও অন্যায় হয়ে গেছে, সেগুলোর সংশোধন কামনা। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন—রসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ ঘরে এসে কোন অনাচার কিংবা পাপাচারে লিপ্ত হয়নি, সে যেন শিশুর মতই নিষ্পাপ হল এবং খোদা পাকের অবস্থা তো এই দাঁড়ায় যে, তিনি তাকে বেহেশতে স্থান না দিয়ে তৃপ্ত হন না।

এভাবে সুনানে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) আমাদের বলেন—হজ্জব ও উমরার ফরজ আদায় কর। কারণ, এ দুটো দারিদ্র্য ও পাপকে এমনি ভাবে দূর করে, যেভাবে রেত লোহার ময়লা দূর করে।

বস্তুত মকবুল হজ্জের ফল হচ্ছে একমাত্র জান্নাত। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূল (সঃ) বলেছেন যে, পরবর্তী উমরা পূর্ববর্তী উমরা থেকে কৃত সব পাপের কাফফারা স্বরূপ। আর মকবুল হজ্জের সুফল হল কেবল জান্নাত।

যদি এ 'বালাদুল আমীন' (মক্কা) খোদার কাছে সর্বোত্তম শহর না হত, আর অন্য সব শহর থেকে বেশী প্রিয় না হত, তা হলে খোদা তাঁর বান্দাদের জন্য সেই শহরের জনশূন্য প্রান্তরগুলোকে হজ্জের স্থান নির্ধারিত করতেন না। বান্দাদের সেখানে যাওয়া তিনি অপরিহার্য করে দিয়েছেন। তা কেবল তার মর্যাদার জন্যেই হয়েছে।

আল্লাহ পাক কুরআন পাকে দু'জায়গায় এ শহরের নামে শপথ নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

"এই নিরাপদ শহরের শপথ !"

আবার বলেছেন ঃ لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ

"এই শহরের শপথ !"

এটি ছাড়া গোটা দুনিয়ায় এমন স্থান আর নেই যেখানে সফর করা ও প্রদক্ষিণ করা ফরজ। এখানকার 'হাজরে আসওয়াদ' ও 'রুকনে ইয়ামানী' ছাড়া আর কোন স্থান নেই যা চুম্বন করা বা স্পর্শ করার ফলে পাপ দূর হয়ে যায়। এমনকি অন্যত্র এ চুম্বন ও স্পর্শ বৈধও নয়। তা ছাড়া নবী (সঃ) বলেছেন—এ মসজিদে হারামে একবার নামায পড়া অন্য যে কোন মসজিদে লাখবার নামায পড়ার সমান। নাসায়ী ও মুসনাদে সহীহ সনদের সাথে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) বলেছেন, 'আমার এ মসজিদে (নববীতে) একবার নামায পড়া কেবল মসজিদে হারাম ভিন্ন যে কোন মসজিদে নামায পড়ার চাইতে উত্তম। আর মসজিদে হারামে নামায পড়ায় আমার এ মসজিদ থেকে একশ গুণ ছাওয়াব বেশী মিলবে। এ হাদীছটি ইবনে হাববানও বর্ণনা করেছেন।

এটা তো সুস্পষ্ট ব্যাপার যে, গোটা ভূমন্ডলের ভেতরে মসজিদে হারাম সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ স্থান। তাই এর সফরের জন্যে দৃঢ়সংকল্প রাখা ফরজ। অন্য স্থান যিয়ারত হয় মুস্তাহাব, নয় ওয়াজিব। মুসনাদে ইমাম আহমদ, তিরমিজী ও নাসায়ীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে হামরা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হযরতের (সঃ) কাছে শুনেছেন যে, তিনি মক্কার নিকটবর্তী জাজুরা নামক স্থানে অবস্থানরত অবস্থায় বলেছেন—"হে মক্কা ! খোদার শপথ, তুমি পৃথিবীর ভেতরে সর্বোত্তম এবং খোদার মনোনীত স্থান। যদি আমাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করা না হত, আমি তা হলে কিছুতেই এখান থেকে বাইরে পা রাখতাম না।" ইমাম তিরমিজী (রঃ) এ হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন।

Contents

পবিত্র মক্কার এও এক বৈশিষ্ট্য যে, এটিকে গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্যে কিবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। গোটা ভূখণ্ডে এ ছাড়া আর কোন কিবলা নেই। এর আরও একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সারা দুনিয়ায় কেবল এই স্থানটির দিকে ফিরে পায়খানা বা প্রস্রাব করা হারাম। এ ব্যাপারে সঠিক মাসআলা হল এই, ঘরে-বাইরে, বনে-প্রান্তরে যেখানেই হোক, এ প্রতিবন্ধক বহাল থাকবে। এর সমর্থনে এর চেয়েও বেশী দলীল আমার কাছে রয়েছে। অন্যত্র আমি তা বর্ণনা করেছি। এ সব দলীলের সারবত্তা সম্পর্কে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই। এমনকি মরু বা প্রান্তরের সীমারেখা নিয়েও কোন মতভেদ নেই। অবশ্য এখানে মতানৈক্য নিয়ে বহাছ করার অবকাশ নেই।

এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই, মসজিদে হারামই দুনিয়ার বুকে খোদার আদি ঘর। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু জর (রাঃ) বলেন, আমি রসূলে খোদার (সঃ) কাছে দুনিয়ার বুকে খোদার আদি ঘর কোনটি সে সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি জবাব দিলেন—তা হচ্ছে 'মসজিদে হারাম।' আবার প্রশ্ন করলাম—তারপর কোন ঘরটি ? জবাব দিলেন—মসজিদে আকসা। জিজ্ঞেস করলাম—এ দুয়ের ভেতরে পার্থক্য ক'বছরের ? তিনি জবাব দিলেন—চল্লিশ বছরের।

কিছু লোক হাদীছটির সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে পারেনি। তারা সংশয়ে পড়ে যায় যে, এটা সর্বজন বিদিত সত্য যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) আকসা মসজিদ তৈরী করে গেছেন। তাঁর এবং হযরত ইবরাহীমের (রাঃ) ভেতরে এক হাজার বছরের ব্যবধান রয়েছে।

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, সংশয়কারীদের সংশয় নেহাৎ অমূলক ও অজ্ঞতাপ্রসূত। কারণ, হযরত সুলায়মান (আঃ) তো আকসা মসজিদের শুধু মেরামত করিয়েছিলেন; নতুন গড়েননি। আদপে মসজিদে আকসা তৈরী করে গেছেন হযরত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (আঃ)। আর তা হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) মসজিদে হারামের ভিত্তি স্থাপনের চল্লিশ বছর পরের ঘটনা।

মহানগরী মক্কার শ্রেষ্ঠত্বের এও একটি দলীল যে, আল্লাহ তা'আলা একে 'উম্মুল কুরা' বা লোকালয়ের জননী আখ্যা দিয়েছেন। ফলে অন্য সব শহর ও লোকালয় এর সন্তান ও অনুগত হয়ে দাঁড়াল। সুতরাং কোন জনপদই এর সমান মর্যাদা পেতে পারে না। ঘটনাটি এরূপ যে, হযরত (সঃ) সূরা ফাতিহাকে 'উম্মুল কুরআন' আখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং সমগ্র আসমানী কিতাবের ভেতরে তার সমতুল্য সূরা আর হতে পারে না।

মক্কানগরীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, স্থানীয় লোক ছাড়া আর কেউ এ শহরে ইহরাম না বেঁধে প্রবেশ করতে পারেনা। এ বিশেষত্ব আর কোন শহরের নেই। এ মাসআলাটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সবাইকে বলেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আরও একটি 'মরফু' রিওয়ায়েত পাওয়া যায়। অবশ্য তা দলীল হতে পারেনা। তাতে বলা হয়েছে, স্থানীয় হোক বা না হোক, কারুর জন্যেই ইহরাম

না বেঁধে মক্কায় প্রবেশ বৈধ হতে পারেনা। আবু আহমদ ইবনে আদী এ রিওয়ায়েত উধৃত করেছেন। এর সনদের ক্ষেত্রে হাজ্জাজ ইবনে ইরতাতা ও অন্যান্য এমন সব রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছেন, যাঁরা দুর্বল রাবীদের থেকেও রিওয়ায়েত গ্রহণ করে থাকেন। ফিকাহবিদদের এ প্রশ্নে তিন ধরণের অভিমত দেখা যায়।

একটি অভিমতে অস্বীকার করা হয়েছে। অন্যটিতে বাসিন্দাদের ভেতরে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। ইহরাম সীমানার ভেতরে কিংবা বাইরে থাকা নিয়ে এ তারতম্য দেখা দেয়। যারা মীকাতের ভেতরে থাকবে, তাদের দরকার হবে না। আর যারা বাইরে থাকবে, তাদের দরকার হবে। এ শেষ মতটি হল ইমাম আবু হানীফার (রঃ)। প্রথম দুটির প্রথমটি হল ইমাম শাফেঈর ও দ্বিতীয়টি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের।

মক্কা শরীফের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই, সেখানে পাপের ইরাদা করলেও পাপী হবে। কার্যত তা করুক বা না করুক। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ○

"যে ব্যক্তি সেখানে জুলুম ও ইলহাদের ইচ্ছা পোষণ করে, আমি তাকে ক্লেশদায়ক শাস্তিতে ভোগাব।"

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই, ইলহাদ ও জুলুমের সাথে 'বা' শব্দ ব্যবহার করে খোদা পাপের ইচ্ছাকেই শাস্তির যোগ্য বলে ঘোষণা করেছেন। কারণ, যথার্থই যখন কাজটি করার মনোভাব নেয়া হয়, তখন 'আরাদ্‌তু বেকাজা' বলা হয় না; বরং 'হামামতু বেকাজা' বলা হয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা এ জায়গায় পাপের ইচ্ছাকেও শাস্তিযোগ্য বলেছেন। যে ব্যক্তি এখানে সীমা লংঘনের ইচ্ছা রাখবে, তাকেও কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।

এ কারণেই মক্কার পাপের গুরুত্ব বাহ্যিক বিচারে হবেনা, অন্য বিচারে হবে। তাই তা বহু গুণ বেড়ে যাবে। কারণ, খারাপ কাজের পরিণামে খারাপ ফলই মিলবে। যদি সে অন্যায় গুরুতর হয়, শাস্তিও সেই অনুসারে হবে। অন্যায় সামান্য হলে, সাজাও সামান্য হবে। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার মনোনীত শহরে তাঁর বায়তুল হারাম ও ফরাশের ওপরে যে পাপ করা হবে, তা দুনিয়ার যে কোন স্থানে কৃত পাপের চাইতে অনেক গুরুতর বিবেচিত হবে। উদাহরণটি এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, শাহী মহলে এসে যদি কেউ কোন অপরাধ করে, তা বাইরে যে কোন স্থানে কৃত অপরাধের চাইতে বেশী গুরুতর বলে ধরা হয়ে থাকে।

সে যা-ই হোক, পাপ বাড়া কমা নিয়ে এ যুক্তি-তর্কের কোন মূল্য নেই। মূল ব্যাপার খোদাই জানেন। গোপন রহস্য কেবল তিনিই জানেন।

মক্কা শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব এ রহস্যটি হেবেও বুঝা যায় যে, অন্তর স্বতস্ফূর্তভাবে সেখানে যাবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠে। মন-মেজাজ অজ্ঞাতেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে যায়। এ প্রেরণা, আগ্রহ, অধীরতা ও আকর্ষণ চুম্বক লোহার মতই 'নিরাপদ শহর'টির দিকে সর্বদা টানতে থাকে। কবি কত চমৎকারভাবে বলেছেন ঃ

محا سنه هيولى كل حسن — ومغنا طيس افئدة الرجال -

"এ শহরের সৌন্দর্য যেন সব সৌন্দর্যের মূলবিন্দু। নিঃসন্দেহে শহরটি অন্তরের জন্য চুম্বক লোহার কাজ করছে।"

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা এ শহর সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اِنَّهٗ مَثَابَةً لِلنَّاسِ

"নিশ্চয়ই সেটা মানুষের সমবেত হবার স্থান" অর্থাৎ মানুষ প্রত্যেক এলাকা ও অলিগলি থেকে সেখানে যিয়ারতের জন্যে এসে জড়ো হবে। আর যতবার আসবে, তত আরও আসার পিপাসা দেখা দেবে, আকাংখা ততই বেড়ে যাবে।

لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها
حتى يعود اليها الطرف عشاقا

"চোখ ফিরাতে না ফিরাতেই আবার চোখ তাকে দেখার জন্যে ঘুরে আসে।"তাই কে জানে এর জন্যে কত লোক খোদার খাতিরে শহীদ হয়ে গেছে! কত জনের চামরা তুলে নেয়া হয়েছে! কত শত লোক ঘায়েল হয়েছে! কত লোক এর জন্যে নিজ জান মাল সব উৎসর্গ করে দিয়েছে। কতশত লোক খোদার মহব্বতে নিজ সন্তান-সন্তুতি, স্ত্রী, ভাই-বোন ও আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে এখানে ছুটে আসছে। অথচ তাদের সামনে নানারূপ ভয়-ভীতি, দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ ছিল। কিন্তু বায়তুল হারামের যিয়ারত তাদের সে দুঃখকে আনন্দে পরিণত করেছে। এরূপ মনে হয় যে, অন্তরের সেই স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ যেন যে কোন সর্বোত্তম নিআমত ও আরাম দায়ক কিছু থেকেও অনেক উত্তম।

وليس محبا من بعد شقاءه
عذابا اذا ما كان يرضى حبيبه

"তাকে কে কবে আবার ভালবাসার দাবীদার বলবে, এ পথে যে দুঃখকে দুঃখ মনে করে।"

এ সব মূলত খোদার সম্পর্ক লীলা। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وطهر بيتى

"আমার ঘর পাক সাফ করে দাও।"

এ ভাবে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যই হল এর মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়া। এভাবে খোদা নিজ রসূল ও বান্দাদের প্রত্যক্ষ খেতাব করে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। কারণ,

খোদা যখন কোন মুমিনের সাথে নিজ প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখান, তখন স্বভাবতই তার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য বেড়ে যায়। আল্লাহ ও গায়রুল্লাহর ভেতরে তফাৎ হল এই যে, বৈশিষ্ট্য দান ও মনোনীত করার ব্যাপারটি শুধু আল্লাহ তা'আলারই একচেটিয়া। খোদার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার ফলে সেই মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়, যা পূর্বে কখনো ছিলনা।

সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্নদের কাছে এ রহস্যটি ধরা দেয় না। কারণ, তারা স্থান, কাল, পাত্রের ভেতরে কোন তারতম্য দেখতে পায় না। তারা একের ওপরে অপরের মর্যাদা লাভের কোন কারণ দেখতে পায়না বলেই এ সব ব্যাপারকে অহেতুক বৈশিষ্ট্য দান বলে আখ্যায়িত করে থাকে। কিন্তু, এ ভুল ধারণার বিরুদ্ধে আমার কাছে চল্লিশটিরও বেশী দলীল রয়েছে। অন্যত্র আমি তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এখানে উক্ত ভ্রান্তি অপনোদনের জন্যে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, তাদের কথা মেনে নিলে নবী ও তাঁর শত্রু কাফিরের একই মর্যাদা মেনে নিতে হয়।

এ কথা স্মরণ রাখা উচিত, শুধু অন্যের তুলনায় কিছু গুণ বেশী থাকলেই এ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা লাভ ঘটেনা। তেমনি কোন একখন্ড ভূমি অন্য একখন্ড ভূমির ওপরে ভূমির উৎকর্ষ বা অপকর্ষের জন্যে-বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা লাভ করেনা। বরং সেখানে যদি কোন ভাল কাজ অনুষ্ঠিত হয়, সেটাই তাকে মর্যাদা দেয়। তেমনি কা'বা শরীফ, মসজিদে হারাম, মিনা, আরাফাতের ময়দান ও অন্যান্য নিদর্শনের স্থানগুলোর স্থান হিসেবে অন্য কোন স্থানের ওপর মর্যাদা নেই। এগুলোর যা কিছু মর্যাদা তা অন্য কারণে ও গুণে।

আল্লাহ তা'আলা এ কথাটি নিম্ন আয়াতে প্রকাশ করেছেন। কাফিররা যখন বলল:

لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ؁

"যতক্ষণ পর্যন্ত রসূলকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তা আমাদেরও না দেয়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিছুতেই ঈমান আনিব না।"

আল্লাহ তা'আলা তার জবাবে বললেন:

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ ۔

"কাকে রসূল করতে হবে, তা খোদাই ভাল জানেন।"

মানে, সবাই আর নবুয়তের গুরু দায়িত্ব বহনের ক্ষমতা রাখেনা। সে জন্যে এমন কতগুলো বিশেষ গুণ থাকা দরকার যা কার আছে বা না আছে, তা খোদাই ভাল জানেন। নইলে দেখতে তো সব মানুষই সমান। আদপে যদি সমান হত, তা হলে আর খোদা তা'আলা অনুরূপ প্রতিবাদ করতেন না।

Contents

তেমনি আল্লাহ তা'আলার এ ফরমানটি দেখা যায় ঃ

وَكَذَٰلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ○

"এ ভাবেই আমি একদলকে অপরদলের ওপরে মর্যাদা দিয়ে পরীক্ষা করে থাকি যেন তারা বলে, এ লোকদেরই কি আমাদের ওপরে আল্লাহ মর্যাদা দিয়েছেন ? খোদা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাদের খবর কি ভালভাবে রাখেন না ?"

মানে, কে বা কারা তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা সেটা খোদাই ভাল করে জানেন। তাদেরই তিনি বিশেষ মর্যাদা দান করেন। অকৃতজ্ঞদের তিনি মর্যাদা দান করেন না।

সুতরাং সব স্থানই খোদার শোকর, ইহসান ও মর্যাদার যোগ্যতা রাখেনা। স্থান, ঘর বা ব্যক্তি যা কিছুই তিনি মনোনীত করেন, তার ভেতরে এমন বিশেষ যোগ্যতা ও গুন থাকে যা অন্যত্র থাকেনা। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা মনোনীত করেন। খোদার মনোনয়ন তাকে আরও বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা দান করে। এটাই হচ্ছে তাঁর সৃজন ও মনোনয়ন লীলা। তাই বলেছেন— "তোমার প্রভু যা চান সৃষ্টি করেন ও যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।"

এর চাইতে ভ্রান্ত কথা আর কি থাকতে পারে যে, বায়তুল হারামের এলাকা ও দুনিয়ার অন্য এলাকা এক ! 'হাজরে আসওয়াদ' আর অন্য একখন্ড পাথর সমান ! অন্য যে কোন মানুষ হযরতের (সঃ) সম মর্যাদার ! মূলত, মর্যাদা লাভের ব্যাপারটি মূল বস্তুর সাথে জড়িত নয়; বরং তার সাথে বাইরের যে গুণ আরোপিত হয় তার সাথেই জড়িত থাকে।

মুতাকাল্লেমিনদের এ সব অভিমত ও উদাহরণ শরীআতের সমতার বিধানের দোহাই দিয়ে চালানো হয়। অথচ শরীআতের বিধানে এরূপ সমতার কথা কোথাও নেই। সাধারণত মুতা-কাল্লেমীনরা এ দলীল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। অবশ্য সাধারণত যে সমতার বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে তা দিয়ে মূল সমতা অর্জিত হয় না। কারণ, পরস্পর বিরোধী বস্তুর বাহ্যিক সাদৃশ্য একটি সাধারণ ব্যাপার। ভেতরগত গুণের তারতম্য সত্ত্বেও এরূপ দেখা যেতে পারে। খোদা তা'আলা কখনও প্রস্রাব ও গোলাপি জলে সমতা রাখেন নি। আগুন আর পানিও সমান নয়। তেমনি সাধারণ স্থান ও পবিত্র স্থানগুলো সমান নয়। মহান ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষরা এক হতে পারে না। তাদের ভেতরে তো পেশাব ও মিশ্‌ক এবং আগুন ও পানির চাইতেও বেশী পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

হযরত মূসা (আঃ) ও ফিরাউনের ব্যক্তিত্বের ভেতরে এ ধরণেরই পার্থক্য বিদ্যমান। একটি শাহী প্রাসাদ ও পবিত্র কাবা ঘরের ভেতরে সেরূপ পার্থক্যই রয়েছে। এরূপ দুটি ভূখন্ড

মর্যাদায় এক হতে পারে কি করে, যখন একখণ্ডের মর্যাদা ধর্মতীর্থ হিসেবে দেখা দেয় এবং অন্য খণ্ডের সেরূপ কোন বৈশিষ্ট্য থাকে না ? এ বাতিল ও ভ্রান্ত মতটি খণ্ডন করার জন্যে আর বেশী কিছু বলার ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু বলতে চাই, ইনসাফ প্রিয়, জ্ঞানী ও বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে ব্যাপারটির মূল নক্সা তুলে ধরব। খোদা ও তাঁর বান্দা তাদের ছাড়া আর কারুরে গুরুত্ব দেন না। খোদা যখন কাউকে কোন বিশেষ মর্যাদা দান করেন, তখন বুঝতে হবে সে তার যোগ্যতা কিছু রাখে। সন্দেহ নেই; কাউকে বৈশিষ্ট্য দানের ব্যাপার একমাত্র খোদার। তিনিই সৃষ্টি করেন আর তিনিই পসন্দ করে থাকেন।

এ থেকেই কোন কোন দিন ও মাসের অন্যান্য দিন ও মাসের ওপরে মর্যাদা প্রমাণিত হয়। খোদার কাছে সর্বোত্তম দিন হল কুরবানীর দিন। অর্থাৎ আকবরী হজ্জের দিন। হাদীছে এসেছে, রসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন যে, আমার কাছে সবচাইতে প্রিয় দিন হল কুরবানীর দিন। তারপর ইয়াওমে আরাফা। অবশ্য একটি মত অনুসারে আরাফাতের দিন তা থেকেও উত্তম। ইমাম শাফেঈর (রঃ) সহচরদের অভিমত এটাই। তাদের কথা হল, আকবরী হজ্জের দিন এবং সেদিনের রোযা দু'বছরের পাপের কাফ্ফারা হয়ে থাকে। অথচ আরাফাতের দিন খোদা যত বান্দাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে থাকেন, তা আর কোন দিন করেন না। এ দিনটিতেই আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের সব চাইতে কাছে এসে যান। তারপর যারা সেখানে অবস্থান করে, তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গৌরব প্রকাশ করে থাকেন। এ সত্ত্বেও সঠিক মত আগেরটি। কারণ, তা হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ পরবর্তী মতটি প্রতিষ্ঠার জন্যে সেরূপ কোন হাদীছ নেই।

এটাও সহীহ মত যে, আকবরী হজ্জের দিনটিই কুরবানীর দিন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ۝

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে, ইয়াওমুন নাহ্-রেই (কুরবানীর দিন) তিনি অনুমোদন পেয়েছেন, ইয়াওমে আরাফাতে নয়। সুনানে আবু দাউদে সহীহ রিওয়ায়েত রয়েছে—'হযরত (সঃ) বলেছেন, আকবরী হজ্জের দিনই ইয়াওমুন নাহ্র। এরূপ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও সাহাবাদের একটি দল থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইয়াওমে নাহরের আগে হল ইয়াওমে আরাফা। ইয়াওমে আরাফা অবস্থান, বিনয়, তাওবা ও কান্না-কাটার দিন। আর ইয়াওমে নাহর কুরবানী ও যিয়ারতের দিন। এ কারণেই সে তাওয়াফকে তাওয়াফে যিয়ারত বলা হয়। কারণ, মানুষ যখন আরাফাতের দিনে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে আসে, তখনই ইয়াওমে নাহরে খোদার ঘরে হাজির হওয়ার ও তা যিয়ারত করার অনুমতি মিলে। তাই

সেদিন কুরবানী করা, মাথা মুণ্ডান, পাথর ছোঁড়া সহ হজ্জের অন্যান্য কাজ সম্পাদন করে। কিন্তু, ইয়াওমে আরাফাতের কাজ যথা ওজু, গোসল ইত্যাদি এর আগেই সমাপ্ত হয়ে থাকে।

জিলহজ্জের দশদিন আবার অন্যান্য দিনগুলোর চাইতে উত্তম। কারণ, এ দিনগুলো খোদার কাছে আর সব দিনের চাইতে বেশী মর্যাদার। সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে, রসূল (সঃ) বলেছেন, এ দশদিনে কৃত পুণ্যকাজ খোদার কাছে অবশিষ্ট সকল দিনের কার্য সমষ্টির চাইতে প্রিয়।

সাহাবারা প্রশ্ন করলেন—জিহাদ ফী-ছাবীলিল্লাহর চাইতেও ?

হযরত (সঃ) জবাব দিলেন ঃ হাঁ। জিহাদও তার চাইতে বেশী প্রিয় নয়। হাঁ—যে ব্যক্তি সে পথে নিজ জানমাল নিয়ে এসে কিছুই ফিরিয়ে নেয়নি, তার কথা আলাদা।

এ দশদিনেরই শপথ নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা। যেমন ঃ

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

"ফজরের শপথ ! আর সেই দশ রাত্রির শপথ !"

এ কারণেই এ দশদিনে তাকবীর, তাহলীল ও হামদ-ছানা বেশী করে পড়া মুস্তাহাব। যেমন হযরত (সঃ) বলেন—এ রাতগুলোয় বেশী করে খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী বর্ণনা কর।

অন্যান্য দিনের সাথে এ দিনগুলোর সম্পর্ক হল হজ্জের স্থানের সাথে অন্যান্য স্থানের সম্পর্কেরই মত।

এভাবে রমজান মাস অন্যান্য মাস থেকে উত্তম। তারও শেষ দশদিনের রাতগুলো অন্য সব রাত থেকে উত্তম। আর কদরের রাত্রি হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। এখন যদি প্রশ্ন জাগে যে, জিলহাজ্জের দশ রাত্রি উত্তম, না রমজানের শেষ দশ রাত্রি ? আবার মি'রাজের রাত উত্তম, না কদরের রাত ? তার জবাবে আমি বলব—প্রথম প্রশ্নের ক্ষেত্রে সঠিক মত হল, রমজানের দশ রাত্রিই অপেক্ষাকৃত উত্তম। পক্ষান্তরে জিলহাজ্জের দশদিন রমজানের দশদিন থেকে উত্তম। এ জবাবে সব জটিলতাই দূর হয়। এর দলীল হচ্ছে এই, রমজানের দশ রাত্রি এ জন্যে উত্তম যে, 'লায়লাতুল কদর' রয়েছে তার ভেতরে। আর জিলহাজ্জের দশদিন এ জন্যে উত্তম যে, তার ভেতরে ইয়াওমুন নাহর রয়ে গেছে, ইয়াওমে আরাফাত আছে এবং অন্যান্য হজ্জ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি সম্পাদিত হয়।

এখন রইল শবে মি'রাজ ও শবে কদরের মর্যাদার পার্থক্য বিচার। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়ার (রঃ) কাছে প্রশ্ন করা হল—একজন বলে শবে মি'রাজ শবে কদর থেকেও উত্তম এবং আরেকজন বলে, লায়লাতুল কদর উত্তম। এ দুয়ের ভেতরে কে ঠিক ?

ইবনে তায়মিয়া (রঃ) জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি লায়লাতুল কদর থেকে শবে মি'রাজকে এজন্যে উত্তম বলে যে, সেই রাতে হযরত (সঃ) ঊর্ধলোকে গিয়েছিলেন, তাই এ রাতটিকে প্রতিবছর ইবাদত বন্দেগী করার জন্যে নির্দিষ্ট করে নিলে তাতে লায়লাতুল কদর থেকেও ছাওয়াব বেশী মিলবে, এটা ভুল। কোন মুসলমান এরূপ ফতোয়া দেননি। তাই এটা সুস্পষ্টতই বাতিল ধারণা। ইসলামে এ ধারণার কোন স্থান নেই। দোআ ও ইবাদতের জন্যে কোন রাতকে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে, যদি সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন দলীল থাকে। অথচ শবে মি'রাজের ব্যাপারে সেরূপ কোনই দলীল নেই। সেই মাস, সে মাসের দশদিন কিংবা নির্দিষ্ট সেই রাত সম্পর্কে এরূপ কিছুই বলা হয়নি, যা বলা হয়েছে তা অন্য কিছু। শরীআতেও শবে মি'রাজের ইবাদত মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়নি। পক্ষান্তরে লায়লাতুল কদরের ব্যাপার আলাদা। নবী (সঃ) থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি শবে কদরে ঈমান ও ইহ্‌তিসাবের সাথে ইবাদতে মশগুল থাকবে, তার অতীতের সব পাপ মাফ হয়ে যাবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, রমযানের শেষ দশরাত্রির ভেতরে শবে কদরের সন্ধান কর। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, এ রাতটি হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। কারণ এ রাতেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

অবশ্য যদি কেউ শবে মি'রাজকে এজন্যে উত্তম বলে যে, হযরত (সঃ) এ রাতে ঊর্ধলোকে বিচরণ করেছেন এবং এ রাতে তিনি যে শিক্ষা ও জ্ঞানরত্ন আহরণ করেছেন, তা আর কোন রাতে করেন নি, তা হলে কথাটা স্বীকার করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রেও এ শর্ত থাকবে যে রাতটিকে তা বলে ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করতে পারবে না।

আর এটাও ঠিক কথা নয়, যে স্থানে বা যে সময়ে হযরতকে (সঃ) বিশেষ কোন নিআমত দান করা হয়েছে, সেই স্থান ও সময়গুলি অন্য সব স্থান ও সময় থেকে উত্তম হবে। এ কথা তো তখনই স্বীকার্য হতে পারে, যখন এ কথা প্রামাণিত হবে যে, মি'রাজে হযরত (সঃ) যে নিআমত লাভ করেছেন তা কদরের রাতে প্রাপ্ত নিআমত কুরআনের চাইতেও উত্তম। সত্যি কথা তো এই, নিআমতের এ তুলনামূলক বিচার করতে হলে নিআমতের অন্তর্নিহিত গুণাগুন ও গুরুত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকা দরকার। আর সে জ্ঞান শুধু ওহীর মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। অথচ সে জ্ঞান ছাড়া এ সব আলোচনায় অংশ গ্রহণ অবাস্তব।

পূর্বসূরীদের কেউ শবে কদরের ওপরে শবে মি'রাজকে স্থান দিয়েছেন বলে জানা যায় না। সাহাবা ও তাবেঈনদের কাউকেও এ মাসকে ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করার কথা শোনা যায় না। তারা এরূপ আলোচনাও করতেন না। সে রাত যে কোনটি তাও নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। যদিও শবে মি'রাজ হযরত (সঃ) এর বিশেষ মর্যাদা লাভের জন্যে যথেষ্ট গুরুত্ব রাখে, তথাপি শরীআত সে রাতটিকে কিংবা যে স্থান থেকে মি'রাজ ঘটেছে, সে স্থানটিকে ইবাদতের

জন্যে নির্দিষ্ট করেনি। এমনকি যে হেরাগুহায় ওহীর সূত্রপাত হল, নবী হবার আগে হুযূর (সঃ) যেখানে অবস্থান করতেন, নবী হবার পরে মক্কায় থেকেও তিনি কিংবা তাঁর কোন সহচর সেখানে নির্দিষ্ট কোন ইবাদতের ইচ্ছা পোষণ করেন নি। আর ওহী নাযিলের দিনটিকে মর্যাদা দেবার লক্ষ্যে কোনরূপ ইবাদতের জন্যে তিনি কিংবা তাঁর সহচরদের কেউ চেষ্টা করেন নি।

এরূপ যারা বিশেষ স্থান ও সময়গুলো ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে থাকে, তারা হল আহলে কিতাব। তারা হযরত ঈসার (আঃ) জীবনের ঘটনাবলী পড়ে ইবাদতের স্থান ও সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। যেমন, তাঁর জন্মদিন ও অন্তর্ধানের দিন।

হযরত উমর (রাঃ) একদিন দেখলেন, কিছুলোক নির্দিষ্ট এক জায়গায় জড়ো হয়ে নামায পড়ছে। তিনি ব্যাপারটা কি তা জানতে চাইলেন। তারা জবাব দিল, এখানে হযরত (সঃ) একদিন নামায পড়েছিলেন। তা শুনে তিনি বলেলনঃ তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। যদি কোন নামাযের ওয়াক্তে তোমরা এখানে এসে পড়, তা হলে নামায পড়ে যাও। তা না হলে নিজের পথ দেখ।

কিছুলোকের মত এই, নবীর (সঃ) জন্যে শবে মি'রাজ এবং উম্মতের জন্যে শবে কদর উত্তম রাত। তাই নবীর (সঃ) কাছে শবে কদরের থেকে শবে মি'রাজ এবং উম্মতের কাছে শবে মি'রাজের চেয়ে শবে কদর উত্তম।

ইয়াওমুল জুম'আ ও ইয়াওমুল আরাফা

যদি প্রশ্ন করা হয়, জুমআ ও আরাফার ভেতরে কোন দিনটি উত্তম? তার জবাবে ইবনে হাব্বান নিজ সংকলনে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রিওয়ায়েত করেছেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, জুম'আর দিনের চাইতে কোন উত্তম দিনকে সূর্য দেখেনি। ঠিক এ ভাবেরই একটি রিওয়ায়েত তামীম ইবনে আউস থেকে রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, সূর্যোদয়ের ফলে যতদিন সৃষ্টি হয়েছে তার ভেতরে জুমআর দিনই উত্তম।

কিছু সংখ্যক আলিম এ সব হাদীছ থেকে দলীল নিয়ে আরাফাতের দিনের চেয়ে জুম'আর দিনকে উত্তম বলে মত দিয়েছেন। কাজবী আবু ইয়ালী ইমাম আহমদ (রঃ) থেকে একটি রিওয়ায়েতের উধৃতি দিয়েছেন। তাতে আছে, জুম'আর রাত কদরের রাত থেকেও উত্তম।

সঠিক মত হল এই, সপ্তাহের অন্যান্য দিনের চাইতে তা উত্তম। পক্ষান্তরে নহর ও আরাফার দিন বৎসরের অন্যান্য দিনগুলির চাইতে উত্তম। এ হুকুমই রয়েছে কদর ও জুম'আর রাতের প্রশ্নে। এ জন্যেই জুম'আর দিনে আরাফাতে অবস্থান করা অন্য সব দিনে অবস্থানের চাইতে কয়েক দিক থেকেই উত্তম। প্রথমে, অন্যান্য দিন থেকে উত্তম দুটো দিনের একত্র হওয়া। দ্বিতীয়,

এ দিনটিতে দোআ কবুল হবার একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে। অধিকাংশের মতে, তা আসরের পরেই। অবস্থানকারী তখন বিনয়ের সাথে প্রার্থনার জন্যে দাঁড়ায় এবং দোআ কবুলের বিশেষ মুহূর্তটি লাভ করে। তৃতীয়, এ দিনটিতেই হযরত (সঃ) আরাফাতে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর সাথেও একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। চতুর্থ, এ দিনটিতে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় মানুষ জুম'আ ও খুৎবার জন্যে সমবেত হয়ে থাকে। তাই ইয়াওমে আরাফায় আবার আরাফাতেও জুম'আর সমাবেশ ঘটে। তখন মসজিদে মসজিদে মুসলমানদের সমাবেশ ও আবেদন নিবেদনের ফলে আরাফাতে অবস্থানকারীদের যে মর্যাদা লাভ ঘটে, তা অন্যদিনে ঘটেনা। পঞ্চম, এটাও কথা যে, আরাফায় অবস্থানকারীদের ইয়াওমে আরাফার ও ইয়াওমে জুম'আর দুটো আনন্দই মিলে থাকে। এ জন্যেই আরাফায় অবস্থানকারীদের রোযা থাকা নিষিদ্ধ। নাসায়ীতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, হযরত (সঃ) আরাফায় অবস্থানকারীদের রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। এ বর্ণনাটি সন্দেহমুক্ত নয়। কারণ, বর্ণনাকারীদের অন্যতম মাহদী ইবনে হরফ জাওযী অপরিচিত ব্যক্তি। অথচ রিওয়ায়েতটি নির্ভর করে তারই ওপরে। তবে উম্মে ফযলের হাদীছে প্রমাণিত হয়, আরাফা'র দিন হযরত (সঃ) রোযা রেখেছিলেন কিনা তা নিয়ে সাহাবাদের ভেতরে সংশয় দেখা দিয়েছিল। একদল বললেন, তিনি রোযা রেখেছিলেন। আরেকদল বললেন, না। তখন তাঁর কাছে এক পেয়ালা দুধ দেয়া হল। তিনি তখন আরাফার ময়দানে একটি উটে বসা ছিলেন। দুধটুকু তিনি পান করলেন।

আরাফাতের ময়দানে ইয়াওমে আরাফায় রোযা না রাখা মুস্তাহাব হওয়ার রহস্য নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন, 'দোআকার্যে শক্তি লাভের জন্যে'। হারবী ও অন্যকিছু লোক এ মত পোষণ করেন। অন্যান্যের মত আলাদা। তাদের ভেতরে ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ) বলেন, আরাফার দিনটি আরাফায় অবস্থানকারীদের আনন্দোৎসবের দিন। তাই তাদের রোযা রাখা ঠিক নয়। তার দলীল হচ্ছে সুনানে উধৃত হাদীছটি। তাতে হযরত (সঃ) বলেন—হে ইসলাম পন্থীগণ! আরাফা, কুরবানী ও মীনার দিন আমাদের জন্যে ঈদ।

আমাদের শায়েখ (ইমাম ইবনে তায়মিয়া) বলেন, ইয়াওমে আরাফা আরাফাতবাসীর জন্যে তাদের একত্রে সমাবেশ উপলক্ষে ঈদই বটে। অন্যান্য লোক ইয়াওমে নাহুরে জমায়েত হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের জন্যে সেদিন ঈদ। তাই আরাফার দিনটি যদি জুম'আর দিনে হয়, তা হলে দুটো ঈদের সমাবেশ ঘটে। ষষ্ঠ, এ দিনটিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিআমত বান্দাদের ওপরে পূর্ণ করে দিয়েছেন। সহীহ বুখারীতে তারিক ইবনে শিহাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ইয়াহুদী হযরত উমরের (রাঃ) কাছে উপস্থিত হয়ে বলল--হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি আপনাদের গ্রন্থ থেকে একটি আয়াত পড়ে থাকেন। সে আয়াতটি যদি আমাদের ইয়াহুদী জাতির ওপরে অবতীর্ণ হত, তা হলে তার অবতরণের দিনটিতে আমরা ঈদ উদযাপন করতাম।

তিনি প্রশ্ন করলেন—সেটা কোন আয়াত ?

ইয়াহুদী জবাব দিল—সে আয়াতটি এই ঃ

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا -

"আজ তোমাদের জন্যে আমি তোমাদের জীবন বিধান পূর্ণ করে দিলাম। আর তোমাদের জন্যে শুধু ইসলামকেই ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।"

তখন হযরত উমর (রাঃ) বললেন—আমি সেই দিনটিকে জানি। কোথায় নাযিল হয়েছে, তাও জানি। এ আয়াত জুম'আর দিন আরাফাত ময়দানে হযরতের (সঃ) ওপরে অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরাও তখন আরাফায় ছিলাম।

সপ্তম, এ দিনটি কিয়ামতের দিনে মানুষের হাশর ময়দানে বিরাট সমাবেশের সাথেও সামঞ্জস্য রাখে। কিয়ামতও জুম'আর দিনেই ঘটবে। যেমন হযরত (সঃ) বলেছেন ঃ "সূর্যোদয়ের ফলে যত দিন সৃষ্টি হয়েছে তার ভেতরে জুমআর দিন সর্বোত্তম। এ দিনে আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে নেয়া হয়েছে। এ দিনেই আবার তাঁকে জান্নাত থেকে বের করা হয়েছে। এ দিনে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যে মুহূর্তে কোন বান্দা যদি খোদার কাছে কোন বস্তু প্রার্থনা করে, তা অবশ্যই লাভ করবে।"

এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের জন্যে একটা দিন নির্ধারিত করে দিয়েছেন একত্র হবার উদ্দেশ্যে। এ দিনে বেহেশত-দোযখের আদি-অন্ত বর্ণনা করা হয়। এ উম্মতদেরই জন্য আল্লাহ তা'আলা এ দিনটি এ জন্যে নির্ধারিত করেছেন যে, শুরু ও পরিণতি দুটোই এতে রয়েছে। এ জন্যে নবী (সঃ) ফজরের নামাযে সূরা 'সিজদা' ও 'হাল আতা আলাল ইনসান' সূরাটি পাঠ করতেন। কারণ, এ সূরা দুটিতে যেদিন হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হল, তার আদি-অন্ত সব বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এতে মানব জাতির শুরু, পরিণতি, জান্নাতে ও জাহান্নামে প্রবেশ সবই বলা হয়েছে। যেন সেদিন মুসলিম জাতি সেই আদি-অন্ত বর্ণনা করে। এ ভাবে মানুষ দুনিয়ার সব চাইতে বড় স্থান ও মহান অবস্থানের স্মরণকে জিইয়ে রাখে। সেটি হল আরাফার দিন। সেখানে মহান প্রতিপালকের সামনে বিরাট একদল মানুষ এমনিভাবে দাঁড়াবে যেন জান্নাত ও জাহান্নামবাসী নিজ গন্তব্যে পেঁছে যাচ্ছে।

অষ্টম, আরেক কথা এই, জুম'আর দিনে দিন ও রাত মিলিয়ে মুসলমানরা অন্যান্য দিন থেকে বেশী ইবাদত করে থাকে। এমনকি অধিকাংশ পাপী মুসলমানও বৃহস্পতি ও শুক্রবারকে

মর্যাদার চোখে দেখে। তারাও মনে করে, এ দিনে পাপ করলে যখন তখন খোদার আজাব এসে যাবে। এটা তাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে আছে, তারা এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। এ সব তো এ কারণেই হয় যে, এ দিনটি খোদার কাছে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। অন্যান্য দিনের ভেতর থেকে খোদা এ দিনটিকে বেছে নিয়েছেন। সন্দেহ নেই, এ দিনটির অন্যান্য দিনের ওপরে মর্যাদা লাভের এটাই কারণ।

নবম, জুম'আর দিনের মর্যাদা লাভের আরেক কারণ হল : এ দিনে জান্নাতবাসী খোদার দীদার লাভ করবে। এক প্রশস্ত ময়দানে জান্নাতবাসিদের জমায়েত করা হবে। মতি, সোনা, জবরজদ, ইয়াকুত ও মিশ্কের তৈরী মিম্বরের ওপর থেকে তারা খোদা পাকের দর্শন লাভ করবে। খোদা তাঁর নূরের জ্যোতি প্রদর্শন করবেন। সে দিন তারা খোদাকে নিজ চোখে দেখবে। পূণ্য কাজের সুফল হাতে হাতে পেয়ে যাবে। যাঁরা মসজিদে সবার আগে যেতেন এবং ইমামের কাছাকাছি গিয়ে বসতেন তাঁরা খোদারও বেশী কাছাকাছি যেতে পারবেন। তাই জান্নাতবাসী খোদার দীদারের দিনের জন্যে অধীর আপেক্ষায় থাকবে। আর তা এ দিনেই ঘটবে। যদি দিনটি আরাফার দিনের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়, তখন তার মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য আরও বেড়ে যাবে। সেদিনটি হবে সব চাইতে উত্তম।

তার কারণ হল এই, আল্লাহ তা'আলা আরাফার দিন বান্দার খুব কাছাকাছি থাকে। তারপর সেই বান্দাদের নিয়ে ফেরেশতাদের সামনে বড়াই করেন : "আমার এ বান্দারা চায় কি ? আমি তোমাদের সাক্ষ্য রাখছি, তাদের আমি ক্ষমা করে দিলাম।"

খোদার সান্নিধ্য লাভের দরুন তাদের মকবুল দোআর মুহূর্তটিও মিলে যায়। তারা প্রার্থনা করে খোদার কাছে এগিয়ে যায় এবং খোদাও তার জবাবে এগিয়ে আসেন।

খোদার সান্নিধ্য দু,ধরণের হয়ে থাকে। একটা হল দোআ কবুলের সান্নিধ্য। দ্বিতীয় হচ্ছে, আরাফায় অবস্থানকারীদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে বড়াইয়ের সান্নিধ্য। ঈমানদারগণ এ সব কল্যাণকর ব্যাপারগুলো অনুভব করে থাকে। নিজ প্রভুর অনুগ্রহ ও অবদানে তাদের ঈমান দৃঢ় হয়। ফলে তারা যথেষ্ট তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করে। রহমত লাভের আশায় খুশীর উৎসব উদযাপন করে। এ সব কারণে আরাফার দিনে যে জুম'আর দিন আসে, তার মর্যাদা অন্য সব দিনের চাইতে বেশী।

কিন্তু জনসাধারণ যে বলে থাকে, এরূপ দিনের ইবাদত সত্তরটি হজ্জের সমান, তা ভুল। রসূল (সঃ), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনদের কারুর কাছ থেকেই এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

●

পবিত্র বস্তুই খোদার প্রিয়

আল্লাহ তা'আলা সব সৃষ্ট বস্তু থেকে পবিত্রতম বস্তুটি পসন্দ করেছেন এবং নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন। যেহেতু তিনি নিজে পবিত্র, তাই পবিত্র বস্তু ভালবাসেন। তেমনি পবিত্র কথা ও কাজ, পবিত্র দান-দক্ষিণা পসন্দ করেন। কথাটি এভাবে বুঝুন যে, সব পবিত্র বস্তুই খোদার মনোনীত বস্তু।

এখন রইল অপবিত্র বস্তু সৃষ্টির প্রশ্ন। সৃষ্টি তিনি দুটোই করেছেন যেন বান্দার ভাল-মন্দ প্রকাশ পায়। কারণ, ভাল বান্দা ভাল কিছুই চাইবে, ভাল ছাড়া সে কিছুই পসন্দ করবে না। ভাল বস্তু ছাড়া সে আর কিছুই সহ্য করতে পারে না। খারাপ কিছুই তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। ভাল ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে সে তৃপ্ত হতে পারে না।

তাই খোদার কাছে কোন কিছু বলতে হলে ভাল কথাই বলা উচিত। রুচি বিগর্হিত কথা, অমার্জিত ভাষা, মিথ্যা, পরনিন্দা, অপবাদ, ভুল কথা, বাহুল্য আলোচনা ইত্যাদি তিনি অত্যন্ত ঘৃণা করেন। কাজের ব্যাপারেও তিনি এরূপ। ভাল কাজ তাঁর প্রিয়। ভাল কাজ বলতে শরীআত সংগত ও বিবেকপ্রসূত কাজকেই বুঝায়। সঠিক বুদ্ধি সম্পন্ন লোক যে কাজকে ভাল বলে থাকেন। শরীআত, জ্ঞান ও প্রকৃতি যে কাজকে ভাল বলে একমত হয়েছে। যেমন, একই প্রভুর উপাসনা করা উচিত। তাঁর কোন অংশীদার করা উচিত নয়। নিজ প্রবৃত্তিকে তাঁরই নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেয়া উচিত। তাঁর ভালবাসা অর্জনের জন্যে সব প্রচেষ্টা ও শক্তি নিয়োজিত করা দরকার। তাঁর সৃষ্ট বস্তুর সাথে সাধ্যমতে ভাল ব্যবহার করা উচিত। তাদের যথাসাধ্য কল্যাণ সাধন করা প্রয়োজন। নিজের প্রতি যেরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, অপরের প্রতি সেরূপ করা দরকার। কাউকে পথে আনতে হলেও সেরূপ প্রচার পদ্ধতি অবলম্বন করা দরকার তার নিজের বেলায় যেরূপ হলে সে ভাল মনে করত। যেরূপ মীমাংসা হলে সে নিজের ব্যাপারে খুশী হত, অপরের ব্যাপারেও সেরূপ মীমাংসা করে দিবে। অপরের দেয়া আঘাতকে সহ্য করবে। কিন্তু, নিজে অপরকে আঘাত দিবে না। পরন্তু তার মর্যাদা রক্ষা করবে এবং কোন রূপ প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করবে না। যদি তার ভাল কিছু জানা থাকে, বলে বেড়াবে। তার খারাপ দিকটা ঢেকে চলবে। ততক্ষণ পর্যন্ত তার ওজর-আপত্তি মেনে চলবে, যতক্ষণ না তা শরীআত বা খোদার বিধি-নিষেধ লংঘন করে।

তেমনি চরিত্রও নেহাৎ উন্নত ও পবিত্র হওয়া উচিত। যেমন, ধৈর্য, ব্যক্তিত্ব, স্থিরতা, গাম্ভীর্য, বিশ্বস্ততা, ইনসাফ, নম্রতা, সততা, উদারতা ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। পক্ষান্তরে হিংসা, ধোকাবাজী,

জালিয়াতি ইত্যাদি না থাকা চাই। তা ছাড়া ঈমানদারদের সাথে বিনয় ব্যবহার ও তাদের মর্যাদা দান এবং খোদার দুষমনদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা ও গায়রুল্লাহর কাছে কঠিন থাকা দরকার। আবার পবিত্রতা, বীরত্ব, দানশীলতা, কৃতজ্ঞতা এক কথায় শরীআত, প্রকৃতি ও বিবেক সম্মত চরিত্রের অধিকারী হওয়া।

তেমনি পবিত্র পানাহারের ব্যবস্থা করা চাই। হালাল ও রুচি সম্মত খানাপিনা গ্রহণ করা উচিত। তা যেন একাধারে আত্মা ও দেহের পরিপুষ্টি সাধন করে। তাতে যেন ইবাদতের প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

এ ভাবে বিয়ের ব্যাপারেও পবিত্রতা রক্ষা করা উচিত। পরিবেশ উত্তম ও পবিত্র হওয়া দরকার। বন্ধু-বান্ধব নির্বাচনের ব্যাপারেও সেটা লক্ষ্য থাকা চাই।

তেমনি দেহ, চরিত্র, কাজ ও কথা, খাওয়া ও পরা, ঘর ও বাড়ী, ওঠা ও বসা সব কিছুই পাক-পবিত্র হওয়া চাই। এ ধরণের মানুষের উদাহরণ দিতে গিয়ে খোদা বলেছেন—যখন তারা মরণোন্মুখ হয়, তখন ফেরেশতা তাদের কাছে এসে বলে ঃ

سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ০

"তোমাদের ওপরে শান্তি নাযিল হোক। যে সব ভাল কাজ করেছ, তার বদৌলতে এখন জান্নাতে প্রবেশ কর।"

ওপরের আয়াতে 'ফাদখুলু' এর 'ফা' শব্দটি 'কারণ' অর্থ প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ পবিত্র জীবন যাপনের কারণে এখন জান্নাতে প্রবেশ কর। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন ঃ

اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ

لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ ০

"অপবিত্র নারী অপবিত্র পুরুষের জন্যে ও অপবিত্র পুরুষ অপবিত্র নারীর জন্যে এবং পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষের জন্যে ও পবিত্র পুরুষ পবিত্র নারীর জন্যে।

এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, খবীছ লোকের কথাবার্তা অপবিত্র এবং পবিত্র লোকের কথাবার্তা পবিত্র হয়ে থাকে। এ তাফসীরও করা হয় যে, পবিত্র পুরুষের জন্যে পবিত্রা স্ত্রী হবে এবং পবিত্রা নারীর জন্যে পবিত্র পুরুষ থাকবে।

এ আয়াতটির মর্ম সাধারণ ও ব্যাপক। অর্থাৎ পবিত্র লোকের কথাবার্তা, কার্যকলাপ ও স্ত্রী-পুত্র সবই পবিত্র হবে। পক্ষান্তরে খবীছদের কথাবার্তা, কাজ কর্ম ও স্ত্রী-পুত্র সবই খবীছ হবে।

Contents

এ ভাবে আল্লাহ তা'আলা যত সব পবিত্র চরিত্রের লোক বেহেশতে ও অপবিত্র অসৎ লোকগুলো দোযখে একত্র করবেন।

আল্লাহ তা'আলা তিনটি আবাসস্থল তৈরী করে রেখেছেন। পবিত্র লোকদের জন্যে আলাদা ঘর করেছেন। অপবিত্রদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। সেখানে যত সব পবিত্র বস্তু সরবরাহ করা হবে। তার নাম জান্নাত। খবীছ লোকদের জন্যে আলাদা বাসস্থান করেছেন। সেখানে শুধু অপবিত্র লোকরাই থাকবে। তার নাম জাহান্নাম। তৃতীয় আবাসস্থল হল পৃথিবী। এখানে পাক ও নাপাক দু'দলই একত্রে বসবাস করবে। এই ভাল-মন্দে মিশ্রণের দরুনই এখানে এত বিপদ আপদ ও দুঃখ কষ্ট দেখা দেয়। এ সবই খোদার লীলাখেলা। যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা পাক ও নাপাক আলাদা করে ফেলবেন। বস্তুত, পবিত্র লোকদের জন্যে ও তাদের পবিত্র পুত্র-পরিজনদের জন্যে পৃথক বাসস্থান মিলবে। সেখানে অন্য কেউ যাবে না। অপবিত্রদের জন্যেও পৃথক বাসস্থান থাকবে। সেখানেও অন্য কেউ যাবে না। এ দু'ধরণের বাসস্থানই তখন থাকবে। খোদা দু'দলের কার্যকলাপ অনুসারে দু'জাগায় ঠাঁই দেবেন। নেক বান্দাদের ভাল কাজের জন্যে পূর্ণ সুখ শান্তির ব্যবস্থা রাখবেন। পক্ষান্তরে বদ লোকদের জন্যে তাদের খারাপ কার্যকলাপের কারণে কঠিন শাস্তি ও দুঃখ কষ্টের ব্যবস্থা করবেন। তাদের পূর্ণ শাস্তিলাভের যথাযথ আয়োজন রাখবেন। তাঁর কলা কৌশল বিরাট। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সর্বোপরি রয়েছে। বান্দা যেন তাঁর প্রতিপালন ক্ষমতার পরিপূর্ণতা এবং জ্ঞান, ইনসাফ ও করুণার অসীমতা অবলোকন করতে পারে। খোদার দুষমনরা যেন বুঝতে পায়, তারা কত বড় মিথ্যা ও অন্যায়ে লিপ্ত ছিল এবং নবীরা ঠিকই ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ

الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ ○

"আর তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ নিয়ে বলছে যে, যারা মারা যায় আল্লাহ তাদের পুনর্বার জীবিত করে উঠাবেন না। হাঁ—এ ব্যাপারে তিনি যা ওয়াদা করেছেন, তা সবই ঠিক। কিন্তু, অধিকাংশ লোক তা জানে না। আর তা এ জন্যে করা হবে যে, তারা যা নিয়ে ঝগড়া করত, তার মূল সত্যটি তাদের চোখে যেন ধরা দেয়। আর কাফিররা যেন বুঝতে পারে তারাই মিথ্যাবাদী ছিল।"

মূল কথা, খোদা পাপ ও পুণ্যকে পার্থক্যের মাপকাঠি স্থির করেছেন। তাই পাক দেহ ও পুণ্য আত্মা পবিত্রতারই অনুসারী। তাদের কথাবার্তা, কাজ-কর্ম সবই পবিত্র হয়ে থাকে। অপবিত্র দেহ ও আত্মা অপবিত্র ও অন্যায় কাজই অনুসরণ করে। অর্থাৎ খারাপ কাজ তারা ভালবাসে। খারাপ কাজই তাদের থেকে প্রকাশ পায়। অপবিত্র স্বভাবের মানুষের কথাবার্তা ও চাল চলন সেরূপই হয়। পক্ষান্তরে পুণ্যবানদের থেকে ভাল কথা ও ভাল কাজ প্রকাশ পায়। কখনও একই মানুষের দু'ধরনের অভ্যাসই থাকে। তারপর যখন যেটা প্রাধান্য লাভ করে, তখন সে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়। যদি খোদা তার মঙ্গল কামনা করেন, তা হলে মরণের আগে সে পবিত্র হয়ে যায়। কিয়ামতে তাকে পবিত্র করেই উঠানো হবে। তাই তাকে দোযখে যেতে হবে না। দুনিয়ায় কখনো যথার্থ তাওবা ও নেক কাজের তাওফিক দিয়ে তাকে নিষ্পাপ করে নেয়া হয়। কখনও বিপদে ফেলে তার পাপ কার্যের কাফ্‌ফারা সেরে নেয়া হয়। ফলে খোদার সকাশে সে নিষ্পাপ হয়েই হাজির হয়। এমন লোকও হয়, যাকে সেভাবে নিষ্পাপ করা হয় না। ফলে, পাপ ও পুণ্য দুটোই নিয়ে সে খোদার দরবারে হাজির হয়। যেহেতু খোদার পবিত্র দরবারে কেউ অপবিত্রতা নিয়ে প্রবেশ করতে পারে না, তাই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে যেন তার পাপ জ্বলে গিয়ে বিশুদ্ধ সোনার মত নিষ্পাপ হয়ে বেরিয়ে আসে। এ ভাবে সে তাঁর করুণার ছায়ায় পবিত্র বাসস্থানে ঠাঁই পায়।

এ ধরনের লোকের জাহান্নামে অবস্থানের কাল নির্ণীত হয় তার পাপের মাত্রা অনুসারে। যার পাপ অল্পতেই কেটে যাবে, সে অল্প সময় এবং যার পাপ কাটতে বেশী সময় লাগবে, সে বেশী সময় জাহান্নামে থাকবে। "নিঃসন্দেহে তারা যথাযথ সাজা ভোগ করবে এবং তোমার প্রভু নিজ বান্দার ওপরে জুলুম করেন না।"

যখন দেখা যাবে, মুশরিককে তার চরম অপবিত্রতার কারণে দোযখের আগুন জ্বালিয়েও পাকপবিত্র করতে পারছেনা, যেভাবে সমুদ্রে ডুবিয়েও কুকুরকে পবিত্র করা যায় না, তখন অগত্যা মুশরিকদের জাহান্নামের স্থায়ী বাসিন্দা করে দেয়া হবে। জান্নাত তার জন্যে চিরতরে নিষিদ্ধ করা হবে। পক্ষান্তরে পাপী ঈমানদারদের পাপ স্খলনের পরে জাহান্নাম তাদের জন্যে হারাম করা হবে। কারণ, তাকে বিশুদ্ধ করণের জন্যে আগুনের আর প্রয়োজন থাকবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র। তাঁর হিকমত মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির অনেক ঊর্ধে। মানুষের স্বাভাবিক বিবেক-বুদ্ধিও সাক্ষ্য দিচ্ছে, তিনি সকল বিচারকের সেরা বিচারক। সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালন কর্তা। তিনি ছাড়া কোনই প্রভু নেই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

●

রসূলের প্রয়োজনীয়তা

ওপরের যত সব আলোচনায় আপনারা জানতে পেরেছেন, মানুষ রসূলের (সঃ) পরিচয় লাভ ও তাঁর ওপরে অবতীর্ণ ওহীর সত্যতা স্বীকারের কতখানি মুখাপেক্ষী। হযরতের (সঃ) আনুগত্যের প্রয়োজন তাদের কত বেশী। কারণ, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সাফল্যের চাবিকাঠি কেবল তাঁরই হাতে রয়েছে। তিনি ছাড়া পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বুঝাই অসম্ভব। খোদার সন্তুষ্টিও তাঁরই পবিত্র হাতের মুঠোয় নিহিত রয়েছে।

এ ভাবে ভাল কাজ, ভাল কথা ও উন্নত চরিত্র তাঁরই কল্যাণকর অবদান ওহীর মাধ্যমে পেতে পারি। তাঁর কথা, কাজ ও চরিত্রের কষ্টি পাথরে সবার কথা, কাজ ও চরিত্র যাচাই করা হয়। তাঁরই অনুসরণের ফলে পথপ্রাপ্ত ও বিভ্রান্তদের ভেতরে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। তাই তাঁর প্রদর্শিত সব কিছুর মুখাপেক্ষিতা মূলত দেহের জন্যে আত্মার, চোখের জন্য জ্যোতির এবং আত্মার জন্যে প্রাণের চাইতেও বেশী। যে কোন অপরিহার্য মুখাপেক্ষিতার চাইতেও রসূলের (সঃ) মুখাপেক্ষিতা মানুষের জন্যে অধিকতর অপরিহার্য।

একটু ভেবে দেখ, যদি শরীআত ও ওহীর বার্তা মুহূর্তের জন্যে তোমাদের কাছে না পেঁৗছে, তা হলে তোমাদের আত্মা বিগড়ে যাবে। তোমাদের দশা এই দাঁড়াবে যেন মাছকে পানি থেকে তুলে ডাঙ্গায় ফেলে রাখল। একজন ঈমানদারের জন্যে রসূলের দ্বীন ও খোদার কালাম থেকে সম্পর্কশূন্য হওয়া তার চাইতেও মারাত্মক। এ অনুভূতি শুধু জাগ্রত আত্মারই থাকতে পারে। মৃত আত্মার তো অনুভূতির প্রশ্নই ওঠে না।

বান্দার উভয় লোকের কল্যাণ যখন হযরতের (সঃ) বয়ে আনা বার্তার ভেতরে নিহিত রয়েছে, তখন যে ব্যক্তি উপদেশ ও কল্যাণ পেতে চায়, তার জন্যে অপরিহার্য হল তাঁর পবিত্র অবদান (ওহী) ও জীবন চরিত নিয়ে গভীর গবেষণা চালানো। এ কাজই তাকে মূর্খতার হাত থেকে বাঁচিয়ে তাঁর অনুগত দলের অন্তর্ভুক্ত করে দেবে। কিছুলোক তো এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রসর। কিছুলোক অল্পেই তৃপ্ত। কিছুলোক তো একেবারেই বঞ্চিত।

আদপে মর্যাদা ও অবদান তো খোদারই হাতে। তিনি যাকে চান দেন। তিনিই শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী।

কঠিন পথ

হযরতের (সঃ) মহান জীবন চরিত ও পবিত্র শরীআত যে ভালভাবে জানতে চায়, তার জন্যে এ আলোচনা নেহাৎ নগণ্য। বিদ্যার দৈন্য ও অবস্থার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যে কটা কথা লেখা

Contents

হল, তাতে না জ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত হতে পারে, না জ্ঞানান্বেষনকারীদের দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হতে পারে। কারণ, এ সব কাজ ঘর ছেড়ে পথে প্রবাসে করতে হয়েছে। আত্মা উত্যক্ত, অবস্থা প্রতিকূল, জ্ঞানের উপকরণ ও কিতাবপত্র নাগালের বাইরে। এমন কোন উপযুক্ত সহায়ক নেই যা থেকে জানা শোনার মাত্রা বাড়িয়ে নেয়া যেতে পারে। কল্যাণ ও উপকারের জিম্মাদার যেই জ্ঞান ভান্ডার, তা এখন ডুমুরের ফুল হয়ে উধাও হয়েছে।

জ্ঞান চর্চাকারীদের ওপরে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। মূর্খতার প্রাধান্যের দরুন শিক্ষাবিদের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। ধর্মহীনতা ও কুসংস্কারের উপকরণ বেড়ে যাওয়ায় (প্রকৃত) শিক্ষা-দীক্ষার মূলোচ্ছেদ ঘটে চলছে। এ জন্যে ধৈর্য ধারণ ছাড়া উপায় নেই। একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কোন সমর্থক ও সাহায্যকারী নেই।

وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ .

"এবং তিনিই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আর কত উত্তম সেই অভিভাবক !"

●

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হযরতের (সঃ) বংশ পরিচয়

হযরতের (সঃ) বংশ সারা দুনিয়ার সেরা বংশ। তাঁর শত্রুরাও এ কথা স্বীকার করবে। আবু সুফিয়ান যখন রোমক সম্রাটের কাছে তাঁর পরিচয় দিয়েছিল, সেও বলেছিল, তাঁর কওম সব কওমের সেরা; তাঁর গোত্র সব গোত্রের ভেতরে উত্তম ও তাঁর পূর্বপুরুষ মানব জাতির ভেতরে মর্যাদায় শীর্ষস্থানীয়।

তাঁর ঊর্ধতন বংশ ধারা এ ভাবে চলেছেঃ মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন আব্দুল মান্নাফ বিন কোসা বিন কিলাব বিন কা'ব বিন লুই বিন গালিব বিন কহর বিন মালিক বিন নজর বিন কেনানা বিন খোযায়মা,বিন মুদরাকা বিন ইলিয়াস বিন মুজির বিন আদনান। আদনান হযরত ইসমাঈলের (আঃ) সন্তানদের অন্যতম ছিলেন। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেঈন ও অধিকাংশ বুযুর্গ আলিমের এটাই মত। কিছুলোক বলেছেন—আদনান হযরত ইসহাকের (আঃ) সন্তানদের অন্যতম ছিলেন। এটা ভুল। তা প্রমাণের জন্যে অন্তত বিশটি দলীল মওজুদ রয়েছে। আমি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়ার কাছে শুনেছি, এ দ্বিতীয় মতটি পূর্ব গ্রন্থানুসারীদের ইসরাঈলী ধারার অভিমত। অথচ এটা তাদের গ্রন্থেরও পরিপন্থী। কারণ, তাতে লেখা আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীমকে (আঃ) নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, অনিচ্ছা সত্ত্বে হলেও নিজ পুত্রকে এবং এক বর্ণনা মতে নিজ দাসী পুত্রকে জবেহ করতে হবে। এখানে পূর্ব গ্রন্থানুসারী ও আমাদের ভেতরে এ ব্যাপারে মতৈক্য দেখা যায় যে, হযরত ইসমাইল (আঃ) তাঁর দাসীর সন্তান ছিলেন। সে যাক, যারা দ্বিতীয় মতটি সমর্থন করে, তাদের তাওরাতের এ বাক্যটি থেকে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছেঃ "হে ইসহাক! নিজ পুত্রকে কুরবান কর।" অথচ এ বাক্যটি ইয়াহুদীদেরই রচিত বাক্য। তাওরাতের উপরোক্ত মূল আয়াতের বিরোধীও বটে।

ইয়াহুদীরা হযরত ইসমাঈলের (আঃ) বংশীয় মর্যাদার শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে ঈর্ষা করত। তারা চাইত, এ মর্যাদা আরবদের না দিয়ে নিজেরাই আত্মসাৎ করবে। অথচ আল্লাহ তা'আলা চাইতেন যথাযথ পাত্রেই সে মর্যাদা সমর্পিত হোক। দ্বিতীয়ত, হযরত ইসহাক (আঃ) কি করে 'জবীহুল্লাহ' হতে পারেন, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জননীকে তাঁর ইয়াকুব নামক পুত্র লাভের সুসংবাদ দিচ্ছেন ? যেমন হযরত ইবরাহীমের (আঃ) কাছে ফেরেশতা এসে সুসংবাদ সহ খোদার ফরমান শোনাচ্ছেনঃ

لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحٰقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوبَ ◎

'ভয় নেই, আমি লূতের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হয়েছি। তখন তাঁর (ইবরাহীমের) স্ত্রী সেখানে দাঁড়ানো ছিল। সে তা শুনে হেসে দিল। তাই আমি তাকে ইসহাকের (জন্মলাভের) সুসংবাদ দিলাম এবং তার পরে ইয়াকুবের (জন্মলাভেরও) সুসংবাদ দিলাম।'

সুতরাং এটা অসম্ভব কথা যে, যার পুত্রলাভ সম্পর্কে সুসংবাদ দান করা হয়েছে, তাকেই আবার জবেহ করার নির্দেশ দেয়া হবে। এতে তো কোনই সন্দেহ নেই যে, ইয়াকুবের (আঃ) জন্মের সুসংবাদ দান করা হয়েছিল। সুতরাং সে সুসংবাদ নিশ্চয়ই ইসহাকের (আঃ) জন্যে ছিল। আয়াতের প্রকাশ্য অর্থেই তো এটা প্রকাশ পায়।

যদি কেউ প্রশ্ন করে, তুমি যা বলছ তা যদি ঠিক হত, তা হলে ইয়াকুব শব্দটিকে ইসহাক শব্দের সহিত যুক্ত করে বাক্যে সেটাকে যেরপ্রাপ্ত শব্দরূপে দেখানো হত। তখন বাক্যটি হত 'ওয়া মিন ও'রাএ ইসহাকা ইয়াকুবো' অর্থাৎ ইয়াকুব ইসহাকের পরে জন্ম নিবে। এর জবাবে বলব, ইয়াকুবের পেশপ্রাপ্ত অবস্থা সুসংবাদের জন্যে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কারণ, সুসংবাদের জন্যে বিশেষ ধরনের বাক্য ব্যবহৃত হয়। বাক্যে বিধেয়কে পূর্বে এনে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার এ বাক্যটি ব্যাকরণবিদদের নীতি অনুসারেই গঠিত হয়েছে। বাক্যটি বিধেয় বাক্যে পরিণত হওয়ায় একটি যথার্থ সুসংবাদমূলক বাক্যে রূপান্তরিত হল। যদি এ বাক্যটিতে ইয়াকুব যথানিয়মে যবরপ্রাপ্ত হত, তা হলে তার মর্ম দাঁড়াত এই ঃ

وَقُلْنَا لَهَا مِنْ وَرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوبَ -

'আমি সেই মহিলাকে ইসহাকের পরে ইয়াকুবের সুসংবাদ দিয়েছি।'

বক্তা যখন বলে ঃ

بشرت فلانا بقدوم أخيه وثقله في أثره -

"আমি অমুককে তার ভাই ও সংগেই তার আসবাবপত্র আসার সুসংবাদ দিয়েছি।" তখন দুটো ব্যাপারেরই সুসংবাদ হয়ে যায়। জ্ঞানী লোকের জন্যে ব্যকরণবিদদের এ রীতিটি অপরিচিত নয়।

শব্দটি যেরপ্রাপ্ত করার ভেতরে আরেকটি অসুবিধে রয়েছে। যেমন তুমি বললে ঃ

مررت بزيد ومن بعده عمرو -

"অর্থাৎ আমি প্রথমে যায়েদের ও পরে আমরের কাছ হয়ে গিয়েছি।" এখানে সংযোক্তা বাক্যাংশ স্বয়ং যের প্রাপ্ত শব্দের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। সুতরাং তার ভেতরে ও যেরপ্রাপ্ত শব্দের ভেতরে কোনই পার্থক্য নেই। যেভাবে যেরদায়ক ও যেরপ্রাপ্ত শব্দ হয়ে থাকে।

সূরা 'আস্সাফ্ফাত' এ ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর কুরবানীর পুত্রের ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার ফরমানও এ ব্যাপারটিকে সমর্থন জানাচ্ছে ঃ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ۝ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۝ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ۝ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ۝ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝

"তারপর যখন তারা দু'জনেই আমার কাছে আত্মসমর্পণ করল এবং মাথা কেটে দেবার জন্যে প্রস্তুত হল, তখন আমি ডেকে বললাম ঃ হে ইব্রাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। আমি এ ভাবেই পুণ্যবানদের পুরস্কৃত করি। নিশ্চয়ই এ ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা। তার বদলে আমি এক জানোয়ার জবেহ করে দিলাম। আর এ ব্যবস্থাই আমি পরবর্তীদের জন্যে রাখলাম। ইব্রাহীমের ওপরে শান্তি নাযিল হোক। এভাবেই আমি পুণ্যবানদের পুরস্কৃত করে থাকি। সে আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্যতম।"

আবার বললেন ঃ

وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ -

"আমি তাকে ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম। সে হবে নবী ও নেককারদের একজন।"

খোদার নির্দেশ ধৈর্য সহকারে ধারণ করে থাকায় আল্লাহ তা'আলা এভাবে তাঁকে সুসংবাদ দিলেন। আর এ কথা তো সবাই জানে, যে বস্তুর সুসংবাদ দেয়া হয়, তা তখন বর্তমান থাকে না। সুসংবাদের পরেই তা পাওয়া যায়।

যদি প্রশ্ন করা হয়, দ্বিতীয় সুসংবাদ নবুওত সম্পর্কিত। অর্থাৎ পিতা খোদার নির্দেশ ধৈর্য সহকারে মেনে নিয়েছে। পুত্রও খোদার নির্দেশের সামনে মাথা পেতে দিয়েছে। তখন আল্লাহ

তা'আলা এ আনুগত্যের ওপরে খুশী হয়ে নবুওত দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। তার জবাব এই : সুসংবাদটি নবুওত, নবীর সত্তা ও অস্তিত্ব সবকিছু বুঝিয়েছে। তাই 'নবী' শব্দটি যবর প্রাপ্ত হয়েছে। মানে, সে নবীও হবে। এভাবে যে সুসংবাদ নবীর সত্তাকেই মূলত বুঝিয়ে থাকে, তা তার নবুওত গুণটিকে ভিন্ন করে বুঝাতে পারে না। কারণ : نبيا من الصالحين বাক্যাংশটি মূল বাক্যের সাথে বাড়তি কথা হিসেবে জুড়ে আছে। অথচ মূল কথা ছেড়ে বাড়তি কথাটার ওপরে সুসংবাদ আরোপ ব্যাকরণ রীতিরও বিরুদ্ধ। সুসংবাদ যদি নবুওতের জন্যে হতে পারে, তা হলে নবী সত্তাটির ওপরে তো আরও বেশী করে হতে হবে।

এতে কোন সংশয় নেই যে, যাঁকে জবেহ্ করার কথা ছিল, তিনি মক্কায় ছিলেন। তাই কুরবানীর দিনের কুরবানী সেই স্থানেই করা হয়। যেভাবে সাফা ও মারোয়ার মাঝপথে ছুটাছুটি ও পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি ইত্যাদি হয়ে থাকে ইসমাঈল ও ইসমাঈল জননীর তখনকার অবস্থা প্রকাশ করার জন্যে এবং আল্লাহ তা'আলার কালাম উচ্চকিত করার জন্যে।

এ কথা সবারই জানা আছে যে, মক্কায় ইসহাক বা ইসহাক জননী ছিলেন না; বরং ইসমাঈল ও ইসমাঈল জননীই ছিলেন। তাই কুরবানীর স্থানও বায়তুল্লাহ কিংবা তার আশেপাশে কোথাও ছিল। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) মিলেই এ বায়তুল্লাহ তৈরী করেছিলেন। হজ্ব পূর্ণ হবার জন্যে মক্কায় কুরবানী করা এ জন্যেই শর্ত হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও ইসমাঈলের (আঃ) সময়কার রীতিও তাই ছিল। পূর্ব গ্রন্থানুসারীদের ধারণা অনুসারে যদি তাঁরা সিরিয়ায় থাকতেন, তা হলে কুরবানীর ঘটনাও সেখানে ঘটত এবং সেই অনুসারে আজও মক্কার স্থলে সিরিয়ায় কুরবানী হত।

তা ছাড়া হযরত ইসমাঈলকে (আঃ) আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল আখ্যা দিয়েছেন। মূলত তাঁর চাইতে ধৈর্যশীল দুনিয়ায় এমন কেউ হতে পারে না, যে ব্যক্তি খোদার ডাকে নিজকে জবেহ করার জন্যে প্রস্তুত করে দেবে। পক্ষান্তরে হযরত ইসহাকের যখন উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁকে বিজ্ঞ বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন :

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ○ إِذْ دَخَلُوا

عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ـ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ... ...

... ... قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ○

"তোমার কাছে কি ইব্রাহীমের মাননীয় অতিথিদের খবর পেঁ'ীছেছে? তারা তার কাছে এসে সালাম জানাল। সেও সালামের জবাব দিল। বললঃ (এরা যে) অচেনা সম্প্রদায়ের (লোক)। ... ...তারা বললঃ ভয় পেয়োনা। তারপর তারা এক বিজ্ঞ সন্তানের সুসংবাদ দিল।"

এ সুসংবাদ নিশ্চয়ই ইসহাক (আঃ) সম্পর্কিত। কারণ, তিনিই তাঁর স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। আর হযরত ইসমাঈল (আঃ) তো হযরত হাজেরার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, ইব্রাহীম ও তাঁর স্ত্রীকে বুড়ো বয়সে সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে হযরত ইসমাঈলের জন্ম অনেক আগেই হয়েছিল।

তা ছাড়া খোদা মানুষের ভেতরে দাসীর ঘরের পুত্রের জন্যে সব চাইতে বেশী ভালবাসা দান করেছেন। ইব্রাহীম (আঃ) যখন নিজ প্রভুর কাছে সন্তান প্রার্থনা করলেন আর খোদাও তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন ও সন্তান দান করলেন, তখন খোদার সাথে তাঁর নিভৃত অন্তরের এক গভীর যোগ সূত্র স্থাপিত হল। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজ বন্ধুই করে নিলেন। বন্ধুত্বের স্তর হল এই, বন্ধুর জন্যে অন্তরে এরূপ একনিষ্ঠ ভালবাসা সৃষ্টি হবে যে, সেখানে আর কেউই ঠাঁই পাবে না। তাই যখন সন্তানের ভালবাসা বন্ধুর অন্তরে দেখা দিতে লাগল, তখন বন্ধুত্বের চাহিদা এটাই হয়ে দাঁড়াল যে, খোদা নিজ বন্ধুকে তাঁর নামে সন্তান উৎসর্গ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি যখন সে আদেশও পালন করতে উদ্যত হলেন, তখন সব ভালবাসার অবসান ঘটিয়ে একক খোদা প্রেমের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে গেল। তাই উৎসর্গেরও প্রয়োজন রইল না। শুধু দৃঢ় মনোভাব ও উদ্যোগই সে প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েছে। তাই খোদার পূর্ব নির্দেশ বাতিল হল। জবীহুল্লার (আঃ) বদলে জান্নাতের এক দুম্বা জবেহ হয়ে গেল। খলীল (আঃ) চরম আনুগত্য দেখিয়ে দিলেন। খোদার পরীক্ষাও পূর্ণ হল।

এটাও সবার জানা আছে যে, এ পরীক্ষা পয়লা সন্তানের ওপরেই হয়েছিল। প্রথম সন্তান রেখে দ্বিতীয় সন্তানের ওপরে কখনও কঠিন পরীক্ষা হতে পারে না। খোদা প্রীতির সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে দ্বিতীয় সন্তান দিয়ে পরীক্ষা দেয়া নীতিগত ভাবেও স্বীকার্য নয়।

তা ছাড়া হযরত ইবরাহীমের স্ত্রী হযরত সারার হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈলের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঈর্ষা ছিল। কারণ, হাজেরা ছিলেন দাসী। তাঁর সেখানে যখন সন্তান জন্ম নিল এবং ইবরাহীমের (আঃ) তাঁর প্রতি বিশেষ ভালবাসা দেখতে পেলেন, তখন বিবি সারার ঈর্ষা চরম হয়ে দেখা দিল। অবশেষে খোদা পাক নির্দেশ দিলেন, বিবি হাজেরা ও তাঁর গর্ভজাত সন্তানকে দূরে নিয়ে মক্কার রেখে আসতে। হযরত সারার যেন রাগ ঠান্ডা হয়। এও খোদার রহমত ও সুদৃষ্টির একটি রূপ ছিল। এখন ভেবে দেখুন, এরপরে কি করে তিনি হযরত সারার গর্ভজাত সন্তানকে জবেহ করে বিবি হাজেরার সন্তানকে অক্ষত রাখতে বলবেন? বরং তার লীলা হল এই, বিবি হাজেরার সন্তানকে জবেহ করতে নির্দেশ দিয়ে হযরত সারার

Contents

অন্তরে ঈর্ষার অনল ঠান্ডা করে করুণার বারি সঞ্চয় করে দিলেন। অবশেষে তাঁর কাছেও বিবি হাজেরা ও তাঁর সন্তানের মর্যাদা ধরা দিল। এ ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এটাও দেখিয়ে দিলেন যে, এরূপ ধৈর্যশীলা জননী ও ধৈর্যশীল সন্তানকে খোদা যে কোন বিপদে বিনষ্ট হতে দেন না। তিনি এও বুঝিয়ে দিলেন, দুঃখের পর সুখ ও হতাশার পরে সফলতা একদিন আসবেই।

বস্তুত, সেই শিশু ও তার জননী নির্জন এলাকায় বিদেশ বিভূঁয়ে একা একা কাটিয়েও যতখানি ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে খোদার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, এ অতুলনীয় ত্যাগের জন্যে পরবর্তীকালের লোকেরা তাঁদের পদাঙ্ককেও পথপ্রাপ্তির নিশানা হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং মুসলমানদের জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের স্মরণীয় স্থান ও নিদর্শনগুলোকে ইবাদত ও কুরবানির স্থল করে দেয়া হয়েছে। বিনয়, নম্রতা ও দুর্বলতা প্রকাশের পর আল্লাহ্ তা'আলা নিজ সৃষ্ট জীবের ভেতর থেকে যার ওপরে অনুগ্রহ করতে চান, তার ভেতরে এ বিস্ময়কর সুন্নতটি যিন্দা করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ○ وَذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

"আমার ইচ্ছা যে, পৃথিবীতে যারা দুর্বল, তাদের ওপরে অনুগ্রহ বর্ষণ করি। এমন কি তাদের কর্তৃত্ব দান করি এবং পৃথিবীর উত্তরাধিকার করে দেই। আল্লাহর অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি দান করেন। আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত বড় অনুগ্রহকারী।"

এক্ষণে মূল উদ্দেশ্যে ফিরছি। হযরতের জীবনধারা, চরিত্র ও ওহী সম্পর্কে এখন আলোচনা করব। এর ভেতরে তো কোন মতানৈক্যই নেই যে, তিনি মক্কা নগরীতে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর জন্মের বছর হল 'আসহাবুল ফীল' এর ব্যাপারটি সংঘটনের বছর। এ ঘটনা অনেক আগে ঘটেছে। হাতী নিয়ে মক্কা আক্রমণকারীরা ঈসায়ী ছিল। মক্কাবাসির চাইতে তারা ধর্ম বিচারে উত্তম ছিল। কারণ, মক্কাবাসিরা তখন প্রতিমা পূজা করত। তথাপি তাদের 'আহলে কিতাব'দের ওপরে খোদা জয়ী করলেন। এতে মানুষের কোন হাত নেই। এ তো নবীর (সঃ) পূর্বাগমনের এক পূর্বাভাস ও কারামাত।

হযরতের (সঃ) মহান পিতার মৃত্যুর কাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন, তিনি মাতৃগর্ভে থাকতেই পিতার অন্তর্ধান ঘটে। একদল আবার তাঁর জন্মের পরে পিতার মৃত্যু ঘটে

৬—

বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু, প্রথম অভিমতটিই সঠিক মনে হয়। দ্বিতীয় মত অনুসারে হযরতের জন্মের সাত মাস পরে তাঁর পিতার মৃত্যু ঘটে। তবে তাঁর জননীর মৃত্যুকাল সম্পর্কে কোন মতানৈক্য নেই। তিনি মদীনা থেকে ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে ইন্তিকাল করেন। তখনও হযরতের বয়স সাত বছর পূর্ণ হয়নি।

তারপর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দাদার মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স আট বছর ছিল। অন্যান্য বর্ণনামতে ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত বলা হয়েছে।

এরপরে তিনি চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে এলেন। চাচা বেশ কিছুকাল তাঁর সেবা করলেন। তাঁর বার বছর বয়সে চাচার সংগে তিনি সিরিয়ায় চলেন গেলেন। কোন এক বর্ণনামতে নয় বছর বয়সে এ সফরকার্য ঘটেছিল। এ সফরেই হযরতের সাথে বাহীরা নামক এক পাদ্রীর সাথে দেখা হয়। তিনি আবু তালিবকে পরামর্শ দিলেন যেন এ ছেলেটি নিয়ে সিরিয়া না যান। কারণ, ইয়াহুদীরা তাঁকে হত্যা করতে পারে বলে আশংকা রয়েছে। তাই তাঁর চাচা তাঁকে একটি চাকরের সাথে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। তিরমিজীর এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরতের সাথে সেদিন বিলালকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু, এটা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, বিলাল তো তখন সেখানে ছিলই না। আর যদি তার থাকাটা মেনে নেয়া হয়, তা হলেও এটা তো ঠিক যে, সে তখন আবু তালিব বা আবু বকরের সাথে ছিল না। বাযাযও তাঁর মুসনাদে এ হাদীছটি নিয়েছেন। কিন্তু, তাতে এ কথা বলা হয়নি যে, আবু তালিব হযরতের সাথে বিলালকে পাঠিয়েছিলেন। একটি লোকের সাথে পাঠানো হয়েছে বলে লেখা আছে।

* * *

যাঁদের দুধ পান করলেন

আবু লাহাবের দাসী ছাওবিয়া হযরতকে (সঃ) কিছুদিন স্তন্যদান করেছিলেন। হযরত ছাওবিয়া হযরতের (সঃ) স্তন্যপানের সময়টিতে আবু সালমা আবদুল্লাহ বিন আব্দুল আশাদ মাখযুমীকেও স্তন্য দান করেছিলেন। তা ছাড়া হযরতের চাচা হামযা ইবনে আব্দুল মুত্তালিবকেও দুধ পান করিয়েছিলেন। মুহাদ্দেছীনরা ছাওবিয়ার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

এর পরে হযরত হালীমা (রাঃ) নিজ পুত্র আব্দুল্লার সাথে হযরতকে স্তন্যদান করেন। তাঁর সন্তানদের অপর দুজনের নাম আনীছা ও জুজামা। জুজামা শায়মা নামে খ্যাতি লাভ করেছিল।

হযরত হালীমা হারিছ বিন আব্দুল ওজ্জা বিন রিফা'আর বংশের ছিলেন। তাঁর বাপ-মার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইমামদের ভেতরে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। হযরত হালীমা হযরতের (সঃ)

চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান বিন হারিছ বিন আব্দুল মুত্তালিবকেও দুধ পান করিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান ছিল হযরতের অন্যতম সেরা দুষমন। অবশ্য মক্কা বিজয়ের সময়ে মুসলমান হয়েছিলেন। আর তখন অন্তরের সাথেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

তা ছাড়া হযরত হামযা যখন সা'আদ বিন বকরের ঘরে স্তন্যপায়ী অতিথি হয়েছিলেন, তখন তাঁর মা হযরতকে স্তন্যদান করেছিলেন। হযরত হামযা তখন হযরত হালিমার কাছে ছিলেন। সুতরাং হামযা দু'দিক থেকে হযরতের (সঃ) দুধভাই ছিলেন। ছাওবিয়া ও হযরত হালীমা--এ দু'দিক থেকে।

যাঁদের ক্রোড়ে পালিত হলেন

প্রথমে তিনি নিজ মাতা হযরত আমিনা বিনতে ওহাব বিন আব্দুল মান্নাফ বিন যুহরা বিন কিলাবের ক্রোড়ে পালিত হন। তা ছাড়া ছাওবিয়া, হালীমা ও তাঁর কন্যা শায়মার ক্রোড়েও আশ্রয় নেন। শায়মা হযরতের (সঃ) দুধবোন ছিলেন। এই মহিলাই বনু হাওয়াযেন প্রতিনিধি দলে শামিল হয়ে হযরতের (সঃ) কাছে এলে হযরত (সঃ) তাঁকে নিজ চাদর বিছিয়ে সম্মানের সাথে বসতে দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া হযরত উম্মে আয়মনের ক্রোড়েও তিনি ঠাঁই নিয়েছিলেন। হযরত (সঃ) তাকে বাপ-মা থেকে পেয়েছিলেন। তিনি দাসী ছিলেন। তাঁর স্বামী ছিলেন যায়েদ বিন হারছা। উসামা বিন যায়েদ তাঁরই পুত্র ছিলেন। এ মহিলাই হযরতের (সঃ) ইন্তিকালের খবর পেয়ে যখন ভীষণ কান্না জুড়েছিলেন, তখন হযরত আবু বকর এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ হে উম্মে আয়মান! কাঁদছ কেন? খোদার কাছে তো তাঁর রসুলের জন্যে এখান থেকে বেশী নিআমত রয়েছে।

তার জবাবে তিনি বিলাপ করে বলে চললেন—জানি, খোদার কাছে তার রসুলের জন্যে অনেক ভাল নিআমত রয়েছে। কিন্তু, আমি তো কাঁদছি এই শোকে যে, আসমান থেকে যে খবরাখবর আমরা পেতেছিলাম, আজ থেকে তা বন্ধ হয়ে গেল।

এ কথার ওপরে দু'জনই কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

খাতনার প্রশ্ন

এ প্রশ্নে তিনটি মত দেখা যায়ঃ

প্রথম, হযরত (সঃ) খাতনাকৃত অবস্থায়ই জন্ম নিয়েছিলেন। এর সমর্থনে যে সব হাদীছ বর্ণনা করা হয়, তা সহীহ নয়। আবুল ফারায জাওযী সেগুলোকে 'মওযু' হাদীছ বলে গণ্য করেছেন। এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীছ মিলে না। আর এ ব্যাপারটিকে তাঁর কোন বিশেষত্ব নে মকরাও যায় না। কারণ, বহু ছেলেই মাতৃগর্ভ থেকে খাতনাকৃত অবস্থায় জন্ম নেয়।

মায়মূনী বলেন ঃ "আমি একদিন আবু আব্দুল্লাহর কাছে বললাম, একটি মাস'আলা বলে দিন। কোন এক খাতনাকারী খাতনা করে দিয়েছে। অথচ সবটা কাটেনি। এখন কি করা যায় ?

তিনি জবাব দিলেন ঃ যদি সে শিরোভাগের অর্ধেক কেটে থাকে, তাহলে দ্বিতীয়বার করার দরকার নেই। কারণ, এতেই শিরোভাগ মোটা হয়ে যাবে। যখন এতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে, তখন পুনরায় দরকার হয় না। কিন্তু যদি অর্ধ শিরোভাগের কম কেটে থাকে, তা হলে আবার কাটতে হবে।

আমি বললাম ঃ আবার কাটতে গেলে তো কষ্ট হবে।

তার জবাবে তিনি বললেন ঃ আমার ধারণায় এতেও তো কোন অসুবিধে নেই।

তখন আমি বললাম ঃ আমার এখানে একটি লোক আছে। তার একটি খাতনাকৃত শিশু হয়েছে। এ ব্যাপার দেখে সে উদ্বিগ্ন হল। তখন আমি তাকে বললাম ঃ খোদা তোমাকে যখন কষ্ট থেকে মুক্তি দিয়েছে, তখন ভাবনা কিসের ?

এ কথা শুনে আমাকে আবু আব্দুল্লাহ (বায়তুল মুকাদ্দাসের মুহাদ্দিছ মুহাম্মদ বিন উসমান খলিলী) বললেন ঃ আমাদের ওখানে এরূপ এক খাতনাকৃত শিশু হয়েছে। পরিবারের লোক তাকে আর খাতনা করায়নি। সর্বসাধারণের ধারণা, চাঁদ তার খাতনা করে দিয়েছে। কিন্তু, এসব কুসংস্কার।

দ্বিতীয় মত হল এই, হযরত (সঃ) হযরত হালিমার ছাগল চড়াবার সময়ে যখন ফেরেশতারা এসে তাঁর 'সীনাচাক' করেন, তখন খাতনাও করে দেন।

তৃতীয় মত হল যে, হযরতকে তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব সপ্তম দিবসে তাঁকে খাতনার জন্যে বসান এবং সে উপলক্ষে সবাইকে দাওয়াত দেন। সেখানে তাঁর নামও রাখেন মুহাম্মদ।

এ রিওয়ায়েতটি হল আবু উমর বিন আব্দুল বারের। মুসনাদের এ রিওয়ায়েতটি 'গরীব' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সনদের ধারাটি এরূপ ঃ আমি শুনেছি আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আহমদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন ঈসা থেকে, তিনি ইয়াহিয়া বিন আইউব থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন আবি সুরা আসকালানী থেকে, তিনি ওলিদ বিন মুসলিম থেকে, তিনি শোয়াইব ও তিনি আতা খোরাসানী ও তিনি আকরামা ও তিনি ইবনে আব্বাস থেকে শুনেছেন যে, আব্দুল মুত্তালিব সপ্তম দিবসে হযরতের খাতনা করিয়েছেন। সবাইকে দাওয়াতও দিয়েছিলেন। সেদিনই নাম রেখেছেন মুহাম্মদ।

ইয়াহিয়া ইবনে আইউব বলেন, আমি এ হাদীছটি খুঁজে কোন মুহাদ্দিছের কাছেই পাইনি। শুধু ইবনে আবি সুরার কাছে পেয়েছি।

এ মাস'আলা নিয়ে বিশিষ্ট আলিমদের ভেতরে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। একজন একখানা কিতাব লিখে তাতে বলেছেন ঃ হযরত (সঃ) খাতনাকৃত অবস্থায় জন্ম নিয়েছেন। এর সমর্থনে তিনি রিওয়ায়েতও উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু, সেগুলো প্রামাণ্য নয়। এ লেখকটি হলেন কামালুদ্দীন বিন তালহা। কামালুদ্দীন বিন আদী আবার তার সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ "হযরতকে (সঃ) আরবের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে খাতনা করানো হয়েছে।" আরবে শুধু যে খাতনার প্রচলন ছিল, তাই নয়; বরং খাতনা করানোটা সেখানে মর্যাদার নিদর্শন ছিল।

• • •

Contents

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

●

বিবাহ ও নবুওত

হযরতের (সঃ) বয়স যখন পঁচিশ হল, ব্যবসা উপলক্ষে তিনি সিরিয়ায় গেলেন। বসরা পর্যন্ত তিনি সফর করলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে পরে তিনি খাদীজা বিনতে খুয়াইলদকে বিবাহ করেন। এক রিওয়ায়েতে তখন তাঁর বয়স তেইশ বলেছে এবং অন্য এক রিওয়ায়েতে বলেছে একুশ। উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদিজার (রাঃ) বয়স ছিল তখন চল্লিশ। ইনিই তাঁর প্রথম বিবাহিত স্ত্রী। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হযরত (সঃ) আর কোন বিবাহ করেননি। হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হযরতকে (সঃ) বলেছেন—আপনি আপনার প্রতিপালকের সালাম জানাবেন হযরত খাদীজার কাছে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরতের (সঃ) অন্তরে নিঃসংগ প্রিয়তা ও উপাসনার প্রেরণা জাগিয়ে দিলেন। হেরা গুহায় গিয়ে তিনি রাতের পর রাত ইবাদত করে চললেন। তাঁর অন্তরে নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম ও প্রতিমাগুলোর প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হল। ঘটনা এই ছিল যে, সেই সব খারাপ কাজের প্রতি নবী হবার পূর্ব থেকেই তাঁর তীব্র ঘৃণা জন্মেছিল। যখন তাঁর বয়স চল্লিশ হল, তখন তাঁর নবুওতের জ্যোতি প্রকাশিত হল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে রিসালাতের দায়িত্ব অর্পণ করলেন এবং বান্দাদের কাছে পাঠালেন। তাঁকে নিজ অনুগ্রহে 'আমীনে ওহী' করে বান্দাদের মাঝে নিয়োজিত করলেন।

তাঁর নবুওত প্রাপ্তির দিনটি সবার মতেই সোমবার ছিল। তবে মাসের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। অধিকাংশের মতে সেটা ছিল রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখ। 'আসহাবে ফীল' ঘটনার একচল্লিশতম বছরে তিনি নবী হন। কেউ কেউ তাঁর নবুওত প্রাপ্তি রমযান মাসে ঘটেছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। তার দলীল হল কুরআনের এ আয়াত ঃ

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ ○

"রমযান মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।"

এ মতের হযরতদের দাবী হল এই, এ মাসেই হযরত (সঃ) নবুওত পেয়েছেন এবং কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়েছে। আলিমদের একটি দল এ মতই সমর্থন করেন। তাঁদের ভেতরে ইয়াহিয়া আস সরসরীও রয়েছেন। তিনি নিজ কাসিদায় বলেছেন ঃ

واتت عليه اربعون فاشرقت
شمس النبوة منه فى رمضان

"হযরতের (সঃ) বয়স যখন চল্লিশ হল, তখন রমযান মাসে তাঁকে নবুওতের আলোয় ধন্য করা হল।"

যাঁরা প্রথম মতের অনুসারী, তাঁদের বক্তব্য হল এই, কুরআন শরীফ এক সঙ্গে রমযানে খোদার কাছ থেকে পহেলা আসমানে অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তেইশ বছর ধরে ঘটনার চাহিদা মোতাবেক এক এক করে হযরতের কাছে নাযিল হয়েছিল। একদল বলেছেন, কুরআন শরীফ রমযান মাসের মর্যাদা বাড়িয়ে তোলার জন্যেই সে মাসে অবতীর্ণ করা হয়েছে। এজন্যে এ মাসে রোযা ফরজ করা হয়েছে। একদল আবার রজব মাসে ওহী শুরু হয়েছে বলে মনে করেন।

ওহীর শ্রেণীভেদ

আল্লাহ তা'আলা হযরতকে (সঃ) ওহীর সব শাখারই পূর্ণত্ব দান করেছেন। এক ধরনের ওহী হল সত্য স্বপ্ন। এ পন্হাটি বেশীর ভাগ গোড়ার দিকে অনুসৃত ছিল। তিনি যা কিছু স্বপ্ন দেখতেন, সুবহে সাদিকের মতই তা সত্য হয়ে দেখা দিত।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল এই, ফেরেশতা হযরতের (সঃ) অন্তরে ওহী ঢেলে দেন; অথচ তিনি ফেরেশতাকে দেখতে পান না। যেমন, একটি রিওয়ায়েতে আছে, হযরত (সঃ) বলেছেন, হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আমার মনে জাগ্রত করে দিয়েছেন যে, কোন প্রাণীই মারা যাবে না যতক্ষণ না তার আহার্য শেষ হয়ে যায়। তাই খোদাকে ভয় কর এবং সৎভাবে আহার্য সংগ্রহ কর। রুযী লাভে বিলম্ব দেখলে খোদার নাফরমানীর আশ্রয় নিয়ে তা পেতে যেওনা। কারণ, খোদার কাছে যে নিআমত আছে, তা কেবল তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই পাওয়া যায়।

তৃতীয় পদ্ধতি ছিল এই, ফেরেশতা হযরতের (সঃ) কাছে একটি মানুষের রূপ ধরে আসতেন। হযরতকে সামনে রেখে ওহী জ্ঞাত করিয়ে যেতেন। এরূপ অবস্থায় কখনও বা সাহাবায়ে কিরামরা সেই ফেরেশতাকে দেখতে পেতেন।

চতুর্থ ধরন ছিল এই, ঘন্টির আওয়াজের মত তা আসতে থাকত। ওহীর এ ধরনটি হযরতের (সঃ) জন্যে বড়ই কষ্টসাধ্য হত এবং ফেরেশতাও গোলমালে পড়ে যেতেন। এমনকি শীতের দিনেও হযরতের (সঃ) শরীর ঘামিয়ে যেত। যদি তিনি কিছুতে সওয়ার থাকতেন, তা হলে সওয়ারী সে বোঝার ভারে মাটির সাথে লেগে যেত। একবার এ ধরনের ওহী আসার প্রাক্কালে হযরতের উরুদেশ যায়েদ বিন ছাবিতের (রাঃ) উরুদেশে স্থাপিত ছিল। যখন ওহী আসা শুরু হল, তখন যায়েদের মনে হলো যেন তার উরুদেশ ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে।

ওহীর পঞ্চম রূপ ছিল এই, হযরত (সঃ) ওহী বাহক ফেরেশতাকে তাঁর যথাযথ আকারে দেখতে পেতেন। এ ভাবে ফেরেশতা এসে হযরতকে (সঃ) খোদার ওহী পেঁৗছিয়ে যেতেন। এরূপ ওহী দু'বার এসেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা নজমে এ ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন।

ষষ্ঠ অবস্থা ছিল এই, খোদা স্বয়ং রসূলের কাছে ওহী পৌঁছিয়েছেন। হযরত (সঃ) যখন মি'রাজের রাতে আকাশ পরিভ্রমণে গেলেন এবং নামায ফরজ করা হল, তখন এ অবস্থা দেখা দিয়েছিল।

সপ্তম রূপ ছিল এই, খোদা মূসাকে (আঃ) আড়াল থেকে সম্বোধন করে ওহী শোনাতেন। তেমনি হযরতকেও (সঃ) শুনিয়েছেন। মূসার (আঃ) সাথে এ ধরনের ওহী বিনিময় তো কুর-আনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত হয়। কিন্তু, হযরতের (সঃ) এ ধরনের ওহী প্রাপ্তি সম্বন্ধে মি'রাজের হাদীছে দেখা যায়।

একদল লোক ওহীর অষ্টম রূপের উল্লেখ করেছেন। সেটা হচ্ছে, খোদার সামনাসামনি হয়ে ওহী গ্রহণ। এ পদ্ধতির কথা তারাই বলেছেন যাঁরা খোদার সাথে রসূলের সরাসরি সাক্ষাৎ লাভের কথা বলেন। এ প্রশ্নে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব ইমামদের ভেতরে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। যদিও হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম উক্ত মতই পোষণ করেন। উছমান ইবনে সাঈদ আদ দারেমী বলেন, সাহাবায়ে কিরাম সবাই এ প্রশ্নে এই একই মত পোষণ করতেন।

Contents

সপ্তম পরিচ্ছেদ

●

রিসালাত ও ওহী

আল্লাহ্ তা'আলা হযরতকে (সঃ) চল্লিশ বছর বয়সে রিসালাত দান করেন। এ বয়সটি হল জ্ঞানের পরিপক্কতা ও পূর্ণতা লাভের বয়স।

বর্ণিত আছে, আগেকার নবীরাও এ বয়সেই নবুওত পেতেন। কিন্তু, ঈসা (আঃ) সম্পর্কে যে বলা হয়, তাঁকে তেত্রিশ বছর বয়সে ঊর্ধলোকে তুলে নেয়া হয়েছে, আদপে সে ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য দলীল পাওয়া যায় না।

তাঁর ওহীর শুরু হয় সত্য স্বপ্ন দিয়ে। হযরত (সঃ) যখনই কোন স্বপ্ন দেখতেন, সুবহে সাদিকের মতই তা সত্য হয়ে দেখা দিত। বলা হয়, এ অবস্থা ছ'মাস চলেছিল। আর নবুওতের পূর্ণকাল ছিল তেইশ বছর। তাই 'সত্য স্বপ্ন' নবুওতের ছচল্লিশ ভাগের একভাগ।

এরপরে আল্লাহ্ তা'আলা হযরতকে নবুওতের মর্যাদায় ভূষিত করেন। তিনি তখন হেরা গুহায় ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। এমন সময় ফেরেশতা এসে হাজির হল। তখন তিনি সেখানে নিঃসঙ্গ থাকতেন। সর্বপ্রথম তাঁর ওপরে এ আয়াত নাযিল হল ঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ -

"তোমার প্রতিপালক সৃষ্টি কর্তার নামে পড়।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ও অধিকাংশ আলিমের মত এটাই। হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, সর্বপ্রথম—يَا اَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ নাযিল হয়েছে। কিন্তু, হযরত আয়েশা সিদ্দীকার মতটিই কয়েকটি কারণে ঠিক মনে হয়।

প্রথম, مَا اَنَا بِقَارِئٍ আয়াতটি পরিষ্কার বলে দেয় যে, হযরত (সঃ) এর আগে নিরক্ষর ছিলেন।

দ্বিতীয়, ধারাবাহিকতাও এটা চায় যে, প্রথমে পড়বার ও পরে ভয় দেখাবার দায়িত্ব আদায় করা হয়। কারণ ঃ

اَنْذِرْ مَا قَرَأْ -

(যা পড়েছ তা মানুষকে শুনিয়ে ভয় প্রদর্শন কর) আয়াতও তাই বলে।

৭—

তৃতীয়, এ আয়াত সম্পর্কে হযরত জাবির (রাঃ) যা বলেছেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত কথা। কিন্তু, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা সোজাসুজি হযরত (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ, হযরত জাবিরের (রাঃ) রিওয়ায়েত থেকেও প্রকাশ পায় যে, 'ইয়া আইউহাল মুদ্দাচ্ছির' অবতীর্ণ হবার আগেও ফেরেশতা এসেছিলেন। কারণ, হযরত জাবিরের বর্ণনাটি এ ভাবে লেখা আছে ঃ

"তারপর আমি মাথা তুলে দেখলাম, হেরা গুহায় যে ফেরেশতা এসেছিলেন, তিনি উপস্থিত। অবশেষে আমি ঘরে ফিরে এলাম এবং বললাম, আমার ওপরে কম্বল দাও, চাদর জড়িয়ে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা 'সূরা মুদ্দাচ্ছির' নাযিল করেন।"

এ রিওয়ায়েতে এটা বুঝা যায় যে, হেরা গুহায় যে ফেরেশতা এসেছিলেন, তখন তিনি 'ইকরা' বিইসমে রব্বিকা' নাযিল করেন। তাই জাবিরের রিওয়ায়েতেও সে সূরা পরে নাযিল হয়েছে। বলা বাহুল্য রিওয়ায়েতই দলীল হতে পারে, ব্যক্তিগত মতামত নয়।

দাওয়াতের স্তর ও পদ্ধতি

প্রথম স্তর নবুওত লাভ। দ্বিতীয় স্তর আপনজনদের ভেতরে প্রচার। তৃতীয় স্তর হল, নিজ সম্প্রদায়ের কাছে প্রচার। চতুর্থ স্তর—পূর্ব গ্রন্থানুসারীদের কাছে প্রচার। তাদের অধিকাংশই আরববাসী ছিল। পঞ্চম স্তর—কিয়ামত পর্যন্ত যত জ্বীন ও ইনসান আসবে সবার জন্যে প্রচারে ব্যাপ্তি দান।

প্রথমে তিন বছর তিনি গোপন প্রচার কার্য চালান। তারপর তাঁকে প্রকাশ্যে প্রচার চালাবার নির্দেশ দেয়া হয় ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ٥

"যা কিছু নির্দেশ পেলে তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং মুশরিকদের থেকে ফিরে যাও।"

এরপর হযরত (সঃ) প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করলেন। কিন্তু, তাঁর সম্প্রদায় তাঁর সাথে শত্রুতা-মূলক পন্থা অনুসরণ করল। তাঁর ও মুসলমানদের ওপরে জুলুম করা শুরু করল। অবশেষে দু'বার হিজরতের অনুমতি দেয়া হল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নাম ও উপাধি

তাঁর পবিত্র নাম সমূহ শুধু প্রশংসা প্রকাশের জন্যে, উপাধি স্বরূপ ছিল না। পরন্তু, এমন সব গুণবাচক নামও ছিল যা থেকে প্রশংসা ও যোগ্যতার পূর্ণতা প্রকাশ পেত।

তার ভেতরে একটি নাম হল 'মুহাম্মাদ'। এ পাক নামটি বেশী খ্যাতি লাভ করেছে। তাওরাতে স্পষ্টভাবে এ নামের উল্লেখ রয়েছে। আমি 'জাফাউল আফহাম' গ্রন্থে সর্বোত্তম মহামানব হযরতের (সঃ) মর্তবা বর্ণনা প্রসঙ্গে এ প্রশ্নটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এ বিষয়টি সম্পর্কে সেটা একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ। এ ব্যাপারে তাতে অনেক কিছু জানার রয়েছে। হযরতের (সঃ) দরূদ সম্পর্কেও তাতে অনেক হাদীছ সংকলিত হয়েছে। তা ছাড়া সে সব হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়েও সমালোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে ত্রুটিপূর্ণ হাদীছগুলো সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। তারপর দরূদের রহস্য, ফজীলাত, উপকারিতা ও হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর দরূদের স্থান, তার শরয়ী গুরুত্ব, সে সম্পর্কে আলিম সমাজের বিভিন্ন মত ও সঠিক মতের প্রমাণাদি, পরিবর্তনকারীদের পরিবর্তন ও প্রচারের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে তৃপ্তিদায়ক আলোচনা করা হয়েছে।

মোদ্দা কথা, পূর্ব গ্রন্থানুসারীদের অভিমতও এই যে, তাওরাতে হযরতের (সঃ) 'মুহাম্মাদ' নামেরই উল্লেখ রয়েছে।

তাঁর অপর নাম ছিল আহমাদ। হযরত ঈসা (আঃ) এ নামের উল্লেখ করে গেছেন। এ নামের রহস্যটি আমি সেই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

তা ছাড়া তাঁর অন্যান্য নাম মুতাওয়াক্কিল, মাহী, হাশির, আকিব, মকফী, নবীউত্ তাওবা, নবীউর রহমাত, নবীউল মুলহামাহ, ফাতিহ ও আমীন। এ ছাড়া শাহিদ, মুবাশশির, বাশীর, নাজীর, কাসিম, যহুক, কিতাল, আব্দুল্লাহ, সিরাজুম মুনীর সাইয়েদে আওলাদে আদম, সাহেবে লিওয়াইল হামদ, সাহেবে মাকামিম মাহমুদ ইত্যাদি।

এ ছাড়াও হযরতের (সঃ) কতগুলো সুন্দর নাম রয়েছে। যখনই তাঁর কোন বিশেষ প্রশংসা মূলক শব্দের সাহায্যে তাঁকে স্মরণ করা হবে, মূলত সেটা তো তাঁর নামই হয়ে যাবে। কিন্তু, তাঁর বিশেষ ও মিশ্রিত গুণ বাচক নামের ভেতরে পার্থক্য বজায় রাখা, তার ওপরে মূল নাম ও গুণবাচক নামের ভেতরে তফাৎ বজায় রাখা দরকার। হযরত জাবীর বিন মুতঈম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) স্বয়ং তাঁর নাম সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেছেন :

"আমি মুহাম্মাদ, আহমাদ ও মাহী। আমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কুফরীর বিলোপ সাধন করবেন। আমি হাশির এবং আমার চরণে সব মানুষকে একত্রিত করা হবে। আমি 'আকিব এবং আমার পরে আর কোন নবী হবেনা।"

হযরতের (সঃ) নাম মুবারক দু'ধরনের। কতগুলো শুধু তাঁরই সাথে নির্দিষ্ট। অন্য কোন নবীর তার সাথে সংশ্রব নেই। যেমন, মুহাম্মাদ, আহমাদ, হাশির, আকিব, নবীউল মুলহেমা ও মাকফী। কতগুলো নাম আবার এমন রয়েছে যা অন্যান্য নবীদেরও থাকত। কিন্তু, তাঁর অবশ্য যে সব নামের সাথে সম্পর্ক গভীর ছিল। যেমন, রসুলুল্লাহ, নবীউল্লাহ, আব্দুল্লাহ, শাহিদ, বাশীর, নাজীর, নবীউর রহমাত, নবীউত্ তাওবা। যদি সমস্ত প্রশংসনীয় গুণাবলীকে নাম ধরা যায়, তাহলে তাঁর পুণ্য নাম দু'শ থেকেও বেড়ে যায়। যেমন, সাদিক, মাসদুক, রঊফ, রহীম ইত্যাদি।

এ প্রসংগে একজন বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার এক হাজার নাম এবং রসুলুল্লারও এক হাজার নাম। সেই ব্যক্তি হলেন আবু খাত্তাব বিন দাহিয়া। তাঁর কথার মর্ম হল গুণাবলীসহ সব রকমের নাম।

নামের ব্যাখ্যা

মুহাম্মাদ (সঃ)। এ হচ্ছে 'হামদ' শব্দের 'মাফউল' (কর্ম বাচ্য)। যেহেতু তিনি অসংখ্য প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী, তাই তাঁর নাম হল 'মুহাম্মাদ' (বহু প্রসংসিত)। 'মাহমুদ' থেকে এ নামে প্রশংসার মাত্রাধিক্য বুঝায়। কারণ 'মাহমুদ' তিন অক্ষর বিশিষ্ট ধাতু। আর মুহাম্মাদ তার গুণিতার্থ ধাতু। এতে অর্থে আধিক্য প্রকাশ পায়। মানে, সমগ্র মানবের চাইতেও তিনি প্রশংসনীয়। এ কারণেই হয়ত তাওরাতে এ নামের উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর উম্মত ও শরীআতের এত বেশী প্রশংসা করা হয়েছে যে, মুসা (আঃ) তাঁর উম্মত হবার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। এ নামের ব্যাখ্যা এরূপ হওয়ার দলীল আমি সেখানে দিয়েছি। আবুল কাসিম সুহায়লী এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গোলমেলে করে ফেলেছেন। আমি অনেক দলীল প্রমাণের সাহায্যে এ অর্থ গ্রহণ করেছি।

ব্যাপারটি এই, তাওরাতে হযরতের (সঃ) নাম 'আহমাদ' লেখা আছে। 'হামদ' শব্দ থেকে তা তৈরী হয়েছে। শব্দটিকে 'আফআলুত তাফজীল' এর ওজনে করা হয়েছে। এর অর্থ নিয়ে মতভেদ আছে। একদল ফাএল (কর্তা) অর্থ গ্রহণ করে। অর্থাৎ খোদার সব চেয়ে বেশী প্রশংসাকারী। কারণ আফআলুত তাফজীল এর পদটি মাফউল (কর্ম) সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াটির স্থলে ফাএল (কর্তা) সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াটি থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। আরও দলীল দিতে গিয়ে তাঁরা বলেন, মাফউল এর ওপরে ক্রিয়া আরোপের দিক থেকে এরূপ বাক্য বলা হয় না ঃ

ما اضرب زيدا - زيد اضرب من عمر

আর এরূপ বাক্যও দেখা যায় না ঃ

ما اشربه للماء - ما اكله للخبز

কারণ, 'আফআলুত তাফজীল' ও ফে'লে তা'আজ্জুব' (বিস্ময় বোধক ক্রিয়া) এ উভয় পদই অকর্ম ক্রিয়া থেকে হয়ে থাকে। তাই অকর্ম ক্রিয়ার মূলে শব্দটি কখনও পেশ, কখনও যবর, আবার কখনও যের-- সব হরকতই গ্রহণ করে।

আর ফে'লটির (ক্রিয়ার) সাথে যে হামযা বাড়ানো হয়েছে, তা এ জন্যে যে, সেটাকে সকর্ম ক্রিয়ায় পরিণত করা হবে। এ হামযাটি তাই কর্মবোধক হামযা হল। যেমন,

ما اظرف زيدا - ما اكرم عمرا

আযরাফু ও আকরামু-এ দুটি পদের মূলে হল 'যরফ' ও 'করম'।

ব্যাপারটি আরও পরিস্কার করার জন্যে তিনি বললেন, মূলত, কর্তাই তো বিস্ময়বোধক। সুতরাং অপরিহার্য হচ্ছে, ক্রিয়াও অকর্ম হবে। এখন রইল এ প্রশ্ন ঃ

ما اضرب زيدا لعمرو

এর মূলে শব্দটি জবর ও পেশ প্রাপ্তই হয়েছে। পরে এ দুটোকে সকর্ম ক্রিয়া করা হয়েছে। এ বাক্যে 'আমর' এর প্রথমে 'লাম' এসেছে কর্মবোধক হয়ে।

জবাব এই, যদি এ পদটি এতে সকর্মই হত, তা হলে বাক্যটি এরূপ হত ঃ

ما اضرب زيدا لعمرو

কারণ, এক দিকে তখন ক্রিয়াটি কর্তার সাথে তো যোগ রাখতই। অপরদিকে হামযা জুড়ে নিয়ে সকর্ম ক্রিয়া হত।

কিন্তু, অবস্থা হল এই, একটি বিশেষ্যের দিকে হামযা যোগ করে ও অন্য বিশেষ্যের দিকে 'লাম' যোগ করে সকর্ম ক্রিয়া করতে হয়েছে। তাই তাঁদের মেনে নিতে হয়েছে যে, এ দুটোই 'আফআলুত তাফজীল ও ফে'লে তা'আজ্জুব' অর্থাৎ কর্ম সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া থেকে না হয়ে কর্তা সংশ্লিষ্ট ক্রিয়া থেকে তৈরী হয়েছে।

অন্যান্য মান্যবরেরা তাঁর মত অস্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ দুটো পদই সকর্ম ও অকর্ম দুধরনের ক্রিয়া থেকেই সৃষ্টি হতে পারে। যেমন বলা হয় ঃ

ما اولعه بكذا অর্থাৎ সে এ ব্যাপারে কতখানি লালায়িত? এখানে যেমন ক্রিয়াটি সকর্ম হয়েছে; তেমনি ما اعجبه بكذا কিংবা ما احبه الى বাক্য দুটোর ভেতরে বিস্ময় ও ভালবাসা সকর্ম ক্রিয়াই হয়েছে। ما ابغضه الى ও এ ধরনের উদাহরণ।

ইমাম সিবুইয়া (রঃ) এখানে একটি জ্ঞানগর্ভ রহস্য বর্ণনা করেছেন। তা এই, তুমি যখন বল : ما ابغضنى لـه কিংবা ما احبنى له অথবা ما اشقنى لـه তখন তুমিই কর্তা হয়ে হিংসাকারী, প্রেমিক ও শত্রু হও। তখন কর্তার ক্রিয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করে থাক। আর যখন তুমি বল :

ما احبنى اليه - ما امقتنى اليه - ما ابغضنى اليه -

তখন তোমার সাথে হিংসা, শত্রুতা বা ভালবাসা করা হয়। তখন তুমি কর্মের ক্রিয়ায় বিস্ময় প্রকাশ কর। সুতরাং যে ক্রিয়া 'লাম' যুক্ত হয়ে সকর্ম হয়, তা কর্তার ক্রিয়া এবং যা 'ইলা' দ্বারা হয়, তা কর্মের ক্রিয়া।

অধিকাংশ ব্যাকারণবিদরা এ সব কারণ বর্ণনা করেন নি। মূল ব্যাপার তো খোদাই ভাল জানেন। এ ছাড়া আর যে সব কারণ বর্ণনা করা হয়েছে, তা এই যে, কতৃত্ব নির্ধারণ ও প্রকাশের জন্যে 'লাম' কর্তার সাথে ব্যবহৃত হয়। যেমন : لمن هذا এ বস্তুটি কার ?

জবাব হল : لـزيـد যায়েদের।

কখনও الى ব্যবহৃত হয়। الى من يصل هـذا الـكتاب অর্থাৎ এ কিতাব কাকে দেয়া হবে ? তখন তা কর্মবাচ্য প্রকাশের জন্যে হয়ে থাকে। যেমন জবাব হবে : الى عبد الله অর্থাৎ আবদুল্লাহকে। এর মূল কারণ হল, 'লাম' কতৃত্ব, অধিকার ও বিশেষত্ব প্রকাশের জন্যে আসে। পক্ষান্তরে 'الى' লক্ষ্য বস্তু প্রকাশের জন্যে আসে ও লক্ষ্য বস্তু ক্রিয়ার দাবীর সাথে সংযুক্ত থাকে। এ জন্যে الى কর্মবাচ্যের জন্যেই বেশী উপযোগী। কিন্তু, ক্রিয়ার দাবীর সেটা হয় চরম বস্তু। হযরত (সঃ) সম্পর্কে কা'আব ইবনে যুহায়েরের কবিতার দু'টি চরণে তাই দেখতে পাই :

فلهو اخوف عندى اذ اكلمه
وقيل انك محبوس ومقتول

"যখন আমি তাঁকে লক্ষ্য করে কিছু বলি, তখন তাঁকে সব চাইতে বেশী ভীতিপ্রদ মনে হয়। তখন সবাই আমাকে বলে, তুমি বন্দী হবে কিংবা নিহত হবে।"

এখানে 'আখওয়াফু' 'খায়ফ' থেকে সৃষ্টি হয়েছে। অর্থ প্রকাশ করেছে ভীতিপ্রদ। এর অর্থ ভয় প্রদর্শনকারী নয়।

তেমনি বলা হয় :

ما اجن زيدا من جن

'আজান্নু' এখানে 'মজনূন' (জ্বীনগ্রস্ত) অর্থ প্রকাশ করেছে।

এ মাজহাব হল কূফী ব্যাকরণবিদদের। অবশ্য বসরী ব্যাকরণবিদরা বলেন—এ হচ্ছে ব্যতিক্রম। এরূপ উদাহরণ দুর্লভ। তাই এরূপ উদাহরণ ভাষার নীতি নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে পারে না। এ ধরনের উপমার জন্যে ব্যাকরণ ছেড়ে জনশ্রুতির ওপরে নির্ভর করাই যুক্তিসঙ্গত।

Contents

কুফার ব্যাকরণবিদরা জবাবে বলেন—এ ধরণের উদাহরণ যেহেতু আরবী ভাষায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়, তাই তাকে দুর্লভ বলা চলে না। কারণ, তা তো প্রচলিত ভাষায় থাকে না এবং খুঁজে বের করতেও কষ্ট হয়। তাই অনুরূপ বাক্য ব্যাকরণ রীতির বিরোধী নয়। কেউ আরও এগিয়ে বলেন—ফে'লকে 'লাযেম' ধরে নিয়ে তার সাথে ফে'লের সম্পর্ক স্থাপন নেহাৎ বাড়াবাড়ি, এর পেছনে কোন দলীল নেই।

এখন রইল 'হামযা' বাড়িয়ে ক্রিয়াকে সকর্ম করার প্রশ্ন। এ ব্যাপারেও যে সিদ্ধান্ত আপনারা নিয়েছেন, তা ভুল। 'হামযা' কখনও কর্মবোধক চিহ্ন হয় না, তা তো কেবল 'তাফজীল' ও 'তাআজ্জুব' বুঝাবার জন্যে আসে। যেমন ফা'এলে 'আলিফ' মাফউলে 'মিম' ও 'ইফতে'আল' এ 'তা' অক্ষর বিশেষ চিহ্ন হয়ে থাকে। তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের সাথে এ সব অতিরিক্ত অক্ষর যোগ করে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করা হয়। 'হামযা'ও সে ধরনের সংযোজন বৈ নয়।

এখন প্রশ্ন রইল,যে ক্রিয়া 'হামযা' সংযোজনে সকর্ম হতে পারে, তা তো শুধু 'যের' লাগিয়ে 'মুয্আফ' করলেও সেরূপ হতে পারে। যেমন ঃ

جلست به - اجلسته - وقمت به اقمته وغيره

কারণ, এ সব উদাহরণে অন্য কোন অক্ষর হামযার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। তাই এটা বুঝা যায় যে, হামযা কেবল 'মুতাআদ্দী' (সকর্ম)র চিহ্ন নয়। তা ছাড়া এখানে মুতাআদ্দীর চিহ্ন 'বা' রয়ে গেছে। আর এটা সর্বজন স্বীকৃত কথা যে, একটা ক্রিয়া সকর্ম করার জন্যে দু'টো চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না।

এ বাগধারাটি প্রচলিত আছে ঃ

ما اعطاه للدراهم - ما اكساه للثياب

এ দুটি বাক্যের 'আ'তা' ও 'আকসা' দুটোই সকর্ম ক্রিয়া। এখানে ক্রিয়া দুটিতে যে 'হামযা' রয়েছে, তা তো 'তা'আজ্জুব' ও 'তাফজীল' এর চিহ্ন। তা হটিয়ে এখানে তো মুতাআদ্দীর 'হামযা' ব্যবহার আদৌ সিদ্ধ নয়। যখন সে'হামযা' দূর করা হয়, তখন তাকে সকর্ম বোধক 'হামযা' ছিল বলা ভুল হবে। এখন থাকে এ উদাহরণটি ঃ

ما اخزبه لزيد

এখানে যায়েদের প্রথমে 'লাম' ফে'লে লাযেমের কারণে আসেনি; বরং সেটা 'গায়ের মুনসারাফ' (অপরিবর্তনীয়)হবার দুর্বলতা দূর করার জন্যে এসেছে।

এখন আমি আবার আলোচ্য বিষয়ের দিকে ফিরে আসছি। এ দুটি মতের যেটাই অর্থ নেয়া হোক, নিজ প্রভুর সর্বাধিক প্রশংসাকারী কিংবা সর্বজনের সর্বাধিক প্রশংসিত-এর যে কোনটির গূঢ় অর্থ মোতাবেক তাঁর নাম মুহাম্মদ। পার্থক্য এই, মুহাম্মদ শব্দ প্রশংসার অজস্র বৈশিষ্ট্যের

ধারক হয়ে থাকে আর আহমদ শব্দ অপরের থেকে বেশী প্রশংসার উপযোগী হয়। সুতরাং মুহাম্মদ হল প্রশংসার সংখ্যা ও রূপ প্রকাশার্থে এবং আহমদ শব্দ হল তার গুণ ও গুরুত্ব প্রকাশের জন্যে ব্যবহৃত।

মোট কথা' হযরত (সঃ) অপরাপর থেকে বেশী প্রশংসার যোগ্য এবং অন্যান্যের থেকে অধিক শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলীর অধিকারী। আজ পর্যন্ত মানব জাতি হযরতের (সঃ) চাইতে বেশী প্রশংসা আর কারুর করেনি। এ দুটোই তাঁর নাম। প্রশংসা ও মর্ম বিচারে এ দুটো নামের চাইতে আধিক্যবোধক ও পূর্ণতা প্রকাশক নাম আর নেই। যদি তার অর্থ কর্তৃকারকে নেয়া হয়, তা হলে তাঁর নাম হবে 'হাম্মাদ'। কারণ, নিখিল সৃষ্টির ভেতরে তিনিই তাঁর প্রভুর সর্বাধিক প্রশংসা করেছেন। তাই, খোদার অধিক প্রশংসাকারী বুঝাবার জন্যে যদি তাঁর নাম 'আহমদ' বলা হয়, তা হলে 'হাম্মাদ' বলাই বেশী যুক্তি সংগত। তাঁর উম্মতের এরূপ নামের উল্লেখ রয়েছে।

দ্বিতীয় কথা, এ দুটো নামই হযরতের (সঃ) অনাবিল চরিত্র ও প্রশংসনীয় গুণাবলী প্রকাশ করে। তাই মুহাম্মদ ও আহমদ দুটো নামই উপযোগী। আকাশ ও পৃথিবীর সব সৃষ্টিই ইহ ও পরকালে অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে তাঁর প্রশংসায় মুখর থাকবে। এ গুণাবলী ও স্বভাব সমূহ অসংখ্য। 'কিতাবুস সালাত ওয়াস সালাম' এ আমি এ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এখানে সফররত অবস্থায় মানসিক অস্বস্তির দরুণ মোটামুটি উল্লেখ করলাম মাত্র। আল্লাহ তা'আলাই সামর্থ্য দানকারী ও সাহায্যকারী এবং নির্ভর কেবল তাঁরই ওপরে করছি।

আল মুতাওয়াক্কিল ঃ

হযরতের এক নাম মুতাওয়াক্কিল। সহীহ বুখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ "আমি তাওরাতে হযরতের (সঃ) পরিচয় প্রসংগ পড়েছি—"মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ আমার ভৃত্য ও বাণীবাহক। আমি তার নাম রেখেছি মুতাওয়াক্কিল। সে অসচ্চরিত্র নয়, উগ্র মেজাজের নয়' হাংগামা প্রিয় নয় এবং অন্যায়ের প্রতিকার সে অন্যায়ের দ্বারা করেনা; বরং ক্ষমা ও ঔদার্যের দ্বারা করে। যদ্দিন তার দ্বারা এক 'মিল্লাতে বায়জা' সৃষ্টি না করব, তদ্দিন তার মৃত্যু হবেনা। সে জাতি ঘোষণা করবে—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" বস্তুত, হযরত (সঃ) মুতাওয়াকিল নামের সব চাইতে বেশী উপযোগী। কারণ, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে খোদার ওপরে সর্বতোভাবে নির্ভর করার ক্ষেত্রে তাঁর জুড়ি ছিলনা।

এখন রইল মাহী, হাশির, মকফী ও আকিব নাম। জাবীর বিন মুতঈমের বর্ণনায় এর ব্যাখ্যা রয়েছে।

মাহী অর্থে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়, যার দ্বারা খোদা কুফরীর লোপ ঘটান। বস্তুত, হযরতকে দিয়েই দুনিয়ার বুক থেকে সব চাইতে বেশী কুফরী ও পাপাচার দূর করা হয়েছে। কারণ, তাঁকে যখন পাঠানো হয়েছে, তখন কয়েকজন আহলে কিতাব ভিন্ন দুনিয়ার সবাই কাফির

Contents

হয়েছিল। যেমন, প্রতিমা পূজক, অভিশপ্ত ইয়াহুদী, বিভ্রান্ত নাসারা ও নাস্তিক। তা ছাড়া তারকার পূজারী, অগ্নি পূজক, রসূলে অবিশ্বাসী দার্শনিক ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহর (সঃ) সাহায্যে এ সব কুফরীর অবসান ঘটান। এমনকি খোদার ধর্ম অন্যান্য ধর্মের ওপরে জয়ী হয়। ইসলাম দিনে দ্বিগুণ ও রাতে চারগুণ এ হারে দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে চলল। হযরতের (সঃ) সত্যের সন্ধান দুনিয়ার দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

হাশির ঃ 'হাশর' অর্থ সমবেত করা। হযরত (সঃ) যেহেতু শেষ নবী এবং তাঁর পরেই 'হাশর' হবে, তাই তিনিই যেন সমগ্র মানব জাতির একত্রে সমাবেশকারী।

আকিব ঃ সব নবীর শেষে এসেছেন বলে তিনি এ নাম পেয়েছেন। যেভাবে চিঠি বা নিবন্ধের ক্ষেত্রে সীলমোহর লাগিয়ে সমাপ্ত করা হয়, তেমনি তিনি যেন নবীর ধারার সীলমোহর।

মাকফী ঃ পূর্বসূরীদের পদাংক অনুসরণকারীকে মাকফী বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাহায্যে দুনিয়াবাসিকে পূর্বেকার নবীদের পদাংক অনুসরণের সুযোগ ও শক্তি দান করেছেন। তিনিই সব নবীর শেষ নিদর্শন।

নবীউত্ তাওবা ঃ হযরতের(সঃ) মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবাসির জন্যে তাওবার দ্বার খুলে দিয়েছেন। খোদা তাঁর তাওবা যেভাবে কবুল করেছেন, সেরূপ আর কারুরই করেন নি। হযরত (সঃ) তো সব চাইতে বেশী তাওবা ও অনুশোচনা করতেন। এমনকি একই বৈঠকে শত শত বার পড়তেন ঃ

رَبِّ اغْفِرْلِي وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○

"হে আমার প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর। আমার তাওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাশীল।"

তিনি বলতেন—"হে মানব! নিজ প্রতিপালকের কাছে তাওবা কর। কারণ, আমিও প্রতিদিন শতবার তাওবা করি।" তাই তাঁর উম্মতের তাওবা অতীতের সব উম্মতের চাইতে বেশী ত্রুটিহীন ও বেশী সহজ হয়। ফলে তা বেশী তাড়াতাড়ি কবুল হয়। অথচ আগেকার উম্মতদের তাওবা কবুলের ব্যাপারটি কঠিনতর ছিল। এমনকি বণী ইসরাঈলদের বাছুর পূজা করার অপরাধ থেকে তাওবা করার জন্যে নিজের হাতে নিজকে হত্যা করতে হয়েছিল। পক্ষান্তরে এ উম্মতদের ওপরে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের অবস্থা এই যে, তাদের লজ্জিত হওয়াটাকেও তাওবা ধরে নেয়া হয়।

নবীউল মুলহিমাহ ঃ এর অর্থ এই যে, তাঁকে খোদার দুষমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে পাঠানো হয়েছে। এ কারণেই হযরত (সঃ) ও তাঁর উম্মতরা আগেকার উম্মতদের চাইতে

অনেক বেশী জিহাদ করেছেন। বস্তুত, কাফিরদের বিরুদ্ধে এ উম্মত যে ধরণের বিরাট বিরাট জিহাদ করেছেন, আগেকার উম্মতদের কখনও এরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়নি। কারণ, কেবল এ উম্মতরাই যুগে যুগে দুনিয়ার আনাচে কানাচে খোদার ধর্মের দুষমনদের সাথে জিহাদ করে আসছে। অতীতের কোন উম্মতেরই এ সৌভাগ্য হয়নি।

নবীউর রহমত : হযরতকে (সঃ) নিখিল সৃষ্টির রহমত হিসাবে পাঠানো হয়েছে। তাই তিনি সমগ্র দুনিয়াবাসির ওপরে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দয়া করে গেছেন। ইসলামপন্থীরা তাঁর করুণার বেশী অংশ পেয়েছেন। কিন্তু কাফির আর বিশেষ করে আহলে কিতাবরাও তাঁর করুণার রাজ্যে মহাশান্তিতে আশ্রয় পেয়েছিল। হাঁ, যারা হযরতের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, তারা নিজেরাই জাহান্নামকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা জীবনের আশা জলাঞ্জলী দিয়ে কঠিনতর শাস্তির দিকে ছুটে গিয়েছে।

ফাতিহ : উন্মুক্তকারী। খোদা হযরতকে (সঃ) পাঠিয়ে আবার হিদায়েতের দ্বার উন্মুক্ত করলেন। অন্ধকে দৃষ্টি দান, বধিরকে শ্রুতি দান এবং জং ধরা হৃদয়কে রেত ঘষা করে দিয়েছেন। কাফিরদের এলাকা বিজিত হল, জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত হল এবং শিক্ষা ও সৎ কার্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হল। মোট কথা, মন ও মগজ, চোখ ও কান, এমনকি দুনিয়া ও আখিরাতের সব কিছুই বিজিত হল।

আমীন (বিশ্বস্ত) **:** মূলত, এই রঙ-বেরঙের পঞ্চ মকারের পৃথিবীতে তিনিই একমাত্র এ নামের উপযোগী। তিনি খোদার ওহী ও শরীআতের আমানতদার। আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টির বিশ্বস্ত প্রহরী। এমনকি নবুওতের আগেও তিনি 'আমীন' নামে বিখ্যাত ছিলেন।

যাহুক ও কাত্তাল : এ দুটো নাম পরস্পর এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা যায় না। নবী (সঃ) মুসলমানদের সামনে সর্বদা হাসিমুখ ছিলেন। ঘৃণা, অবজ্ঞা, রাগ বা উষ্মার কোন আভাস পর্যন্ত ছিল না। কিন্তু, খোদার দুষমনদের জন্যে ছিলেন সংহারক। অত্যাচারীকে শাস্তি দেবার কাজে তিনি কারুর অপবাদ বা লাঞ্ছনাকে পরোয়া করতেন না।

বাশীর (সুসংবাদ দাতা) **:** তাঁর যারা অনুগত হবে, তাদের তিনি জান্নাতের সুসংবাদ দান করবেন।

নাজীর (ভয় প্রদর্শনকারী) **:** যারা নাফরমানী করবে, তাদের তিনি খোদার আজাবের ভয় দেখাবেন।

তা ছাড়া কুরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে 'আবদুল্লাহ' আখ্যা দিয়েছেন :

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ

তেমনি : تَبَارَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ

অথবা : فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى

কিংবা : وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا

হাদীছে আছে, হযরত (সঃ) বলেছেন : আমি বণী আদমের সর্বাধিনায়ক। তথাপি আমার কোন অহংকার নেই।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাম 'সিরাজুম মুনীর' রেখেছেন। তার মানে হল প্রদীপ্ত মশাল যা না জ্বালিয়েই আলো দেয়। পক্ষান্তরে সূর্যকে 'সিরাজুওহ্হাজ' নাম দিয়েছেন যা তাপদগ্ধ করে মানুষকে আলো দেয়।

●

Contents

নবম পরিচ্ছেদ

হযরতের হিজরত

মুসলমানের সংখ্যা যখন বাড়ল, কাফিরদের যখন কিছুটা বিপদাশংকা দেখা দিল, তখন নবী (সঃ) কঠিন কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হলেন। অগত্যা সাহাবাদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। বললেন ঃ সেখানে এক বাদশা আছে। প্রজার ওপরে তিনি জুলুম করেন না। তখন বারজন পুরুষ ও চারজন নারী হিজরত করলেন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন উছমান (রাঃ)। এ সাহাবাদের দ্বারাই হিজরতের সূত্রপাত হল। নবী দুলালী হযরত রুকাইয়াও (রাঃ) এ দলে ছিলেন। আবিসিনিয়ায় তারা নিরাপদেই জীবন কাটাচ্ছিলেন। পরে তাঁরা খবর শুনলেন, কুরাইশরা মুসলমান হয়ে গেছে। যদিও তা গুজব ছিল, তথাপি বিশ্বাস করে মক্কা ফিরে এলেন। ফিরে এসে জানলেন, কুরাইশরা আগের চাইতেও মুসলমানদের বেশী দুষমন হয়েছে। তাই কিছু লোক আবার ফিরে গেলেন। কিছু লোক মক্কায় থেকে গেলেন। এরা আগের চাইতেও কুরাইশদের হাতে বেশী অত্যাচার ভোগ করলেন। তাদের ভেতরে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)ও ছিলেন।

নবী (সঃ) তাদের পুনরায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। এবারে তিরাশীজন পুরুষ ও আঠারজন নারী আবিসিনিয়া গেলেন। তাদের ভেতরে আম্মাদও ছিলেন (অবশ্য বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে)। এ'রা নাজ্জাশী বাদশার কাছে খুব নিরাপদে দিন কাটালেন। কুরাইশরা তা জানতে পেয়ে আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরকে সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে ভাঙ্গানী দেবার জন্যে পাঠাল। কিন্তু, তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হল।

এরপর কুরাইশদের অত্যাচার বেড়ে গেল। যার ফলে হযরতকে (সঃ) সপরিবারে শো'বে আবি তালিবে' তিন বছর ও কারুর মতে দু'বছর বন্দী জীবন কাটাতে হল। সেখান থেকে তিনি আটচল্লিশ বছরে এবং এক রিওয়ায়েতে উনপঞ্চাশ বছর বয়সে বের হন। এ ঘটনার ক'মাস পরে সাতাশী বছর বয়সে তাঁর চাচা আবু তালিব মারা যান। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস এই নজরবন্দী অবস্থায় জন্ম নেন। হযরতের ওপরে কুফফারদের অত্যাচার বেড়েই চলল। কিছুদিনের ভেতরে হযরত খাদীজাও (রাঃ) ইন্তিকাল করলেন। এরপর কাফিররা অত্যাচারের মাত্রা আরও চড়িয়ে দিল। তখন নবী (সঃ) তায়িফ চলে গেলেন। হযরত (সঃ) ও যায়েদ বিন হারেছা দুজনই প্রচারের উদ্দেশ্যে গেলেন। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করলেন। কিন্তু, সেখানকার লোক ইসলাম গ্রহণের বদলে হযরতকে (সঃ) কষ্ট দিতে লাগল। শহর থেকে বের করে দিল। তাঁর

ওপরে হামলা চালাল। আর এভাবে পাথর নিক্ষেপ শুরু করল যে, তাঁর পা মুবারক শোনিতাক্ত হয়ে গেল।

অবশেষে তিনি মক্কা ফিরে এলেন। পথে এক ঈসায়ী সাক্ষাৎ করে মুসলমান হল। তাঁকে সত্যনবী বলে মানল। ফেরার পথে 'ওয়াদীয়ে নাখলা' নামক স্থানে পৌঁছলে একদল জ্বীন তাঁকে নিয়ে গিয়ে কুরআন শুনে মুসলমান হল। তা ছাড়া পাহাড়ের ওপরে নির্দিষ্ট ফেরেশতাদের সাথে দেখা হল। তাঁরা আরজ করলেন, আপনি বলুন, এ পাহাড়টি আমরা তায়িফবাসির ওপরে নিক্ষেপ করে তাদের ধ্বংস করে ফেলি। নবী (সঃ) বললেন "না! আমার বিশ্বাস, ওদের থেকেই আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই এমন লোক সৃষ্টি করবেন যারা ইবাদত করবে এবং খোদার সাথে কাউকে শরীক করবে না।" এ পথেই হযরত (সঃ) এ মশহুর দোআটি উচ্চারণ করেন ঃ

اللهم اليك اشكو ضعف قوتی و قلة حيلتی

"হে আল্লাহ! আমার দুর্বলতা ও অভাব নিয়ে কেবল তোমার কাছেই অভিযোগ জানাই।"

এরপর নবী (সঃ) বেশ কিছু কাল মক্কা ছিলেন। সবাইকে খোদার পথে ডাকতে লাগলেন। প্রত্যেক মেলা ও তেহারে গিয়ে তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করলেন। সবাইকে ডেকে বললেন ঃ আল্লাহর দ্বীন প্রচারে যারা সহায়তা করবে, তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে। কিন্তু, কোন গোত্রই এতে কর্ণপাত করল না। আসলে আল্লাহ তা'আলা এ সম্মানটি মদীনার আনসারদের দেবেন। তাই যখন তিনি নিজ ধর্মের মর্যাদা বাড়ালেন, নিজ ওয়াদা পুরা করার ও নিজ রসূলের সাহায্য করার ইচ্ছা করলেন এবং ইসলামের শত্রুদের প্রতিদান দেবার মনস্থ করলেন, তখন নবীকে (সঃ) আনসারদের কাছে পৌঁছিয়ে দিলেন। কারণ, এ সৌভাগ্য তাদেরই জন্যে লেখা ছিল।

বস্তুত, ছ'জন এবং আরেক রিওয়ায়েত অনুসারে আটজন লোক তীর্থের মওসুমে মীনায় মাথা মুন্ডন করছিল। হযরত (সঃ) তাদের কাছে গিয়ে ইসলামের বাণী পৌঁছালেন ও কুরআন পড়ে শুনালেন। এ দলটি ইসলামের ডাকে সাড়া দিল। মদীনায় ফিরে এসে তারা নিজ নিজ গোত্রের কাছে ইসলাম প্রচার করল। সেখানে ইসলামের বাণী এরূপে পৌঁছল যে, আনসারদের এমন ঘর খুব কমই ছিল যেখানে রসূলুল্লাহর (সঃ) প্রশংসা চলতনা।

মদীনার বণু যরীকের মসজিদে প্রথমে প্রকাশ্যে কুরআনের আয়াত উচ্চারিত হল। পরের বছর মদীনা থেকে বারজন হযরতের (সঃ) সমীপে উপস্থিত হল। তাদের ভেতরে পাঁচজন আগের বারে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। তারা ওকবা নামক স্থানে, নবীর (সঃ) হাতে নারীদের দায়িত্ব সহ বাইয়াত হয়ে মদীনা ফিরে যান। পরবর্তী বছর তিয়াত্তরজন পুরুষ ও দু'জন নারী হযরত (সঃ) এর খিদমতে হাজির হল। মদীনা থেকে ওকবায় এটাই শেষ দল এসেছিল। তারা তাঁর হাতে হাত রেখে এ শপথ করে গেলো যে, হযরতের (সঃ) নিষিদ্ধ কার্য থেকে তাদের নারী, সন্তান-সন্ততি ও নিজকে বিরত রাখবে।

Contents

অবশেষে হযরত (সঃ) স্বয়ং ও তাঁর সাহাবীরা হিজরত করে মদীনা চলে গেলেন। রসূল (সঃ) তাদের ভেতর থেকে বারজন প্রচারক নির্বাচন করলেন এবং সাহাবাদের মদীনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। একটি দল গোপনে রওয়ানা হল। কারুর মতে আবু সালমা ইবনে আব্দুল আশাদ মাখযুমী ও কারুর মতে মাস'আব ইবনে উমায়ের সর্বাগ্রে এ সফরে পা বাড়ালেন। তারা মদীনায় আনসারদের কাছে ঠাঁই নিলেন। আনসাররা তাঁদের যথেষ্ট সেবাযত্ন করলেন। মদীনায় দ্রুতগতিতে ইসলামের প্রচার চলল।

তারপর আল্লাহ তা'আলা রসূলকে (সঃ) হিজরতের অনুমতি দিলেন। তিনি রবিউল আউয়াল, অন্য রিওয়ায়েত অনুসারে সফর মাসের মংগলবার মক্কা থেকে রওনা হলেন। তখন রসূলের (সঃ) বয়স ছিল তিপ্পান্ন। তাঁর সথে ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তাঁর গোলাম আমের ইবনে ফাহীর। আব্দুল্লাহ ইবনে উরায়কাত লায়ছী তাঁদের পথ দেখিয়ে চলল। রসূল (সঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রথমে গিয়ে তুর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিলেন। তিন দিন সেখানেই কাটালেন। তারপর সওয়ারী নিয়ে মদীনায় রওনা হলেন। তিনি বারই রবিউল আউয়াল, মংগলবার রাতে মদীনায় পেঁছিলেন।

একদলের মতে তিনি মদীনার বাইরে কুব্বা ময়দানে বনু আমর ইবনে আওফের এবং অন্য রিওয়ায়েত অনুসারে কুলছুম বিন হাযমের ঘরে মেহমান হন। আরেক রিওয়ায়েতে সা'দ বিন খায়সামার কথা বলা হয়েছে। রসূল (সঃ) সেখানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন এবং কুব্বা মসজিদ গড়ে তুলেন। তারপর শুক্রবার সকালে তিনি সেখান থেকে রওনা করেন। বনু সালেমদের এলাকায় পেঁছিলে জুম'আর ওয়াক্ত হয়ে গেল। হযরতের (সঃ) সহচর সংখ্যা ছিল তখন প্রায় একশ। তারা সবাই একত্রে জুম'আ পড়লেন। তারপর তিনি উটনীর ওপরে সওয়ার হয়ে মদীনায় চললেন। সংগের সহচররা উটনীর রশি ধরে চলল। সবাই নিজ নিজ বাড়ীতে নেবার জন্যে হযরতের (সঃ) কাছে অনুরোধ জানাতে লাগলেন। রসূল (সঃ) বললেন—সওয়ারী ছেড়ে দাও। আল্লাহর নির্দেশেই সে চলছে। যেখানে গিয়ে বসে পড়বে, সেখানেই আল্লাহর মঞ্জুরী রয়েছে। বস্তুত, আজ যেখানে মসজিদে নববী রয়েছে, সেখানে এসেই উটনী বসে পড়ল। এ ভূখণ্ড ছিল বনু নাজ্জারের সাহল ও সোহায়েল নামক দু'টি ছেলের।

এখানে তিনি আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়ীতে তাশরীফ নিলেন। তারপর তিনি সাহাবাদের নিয়ে সেই শূন্য ভূখণ্ডে কাঁচা ইট ও খেজুর শাখা দিয়ে মসজিদ গড়ে তুললেন। অতপর তিনি মসজিদ সংলগ্ন স্থানেই পুণ্যাত্মা বিবিদের জন্যে হুজরা গড়ে নিলেন। সর্ব প্রথম কক্ষটি ছিল হযরত আয়েশা সিদ্দীকার। সাত মাস পরে তিনি আবু আইয়ুব আনসারীর ঘর থেকে চলে এলেন।

যখন আবিসিনিয়ার মোহাজিররা হযরতের (সঃ) এ হিজরতের খবর পেলেন, তাঁদের তেত্রিশজন ফিরে এলেন। তাঁদের সাতজন পথে মক্কার কাফিরদের হাতে বন্দী হলেন ও বাকী সবাই এসে মদীনায় পেঁাছলেন। আবিসিনিয়ায় অবশিষ্ট মোহাজিরগণ খায়বার বিজয়ের পরে নৌকা যোগে প্রত্যাবর্তন করলেন।

মি'রাজ

তারপর নবী (সঃ) মুতঈম ইবনে আদীর ঘরের কাছ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। এরপরেই তাঁকে দৈহিক ও আত্মিক ভাবে আকসার মসজিদ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করানো হয়। সেখান থেকে সশরীরে তিনি আকাশ মন্ডলী পরিভ্রমণ করে আল্লাহ পাকের উন্নততম দরবারে উপনীত হন। আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন করেন এবং নামায ফরজ করা হয়।

সহীহ রিওয়ায়েত মতে সশরীরে তাঁর একবার মি'রাজ হয়। একদলের ধারণা, স্বপ্নে মি'রাজ ঘটেছে। আরেকদল বলেন, তাঁর মি'রাজ ঘটেছিল, এতটুকু বলেই চুপ থাকা উচিত। অবস্থা বিশ্লেষন নিশ্প্রয়োজন। অন্যদল বলেন, বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সশরীরে ও সেখান থেকে উর্ধ্বলোকে আত্মিক সফর করেছিলেন। একদল এরূপও বলেন, মি'রাজ দুবার ঘটেছে। একবার সশরীরে ও আরেকবার আত্মিকভাবে। তিনবার মি'রাজ ঘটেছে বলেও একদলের ধারণা। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নবুওতের পরেই মি'রাজ হয়েছে। শরীকের রিওয়ায়েতে নবুওতের আগে মি'রাজ ঘটেছে বলে যা বলা হয়েছে, তা ভুল। এ হল তাঁর স্মৃতি শক্তির দুর্বলতার প্রমাণ। এক দলের ধারণা, ওহীর আগে স্বপ্নে ও পরে সশরীরে মি'রাজ ঘটেছে। একদলের ধারণা, এখানে ওহী বলতে বিশেষ ধরণের ওহী বুঝানো হয়েছে। যে ওহী দ্বারা নবুওতের সূত্রপাত ঘটেছে, তা নয়। মূল কথা, মি'রাজের তত্ত্ব বলে দেবার আগেই সহসা এ ঘটনা ঘটে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।'

Contents

দশম পরিচ্ছেদ

হযরতের সন্তান-সন্ততি

হযরতের (সঃ) সর্বপ্রথম সন্তান ছিলেন আল্ কাসিম। তাঁর নামেই হযরত (সঃ) এর ডাকনাম ছিল আবুল কাসিম। কিন্তু, শৈশবেই তিনি ইন্তেকাল করেন। এক রেওয়ায়েতে আছে, তাঁর বয়স এতখানি হয়েছিল যে, তিনি সওয়ারী চালিয়ে সফরও করেছিলেন।

কাসিমের পরে যয়নব (রাঃ) জন্ম নিলেন। এক রিওয়ায়েতে কাসিমের চেয়ে যয়নবের (রাঃ) বয়স বেশী বলা হয়েছে। তারপর হযরত রুকাইয়া, হযরত উম্মে কুলছুম ও হযরত ফাতিমা (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের বয়স নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—হযরত রুকাইয়া অপর তিনজন থেকে বড় ছিলেন এবং উম্মে কুলছুম সবার ছোট ছিলেন। তারপর হযরত আব্দুল্লাহ জন্ম নেন। তাঁর জন্ম নবুওতের আগে হয়েছে, না পরে, তা নিয়ে মতভেদ দেখা যায়। সঠিক মত হল এই, তিনি নবুওতের পরে জন্ম নিয়েছেন। তাঁর উপাধি নিয়েও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তায়্যিব ও তাহির দু'টি উপাধিই কি তাঁর ছিল, না দু'জনের ? এ ব্যাপারে বিবেচনা প্রসূত মত হল এই, দুটো উপাধিই হযরত আব্দুল্লাহর (রাঃ) ছিল। খোদাই সর্বজ্ঞ।

এ সব সন্তান-সন্ততিই উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজার (রাঃ) গর্ভে জন্মেছিলেন। অন্য সব পুণ্যময়ী বিবিদের ঘরে কোন সন্তান জন্মেনি। তারপর মদীনায় হযরত মারিয়া কিবতিয়ার (রাঃ) গর্ভে অষ্টম হিজরীতে ইবরাহীম জন্ম নেন। তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাস হযরত আবু রাফে (রাঃ) এ সুসংবাদ দান করেন। তা শুনে হযরত (সঃ) তাঁকে একটি গোলাম দান করেন। কিন্তু, স্তন্য ত্যাগের আগেই সে মারা যায়।

হযরত (সঃ) তার জানাযায় শরীক হয়েছিলেন কিনা এ ব্যাপারেও দু'টি মত রয়েছে। হযরত ফাতিমা (রাঃ) ভিন্ন সব সন্তান-সন্ততিই তাঁর জীবদ্দশায় মারা যান। অবশ্য হযরত ফাতিমাও (রাঃ) তাঁর ইন্তিকালের ছ'মাস পরেই মারা যান। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ও স্থৈর্যের জন্যে তাঁকে দুনিয়ার সমগ্র নারীকুলের ওপরে মর্যাদা দান করেছেন। তাঁকে বিশ্বের নারী জাতির শিরোমণি করে উন্নততম আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হযরতের সব সন্তান-সন্ততির ভেতরে হযরত ফাতিমার (রাঃ) মর্যাদা সর্বাধিক। একদলের ধারণা, তিনি সমগ্র দুনিয়ার নারীদের চেয়েও বেশী মর্যাদার অধিকারী। একদল আবার তাঁর

জননী হযরত খাদীজাকে (রাঃ) রমণী শ্রেষ্ঠা বলে থাকেন। একদল তো হযরত আয়েশাকে (রাঃ) শ্রেষ্ঠতমা মনে করেন। আরেক দলের মত হল, এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকাই উত্তম।

আত্মীয়-স্বজন

রসূলের চাচাদের অন্যতম হলেন আসাদুল্লাহি ওয়ার রসূলে সাইয়েদুশ শোহাদা হযরত হামযা (রাঃ)। তা ছাড়া রয়েছেন হযরত আব্বাস, আবু তালিব, আবু লাহাব, যুবায়ের, আব্দুল কা'বা, মুকাওয়েম, যিরার, কুছাম, মুগীরা ও আইদাক বা মাসআব বা নওফেলুল আওয়াম। আবু তালিবের মূল নাম ছিল আব্দুল মান্নাফ। আবু লাহাবের আসল নাম ছিল আবদুল ওজ্জা। মুগীরার উপাধি ছিল হাজল।

এদের ভেতরে শুধু হযরত হামযা (রাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ) মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁর ফুফুদের ভেতরে শুধু হযরত সফিয়া (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত যুবায়ের বিন আওয়ামের জননী ছিলেন। এ ছাড়া তাঁর অন্যান্য ফুফুদের নাম ছিল আতিকা, বুরাত, উরবী, উমায়মা ও উম্মে হাকীম। হযরত আতিকা ও হযরত উরবীর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। একদল হযরত উরবীর ইসলাম গ্রহণকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন।

হারিছ ছিলেন তার চাচাদের ভেতরে সবার বড় এবং হযরত আব্বাস (রাঃ) ছিলেন সবার ছোট। তাঁর সন্তান ও বংশধররা পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিরাট ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। খলীফা মামুনের সময়ে এক আদম শুমারীতে তাঁদের সংখ্যা ছ'লাখে পোঁচেছিল। এভাবে আবু তালিব, হারিছ ও আবু লাহাব প্রমুখের বংশধররাও অনেক বেড়েছিল। কোন কোন রিওয়ায়েতে হারিছ ও মুকাওয়েম একই ব্যক্তির নাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার আইদাক ও হাজলকে একই ব্যক্তি বলেছেন।

পুণ্যময়ী বিবিগণ

হযরত খাদীজা (রাঃ) ঃ

হযরতের (সঃ) প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজার (রাঃ) সাথে নবুওতের আগেই বিয়ে হয়েছিল। তখন হযরত খাদীজার (রাঃ) বয়স ছিল চল্লিশ বছর। তাঁর জীবদ্দশায় হযরত (সঃ) আর কোন বিয়ে করেন নি। ইবরাহীম ভিন্ন সব সন্তান-সন্ততিই তাঁর গর্ভে হয়েছিল। হযরতের এ স্ত্রীই তাঁর সাথে অশেষ নির্যাতন ও কষ্ট সয়েছেন এবং তাঁর প্রচার কার্যে সাহায্য করতে গিয়ে ধনে ও প্রাণে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাই তাঁকে হযরত জিব্রাঈলের (আঃ) মাধ্যমে সালাম পোঁছিয়েছিলেন। এ মর্যাদা কেবল তাঁরই লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। হিজরতের তিন বছর আগে তিনি ইন্তিকাল করেন।

হযরত সওদা (রাঃ) ঃ

হযরত খাদীজার (রাঃ) ইন্তিকালের কিছুকাল পরে হযরত (সঃ) হযরত সওদা বিন্তে যুমআ কর্শিয়াকে বিয়ে করেন। হযরত সওদা (রাঃ) পরে স্বামীর ওপরে নিজ অধিকার হযরত আয়েশাকে (রাঃ) দান করেছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ঃ

তারপর রসূল (সঃ) উম্মে আবদুল্লাহ হযরত আয়েশাকে (রাঃ) বিয়ে করলেন। তিনি হযরতের (সঃ) সব চাইতে প্রিয় স্ত্রী ছিলেন। তাঁর পবিত্রতা সম্পর্কে আরশ থেকে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করেছিলেন। আর বিয়ের আগেই রেশমের এক টুকরা কাপড়ে তাঁর ছবি অবতীর্ণ হয়েছিল। জানানো হয়েছিল ঃ এ হচ্ছে আপনারই পুণ্যময়ী স্ত্রী।

শওয়াল মাসে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর বয়স তখন ছ'বছর। হিজরতের পরে তাঁর রুখসতী হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স ছিল নয় বছর। হযরত (সঃ) একমাত্র তাঁকেই কুমারী অবস্থায় বিয়ে করেন। তিনি ছাড়া আর কারুর বিছানায় ওহী নাযিল হয়নি। যারা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ তুলেছিল, তাঁরা যে কুফরী করেছিল এ ব্যাপারে সবাই একমত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) পবিত্র বিবিগণের ভেতরে সব চাইতে শিক্ষিতা ও ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। দুনিয়ার মুসলিম নারীকুলের ভেতরে ফিকাহ শাস্ত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। যার ফলে বড় বড় সাহাবাগণ জটিল মাসআ'লা-মাসায়েলের ব্যাপারে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। এক রিওয়ায়েতে দেখা যায়, নবী (সঃ) কিছুদিনের জন্যে তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। কিন্তু, রিওয়ায়েতটিকে প্রামাণ্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না।

হযরত হাফসা (রাঃ) ঃ

তারপর তিনি হযরত হাফসাকে (রাঃ) বিয়ে করেন। তিনি হযরত উমরের (রাঃ) কন্যা ছিলেন। আবু দাউদে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) তাকে তালাক দিয়েছিলিন। কিন্তু, আবার ফিরিয়ে নিয়েছেন।

হযরত যয়নব বিন্তে খুযায়মা (রাঃ) ঃ

তার পরে বণু হিলাল বিন আমরের হযরত যয়নব বিন্তে খুযায়মা বিন হারিছ কায়সিয়াকে বিয়ে করেন। হযরতের (সঃ) ঘরে এসে তিনি মাত্র দু'মাস জীবিত ছিলেন।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ঃ

তাঁর পরে তিনি হযরত উম্মে সালমা হিন্দ বিন্তে আবি উমাইয়া কর্শিয়াকে বিয়ে করেন। আবি উমাইয়ার আসল নাম হুজায়ফা ইবনে মুগীরা। হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) সবার শেষে ইন্তিকাল করেন। একদল বলেন ঃ হযরত সফিয়াই(রাঃ) সবার শেষে মারা যান। তাঁর বিয়ের ওলী কে হয়েছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে। তাবাকাতে ইবনে সা'আদের বর্ণনা অনুসারে

সালমা ইবনে আবি সালমা ছিলেন। তাই যখন হযরত (সঃ) আবার সালমা ইবনে আবি সালমার ওলী হয়ে উমামা বিন্তে হামযার সাথে তাকে বিয়ে দিলেন, তখন বললেন ঃ 'হে সালমা ! এক্ষনে প্রতিদান হয়ে গেল।' এটা তিনি এ জন্যি বলেছিলেন যে, হযরত উম্মে সালমার সাথে বিয়ের সময়ে তাদের পরিবারের সব লোকের ভেতরে কেবল সালমাই ওলী হয়েছিলেন। তাবাকাতে ইবনে সা'আদে সালমা (রাঃ) প্রসংগে এভাবেই ঘটনাটি বলা হয়েছে।

ওয়াকিদীও উম্মে সালমার উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, মাজমা ইবনে ইয়াকুব তার পিতার কাছ থেকে শুনেছেন যে, রসূল (সঃ) হযরত উম্মে সালমার কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়ে তাঁকে বিয়ে করেছেন। তখন তাঁর ছেলে উমর ইবনে আবি সালমা অত্যন্ত ছোট ছিলেন।

ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁর মুসনাদে লিখেছেন ঃ আমি এ রিওয়ায়েত আফফান থেকে শুনেছি, আফফান হাম্মাদ ইবনে আবি সালমা ও হাম্মাদ ছাবিত থেকে শুনেছেন। ছাবিত বলেছেন—আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে আবি সালমা এবং তাঁকে তাঁর বাপ এ বর্ণনা শুনিয়েছেন যে, উমর ইবনে আবি সালমা বলেন ঃ আমাকে উম্মে সালমা বলেছেন যে, 'যখন তিনি আবু সালমার ইদ্দাত পূর্ণ করেছেন, তখন তাঁর কাছে নবী (সঃ) বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। উম্মে সালমা হযরতকে (সঃ) স্বাগত জানালেন। এবং আরজ জানালেন, আমি এক অসহায়া ও বিপদগ্রস্থা নারী। আমার কোন ওলী নেই।' রিওয়ায়েতটিতে আরও বলা হয়েছে ঃ 'তখন তিনি নিজ পুত্র উমরকে বললেন ঃ ওঠ। রসূলের (সঃ) সাথে আমার বিবাহ পড়িয়ে দাও।' কিন্তু, রিও-য়ায়েতের এ অংশটি ভেবে চিন্তে দেখার মত। কারণ, ইবনে সা'আদ উল্লেখ করেছেন যে, হযরত যখন ইন্তিকাল করেন, তখন উমরের বয়স মাত্র ন'বছর। এবং হযরত (সঃ) উম্মে সালমাকে (রাঃ) চতুর্থ হিজরীর শওয়াল মাসে বিয়ে করেন। তখন উমরের বয়স মাত্র তিন বছর। এত ছোট বয়সে কেউ বিয়ের ওলী হতে পারে না। ইবনে সা'আদ ও অন্যান্য ইতিহাস বেত্তারাও এভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদকে (রঃ) যখন এ বর্ণনা শোনানো হল, তখন তিনি বললেন—কে বলেছে যে, উমর ছোট ছিল ?

আবুল ফারাজ ইবনে জাওযী এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ সম্ভবত ইমাম আহমাদের এ বক্তব্যটি উমরের সঠিক বয়স জ্ঞাত হবার আগেকার। ইবনে সা'আদ ও অন্যন্য ইতিহাসকারদের একটি দল তার বয়স উল্লেখ করেছেন।

এক রিওয়ায়েতে এও আছে যে, সে বিয়েতে হযরত উমর (রাঃ) ওলী ছিলেন। সেখানে প্রশ্ন দাঁড়ায়, পূর্ব রিওয়ায়েতে উম্মে সালমা যে 'হে উমর ! ওঠ।' বলেছেন, তার জবাব কি ? এখানে জানা দরকার যে, উমর বিন আবি সালমার বংশ তালিকায় কা'ব' দেখতে পেয়ে এ ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। কারণ, হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের বংশ তালিকাও গিয়ে কা'ব নামেই শেষ হয়। যেমন, উমর ইবনে খাত্তাব ইবনে নোফায়েল ইবনে আব্দুল ওজ্জা ইবনে রিবাহ ইবনে আব্দুল্লাহ

ইবনে বেরাজ ইবনে রাওয়াহ ইবনে আদী ইবনে কা'ব এবং উম্মে সালমা বিনতে আবি উমাইয়া ইবনে মুগীরা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে মাখযুম ইবনে য়্যাকজা ইবনে মাররাহ্ ইবনে কা'ব। সুতরাং উম্মে সালমা যখন 'হে উমর। ওঠ এবং রসূলের (সঃ) বিয়ে পড়াও' বললেন, তা দেখে মুহাদ্দিছীনেরা ভ্রমে পড়লেন এবং তাঁরা উমর ইবনে আবি সালমাকেই বুঝে নিলেন। মর্ম গ্রহণের এ ভ্রান্তির ওপরেই নির্ভর করে তাঁরা জুড়ে দিলেন, তখন উম্মে সালমা তাঁর পুত্রকে বললেন। অথচ এ দায়িত্ব আদায় করা তাঁর শিশু পুত্রের জন্যে অসম্ভব ছিল। তাই এটাও ফকীহদের বিভ্রান্তি বৈ নয় যে, নবী (সঃ) বললেন ঃ হে বৎস ! ওঠ, তোমার জননীর বিবাহ পড়াও।'

আবু ফারাজ ইবনে যাওজী বলেছেন, এ রিওয়ায়েত আমি কোন হাদীছেই পাইনি। যদি এ রিওয়ায়েত সঠিকও হয়, তা হলে তার মর্ম এই হবে যে, নবী (সঃ) তাঁকে পরিহাস স্থলে একথা বলেছিলেন। তা না হলে তখন তো আবি সালমা তনয় উমরের বয়স মাত্র তিন বছর ছিল। কারণ, নবী (সঃ) চতুর্থ হিজরীতে এ বিয়ে করেছেন। তাঁর ইন্তিকালের সময় উমর ইবনে আবি সালমার বয়স ছিল ন'বছর। তা ছাড়া হযরত (সঃ) বিয়ের ওলির মুখাপেক্ষী ছিলেন না। ইবনে আকীল বলেছেন যে, ইমাম আহমাদের (রাঃ) প্রকাশ্য বক্তব্যে বুঝা যায়, নবীর (সঃ) বিয়েয় ওলী থাকা শর্ত ছিলনা। এটাও নবীর (সঃ) একটি বৈশিষ্ট্য।

যয়নব বিন্তে জাহাশ ঃ

তারপর হযরত (সঃ) আসাদ ইবনে খুযায়মার বংশের যয়নব বিন্তে জাহাশকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন হযরতের চাচী উমায়মার কন্যা। তাঁর সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হল ঃ

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

"তার সাথে যায়েদের যখন পাট চুকে গেল, আমি তাকে আপনার সাথে বিয়ে দিলাম।"

এ কারণেই হযরত যয়নব (রাঃ) অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মেনীনের কাছে অহংকার করে ফিরতেন যে, তোমাদের পরিবারের লোকজন তোমাদের বিয়ে পড়িয়েছে। আর আমার বিয়ে আল্লাহ তা'আলা সপ্ত আকাশের ওপরে থেকে পড়িয়েছেন। এটা অবশ্যই তাঁর বৈশিষ্ট্য যে, স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা ঊর্ধ্বলোকে থেকে তাঁর বিয়ে পড়িয়েছেন।

আমীরুল মুমেনীন হযরত উমরের (রাঃ) খিলাফতের গোড়ার দিকেই তিনি পরলোক গমন করেন।

প্রথমে তাঁর বিয়ে হয়েছিল হযরত যায়েদ ইবনে হারিছার সাথে। নবী (সঃ) তাঁকে পালক পুত্র করেছিলেন। তিনি যখন তালাক দিলেন, তখন আল্লাহ তা'লা নবীর (সঃ) সাথেই যয়নবের ঃ(র) বিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য হল, মুখ বোলা পুত্রের বধুকে বিয়ে করা বৈধ প্রমাণ করা।

হযরত জুবায়রিয়া বিন্তে হারিছ :

তা ছাড়া হযরত (সঃ) হযরত জুবায়রিয়া বিন্তে হারিছ ইবনে আবি যিরার মুস্তালাকিয়াকেও বিয়ে করেন। তিনি বণী মুস্তালিকের বন্দীদের সাথে এসেছিলেন। হযরতের (সঃ) কাছে মুক্তি লাভের বিনিময় আদায়ে সাহায্য প্রার্থনার জন্যে তাঁর খিদমতে হাজির হয়েছিলেন। তিনি তাঁর দাসত্বের বন্ধন মুক্তির টাকা আদায় করে তাঁকে বিয়ে করে নিলেন।

হযরত উম্মে হাবীবা :

তারপর তিনি উম্মে হাবীবাকে (রাঃ) বিয়ে করেন। তাঁর আসল নাম ছিল রিমলা বিন্তে আবি সুফিয়ান বিন সখর বিন হরব করশিয়া উমুবিয়া। এক রিওয়ায়েতে তাঁর হিন্দা নামেরও উল্লেখ রয়েছে। হিজরতের সময়ে যখন তিনি আবিসিনিয়ায় ছিলেন, তখনই তাঁর সাথে হযরতের (সঃ) বিয়ে হয়। সম্রাট নাজ্জাশী হযরতের পক্ষ থেকে চারশ দীনার দেন মহর আদায় করেন। সেখান থেকে তিনি মদীনায় চলে এলেন। তাঁর ভাই মু'আবিয়ার শাসনকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

ইতিহাস বেত্তা ও জীবনীকারদের কাছে এ বর্ণনাটিই মশহুর। তাঁদের মতে তাঁর বিয়ের অবস্থা ঠিক তাই ছিল যা হযরত খাদীজার মক্কায়, হযরত হাফসার মদীনায় ও হযরত সফিয়ার খায়বারের পরে ছিল। এখন প্রশ্ন রইল আকরামার বর্ণনা নিয়ে। তাঁর রিওয়ায়েতে রয়েছে যে, 'আবু সুফিয়ান নবীর (সঃ) কাছে নিবেদন করলেন—'তিনটি ব্যাপারে আমি আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি। আপনি তা কবুল করুন।' তার ভেতরে একটি ছিল এই, 'আমার কাছে আরবের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারী উম্মে হাবীবা রয়েছে। আমি আপনার কাছে তাকে বিয়ে দিতে চাই।' এ রিওয়ায়েতটি সম্পূর্ণ ভুল। আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম বলেন, এ রিওয়ায়েতটি মওযু (মনগড়া)। ইবনে জাওযী বলেন; অবশ্যই এ রিওয়ায়েতের কোন কোন রাবীর (বর্ণনাকারী) বিভ্রম ঘটেছিল। তা ছাড়া ইকরামা ইবনে আম্মার মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত ছিল। কারণ, ইতিহাসকাররা এ ব্যাপারে একমত যে, উম্মে হাবীবার আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে বিয়ে হয়েছিল। সেখানে সন্তান-সন্ততিও হয়েছিল। তাঁদের নিয়েই আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। পরে তাঁর স্বামী খৃষ্টান হয়ে যায়। কিন্তু, হযরত উম্মে হাবীবা ইসলামের ওপরে দৃঢ় থাকেন। নবী করীম (সঃ) নাজ্জাশী সম্রাটের মাধ্যমে তাঁর বিয়ের পয়গাম পাঠান। তিনিই তাঁর বিয়ে পড়িয়ে দেন এবং হযরতের (সঃ) পক্ষ থেকে তাঁকে চারশ দীনার মহারানা দেন। এ ঘটনা সপ্তম হিজরীতে ঘটে।

একবার আবু সুফিয়ান হযরতের (সঃ) বাড়ী এলে উম্মে হাবীবা হযরতের (সঃ) বিছানা সরিয়ে অন্য বিছানা দিলেন, তাতে যেন আবু সুফিয়ান না বসতে পারে। আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, আবু সুফিয়ান ও মু'আবিয়া অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময়ে একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করেন। তা ছাড়া এ সম্পর্কিত রিওয়ায়েতে এ ধরনের বাক্যাংশ রয়েছে, "যেভাবে এদ্দিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছি, এখন থেকে সেভাবেই আমি কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়ব, এটাই কি আপনি বলতে চান ? নবী (সঃ) জবাব দিলেন—হাঁ।"

হযরত (সঃ) আবু সুফিয়ানকে এ ভাবের নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা তা নিশ্চিত বলা কঠিন। এ রিওয়ায়েতের যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। এর সনদের ভেতরেও মতভেদ রয়েছে। একদলের মতে সহীহ রিওয়ায়েত এটাই যে, হযরত (সঃ) তাঁকে মক্কা বিজয়ের পরে বিয়ে করেছেন। কিন্তু, কেবল ইতিহাস বেত্তাদের কথাতেই একটা রিওয়ায়েতকে উড়িয়ে দেয়া যায় না। ইতিহাস শাস্ত্রে যার জ্ঞান রয়েছে, সে অবশ্যই জানে যে. সমালোচনার এ ধরনটি সম্পূর্ণ ভুল।

একদল লোকের ধারণা যে, আবু সুফিয়ান হযরতের (সঃ) কাছে বিয়েটি নতুন করে আবার করার জন্যে আবেদন জানিয়েছিল। এটা তার মানসিক তৃপ্তি লাভের জন্যেই করেছিল। কারণ, হযরত (সঃ) তার অনুমতি ছাড়াই এ বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু, এ রিওয়ায়েতও ভ্রান্তিপূর্ণ। নবী (সঃ) সম্পর্কে এ ধরনের ভুল ধারণা পোষণ করা যেতে পারে না। তা ছাড়া আবু সুফিয়া-নের মত বিচক্ষণ লোকের কাছ থেকেও এরূপ আবদার প্রত্যাশা করা যায় না।

ইমাম বায়হাকী ও ইমাম মানজার বলেন—হতে পারে, যখন আবু সুফিয়ান উম্মে হাবীবার স্বামীর আবিসিনিয়ায় মৃত্যুর খবর পেল, তখন মদীনা সফরে এসে হযরতের (সঃ) কাছে এ অনুরোধ জানিয়েছিল। তাই, মুহাদ্দিছীনরা যখন 'কাফিরের বিরুদ্ধে লড়াই' ও নিজ পুত্রকে 'ওহী লিখক' করা সম্পর্কিত আবেদনের হাদীছটি পেলেন, তখন তাঁদের খেয়াল হল, হয়ত এ দুটো আবেদনই মক্কা জয়ের পরে করেছিল। তাই রাবী তিনটি ব্যাপার একই হাদীছে সমবেত করেছেন।

আদপে, এ রিওয়ায়েত নিয়ে এত বেশী মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে যে, তা বলার নয়। মুহাদ্দিছী-নরা এ হাদীছটিকে অন্য এক পন্থায় ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা বলেন, রিওয়ায়েতটির অর্থ এই যে, (আবু সুফিয়ান আবেদন করল) 'আমি যদিও আগে উম্মে হাবীবার বিয়েতে রাজী ছিলাম না, এখন রাজী রয়েছি। আরও আবেদন জানাচ্ছি, আপনি তাকে বিয়ে করে নিন।' এ ধরণের ব্যাখ্যা কোন কিতাব বা ইতিহাসে মিলে না। বড় বড় বুযুর্গ বলেছেন, এ ধরণের ব্যাখ্যা নিয়ে তৃপ্ত থাকা চলে না। কারণ, এটা নেহাৎ ভুল রিওয়ায়েত।

এক রিওয়ায়েতে এ কথাও রয়েছে, যখন আবু সুফিয়ান হযরতের (সঃ) 'ঈলা'র সময়ে গুজব শুনল যে, হযরত (সঃ) নিজ স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন, সে মদীনায় ছুটে এল। এবং অন্যান্যের সাথে তার মেয়েকেও তালাক দিয়েছেন ভেবে অনুরূপ আবেদন জানিয়েছিল। অথচ আগের রিওয়ায়েতের মত এটাও ভুল। একদলের ধারণা, হাদীছটি ঠিক। তবে, রাবী উম্মে হাবীবার নাম নিতে গিয়ে ভুলে পড়েছেন। বরং আবু সুফিয়ান উম্মে হাবীবার বোন রিমলাকেও বিয়ে করার জন্যে হযরতের (সঃ) কাছে আবেদন জানিয়েছিল। আর এ কথাটি তো সবাই জানে যে, দু'বোন একত্রে স্ত্রী হিসেবে রাখা হারাম। এটাই বা কি করে হতে পারে যে, এ ব্যাপারটি তার মেয়ের দৃষ্টি এড়িয়েছে। অথচ তিনি আবু সুফিয়ান থেকেও শিক্ষিতা ছিলেন। বরং এরূপ

রিওয়ায়েত আছে যে, তিনি হযরতকে (সঃ) প্রশ্ন করেছিলেন—আপনি কি আবু সুফিয়ান দুহিতা ও আমার ভগ্নিকে বিয়ে করতে চান? হযরত (সঃ) জবাব দিলেনঃ তুমিও কি তাই চাও? তিনি জবাব দিলেনঃ আমি আপনার থেকে বিচ্ছেদ চাই না। অবশ্য এটা কামনা করি যে, আমার বোনও এ পুণ্যে আমার সাথে অংশীদার হোক। হযরত (সঃ) বলে দিলেনঃ সে আমার জন্যে হালাল নয়।

আসল ঘটনা ছিল এই। আবু সুফিয়ানের প্রার্থনাও এটা হতে পারে। কিন্তু রাবী ভুল করে উম্মে হাবীবার নাম উল্লেখ করেছেন। এক রিওয়ায়েতে রিমলার এক নামও উম্মে হাবীবা বলা হয়েছে। এ কথা যদি হাদীছে নাও থেকে থাকে, তথাপি এ জবাবটি বেশী সঠিক মনে হয়।

তা ছাড়া "নবী (সঃ) আবু সুফিয়ানের প্রত্যেকটি প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন" এ কথাটিও রাবী ভুলক্রমে বর্ণনা করেছেন। কারণ, হযরত (সঃ) তার কিছু প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিলেন। রাবী যে বলেছেন, 'আবু সুফিয়ান যা চেয়েছিল, তাই তিনি দিয়েছিলেন' তার মর্ম হল এই, যা দেবার মত ছিল, তা দিয়েছিলেন। কিংবা রাবী যার কাছে বর্ণনা করেছিলেন, তার মনোভাব অনুসারেই বলে দিলেন, 'যা চেয়েছিল, কবুল করেছিলেন।' খোদাই সর্বজ্ঞ।

হযরত সফিয়া (রাঃ)ঃ

তা ছাড়া নবী (সঃ) হযরত মুসার (আঃ) ভাই হারুনের (আঃ) বংশধর বণী নজীরের অধিপতি হাই ইবনে আখতাবের কন্যা হযরত সফিয়াকে (রাঃ) বিয়ে করেন। এ মহিলা এক নবীর বংশধর ছিলেন এবং অন্য নবীর স্ত্রী হলেন। সমসাময়িক দুনিয়ায় তিনি অদ্বিতীয়া সুন্দরী ছিলেন। দাসী হয়ে তিনি এসেছিলেন। হযরত (সঃ) তাঁকে বিনিময় দিয়ে মুক্ত করলেন এবং এই মুক্তির বিনিময়টুকুই মহর নির্ধারিত হল।

এ ভাবে নবীর (সঃ) এ কাজটি উম্মতের জন্যে সুন্নাত হয়ে দাঁড়াল। যদি কেউ নিজ ক্রীতদাসী আযাদ করে দিয়ে পরে বিয়ে করতে চায়, তা হলে আযাদ করাটাই মহর হয়ে যায়। আযাদ করাতেই তার বিয়ে সিদ্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার বিয়ে পড়ার দরকার হয় না। ইমাম আহমাদ (রঃ) ও বিরাট একদল মুহাদ্দিছের এটাই মত যে, যদি কেউ বলে 'আমি আমার দাসীকে আযাদ করলাম এবং সেটাকেই তার মহর ঠিক করলাম' কিংবা 'আমি আমার দাসীর আযাদ করাটাকে তার বিয়ের মহর মনে করলাম' তা হলে আযাদ করা ও বিয়ে করা দুটোই সিদ্ধ হয়ে গেল। কোন ওলিরও প্রয়োজন হয় না।

অবশ্য একদল আলিম বলেন, বিয়ের এ পদ্ধতিটি শুধু রসুলের (সঃ) জন্যেই সিদ্ধ ছিল। অবশিষ্ট ইমামত্রয়ের মত এটাই। কিন্তু, পয়লা মতটিই বেশী সঠিক। কারণ, মাস'আলার ধরন দেখলে তাতে বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। যতক্ষণ এর বিরুদ্ধে কোন দলীল দাঁড় করানো না

যায়, ততক্ষণ রসূলের (সঃ) জন্যেই এটা খাস, তা বলা যায় না। কারণ, সেরূপ ক্ষেত্রে খোদা তা'আলা স্বয়ং বলে দিয়েছেন ঃ

خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ◎

"এ বধূ তোমারই জন্যে; অন্য মুসলমানের জন্যে নয়।"

এ ছিল খোদার বিয়ে পড়ানো উম্মুল মু'মিনীন সম্পর্কে। আযাদ করা উম্মুল মু'মিনীন সম্পর্কে নয়। তাতে তিনি উম্মতের কোন সুবিধারও উল্লেখ করেন নি। উম্মতের সুবিধার জন্যে তো আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বারা পালিত পুত্রবধূ বিয়ে করা সিদ্ধ করে দিয়েছেন।

এতে বুঝা যায়, যখনই হযরত (সঃ) কোন বিয়ে করেছেন, তার ভেতরে উম্মতেরও সুবিধা ও সুযোগদান উদ্দেশ্য ছিল। হাঁ—যদি খোদা ও তাঁর রসূল কোন প্রকাশ্য বাণীর সাহায্যে কোন ব্যাপার খাস করে নেন, তখন তার ব্যাপ্তি বিনষ্ট হবে। এ নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও এর সাহায্যে দলীল দান এবং এর ওপরে কিয়াস করে মাস'আলা তৈরী করা অন্যত্র হবে।

হযরত মায়মুনা (রাঃ) ঃ

হযরত (সঃ) মায়মুনা বিন্তে হারিছ হিলালীকে বিয়ে করেন। তিনি ছিলেন তাঁর শেষ স্ত্রী। সবার শেষে তিনি মক্কায় উমরা আদায় করা ও ইহরাম খুলে ফেলার পরে এ বিয়েটি করেন। ইবনে আব্বাসের একটি মত এরূপও দেখা যায় যে, তিনি ইহরাম খোলার আগেই নিকা করেন। যদি এটাকে সঠিক ধরা হয়, তা হলে বর্ণনাকারীর ভুল বলতে হয়। কারণ, এ নিকার মূল ঘটক আবু রাফে' (রাঃ) এ ব্যাপারটি বেশী জানেন। তাঁর বর্ণনা মতে হযরত (সঃ) ইহরাম খুলে নিকা করেন। হযরত আবু রাফে' বলেন ঃ আমি তাঁদের দু'জনার মধ্যকার বাণী বাহক ছিলাম। তা ছাড়া তখন হযরত ইবনে আব্বাসের বয়স দশ কিংবা কিছু বেশী ছিল। সেখানে তিনি ছিলেনও না। পক্ষান্তরে, আবু রাফে' প্রাপ্ত বয়স্ক ছিলেন। তাঁর হাতেই কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। অপর যে কেউর তুলনায় তিনি এ ব্যাপারে বেশী খবর রাখেন। এটাতো সূর্যের চাইতেও উজ্জ্বল সত্য যে, এ ব্যাপারে হযরত আবু রাফে'র মতকেই মেনে নিতে হয়।

হযরত মায়মুনা (রাঃ) হযরত মু'আবিয়ার শাসনকালে মারা যান। সরফ নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত রায়হানা বিন্তে যায়েদ নযরিয়া (রাঃ) ঃ

এক বর্ণনা মতে তিনি হযরতের পবিত্র বিবিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একটি মত হল এই, তিনি করজী মহিলা ছিলেন। বণী কুরায়জার পরাজয়ের দিন তিনি বন্দী হয়ে আসেন এবং হযরতের (সঃ) অংশে পড়েন। হযরত (সঃ) তাঁকে আযাদ করে নিকা করেন। তারপর এক তালাক দেন। পরে আবার তিনি ফিরিয়ে আনেন।

মুহাদ্দিছদের একটি দল তাঁকে দাসী বলেছেন। তিনি হযরতের (সঃ) আযাদ করা ও 'মাওতুআ' (সহবাসকৃত) দাসী ছিলেন। তাই তাঁকে পবিত্র স্ত্রীদের দলে শামিল না করে দাসী ধরা হয়।

এ সব মহিলার সাথেই হযরতের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু, এমন কিছু মহিলার কথাও কিতাবে রয়েছে যাঁদের কাছে তিনি কিংবা তাঁর কাছে তারা বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু, হযরত (সঃ) অস্বীকার করায় অথবা তাদের কোন ওজর থাকায় বিয়ে হয়নি। তাদের সংখ্যা চার কিংবা পাঁচ হবে। একটি মত অনুসারে তাদের সংখ্যা হয় ত্রিশ। কিন্তু জীবনীকারদের গবেষণায় শেষোক্ত মতটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

তা ছাড়া এটা মশহুর কথা যে, হযরত (সঃ) জওনিয়ার কাছে বিয়ের পয়গাম পাঠিয়েছিলেন। তার বাড়ীতে তিনি তাশরীফও নিয়েছিলেন। কিন্তু, তিনি ওজর পেশ করলেন। হযরত (সঃ) তার ওজর কবুল করলেন। তেমনি ঘটেছিল কালবিয়ার ও যে মহিলার দেহে হযরত (সঃ) শ্বেত রোগ দেখতে পেয়েছিলেন, তাঁর ঘটনাটি। তা ছাড়া এক মহিলা হযরতের (সঃ) কাছে বিয়ে বসার প্রস্তাব নিয়ে এলে তিনি তাকে এক সাহাবীর সাথে বিয়ে দেন এবং কুরআনের কয়েকটি সূরা শেখানোকে তার মহর নির্ধারিত করে দেন। এই হল আসল ঘটনা। আল্লাহই সব জানেন।

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, হযরতের (সঃ) ইন্তিকালের সময়ে তাঁর ন'জন স্ত্রী বেঁচে ছিলেন। তাঁদের আটজনের দিনও বণ্টিত ছিল। তাঁদের নাম এখানে দেয়া হল ঃ

হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত হাফসা (রাঃ), হযরত যয়নব বিন্তে জাহাশ (রাঃ), হযরত উম্মে সালমা (রাঃ), হযরত সফিয়া (রাঃ), হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ), হযরত মায়মুনা (রাঃ), হযরত সওদা (রাঃ) ও হযরত জুবায়রিয়া (রাঃ)। ৬২ হিজরীতে ইয়াযীদের রাজত্বকালে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ইন্তিকাল করেন।

হযরতের দাসীবৃন্দ

আবু উবায়দা (রাঃ) বলেন, হযরতের (সঃ) চারজন দাসী ছিলেন।

হযরত মারিয়া ঃ ইনি রসূল (সঃ) তনয় ইবরাহীমের (আঃ) জননী ছিলেন।

হযরত রায়হানা ও হযরত জামীলা ঃ এ'রাও দাসী ছিলেন। যুদ্ধ বন্দী হয়ে এসে হযরতের অংশে পড়েছিলেন।

হযরত যয়নব বিন্তে জাহাশও হযরতকে (সঃ) একজন দাসী দিয়েছিলেন।

হুযরাতের দাসগণ

তাঁদের অন্যতম ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা ইবনে শুরাহবীলঃ নবী (সঃ) তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁকে তিনি আযাদ করে দিয়েছিলেন। তারপর উম্মে আয়মনের সাথে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই ঘরে উসামা (রাঃ) জন্ম নেন। তা ছাড়া হযরত আসলাম, আবু রাফে, ছওবান, আবু কাবশা সেলীম, সালেহ, রিবাহ নওবী, ইয়াছার নওবী (উরনায়েনের যুদ্ধে মারা যায়), মু'দআম ও নবীর (সঃ) সফরকালীন প্রহরী কিকারা নওবী। খায়বর যুদ্ধে সে হযরতের (সঃ) উটের রশি ধারণ করেছিল।

বুখারীর রিওয়ায়েত অনুসারে নওবী সেই গোলাম, যে এক জিহাদের সময়ে একটি চাদর লুকিয়ে নিয়েছিল। যখন সে নিহত হল, তখন নবী (সঃ) বললেন, সেই চাদর তার ওপরে আগুন হয়ে জ্বলছে। কিন্তু, মুআত্তার রিওয়ায়েতে চাদর লুকানো গোলামের নাম ছিল মুদআম। আর এ দু'জনই খায়বার যুদ্ধে মারা যায়।

তা ছাড়া আঞ্জাশাহ, হাভী অন্যতম গোলাম ছিল। সফীনাহ ইবনে ফারুখ নামক অন্য এক গোলাম ছিল। তার আসল নাম মোহরান। নবী (সঃ) তাকে সফীনা নাম এ জন্যে দিয়েছিলেন যে, সফরের সব জিনিসপত্তর সে জাহাজের মতই বয়ে বেড়াত। তাই একবার তিনি বললেনঃ তুমি সফীনা।

আবু হাতিম রিওয়ায়েত করেন যে, হযরত (সঃ) তাকে আযাদ করেছিলেন। অন্যান্যের মতে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) তাকে আযাদ করেছিলেন।

তা ছাড়া ছিলেন উনায়সা (যাঁর কুনিয়াত ছিল আবু মাশরুহ), আফলাহ, উবায়দা, তুহমান, জাকোয়ান, মোহরান ও মারওয়ান। তুহমানের নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তারপর হুনায়েন, সুন্দর, ফুযালা ইয়ামানী, মাবুরখসী, ওয়াকিদ, কাসসাম, আবু ওসায়িব এবং আবু মুওয়াহিবাও তাঁর গোলাম ছিলেন। দাসীদের ভেতরে সালমা, উম্মে রাফে', মায়মুনা বিন্তে সা'দ, খুযায়রাহ, রিজবী, রীশাহ, উম্মে যুমায়ের, মায়মুনা বিন্তে আবু উসায়িব, মারিয়া ও রায়হানার উল্লেখ রয়েছে।

হুযরাতের খাদেম

তাঁদের ভেতরে হযরত আনাস ইবনে মালিকের ওপরে সাধারণ ব্যাপার সমূহের দায়িত্ব ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে রসূলের (সঃ) জুতা ও মিসওয়াক থাকত। উকবা ইবনে আমের জুহনী সফরে হযরতের (সঃ) খচ্চরের লাগাম ধরে থাকতেন। আসলা' ইবনে শরীক হযরতের (সঃ) সফরের সহচর ছিলেন।

হযরত বিলাল ইবনে রিবাহ মুআজ্জিন ছিলেন। হযরত সা'দও (রাঃ) অন্যতম খাদেম ছিলেন। এ দু'জনই হযরত আবু বকরের গোলাম ছিলেন। তা ছাড়া হযরত আবু জর গিফারী (রাঃ), আয়মন ইবনে আবীদ এবং তাঁর জননী হযরত উম্মে আয়মন প্রমুখও হযরতের (সঃ) সেবক-সেবিকা ছিলেন।

হযরত আয়মন ইবনে আবীদ ও তাঁর জননী উম্মে আয়মন হযরতের (সঃ) ওজু ও ইস্তিঞ্জার ব্যবস্থা করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

ওহী লিখকগণ

তাঁদের নাম নিম্নে দেয়া হল ঃ

আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উছমান (রাঃ), আলী (রাঃ), যুবায়ের (রাঃ), আমের বিন ফাহীরা (রাঃ), আমর ইবনুল আস (রাঃ), উবায় বিন কা'ব (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন আরকাম (রাঃ), ছাবিত বিন কায়েস (রাঃ), হাঞ্জালা বিন রবী' আযাদী (রাঃ), মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রাঃ), খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ) ও খালিদ বিন সাঈদ ইবনুল আস (রাঃ)।

বর্ণিত আছে, হযরত মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ) ও হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) প্রথম থেকেই ওহী লিখক নিযুক্ত হন। এ দু'জন বিশেষ করে এ দায়িত্বেই নিয়োজিত ছিলেন।

●

একাদশ পরিচ্ছেদ

হযরতের পত্র ও উপদেশ নামা

সদকা সম্পর্কিত একটি উপদেশ নামা হযরত আবু বকরের (রাঃ) কাছে ছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) সেটা হযরত মালিক বিন আনাসকে বাহরাইন পাঠাবার সময়ে তার জন্যে লিখেছিলেন। অধিকাংশ মুসলমান সেটা কার্যকরী করেছিল।

ইয়ামানবাসিদের কাছে হযরত (সঃ) একটি উপদেশ নামা পাঠিয়েছিলেন। আবু বকর বিন আমর বিন হাযম তার বাপ থেকে এবং সে তার বাপ থেকে এ বর্ণনাটি পেয়েছিল। এ রিওয়ায়েতটি ইমাম হাকাম (রঃ) তাঁর সহীহ মুসনাদ ও ইমাম নাসায়ী (রঃ) প্রমুখ নিজ নিজ সংকলনে স্থান দিয়েছেন। আবু দাউদ (রঃ) প্রমুখ 'মুরসাল' রিওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন। এটা ছিল দীর্ঘ এক উপদেশ নামা। তাতে যাকাত, দিয়াত (ক্ষতিপূরণ) ও ফিকাহর অন্যান্য হুকুম-আহকাম সম্পর্কে লেখা ছিল। তা ছাড়া কবীরা গুনাহ, তালাক, গোলাম আযাদ, একই কাপড়ে নামায আদায় ও অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার, কুরআন স্পর্শ করা ইত্যাদি মাস'আলা বিস্তারিত ভাবে লেখা ছিল।

ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, হযরত (সঃ) যে উপদেশনামা লিখিয়েছেন, তা থেকেই ফকীহরা ক্ষতিপূরণের (দিয়াত) পরিমাণ নির্ধারিত করেছেন।

তা ছাড়া বণু যুহায়রের কাছেও তিনি পত্র লিখেছেন।

হযরত উমরের (রাঃ) কাছেও একটি পত্র ছিল। তার ভেতরে যাকাত ও অন্যান্য মাস'আলা লেখা ছিল।

রাজা-বাদশার কাছে পত্র

হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পন্ন করে যখন হযরত (সঃ) মদীনায় ফিরে এলেন, তখন তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্র নায়কের কাছে পত্র লিখে দূত মারফত পাঠালেন। রোমক সম্রাটের কাছেও তিনি এভাবে পত্র লিখলেন। হযরতের (সঃ) কাছে নিবেদন করা হলঃ সিল মহর না দেখলে তাঁরা চিঠি পড়েন না। তখন তিনি সোনার একটি আংটি তৈরী করলেন। তার ওপরে তিনটি ছত্র খোদাই করালেন। এক ছত্রে আল্লাহ, এক ছত্রে মুহাম্মদ ও অন্য ছত্রে রসূল লেখা ছিল। চিঠির শেষে তিনি এ মহরই লাগিয়ে দিতেন।

সপ্তম হিজরীতে রসূল (সঃ) একই দিনে ছয় জনের কাছে চিঠি লিখলেন। প্রথমে আমর বিন উমাইয়া জামিরীকে সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে পাঠালেন। তাঁর আসল নাম আসমাহা ইবনে আবহুর। আরবী ভাষায় আসমাহা অর্থ হল দান বা বখশিশ।

সম্রাট নাজ্জাশী হযরতের পত্রের যথেষ্ট সম্মান করলেন। ইসলাম কবুল করলেন এবং সত্য কলিমা পাঠ করলেন। তিনি ইঞ্জীলের মস্তবড় পন্ডিত ছিলেন। যেদিন বাদশাহ নাজ্জাশী মারা গেলেন, নবী (সঃ) মদীনায় থেকে তাঁর গায়েবী জানাযা আদায় করলেন। ওয়াকিদী সহ মুহাদ্দিছদের একটি দল এরূপ বর্ণনা দান করেন।

কিন্তু, ঘটনাটি ছিল অন্যরূপ। কারণ, যে নাজ্জাশীর তিনি গায়েবী জানাযা পড়েছিলেন, তাঁর কাছে তিনি পত্র পাঠান নি। পত্র যার কাছে পাঠানো হয়েছিল, সে ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানত না। প্রথম নাজ্জাশী সম্রাটই মুসলমান হয়ে মারা গিয়েছিলেন।

মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) রোমক সম্রাট, পারশ্য সম্রাট ও নাজ্জাশী বাদশাহকে পত্র লিখেন। আর এ নাজ্জাশী আগেকার সেই মুসলিম নাজ্জাশী নয় যাঁর গায়েবী জানাযা পড়া হয়েছিল। আবু মুহাম্মদ হাযম বর্ণনা করেন, যে নাজ্জাশীর কাছে হযরত (সঃ) পত্র পাঠিয়েছিলেন, তার নামের এ পত্রটি নিয়ে আমর ইবনে উমাইয়া আজমিরী গিয়েছিলেন। এ নাজ্জাশী ইসলাম গ্রহণ করে নাই। প্রথম মতটি হল ইবনে সা'দ প্রমুখের এবং দ্বিতীয় মতটি হল ইবনে হাযমের।

তা ছাড়া তিনি দাহিয়া ইবনে খলীফা কালবীকে রোমক সম্রাটের কাছে পত্র দিয়ে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নাম ছিল হেরাক্লিয়াস। তিনি ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করতেন। পরে সে ইচ্ছা বর্জন করেন। একটি রিওয়ায়েত অনুসারে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, এটা ভুল। আবু হাতিম ও ইবনে হাব্বান হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেছেন ঃ

"আমার এ পত্র যে রোমের কাইসারের কাছে পেশছাবে সে জান্নাতের যোগ্য হবে।"
একজন দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, ঃ "যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ না করেন ?"
তিনি জবাব দিলেন ঃ "হাঁ, সে যদি গ্রহণ নাও করে।"

সে ব্যক্তি গিয়ে কাইসারের সাথে দেখা করল। যখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস যাচ্ছিলেন, সে চিঠিটি তাঁর বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে আত্ম গোপন করে রইল। কাইসার ঘোষণা করলেন, 'যে ব্যক্তি এ চিঠি নিয়ে এসেছে, সে নিরাপদ।' তখন সে বেরিয়ে এসে বলল, 'আমি এনেছি।' কাইসার বললেন ঃ ফিরে আসার পরে আমার সাথে দেখা করো।

বস্তুত, কাইসার ফিরে এলে পত্রবাহক তাঁর সাথে দেখা করল। কাইসার শাহী প্রাসাদের দ্বার বন্ধ করার আদেশ দিলে দরজা বন্ধ করা হল। তারপর এক ঘোষককে ডেকে বললেন, 'ঘোষণা করে দাও যে, কাইসার মুহাম্মদের (সঃ) ধর্ম গ্রহণ করে খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করেছেন।' ঘোষক থেকে এ ঘোষণা শোনার সংগে সংগে তাঁর সমগ্র বাহিনী প্রাসাদ ঘেরাও করে ফেলল।

তখন কাইসার রসুলের বাণী বাহককে বললেন : তুমি তো দেখতে পেলে, আমার রাজত্ব চলে যাবার ভয় রয়েছে।

তারপর তিনি ঘোষণাকারীকে আদেশ করলেন : এখন এ কথা ঘোষণা করে দাও যে, কাইসার তোমাদের ধর্মে স্থির রয়েছেন। অপরদিকে হযরতের (সঃ) কাছে চিঠি লিখে পাঠালেন : আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আপনার খিদমতে এক থলে দীনার পাঠালাম।

হযরত (সঃ) তা পেয়ে বললেন : খোদার দুষমন মিথ্যা বলেছে। সে মুসলমান হয়নি। এই বলে তিনি দীনারগুলো সবার ভেতরে ভাগ করে দিলেন।

তা ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে হুজাফা সাহমীকে খসরুর কাছে পত্র দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর নাম ছিল পারভেজ ইবনে হরমুয ইবনে নওশেরোঁয়া। তিনি হযরতের (সঃ) পবিত্র পত্রখানা টুকরা টুকরা করে ফেলেন।

তা শুনতে পেয়ে হযরত (সঃ) দোআ করলেন : 'ইয়া আল্লাহ ! তার দেশকেও টুকরা টুকরা করে দাও।' তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেশ ও জাতিকে টুকরা টুকরা করে দিয়েছিলেন।

হযরত (সঃ) হাতিব বিন বুলতা'কে মুকাওকাশের কাছে পাঠালেন। তাঁর নাম ছিল জরীহ বিন মীনা। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার শাসক ও কিবতীদের অধিপতি ছিলেন। তিনি জবাব দিলেন : 'অতি উত্তম। আর সময়ও এসে গেছে।'

তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না। তবে, নবীর (সঃ) খিদমতে মারিয়া (রাঃ) নাম্নী এক দাসী এবং তার দু'বোন সীরীন ও কিসরাকে পাঠালেন। হযরত (সঃ) সীরীনকে হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিতকে দান করলেন। তা ছাড়া তিনি আরও একটি দাসী, এক হাজার মিছকাল সোনা, বিশটি কিবতী রেশম বস্ত্র, একটি সাদা খচ্চর যা দুলদুল নামে খ্যাত, আফীর নামক সাদা গাধা ও মাবুর নামক এক খোজা ভৃত্য পাঠিয়েছিলেন। এক রিওয়ায়েত মোতাবেক এ ভৃত্যটি মারিয়ার (রাঃ) চাচাত ভাই। তা ছাড়া লুযায নামক একটি ঘোড়া, শীশা নির্মিত পেয়ালা এবং মধুও হযরতের (সঃ) সমীপে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন। নবী (সঃ) তা দেখে বললেন :

"হতভাগা নিজ রাজত্বের কার্পণ্যে পড়ে গেছে। অথচ পার্থিব রাজত্বের তো স্থায়িত্ব নেই।"

তা ছাড়া শুজা' বিন ওহাব আযাদীকে বোলকার শাসনকর্তা হারিছ বিন আবি শিমার গাচ্ছানীর কাছে পত্র দিয়ে পাঠান।

ইসহাক ওয়াকিদী বলেন—এ ব্যাপারে কয়েকটি রিওয়ায়েত রয়েছে। একটিতে বলা হয়েছে, তাঁকে জাবালা বিন আবহামের কাছে পাঠানো হয়। এক রিওয়ায়েতে আলোচ্য দু'জনের কাছেই পাঠানো হয়েছিল। আরেক রিওয়ায়েতে বলা হয়, তাঁকে দাহিয়া কালবীর সাথে হেরাক্লিয়াসের কাছে পাঠানো হয়েছিল।

হযরত (সঃ) সালীত বিন আমরকে হাওজা বিন আলী হানাফীর কাছে ইয়ামামায় পাঠান। তিনি রসূলের (সঃ) দূতকে যথেষ্ট সম্মান দেখান।

এক বর্ণনায় দেখা যায়, রসূল (সঃ) হাওজা ও ছুমামা বিন আছাল হানাফীর কাছে দূত প্রেরণ করেন। হাওজা তো ইসলাম গ্রহণ করেননি। অবশ্য ছুমামা পরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

মোট কথা দু'জন শাসকের কাছে একই দিনে হযরতের (সঃ) দূত পত্র নিয়ে গিয়েছিলেন। অষ্টম হিজরী জিলকদ মাসে আমর ইবনুল আসকে আম্মান সম্রাটের দু'ছেলে জীফার ও আবদুল্লাহর কাছে পাঠানো হয়। তারা দু'জনই মুসলমান হয়েছিলেন। হযরতের (সঃ) নবুওতকে তাঁরা সত্য বলে স্বীকার করলেন। আমর ইবনুল আস যাকাত আদায়ের জন্যে সেখানে থেকে গেলেন। সেখানে বসেই তিনি হযরতের (সঃ) ইন্তিকালের সংবাদ পান।

এ ছাড়া হযরত (সঃ) জু'রানা থেকে ফেরার প্রাক্কালে 'আলা বিন হাজরামীকে বাহরাইনের বাদশাহ মাঞ্জার বিন সা'দী আবাদীর কাছে পাঠান। একটি বর্ণনা মতে মক্কা বিজয়ের আগেই এ চিঠি লিখেছিলেন। তিনি হযরতের (সঃ) নবুওতের সত্যতা মেনে নিয়ে মুসলমান হয়ে যান।

রসূল (সঃ) মুহাজির বিন আবি উমাইয়া মাখযুমীকে ইয়ামানের শাসক হারিছ বিন আবদে কিলাল হুমায়রীর কাছে পত্র দিয়ে পাঠান। তিনি জবাব দেন—আমি ভেবে দেখব।

তবুক যুদ্ধ থেকে ফিরে আবু মুসা আশআরী (রাঃ) ও মা'আজ বিন জাবালকেও ইয়ামানে পাঠানো হয়। এক রিওয়ায়েতে আছে, দশম হিজরীতে তাঁরা প্রচার কার্যে সেখানে গিয়েছিলেন। ফলে, সেখানকার অধিকাংশ লোক যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।

তারপর হযরত আলীকে (কঃ) সেখানে পাঠানো হল। তিনি মক্কায় এসে বিদায় হজ্জে অংশ গ্রহণ করেন।

এ ছাড়া রসূল (সঃ) জারীর বিন আবদুল্লাহকে হুমায়রী ও জী-উমর দুর্গের অধিপতিদের কাছে পাঠান। তাঁদের কাছে ইসলামের আহ্বান পেঁছিলে তাঁরা দুজনই মুসলমান হয়ে গেলেন। জারীর (রাঃ) সেখানে থাকতেই রসূল (সঃ) ইন্তিকাল করেন।

হযরত (সঃ) উমর বিন উমাইয়া জমিরীকে মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের কাছে পাঠান। যুবায়ের বিন আওয়ামের ভাই সাএব বিন আওয়ামকেও তার কাছে চিঠি সহ পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু, সে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

ফরোয়া বিন আমর জুজামীর কাছেও ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পত্র পাঠানো হয়েছিল। এক বর্ণনা মতে তার কাছে পাঠানো হয়নি। ফরোয়া হেরাক্লিয়াসের নিযুক্ত মু'আনের গভর্ণর ছিলেন। তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। নবীকে (সঃ) পত্র দিয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণের খবর জানিয়েছিলেন। তা ছাড়া মাসউদ বিন সা'দের মারফত হযরতকে (সঃ) য়্যা'ফুর নামক একটি

সাদা খচ্চর উপহার পাঠিয়েছিলেন। এটাই হচ্ছে মুহাদ্দিছীনদের একটি দলের মত। আর য়্যা'ফুর ও উফায়ের অর্থে তেমন তারতম্য নেই। পার্থক্য শুধু এই, য়্যা'ফুরের ক্ষুদ্র রূপ হল উফায়ের। কেউ তার নাম বলেন ফিদ্দা। তা ছাড়া 'যরব' নামক একটি ঘোড়াও পাঠিয়েছিলেন এবং মূল্যবান কাপড় ও সোনার কারুকার্য করা একটি ক্বাবা পাঠিয়েছিলেন।

হযরত (সঃ) এ নজরানা কবুল করেছিলেন এবং মাসউদ বিন সা'আদকে বার উকিয়া বখশিশ দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া তিনি আইয়াশ বিন আবি রবি'য়া মাখযুমীকে হুমায়ের গোত্রের তিন সর্দার হারিছ, মাসরুহ ও নঈমের কাছে পাঠান।

হযরতের মুআজ্জিন দল

হযরতের (সঃ) চারজন মু'আজ্জিন ছিলেন। দু'জন মদীনায় ছিলেন। একজন হলেন হযরত বিলাল বিন রিবাহ্। হযরতের (সঃ) আদেশ পেয়ে তিনিই প্রথম আজান দেন। আরেকজন হলেন অন্ধ সাহাবী হযরত আমর বিন উম্মে মাকতুম কুরশী 'আমেরী।

কুব্বা মসজিদে ছিলেন হযরত আম্মার বিন ইয়াসিরের গোলাম সা'আদ (রাঃ)। আর মক্কায় ছিলেন আবু মাহজুরাহ (রাঃ)। তাঁর আসল নাম ছিল আওস বিন মুগীরা। আবু মাহজুরা (রাঃ) আজান সুর করে দিতেন এবং ইকামাতে দু'বার করে শব্দ উচ্চারণ করতেন। পক্ষান্তরে হযরত বিলাল সুর করে আজান দিতেন না এবং ইকামাতেও শব্দগুলো একবারই উচ্চারণ করতেন। তাই মক্কাবাসী ও ইমাম শাফেঈ (রঃ) আবু মাহজুরার আজান ও বিলালের ইকামাত গ্রহণ করলেন এবং আবু হানীফা ও কুফাবাসিরা হযরত বিলালের আজান ও আবু মাহজুরার ইকামত গ্রহণ করেন। ইমাম আহমদ (রঃ) এবং অন্যান্য জাহির-পন্হী মুহাদ্দিছ ও মদীনাবাসী হযরত বিলালের আজান ও ইকামাত দুটোই গ্রহণ করেন। ইমাম মালিক (রঃ) আজানে দু'স্থানে তাকবীর পুনরুচ্চারণ ও ইকামাতে আদৌ পুনরুচ্চারণের বিরোধীতা করেছেন। তিনি সবই একবার উচ্চারণের পক্ষপাতী।

হযরতের মনোনীত শাসক বৃন্দ

রসূল (সঃ) খসরুর মৃত্যুর পরে বাহরামের পুত্র বাজান বিন সাসানকে সমগ্র ইয়ামান বাসির ওপরে শাসক করে দিলেন। ইসলামী শাসনকালের তিনিই প্রথম ইয়ামানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। অনারব পৃথিবীর রাষ্ট্রপতিদের ভেতরেও তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।

বাজানের মৃত্যুর পরে রসূল (সঃ) শাহুর বিন বাজানকে সান'আর শাসক নিযুক্ত করেন।

শহর বিন বাজান পরে নিহত হওয়ায় রসূল (সঃ) খালেদ বিন সাঈদ ইবনুল আসকে সান'আয় পাঠান এবং মুহাজির বিন আবি উমাইয়া মাখযুমীকে কান্দা ও সওফের শাসনকর্তা

নিযুক্ত করেন। তারপর নবী (সঃ) ইন্তিকাল করেন। ফলে আর কোন নতুন বাহিনী কোথাও পাঠানো হয়নি। এরপরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ধর্মচ্যুত গোষ্ঠির বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।

হযরত (সঃ) যিয়াদ বিন উমাইয়া আনসারীকে হাযরামাউতে, আবু মুসা আশ'আরীকে যুবায়েদ, আদন, যুমআ ও সাহেলে, মাআজ বিন জাবালকে জুন্দে ও আবু সুফিয়ানকে নাজরানে পাঠান। তাছাড়া তার ছেলে ইয়াযীদকে তীমার শাসক করে পাঠালেন। ৮ম হিজরীতে ইতাব বিন উসায়েদকে মক্কার শাসক ও হজ্জ মওসুমে ইসলামী ব্যবস্থাপনার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। হযরত আলীকে (রাঃ) তিনি ইয়ামানের খুমুছ (পঞ্চমংশ) আদায়ের জন্যে নিয়োজিত করেন এবং প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করেন। হযরত আমর ইবনুল আসকে তিনি আম্মান ও তার সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোর শাসনকার্যে নিযুক্ত করেন। সদকা আদায়ের জন্যেও তিনি একদল সাহাবাকে নিযুক্ত করেন। কারণ, প্রত্যেক গোত্র ও পরিবারের থেকেই তাদের সদকা আদায় করার জন্যে এক একজন নিযুক্ত করলেন। সেজন্যে বহু সংখ্যক আদায়কারী নিয়োজিত হল। নবম হিজরীতে হযরত আবু বকরকে (রাঃ) হজ্জের ব্যবস্থাপনায় নিযুক্ত করা হয়।

তারপর সেখানে হযরত আলীকেও (রাঃ) পাঠানো হয় সেখানকার সবাইকে সুরা বারাআত পড়ে শোনাবার জন্যে। কারণ, হযরত আবু বকর (রাঃ) হজ্জের দায়িত্ব নিয়ে মদীনা ছেড়ে আসার পরে এ সুরা নাযিল হয়। অন্য কারণ হল এই, আরবরা কা'বা-রক্ষী গোত্র ছাড়া অন্য-কারুর কাছে নতি স্বীকারে রাজী হত না। একটি বর্ণনা মতে তাঁকে হযরত আবু বকরের (রাঃ) সহকারী করে পাঠানো হয়েছিল। এ জন্যেই হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আলীকে (রাঃ) প্রশ্ন করেছিলেনঃ তুমি পরিচালক হয়ে এসেছ, না পরিচালিত হতে? তিনি জবাব দিলেনঃ পরিচালিত হতে।

রাফিজীরা বলে থাকে, হযরত আবু বকরকে (রাঃ) পদচ্যুত করে হযরত আলীকে (রাঃ) আমীর করা হয়েছিল। এটা হচ্ছে সে দলের নিতান্তই ধাপ্পাবাজী ও জালিয়াতী। এ ঘটনাটি কি জিলহজ্জে ঘটেছিল, না জিলকা'দে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে এবং তা নেহাৎ স্মৃতি বিভ্রাট বৈ নয়।

হযরতের প্রহরীদল

বদর যুদ্ধে হযরত (সঃ) যখন 'আরীশ' নামক স্থানে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, তখন সা'আদ বিন মা'আজ (রাঃ) তাঁর পাহারার দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

ওহুদের যুদ্ধে তাঁর দেহরক্ষী নিযুক্ত হয়েছিলেন মুহাম্মাদ বিন মুসলিম। খন্দকের যুদ্ধে

Contents

হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ) এ সৌভাগ্যের অধিকারী হন। এ ছাড়া আরো কয়েকজন সাহাবী রসূলের (সঃ) প্রহরীর দায়িত্ব সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু যখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তোমাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন, তখন তিনি সবাইকে এ আয়াত শুনিয়ে পাহারাদারদের বিদায় দিলেন।

সাহাবাদের অন্যান্য দায়িত্বে নিযুক্তি

অপরাধী ও শত্রুদের যাঁরা কিসাস করতেন ও শাস্তি দিতেন, তাঁদের নাম এখানে দেয়া হল ঃ

হযরত আলী (রাঃ), যুবায়ের বিন আওয়াম (রাঃ), মিকদাদ বিন আমর (রাঃ), মুহাম্মদ বিন মুসলিমা (রাঃ), আসিম বিন ছাবিত (রাঃ), ও যিহাক বিন সুফিয়ান কিলাবী (রাঃ)। হযরত কায়েস বিন সা'দ বিন ইবাদাহ আনসারী (রাঃ) হযরতের (সঃ) পক্ষ থেকে সেনা বিভাগের তদারকে নিযুক্ত ছিলেন। মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) হুদায়বিয়া সন্ধির দিনে হযরতের (সঃ) দেহরক্ষী হিসেবে তরবারি হাতে দাঁড়িয়েছিলেন।

হযরতের ব্যক্তিগত ব্যাপারের বন্দোবস্ত

হযরত বিলালকে (রাঃ) তিনি পারিবারিক খরচ পত্রের দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন। মুআয়কীব ইবনে আবি ফাতিমাতুদ্‌দাওসী তাঁর সিলমোহর রক্ষক ছিলেন। জুতা ও মিস্‌-ওয়াক থাকত হযরত ইবনে মাসউদের (রাঃ) কাছে। এ ভাবে রিবাহুল আসওয়াদ (রাঃ), উনায়সা, আনাস্‌ বিন মালিক (রাঃ) ও হযরত আবু মুসা আশ্‌'আরীর (রাঃ) কাছেও কিছু কিছু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল।

হযরতের মুখপাত্র ও সভাকবি

হযরত কা'ব বিন মালিক (রাঃ) ও হাস্‌সান বিন ছাবিত (রাঃ) রসূলের (সঃ) সভাকবি ছিলেন। ইসলামের ওপরে অন্যান্য আরব কবিদের আক্রমণের জবাব দিতেন তাঁরা। তাঁরা কাফিরদের বিরুদ্ধে অনমনীয় মসীযোদ্ধা ছিলেন। কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধে তাঁরা ঘৃণা সৃষ্টি করতেন।

হযরতের (সঃ) মুখপাত্র হিসেবে কাজ করতেন ছাবিত বিন কায়েস বিন শিমাস (রাঃ)।

হযরতের কাফেলা সংগীতকার

তাঁদের নাম এই ঃ আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ), আঞ্জাশা, আমের বিন আকু' ও তার চাচা সালমা বিন আকু'।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে, কাফেলা সংগীতকারদের চিত্তাকর্ষক সুর ঝংকারে মুগ্ধ হয়ে হযরত (সঃ) একদিন বললেনঃ হে আঞ্জাশা! দুর্বলা নারী বেচারীদের দিকেও একটু দয়া দৃষ্টি রেখ!

হযরতের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও অভিযান প্রেরণ

হযরতের (সঃ) হিজরতের পরে মদীনায় আস্তানা গড়ে নেবার পরবর্তী দশ বছরেই যত যুদ্ধ অভিযান ও প্রতিনিধি প্রেরণ কার্য সম্পাদিত হয়। তাঁর সময়ে সংঘটিত যুদ্ধের সংখ্যা হল সাতাশ। কোন রিওয়ায়েতে পঁচিশ ও এক রিওয়ায়েতে উনত্রিশ বলা হয়েছে। এর চেয়ে কম বা বেশীও বলা হয়েছে।

ন'টি যুদ্ধে তিনি স্বয়ং পরিচালনার ভার নেনঃ বদর, ওহুদ, খন্দক, বণু কুরায়যা, বণু মুস্তালিক, খায়বার, মক্কা বিজয়, হুনায়েন ও তায়েফ। অপর এক বর্ণনা মতে তিনি বণু নযীর, গাবা ও ওয়াদিয়ে কুরার যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া ছোট খাট অভিযান প্রেরণ ও দাংগা-হাংগামা সংঘটন গণনা করলে তার সংখ্যা হবে প্রায় ষাট। তবে উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ মাত্র সাতটিই ছিলঃ বদর, ওহুদ, খন্দক, খায়বার, হুনায়েন, তবুক ও মক্কা বিজয়। এ সব যুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনের আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে।

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আনফালের আয়াত ও ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আল ইমরানের শেষের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। যেমন খোদা বলেনঃ

وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ - الخ -

তা ছাড়া খন্দক, বণু কুরায়যা ও খায়বার যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আহযাবের গোড়ার আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। সূরা হাশরে বণু নযীরের যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে। সূরা 'ফাতহ' এ হুদায়বিয়ার সন্ধি ও খায়বার বিজয় সম্পর্কে আয়াত এসেছে। সে আয়াতে বিজয়ের সুসংবাদ জানানো হয়েছিল। তা ছাড়া সূরা 'নসর' এ তো সার্বিক ও চূড়ান্ত বিজয় সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ওহুদের যুদ্ধে হযরত (সঃ) আহত হয়েছিলেন। হুনায়েন ও বদরে ফেরেশতারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। খন্দকের যুদ্ধেও ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের দেখে কাফির-দের পা টলে গেল এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে পালাল। এ যুদ্ধে কাফিরদের মুখের ওপরে ফেরেশতারা পাথর নিক্ষেপ করেছিলেন। তাই শেষকালে লাঞ্ছিত হয়ে পালিয়ে গেল।

বদর ও হুনায়েনের যুদ্ধে বিরাট জয়লাভ ঘটে। তায়েফের যুদ্ধে তিনি 'মেঞ্জানিক' ব্যবহার করেছিলেন। আহযাবের যুদ্ধে হযরত সালমান ফার্সীর পরামর্শক্রমে খন্দক বা পরিখা খনন করে রক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন।

Contents

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

●

হযরতের সমরোপকরণ ও ব্যবহার্য দ্রব্য

হযরতের কাছে ন'টি তরবারি ছিল। একখানা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। সেটার নাম ছিল 'মাছুর।' দ্বিতীয়টির নাম ছিল 'উদ্ব।' তৃতীয়টি হল বা 'জুলফিকার।' এটিকে নবী (সঃ) সব সময়ে কাছে রাখতেন। সে তরবারির হাতল ও সংশ্লিষ্ট অন্য সব রৌপ্য নির্মিত ছিল। তা ছাড়া তাঁর কাছে 'কেল'ঈ, বিত্তার, খনফ, দাসুব, মাখজাম ও কাযীব নামক তরবারি ছিল। শেষটিও রূপা দিয়ে বাঁধানো ছিল।

'জুলফিকার' তরবারি তিনি বদর যুদ্ধে লাভ করেন। স্বপ্নে তিনি এটিকে দেখতে পেয়েছিলেন। যেদিন তিনি মক্কা প্রবেশ করেন, তখন সে তরবারিতে সোনা ও রূপার কারুকার্য খচিত ছিল।

হযরতের (সঃ) সাতটি বর্ম ছিল। একটি হল 'জাতুল ফযুল।' এটিকে হযরত (সঃ) পারিবারিক অভাব-অনটনে এক বছরের জন্যে পনের সের যবের বিনিময়ে আবু শোহম নামক এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন। বর্মটি লোহার গড়া ছিল। তা ছাড়া 'জাতুল বিশাহ', জাতুল হাওয়াশী, সা'দিয়া, ফিদ্দা, বিতরা ও খারনফ নামক বর্মও তাঁর ছিল।

এ ছাড়া তাঁর কাছে ছ'টি বর্শা ছিল। সেগুলোর নাম ছিল, যওরা, রওদা, সফরা, বায়দা ও কছুম। শেষটি ওহুদ যুদ্ধে ভেঙ্গে গিয়েছিল। তখন সেটাকে কাতাদা বিন নু'মান ও শাদ্দাদ (রাঃ) তুলে নিলেন। হযরতের কাছে বর্শা ফলক রাখার একটা থলে ছিল। সেটার নাম ছিল কাফুর।

হযরতের (সঃ) একটি কোমরবন্দ ছিল। তাতে সোনা ও রূপার তিনটি তার ছিল। চারপাশ রূপোয় বাঁধানো ছিল। অবশ্য এটা একদলের অভিমত। কিন্তু, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ) বলেন—এরূপ কোন বর্ণনা আমি পাইনি যাতে হযরতের (সঃ) এ ধরণের কোন কোমরবন্দ ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে।

এ ছাড়া হযরতের (সঃ) কাছে 'যলুক' নামক একটি ঢাল ছিল। ফাতাক নামেও একটি ঢাল ছিল। তা ছাড়া আরেকটি ঢাল হযরতকে (সঃ) উপহার দেয়া হয়েছিল। তাতে চিত্র অংকিত ছিল। হযরত (সঃ) তাতে হাত রাখা মাত্র আল্লাহ সে চিত্র মিলিয়ে দেন।

হযরতের (সঃ) কাছে নেযা ছিল পাঁচটি। একটির নাম ছিল 'মাছওয়া' আরেকটির নাম ছিল মুনছানী। 'নুব'আ' নামক তাঁর একটি অস্ত্র ছিল। তা ছাড়া 'বায়দা' নামে একটি বড় এবং গেমরা নামক একটি ছোট অস্ত্র ছিল। ঈদের সময়ে সেটিকে হযরতের (সঃ) আগে আগে

নিয়ে চলা হত। নামাযের সময়ে সেটা হযরতের সামনে গেড়ে দেয়া হত। নামাযের জন্যে সেটাকে আড় সৃষ্টি করার কাজে লাগানো হত। কখনও হযরত (সঃ) সেটাকে সাথে নিয়ে বেরোতেন। মোশেহ্ নামক তাঁর একটি লোহার টুপি ছিল। তাতে তামা জড়ানো ছিল। তা ছাড়া মাসবুগ বা জুল মাসবুগ নামক আরেকটি লৌহ মুখোস ছিল।

জিহাদে ব্যবহারের জন্যে হযরতের (সঃ) তিনটি জুব্বা ছিল। একটি সবুজ রেশমের তৈরী ছিল। বর্ণিত আছে, উরুয়া বিন যুবায়েরের (রাঃ) কাছে একটি জুব্বা ছিল। তাতে সবুজ রেশমের বুননী ছিল। হযরত (সঃ) জিহাদের ময়দানে সেটা ব্যবহার করতেন। এ রিওয়ায়েতের ভিত্তি তেই ইমাম আহমদ (রঃ) জিহাদের ময়দানে রেশমী বস্ত্র ব্যবহার জায়েয বলেছেন।

হযরতের (সঃ) কাছে 'উক্কাব' নামক এক কালো পতাকা ছিল। সুনানে আবু দাউদে এক সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, 'আমি হযরতের (সঃ) পতাকা গাঢ় হলুদ বর্ণের দেখেছি। অধিকাংশ সময়ে তা কালো দেখা যেত।

তা ছাড়া হযরতের (সঃ) 'কুন্' নামক একটি তাবু ছিল। আর এক গজ বা তা থেকে কিছু লম্বা একটি লাঠি ছিল। সেটাকে নিয়ে হযরত (সঃ) চলাফিরা করতেন। সেটায় ভর করে তিনি যানবাহনে আরোহন করতেন। তারপর উটের সাথে ঝুলিয়ে রাখতেন। 'উরজুন' নামে হযরতের (সঃ) একটি ঠেস দিয়ে দাঁড়াবার লাঠি ছিল। মামশুক নামে আরেকটি লাঠিও ছিল। এ লাঠিটিই চার খলীফার হাতে শোভা পেত।

রিয়ান নামে তাঁর একটি পেয়ালা ছিল। তাকে 'মগিয়া'ও বলা হয়েছে। আরেকটি পেয়ালার সাথে সোনার চেইন লাগানো ছিল। শীশারও একটি পেয়ালা ছিল। এ ছাড়া তাঁর চৌকির নীচে রাতের বেলায় পেশাব করার জন্যে একটি কাঠের পাত্র ছিল।

তাঁর 'সাদির' নামক একটি মশক ছিল। ওযু করার জন্যে ছিল একটি পাথরের পাত্র। কাপড় ধোবারও একটি পাত্র ছিল। 'সিক্কা' নামক একটি বড় পেয়ালা ছিল তাঁর। তা ছাড়া হাত ধোবার একটি থালা, তেলের শিশি ও আয়না-কাঁকই রাখার একটি থলে ছিল। কথিত আছে, তাঁর চিরুনী সেগুন কাঠের তৈরী ছিল। তাঁর একটি সুরমাদানী ছিল। রাতে শোবার সময়ে তিনি তা থেকে তিনবার কাঠির সাহায্যে 'আছমাদ' সুরমা ব্যবহার করতেন। তাঁর থলের ভেতরে দুটো কেঁচি ও মিস্ওয়াক ছিল।

এ ছাড়া হযরতের (সঃ) বিরাট একটি পাত্র ছিল। তাতে চারটি আংটা লাগানো ছিল। চার জনে ধরে তা তুলত। পরিমাপের জন্যে 'ছা' ও 'মুদ' রাখতেন। একটি চাদরও ছিল। হযরতের (সঃ) খাটের পায়া ছিল সেগুন কাঠের। সা'আদ বিন যিরারাহ সেটাকে হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছিল। তাঁর বিছানা ছিল চামড়ার। তাতে খেজুর পাতার গাঁথুনী ছিল।

বিভিন্ন হাদীছ থেকে রসূলে খোদার যাবতীয় ব্যবহার্য বস্তুর এটাই পূর্ণ তালিকা। ইমাম তিবরানী তাঁর 'মু'জিমে তিবরানী' গ্রন্থে হযরতের থালা ও ঘটি-বাটি সম্পর্কে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ হাদীছ উধৃত করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাসের এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরতের হাতল বাঁধানো একটি তরবারি ছিল। তার চারপাশে সোনা-রূপার কারুকার্য ছিল। তরবারিটি জুলফিকার নামে খ্যাত।

হযরতের (সঃ) কাছে 'সুদাদ' নামক একটি ধনুক ছিল। 'জাম'আ' নামক একটি ফলক পাত্র ছিল। আর ছিল একটি বর্ম। বর্মটিতে তামার কারুকার্য ছিল। সেটাকে বলা হত 'জাতুল ফযুল।' নূব'আ নামক একটি হাতিয়ার ছিল। তা ছাড়া 'দিকন' নামক একটি লাঠি, মুজিয নামক সাদা ঢাল, সকব নামক ধূসর বর্ণের ঘোড়া, দাজ নামক গদী, দুলদুল নামক সাদা খচ্চর, কুসওয়া নামক একটি উটনী, য়্যা'ফুর নামক গাধা, কুর্দ নামক চাটাই, কামার নামক বকরী, সাদির নামক পেয়ালা ও জামে' নামক কেচি হযরতের (সঃ) অধিকারে ছিল। তা ছাড়া তাঁর একটি আয়না ও 'মউত' নামে একটি ডাণ্ডা ছিল।

হযরতের জীব-জন্তু

তাঁর একটি সকব ঘোড়া ছিল। এ ঘোড়াটিই তাঁর অধিকারে সর্বপ্রথম আসে। এক আরব বাসির কাছ থেকে তিনি দশ উকিয়ায় এটা কিনেছিলেন। ঘোড়াটির চাঁদ কপাল, লাস্যময় দেহ, কালো চোখ ও কালসে রঙ ছিল। মুর্তাজিব নামে আরেকটি ঘোড়া ছিল। খুযায়মা বিন ছাবিত এটা সম্পর্কেই সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

এ ছাড়া লাহীফ, লুযায, যরব, সাজা ও ওয়ার্দ নামক ঘোড়াও ছিল। সব বর্ণনাকারী ঘোড়ার সংখ্যা সাত হবার ব্যাপারে একমত। শাফেঈ মাজহাবের ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসহাক বিন জামা'আ একই চরণে তা একত্র করে দিয়েছেন :

الخيل سكب لحيف سجه ظرب
لزاز مرتجز ورد لها اسرار

তাঁর পুত্র ইমাম ইজ্জুদ্দীন আবদুল আযীয আবু আমর থেকে আমি এটা পেয়েছি।

একটি বর্ণনা মতে হযরতের কাছে এ ছাড়াও পনেরটি ঘোড়া ছিল। কিন্তু, এ বর্ণনা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হযরতের (সঃ) গদীর চারপাশে খেজুরের খোসা বোঝাই থাকত। তাঁর দুলদুদল নামে একটি খচ্চর ছিল। সম্রাট মুকাওকাশ তাঁকে সেটা উপঢৌকন স্বরূপ দিয়েছিলেন। ফিদ্দা নামক আরেকটি খচ্চর ফরোয়া জুযামী নজর স্বরূপ দিয়েছিলেন। ঈলার শাসক তাঁকে সাদা খচ্চর পাঠিয়েছিলেন। আরেকটি খচ্চর পাঠিয়েছিলেন দওমাতুল জুন্দলের শাসনকর্তা।

একটি বর্ণনা মতে সম্রাট নাজ্জাশীও একটি খচ্চর পাঠিয়েছিলেন। আর সেটায়ই তিনি চলাচল করতেন। এ ছাড়া কিবতী শাসক মুকাওকাশ আফীর নামক একটি সাদা গাধা পাঠিয়েছিলেন। ফরোয়া জুযামীও একটি গাধা উপহার দিয়েছিলেন।

বর্ণিত আছে, হযরত সা'আদ বিন ইবাদা (রাঃ) হযরতের (সঃ) খিদমতে একটি গাধা নজরানা স্বরূপ পেশ করেছিলেন। তিনি তাতে সওয়ার হয়েছেন। হযরতের (সঃ) কাছে কুসওয়া নাম্নী একটি উত্তম উটনী ছিল। কথিত আছে, তাতে চড়েই তিনি হিজরত করেছিলেন। তা ছাড়া উদবা, ও জুদ'আ নামক দুটো উটও ছিল। সেগুলোর কান ও নাক সব ঠিক থাকা সত্ত্বেও এমনি এ নামে খ্যাত হয়েছিল। একটি বর্ণনা মতে, একটির কান কাটা ছিল বলে 'উদবা' খ্যাতি পেয়েছিল। এ নিয়েও মতভেদ আছে যে, এ দুটো নাম কি একটির, না দুটির? 'উদবা' এত দ্রুতগামী ছিল যে, কোন উটই তার আগে যেতে পারত না। একবার এক আরব বাসিন্দার উটনী সেটার আগে চলে যাওয়ায় মুসলমানরা অত্যন্ত দুঃখ পেল। নবী (সঃ) তখন বললেন, খোদার বিধান হল এই, দুনিয়ার লয়শীল বস্তুর যে কোনটি যতক্ষণ পতনশীল হয়ে না চলবে, ততক্ষণ দুনিয়া ছেড়ে যাবে না।

তিনি বদর যুদ্ধে গণীমতের (যুদ্ধলব্ধ) সম্পদ হিসাবে আবু জেহেলের উটটি পেলেন। সেটার নাকে রুপার লাগাম ছিল। হুদায়বিয়ায় হযরতকে (সঃ) এটা দেয়া হয়েছিল যেন মুশরিকরা তা দেখে জ্বলে পুড়ে মরে। হযরতের (সঃ) কাছে প'য়তাল্লিশটি যুবতী উট ছিল। তাঁর কাছে আরও একটি উট ছিল। সা'আদ বিন ইবাদা (রাঃ) সেটা বণু আকীল গোত্র থেকে নিয়ে হযরতকে (সঃ) দিয়েছিলেন।

হযরতের (সঃ) বকরীর সংখ্যা ছিল একশ। এ সংখ্যা তিনি বাড়তে দিতেন না। কোন বাচ্চা হলেই বড় একটি বকরী জবেহ করতেন। এ ছাড়া তাঁর সাতটি পাহাড়িয়া ছাগল ছিল। সেগুলো হযরত উম্মে আয়মন (রাঃ) চড়িয়ে ফিরতেন।

হযরতের পোষাক-পরিচ্ছদ

হযরতের (সঃ) 'সাহাব' নামক একটি পাগড়ী ছিল। হযরত আলী (কঃ)ও সেটা বেঁধেছিলেন। তিনি পাগড়ীর নীচে টুপী পরতেন। শুধু টুপী পরার অভ্যেসও ছিল তাঁর। পাগড়ী বেঁধে তিনি লেজ কাঁধের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিতেন। সহীহ মুসলিমে হযরত আমর বিন হারিছ বর্ণনা করেন:

"আমি হযরতকে (সঃ) মিম্বরে দাঁড়ানো দেখেছি। মাথায় ছিল তাঁর কালো পাগড়ী এবং তার দু'লেজ কাঁধের দু'দিকে ঝুলানো ছিল।"

মুসলিম শরীফে হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন: "হযরত (সঃ) যখন মক্কা প্রবেশ করলেন, তাঁর শিরে তখন কালো শিরস্ত্রান শোভা পাচ্ছিল।" অবশ্য এ বর্ণনাটিতে লেজ

সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এতে জানা যায়, সর্বদা তিনি পাগড়ীর লেজ ঝুলাতেন না।

একটি বর্ণনায় এও আছে, হযরত (সঃ) যখন মক্কা প্রবেশ করেন, তখন তাঁর দেহে জংগী পোষাক ছিল। তাঁর শিরে তখন লৌহ শিরস্ত্রান ছিল। মনে হয়, তিনি স্থান-কাল অনুসারে যথোপযোগী পোষাক ব্যবহার করতেন।

আমাদের শায়েখ ইবনে তায়মিয়া (রঃ) পাগড়ীর বাড়তি অংশ ঝুলানো সম্পর্কে এক আশ্চর্য রহস্য বর্ণনা করতেন।

হযরত (সঃ) মদীনায় একবার স্বপ্নে দেখলেন। তিনি বলেন: স্বপ্নে আমি খোদার দর্শন লাভ করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে বললেন: "হে মুহাম্মদ! উর্ধ জগতের ফেরেশতারা কি কথা নিয়ে ঝগড়া করছে, জান? আমি জবাব দিলাম: না। আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁর হাত আমার দুটি কাঁধের মাঝে রাখলেন। অমনি আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুর জ্ঞান আমার লাভ হলো ইত্যাদি।"

তিরমিজীতেও এ বর্ণনা রয়েছে। ইমাম বুখারীকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছেন: "এটা সহীহ রিওয়ায়েত।" আবার প্রশ্ন করা হল, রিওয়ায়েতের যে অংশটিতে বলা হল "নবীর (সঃ) কাঁধে তখন পাগড়ীর লেজ ঝুলানো ছিল" তাও কি সঠিক? তার জবাবে তিনি বললেন: শুধু মুর্খদের অন্তর ও জিহবাই এটা অস্বীকার করতে পারে। আর আমি তো শুধু তাঁর (হযরতের) জন্যে ছাড়া অন্য কারুর জন্যে পাগড়ীর লেজ ঝুলানো প্রমাণ করা বাহুল্য মনে করি।

তিনি জামা পরেছেন। কামীস তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন। তার আস্তিন পাঞ্জার গীরা পর্যন্ত ছিল। তা ছাড়া জুব্বা পরতেন এবং কাবার মতই ফিরোজ নামক এক ধরণের জামা পরতেন। তিনি কাবাও পরতেন। সফরের সময়ে তিনি চুরিহাতার জুব্বা পরতেন। চাদর ও ইজার ব্যবহার করতেন।

ওয়াকিদী বলেন—তাঁর চাদর তিন হাত লম্বা ও ন্যুনাধিক দেড়হাত পাশে ছিল। তাঁর লুংগী আম্মানী সুতার তৈরী ছিল। তা দৈর্ঘ্যে দুহাতের কিছু বেশী ও পাশে এক হাতের কিছু বেশী ছিল। তিনি লাল রঙের হুল্লা পোষাকও ব্যবহার করতেন। চাদর ও লুংগী এ দুটোকে মিলিয়ে হুল্লা পোষাক বলা হত। তাই যারা হুল্লা পোষাক বলতে শুধু লাল পোষাক মনে করে তারা ভুল করে। কারণ, হুল্লা বা লাল জোড়া-পোষাক বলতে ইয়ামানের দুটো চাদর বুঝাত। তাতে ইয়ামানের আর সব চাদরের মতই লাল ও কালো সুতার বুননী থাকত। কালোর মাঝে কিছু লাল সুতার রেখা থাকত বলেই তাকে লাল পোষাক নাম দেয়া হয়। আদপে ইসলামে পুরো লাল পোষাক পরা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আবু দাউদের (রঃ) 'সুনান' নামক সংকলনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে এক বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি বলেছেন: "আমার দেহে জাফরানী রং মাখা একটি চাদর দেখে হযরত (সঃ) বললেন, এটা কিরূপ চাদর তুমি জড়িয়ে নিয়েছ?

আমি তক্ষুণি হযরতের অসন্তোষ বুঝতে পেরে বাড়ী ফিরে এলাম। চুলোয় তখন আগুন জ্বলছিল। চাদরটি তাতে ছুড়ে ফেললাম। পরদিন হযরতের (সঃ) খিদমতে হাজির হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আব্দুল্লাহ ! চাদরটি তুমি কি করলে ? তখন আমি সবিস্তারে সব কথা বললাম। তিনি তা শুনে বললেন ঃ ঘরের কোন মেয়ে লোককে দিলেনা কেন ? তাদের জন্যে তা পরায় কোন দোষ নেই।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) গাধার জন্য লাল গদী তৈরী করতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ মুসলিমে ওপরের বর্ণনাকারীর আরেকটি বর্ণনায় বলা হয় ঃ হযরত (সঃ) আমার দেহে দুটো জাফরানী রঙ ছাপানো চাদর দেখে বললেন—এগুলো পরিধান করোনা। এ হচ্ছে কাফিরের পোষাক।

সহীহ মুসলিমে হযরত আলী (কঃ) থেকে একটি বর্ণনায় বলা হয় ঃ নবী (সঃ) কাপড়ে জাফরানী রঙ মাখাতে নিষেধ করেছেন।

আর এ কথা সবারই জানা আছে যে, জাফরানী রঙ কাপড়কে লাল করে দেয়। একটি হাদীছ সংকলনে এরূপ একটি ঘটনা আছে যে, হযরতের (সঃ) সাথে এক সাহাবী একবার সফরে বেরিয়েছিলেন। হযরত (সঃ) তাঁর আসবাব পত্রের ভেতরে একটা লাল পাড়ওয়ালা চাদর দেখতে পেয়ে বললেন—আমি তোমার সোয়ারীতে এ লাল বস্তু যেন না দেখি। তা শুনে তিনি তক্ষুণি ক্ষিপ্রতার সাথে ছুটে গেলেন। এমনকি তাঁর উট পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল। সে উট থেকে সব লাল কাপড় নামিয়ে ফেললেন।

আবু দাউদ এ বর্ণনাটি উধৃত করেছেন। বস্তুত লাল বা সোনালী রঙের পোষাক পরার বৈধতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। এর প্রতি হযরতের (সঃ) কঠোর বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেয়েছে। তাই হযরত (সঃ) কি করে নিজেই আবার গাঢ় লাল পোষাক পরতে পারেন ? আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাঁকে তা থেকে পবিত্র রেখেছেন। অবশ্য লাল রেখা বিশিষ্ট কথাটিই তালগোল পাকিয়েছে।

এ ছাড়া তিনি কারুকার্য করা কালো ও সাদা জামা ব্যবহার করেছেন। কালো জামায় সবুজ রেশমের আস্তিন বিশিষ্ট কাবা পরিধান করেছেন। ইমাম আহমদ (রঃ) ও আবু দাউদ (রঃ) নিজ নিজ সূত্রে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রোমক সম্রাট হযরতের (সঃ) খিদমতে রেশমের এক মহামূল্যবান জুব্বা পাঠিয়েছিলেন, তিনি তা পরিধান করেন। আমি যেমন হযরতের (সঃ) উভয় হাত এখনো বাইরে দেখতে পাচ্ছি। আসমাঈ বলেন, সে জুব্বা ঢিলা ঢোলা কাবা ছিল। তার আস্তিন ছিল লম্বা।

খাত্তাবী (রঃ) বলেন, হতে পারে এ জুব্বায় কিছুটা রেশমের কারুকার্য ছিল। তা না হলে সাধারণ জুব্বা কখনো রেশমের তৈরী হয় না।

নবী (সঃ) একটি পাজামাও খরীদ করেছিলেন। এটা সুস্পষ্ট যে, তিনি তা ব্যবহারের জন্যেই কিনেছিলেন। এক রিওয়ায়েতে তাঁর পাজামা পরারও উল্লেখ রয়েছে। আর সাহাবারা তো তাঁর অনুমতি নিয়ে পাজামা পরতেন। তিনি মুজাও ব্যবহার করতেন। তাঁর ব্যবহৃত মুজার নাম ছিল 'তাসুমা'। হযরত (সঃ) আংটিও ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, তিনি তা কোন হাতে পরতেন। এ সব বর্ণনাই সূত্র বিচারে বিশুদ্ধ।

জিহাদে তিনি বর্ম পরতেন। একটির নাম ছিল 'খারদা' ও অপরটির নাম ছিল 'যদির্য়া'। ওহুদ যুদ্ধে যে তিনি দুটো বর্ম পরেছিলেন, তা তো সবাই জানে। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বলেন—এটা নবীর (সঃ) জুব্বা। এই বলে তিনি যে একটি মূল্যবান খসরুয়ানী জুব্বা দেখালেন, তাতে রেশমের কারুকার্য ছিল। তার চারদিকেও রেশম বুনানো ছিল। তিনি বলেছেন, এজুব্বা হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে ছিল। তিনি ইন্তিকাল করার পরে এটা আমি হিফাজত করে রেখেছি। নবী (সঃ) এটা পরতেন। আমি এটা ধুয়ে রোগীদের সেই পানি পান করতে দেই এবং তারা সুস্থ হয়ে যায়। নবীর (সঃ) দুটো সবুজ চাদর ছিল। আর একটি কালো কম্বল, একটি লাল রেখা বিশিষ্ট কম্বল ও একটি পশমের কম্বল ছিল। তাঁর জামা সূতীর ছিল। তার দৈর্ঘ্যও কম ছিল। তার আস্তিনও ছোট ছিল। অবশ্য লম্বা হাতাওয়ালা জামা রসূল (সঃ) কিংবা সাহাবা (রাঃ) কেউই পরতেন না। তা পরা সুন্নতের খেলাফ কাজ। এমনকি তা ব্যবহার জায়েয কিনা সন্দেহের ব্যাপার। কারণ, এটা হচ্ছে দাম্ভিকদের পোষাক। নবী (সঃ) জামা ও হিব্রা চাদর অত্যন্ত পসন্দ করতেন। হিব্রা চাদরের চারপাশে লাল পাড় থাকে। তিনি সবচাইতে সাদা কাপড় ভালবাসতেন এবং বলতেন—এগুলো উত্তম কাপড়। এগুলোই পরিধান কর এবং মৃতদের কাফনের কাজে ব্যবহার কর।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে একটি সহীহ রিওয়ায়েতে বর্ণিত আছে; তিনি একটি পুরনো কম্বল ও মোটা সূতার একটি চাদর বের করলেন এবং বললেন—নবী (সঃ) এ দুটো কাপড় পরা অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। তিনি সোনার আংটি পরতেন। পরে তা ছুড়ে ফেলেছেন এবং সোনার আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তারপর তিনি রূপার আংটি ব্যবহার করতেন। সেটা নিষেধ করেননি।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, আবু দাউদের এক বর্ণনায় আছে, রসূল (সঃ) কতগুলো কাজ নিষেধ করে গেছেন। তার ভেতরে একটি হচ্ছে, শাসনকর্তা ভিন্ন অন্য কারুর জন্যে আংটি পরা বৈধ নয়।

এর জবাবে বলব, এ রিওয়ায়েতটির সহীহ বা গায়ের সহীহ হওয়া সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে অক্ষম।

হযরতের আংটির গিল্টি করা অংশ ভেতরের দিকে থাকত। ইমাম তিরমিজী (রঃ) একটি হাদীছ উধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়ঃ হযরত (সঃ) যখন পায়খানায় যেতেন, তখন আংটি খুলে নিতেন। ইমাম তিরমিজী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। অবশ্য আবু দাউদ (রঃ) হাদীছ-টিকে মুনকার বা গ্রহণের অযোগ্য বলেছেন।

এখন থাকে আজমী সবুজ চাদর সম্পর্কিত প্রশ্ন। এ ধরনের চাদর (তিলছান) রসূল (সঃ) কিংবা সাহাবাদের (রাঃ) কেউ পরেছেন বলে বর্ণনা নেই। পরন্তু সহীহ মুসলিমে হযরত নুয়াস বিন সুমআন (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে বলেছেন, সে ইস্পাহান থেকে সত্তর হাজার ইয়াহুদী নিয়ে বের হবে। তাদের গায়ে এ ধরনের সবুজ চাদর থাকবে।

হযরত আনাস (রাঃ) একবার তিলছান পরিহিত একটি দল দেখে বললেন—খায়বারের ইয়াহুদীদের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য কত বেশী! তাই পূর্বসূরীদের একটি দল তিলছান ব্যবহার করা মাকরূহ ভাবতেন। আবু দাউদ ও হাকাম নিজ নিজ মুসনাদে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা উধৃত করেছেন যে, হযরত (সঃ) বলেছেনঃ যারা যে জাতিকে অনুসরণ করবে, তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

তিরমিজির এক রিওয়ায়েতে নবী (সঃ) বলেনঃ আমাকে ছেড়ে যে অন্য কোন সম্প্রদায়কে অনুসরণ করবে, সে আমার দলের নয়।

হিজরতের হাদীছে যে বলা হয়েছে, নবী (সঃ) আবুবকরের (রাঃ) কাছে মাথা ও মুখ ঢেকে এসেছিলেন, তা তিনি অবস্থা ও পরিস্থিতির দায়ে করেছিলেন যেন কাফিররা তাঁকে দেখতে না পায়। এটা তাঁর অভ্যাস ছিলনা; বরং সাময়িক পরিস্থিতির চাপে করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) অধিকাংশ সময় মাথা ও মুখ ঢেকে রাখতেন, সে সম্পর্কে সত্য ব্যাপার তো খোদাই ভাল জানেন। হতে পারে, গরম অথবা অন্য কোন প্রয়োজনের তাগাদায় তিনি তা করতেন। তাই বলে এটাকে মুখ-মাথা ঢেকে চলার অভ্যাস ছিল বলা চলে না।

অধিকাংশ সময়ে নবী (সঃ) ও সাহাবীরা (রাঃ) সুতার কাপড় পরতেন। মাঝে মাঝে পশম ও সিল্কের কাপড় পরতেন। শায়েখ আবু ইসহাক ইস্পাহানী সহীহ সনদ (সূত্র) সহকারে জাবির বিন আইয়ুব থেকে বর্ণনা করেনঃ হযরত সিলত বিন রাশেদ ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরীনের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর দেহে তখন কালো পশমী জুব্বা, পশমী ইজার ও পশমী পাগড়ী ছিল। তা দেখে ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরীন খুব মনোক্ষুন্ন হলেন। বললেনঃ কিছুলোক উলের বস্ত্র পরিধান করে যুক্তি দেখায় যে, হযরত ঈসাও (আঃ) তা পরেছিলেন। অথচ আমার কাছে

এক নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, হযরত (সঃ) উল, সিল্ক ও সুতা সব ধরনের বস্ত্রই পরিধান করেছেন। সেক্ষেত্রে আমাদের নবীকেই (সঃ) অনুসরণ করা বেশী উত্তম।

ইবনে সীরীনের উদ্দেশ্যে ছিল এই, কিছুলোকের ধারণা যে, বিশেষ করে কালো পোশাক পরা অন্যান্য পোশাক পরার চাইতে উত্তম। তাই তারা অন্য ধরনের কাপড় পরা এড়িয়ে চলত। এ ভাবে তারা একই পোশাককে প্রাধান্য ও বিশেষত্ব দিয়ে সেটাকে বিশেষ একটা প্রচলন হিসেবে চালু করে এবং সেটা বর্জন করাকে পাপ মনে করে। অথচ বিশেষ কোন পোশাক চালু করে সেটাই অপরিহার্য ধরে নেওয়াটাই পাপের কাজ। সব চাইতে উত্তম পন্থা নবী (সঃ) দেখিয়ে গেছেন। সেটাই সুন্নত। সেটার জন্যেই তিনি আদেশ দিয়েছেন, প্রেরণা জুগিয়েছেন এবং নিজে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। হযরতের (সঃ) পোশাক রীতি হল এইঃ সুতার হোক, পশমের হোক কিংবা সিল্ক ও অন্যকিছুর হোক, যা জুটে, তাই পরবে। তিনি ইয়ামানী চাদর, সবুজ চাদর, জুব্বা, কাবা, কামীস, পাজামা, ইজার, মুজা, জুতা সব কিছুই ব্যবহার করেছেন। কখনও তিনি পাগড়ীর লেজ পেছনে ঝুলিয়েছেন, কখনও বা ঝুলাননি ; বরং ঘাড়ের সাথে পাগড়ীর লেজ জড়িয়ে নিয়েছেন।

হযরত (সঃ) যখন কোন নতুন পোশাক পরতেন, তখন সেটার নাম বলে নিয়ে এরূপ দোআ পড়তেনঃ

اللهم انت كسوتني هذا القميص او الرداء او العمامة اسألك
خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له -

"হে খোদা তুমিই আমাকে এ কামীস, চাদর বা পাগড়ী পরিয়েছ। আমি তোমার কাছে এটার কল্যাণ ও যার জন্যে এটা তৈরী হয়েছে, তার কল্যাণ প্রার্থনা করি। আর এটার অকল্যাণ ও যার জন্যে এটি তৈরী হয়েছে, তার কোন অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

যখন তিনি জামা পরতেন, ডান দিক থেকে শুরু করতেন। এভাবে তিনি কালো পশমী কম্বল ব্যবহার করতেন। সহীহ মুসলিমে উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) কালো পশমের কম্বল গায়ে জড়িয়ে বের হয়েছিলেন।

মুসলিম ও বুখারী শরীফে হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ আমি হযরত আনাসের (রাঃ) কাছে আরজ করলাম, নবী (সঃ) কোন পোশাক বেশী পসন্দ করতেন? তিনি বললেনঃ হিব্রা। হিব্রা হল এক ধরনের ইয়ামানী চাদর। কারণ, সেই চাদরের অধিকাংশ সুতা ইয়ামানের হত। এই এলাকাটি নিকটবর্তী ছিল। কখনও তিনি সিরিয়া ও মিসরের তৈরী কাপড় পরতেন। যেমন, কিবতী চাদর। সেগুলো সিল্কের ছিল। কিবতীরা সিল্ক তৈরী করত।

সুনানে নাসায়ীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি হযরতের (সঃ) জন্যে পশমী চাদর তৈরী করেছিলেন এবং তিনি তা গায়ে জড়ালেন। যখন তিনি ঘুমিয়ে গেলেন,

তখন পশমের গন্ধ বেরুল। আর সেটা তিনি খুলে ফেললেন। কারণ, তিনি সুঘ্রান দ্রব্য পসন্দ করতেন।

সুনানে আবু দাউদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ আমি হযরতের (সঃ) পবিত্র দেহে দামী পোষাকও দেখেছি। সুনানে নাসায়ীতে হযরত আবু রিশমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ আমি হযরতকে (সঃ) দুটি সবুজ চাদর গায়ে জড়িয়ে খুৎবা পাঠ করতে দেখেছি।

তিনি সবুজ চাদর বলতে সবুজ রেখার চাদর বুঝিয়েছেন। যারা লাল হুল্লা বলতে, গাঢ় লাল চাদর বুঝেন, তাদের এ ব্যাপারটি একটু তলিয়ে বুঝা দরকার। কারণ, এখানে সবুজ চাদর বলতে কোন হাদীছসাস্ত্রবিদই গাঢ় সবুজ চাদর বলেননি।

হযরতের (সঃ) আসন ছিল চামড়ার। তাতে খেজুরের ছাল ভরা থাকত। এক ধরনের লোক তো আজকাল বেরিয়েছেন যারা খোদার হালাল বস্তুকে হারাম করে নিয়ে সেটাকে দরবেশী ও পরহেজগারীর চাবিকাঠি বলে ঘোষণা করে থাকেন। অপর দল মোটা কাপড় ও নিরামিষ ভোজনকে অহংকার ভরে বর্জন করে চলে। এ দু'দলই রসুলের সুন্নতের বিরোধী। তাই প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অভ্যেস ছিল কখনও উত্তম কাপড় পরে ও ভাল খানা খেয়ে আবার কখনও সরল সহজ জীবন যাপন করে কোন বিশেষ ধরনের জীবন পদ্ধতির সাথে নিজদের নির্দিষ্ট ও বিশিষ্ট হতে দিতেন না। সুনানে হযরত উমরের (রাঃ) বরাত দিয়ে এক 'মারফু' রিওয়ায়েতে বলা হয়েছেঃ যে ব্যক্তি খ্যাতি লাভের জন্যে বিশেষ ধরনের পোষাক পরিধান করে, কিয়ামতের দিন তাকে লাঞ্ছনার পোষাক পরানো হবে। তারপর দোযখে সেই পোষাকের আগুনেই জ্বলবে। কারণ, সে দাম্ভিকতা ও অহংকার দেখিয়েছিল। তাই খোদা তাকে লাঞ্ছিত করবেন। যেমন কেউ যদি লুঙ্গী বা পরনের কাপড় গীরার নীচে ঝুলিয়ে অহংকার প্রকাশ করে, তাকে দুনিয়ায় বিপর্যস্ত করে দেয়া হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে বিপর্যস্ত থাকবে।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার বশে লুঙ্গী মাটিতে বইয়ে চলবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে তাকাবেন না।

সুনানে তিনিই বর্ণনা করেনঃ নবী (সঃ) বলেন, লুঙ্গী, জামা ও পাগড়ী সব কিছু পরার ভেতরেই অহংকার প্রকাশের প্রবণতা দেখা দিতে পারে। তাই এগুলোর যে যেটাই সেই কারণে বাড়িয়ে বা ঝুলিয়ে দিয়ে চলবে, কিয়ামতের দিন তার দিকে খোদা চোখ তুলে তাকাবেন না। সুনানে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে এও বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) লুঙ্গী সম্পর্কে যা বলেছেন, জামা সম্পর্কেও তাই বলেছেন। এ ভাবে একই পোষাক-আষাক কখনও প্রশংসনীয় হয়, কখনও বা নিন্দনীয় হয়। যদি খ্যাতি অর্জনের জন্যে হয়, সেটা নিন্দনীয়। হাঁ—যদি বিনয় ও দৈন্য

প্রকাশের জন্যে হয়, সেটা প্রশংসনীয়। যেমন, লোক দেখানো বাড়তি কাপড় ব্যবহার নিন্দনীয়। হাঁ—তা থেকে যদি খোদার প্রাপ্ত নিআমাত প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হয়, সেটা প্রশংসনীয় বটে।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ নবী (সঃ) বলেছেন, যার অন্তরে তিল পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না। আর যার অন্তরে তিল পরিমাণ ঈমান থাকবে সে দোযখে যাবে না। এক সাহাবী আরজ করলেনঃ হে খোদার রসূল! আমি ভাল ভাল কাপড় ও জুতা পরতে চাই। সেটাও কি অহংকার বলে গণ্য হবে? নবী (সঃ) বলেনঃ না। আল্লাহ তা'আলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকেই পসন্দ করেন। অহংকার দ্বারা সত্যকে উপেক্ষা ও সর্ব সাধারণকে অবজ্ঞা করা বুঝানো হয়েছে।

●

Contents

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

●

হযরতের আহার্য বস্তু

হযরতের (সঃ) খানা পিনারও একটি স্বতন্ত্র পন্থা রয়েছে। যা ছিল তাই নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন। আর যা নেই, তা নিয়ে ভাবতেন না। হালাল ও পবিত্র খানা যা কিছুই পেতেন খেয়ে নিতেন। হাঁ—যদি অরুচীকর হত, তা হারাম না হলেও বর্জন করতেন। কোনদিন তিনি কোন খাদ্য খাদকের ব্যাপারে ত্রুটি ধরেন নি। ভাল মনে হলে খেয়েছেন, নইলে এমন ভাবে রেখে দিয়েছেন, যেন সেটা তিনি অনভ্যাস বশতই রেখে দিয়েছেন। তা বলে ব্যক্তিগত অরুচীর জন্যে তিনি তা উম্মতের জন্যে অবৈধ করে যান নি। বরং তাঁরই খাবার পাত্রে অন্যেরা খেয়েছেন, তিনি নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছেন।

হালুয়া ও মধু তাঁর খুবই পসন্দনীয় ছিল। তা ছাড়া উট, ভেড়া, মুরগী, দুম্বা, জংলী গাধা ও খরগোশের গোশ্‌ত খেয়েছেন। সামুদ্রিক জীব মাছও খেয়েছেন। বকরীর গোশ্‌ত খেয়েছেন। কাচা ও পাকা দু'ধরনের খোর্মাই খেতেন। খালেস দুধ, পানি মিলানো দুধ, ছাতু ও পানি মিশানো মধুও তিনি গ্রহণ করেছেন। খেজুর ভিজানো পানি পান করেছেন। দুধ ও আটা দিয়ে তৈরী পিঠা খেয়েছেন। কাচা খেজুর বীচিসুদ্ধ খেয়েছেন। পনীর খেয়েছেন। পাকা খেজুর দিয়ে রুটি খেয়েছেন। সিরকা দিয়েও রুটি খেয়েছেন। গোশতের ঝোলে রুটি ভিজিয়ে 'ছরীদ' খেয়েছেন। চর্বির পাকানো 'ঈহালা' দিয়েও তিনি রুটি খেয়েছেন। ভুনা গোশত ও কলিজী খেয়েছেন। কদু তরকারী ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য। ঘিয়ে তৈরী ছরীদ, পনীর, রুটি, যয়তুন এবং নরম খেজুরের সাথে খরবুজ ও শুকনো খেজুর মাখন দিয়ে খেয়েছেন।

কেউ সুগন্ধি কিছু দিলে তিনি ফিরাতেন না। আর তা পাবার জন্যেও কাউকে বাধ্য করতেন না। হযরতের (সঃ) অভ্যাসই ছিল এই, সামনে যা পেলেন, খেয়ে নিলেন। না মিলল তো ধৈর্য ধরলেন। এমনকি ক্ষুধার যন্ত্রনায় তিনি পেটে পাথরও বেঁধেছেন। দু'তিন মাসেও হয়ত তাঁর রান্না ঘরে আগুন জ্বলতনা। সফরে অধিকাংশ সময়ে মাটিতে বসেই খেয়ে নিতেন। মাটিই তাঁর দস্তরখানা হত। তিনি তিন আঙ্গুল দিয়ে খেতেন। খাওয়া শেষে তা ধুয়ে নিতেন। এটাই হচ্ছে খানা খাবার সর্বোত্তম পন্থা। কারণ, অহংকারীরা এক আংগুলে ও লোভীরা পাঁচ আংগুলে খায়। তারা পাঞ্জা ভরে মুখ পুরে খায়।

হযরত (সঃ) কখনও হেলান দিয়ে বা হাতে ভর দিয়ে খেতেন না। ভর করে খাওয়া তিন প্রকারের হতে পারে। ঠেস দিয়ে খাওয়া, জানুতে ভর দিয়ে খাওয়া কিংবা এক হাতে ভর দিয়ে অন্য হাতে খাওয়া। এ তিন ধরনের ভর দেয়াই নিন্দনীয়।

হযরত (সঃ) খাবার শ্রুতে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আলহামদ্ুলিল্লাহ' পড়তেন। খাবার শেষে তিনি এ দোআ পড়তেন ঃ

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفى ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ـ

কখনও এর্প 'হামদ' পাঠ করতেন ঃ

الحمد لله الذى يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا وكل بلاء حسن ابلانا ـ الحمد لله الذى اطعم من الطعام وسقى من الشراب وكسى من العرى وهدى من الضلالة وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين ٥

'সব প্রসংশাই সেই আল্লাহর যিনি সবাইকে খাওয়ান অথচ তাঁকে কেউ খাওয়ায় না। তিনি আমাদের পথ দেখিয়েছেন, খাদ্য দিয়েছেন, পানীয় দিয়েছেন এবং এভাবে উত্তম পরীক্ষায় ফেলেছেন। সব প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের আহার দিলেন, পোষাক পরিচ্ছদ দিলেন এবং বিভ্রান্তির স্থলে স্পথ দেখালেন আর অন্ধ চোখে আলো দিলেন। এভাবে বহু স্ষ্টির ওপর মর্যাদা দিলেন। তাই সব প্রশংসাই নিখিল স্ষ্টির প্রতিপালকের জন্য।'

কখনও আবার এ দোআ পড়তেন ঃ

الحمد لله الذى اطعم وسقى وسوغه ـ

"সব প্রশংসা তাঁর যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন আর তা নির্ভেজাল করে দিলেন।"

যখন তিনি খানা খেয়ে উঠতেন, আংগ্লগ্লো সাফ করে নিতেন। তাঁর কাছে হাত মোছার র্মাল ছিল না আর এ অভ্যাসও ছিলনা যে, খেয়ে সেরেই হাত ধ্য়ে ফেলতেন। অধিকাংশ সময়ে বসেই যা কিছ্ পান করতেন। দাঁড়িয়ে কেউ কিছ্ পান করলে ধমক দিতেন। একবার তিনি বিশেষ কারণে বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে পান করেছিলেন। সেই ঘটনার আভাস ও পারিপার্শ্বিকতায় পরিষ্কার ব্ঝা যায়, তিনি একবার যমযম ক্পে পানি পান করেছিলেন দাঁড়িয়ে এবং তা লোকের ভীড়ে বসার স্যোগ না পেয়েই। তাই দাঁড়িয়ে পান করা না জায়েয। দ্'হাদীছের পরস্পর বিরোধী মতের এ ভাবে আপোষ ঘটে।

তিনি যখন কিছ্ খেতে বা পান করতে দিতেন, ডান দিক থেকেই দিয়ে আসতেন। বাম দিকে যত বড় মর্যাদাশালী লোক থাকনা কেন।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

●

হযরতের পারিবারিক জীবনাদর্শ

হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক নির্ভুল হাদীছে হযরত (সঃ) বলেন ঃ

"তোমাদের পৃথিবীতে আমার প্রিয় জিনিষ হচ্ছে দুটি। নারী আর সুগন্ধি দ্রব্য। তবে নামায আমার নয়ন জুড়ায়।"

হাদীছের এটাই সঠিক বর্ণনা। যে সব বর্ণনাকারী তিনটি বস্তু প্রিয় বলে বর্ণনা করেন, তাদের বুঝের ত্রুটি ঘটেছে। নবী (সঃ) 'তিন' বলেন নি। কারণ, নামায এ পৃথিবীর কোন বস্তু নয়। তাই 'তিন' বলার অবকাশ এখানে ছিল না। দুনিয়ার সব বস্তুর ভেতরে তাঁর কাছে নারী ও সুগন্ধি দ্রব্য প্রিয় ছিল।

হযরত (সঃ) একই রাতে সকল স্ত্রীর কাছেই উপস্থিত হতেন। কারণ, এটা সর্ব সম্মত মত যে, তিনি তিরিশজন পুরুষের ক্ষমতা রাখতেন। আল্লাহ তা'আলা এ ক্ষেত্রে তাঁর জন্যে যত জন বৈধ করেছিলেন, তা উম্মতের কারুর জন্যে করেন নি। তিনি পবিত্র বিবিদের প্রত্যেকের অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করে চলতেন। কোনরূপ তারতম্য সৃষ্টি হতে দিতেন না। এখন রইল ভালবাসার প্রশ্ন। সে ব্যাপারে তিনি খোদার কাছে মুনাজাত করতেন—"হে খোদা! যত কিছুর ওপরে আমার হাত আছে, তা সবই আমি সমানভাবে বন্টন করে দিয়েছি। কিন্তু, যার ওপরে আমার হাত নেই, তার জন্যে আমাকে দোষ দিওনা।" ভালবাসা ও সাহচর্যের প্রশ্নটি মানুষের ইচ্ছাধীন নয়। তাই এ দুটোর ব্যাপারে সমতা সৃষ্টি অপরিহার্য নয়।

ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের এ প্রশ্নে মতভেদ দেখা দিয়েছে যে' হযরতের (সঃ) জন্যেও সমতা রক্ষা-করা ওয়াজিব ছিল কিনা এবং তিনি সবার ভেতরে সময় বন্টন করে দিয়েছিলেন কিনা? হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ বিয়ে কর। কারণ, এ উম্মতের ভেতরে নারী বেশী।

নবী (সঃ) তালাকও দিয়েছেন। কিন্তু, ফিরিয়ে নিয়েছেন। একমাস পর্যন্ত সব স্ত্রীর সাথে ঈলাও (সব যোগাযোগ বন্ধ রাখা) করেছেন। কিন্তু, তিনি 'জিহার' করেন নি। যাঁরা তাঁর জিহার সম্পর্কে বলেছেন, ভুল করেই বলেছেন। এ ক্ষেত্রে 'জিহার' সম্পর্কিত ভুল ধারণার নিরসনও করা হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁকে তা থেকে মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন।

হযরতের পারিবারিক সম্পর্ক ব্যবহারিক জীবন ও নৈতিকতার উত্তম নমুনা ছিল। তিনি আনসার কন্যাদের হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে খেলাধুলা করার জন্যে ডেকে দিতেন। নিজেও

তিনি শরীঅত সীমা রক্ষা করে তাদের খেলায় অংশ গ্রহণ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন পানি পান করতেন, তখন তিনিও পাত্রের সেই বিশেষ স্থানটিতে মুখ দিয়ে পানি পান করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন কোন হাড় থেকে গোশ্‌ত ছিঁড়ে খেতেন, হযরত (সঃ) সেই হাড়টি তুলে ঠিক সেখান থেকেই অবশিষ্ট গোশ্‌ত ছিঁড়ে খেতেন। হযরত আয়েশার (রাঃ) জানুতে হেলান দিয়ে তিনি কুরআন পাঠ করতেন। কখনও তিনি হয়ত হযরত আয়েশার (রাঃ) অপবিত্র কালেই তাঁর সান্নিধ্যে কাটাতেন। এমনও হত যে, রোযা অবস্থায়ই তাঁকে চুমু খেতেন।

স্ত্রীর প্রতি হযরতের সদ্ব্যবহারের এগুলোও নিদর্শন ছিল যে, তিনি স্বয়ং তাঁদের সাথে খেলাধুলো ও আমোদ প্রমোদে অংশ নিতেন। হাবশী ছেলেদের ডেকে তাঁদের খেলা দেখাতেন। তারা যখন মসজিদে খেলত, উম্মুল মু'মিনীন হযরতের (সঃ) কাঁধে ভর দিয়ে তা দেখতেন। কখনও তাঁরা দু'জন দৌড়ের পাল্লা দিয়ে একে অপরকে হারিয়ে দিতেন। দু'বার হযরত (সঃ) দৌড়ে তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। একবার দৌড়ের প্রতিযোগীতায় যেতে দুজনই বাইরে চলে এসেছিলেন।

হযরত (সঃ) যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, উম্মুল মু'মিনীনদের ভেতরে 'কোরা' বা লটারীর ব্যবস্থা করতেন। যাঁর নাম লটারীতে আসত, তিনিই সাথে যেতেন। ফলে, কারুর কোন অভিযোগ থাকতনা। এটাই অধিকাংশ ইমামের মত।

তিনি বলতেন, তোমাদের ভেতরে সে-ই সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর সাথে ভাল ব্যবহার করে। আমি আমার স্ত্রীদের সাথে তোমাদের সবার চাইতে ভাল ব্যবহার করি।

কখনও তিনি সব স্ত্রীদের সামনে কোন একজনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন। আসর নামায পড়ে তিনি সব বিবির ঘরেই যেতেন। তাঁদের কাছে বসতেন। তাঁদের অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতেন। রাত হলে যাঁর ভাগে পড়তেন, তাঁর কাছেই যেতেন এবং তাঁর ঘরেই রাত কাটাতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন, এই বন্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তিনি এত সতর্ক ছিলেন যে, কখনই একের ওপরে অপরের প্রাধান্য দিতেন না। এবং তিনি সবার ঘরে একবার ঘুরে আসতেন না, এমন ঘটনা কদাচিৎ ঘটত। তিনি সবার কাছে গিয়েই একবার বসতেন। অবশেষে যাঁর বন্টনে যে রাত হত, সে রাত তাঁর ঘরেই কাটাতেন। ন'জন স্ত্রীর আটজনের ভেতরে এ বন্টন ব্যবস্থা ছিল।

সহীহ মুসলিমে হযরত 'আতার এ বক্তব্য উধৃত করা হয়েছে—'যিনি এ বন্টন ব্যবস্থার বাইরে ছিলেন, তিনি হলেন সফিয়া বিন্তে হাই। অথচ এ হচ্ছে হযরত আতার (রাঃ) বুঝের ভুল। পক্ষান্তরে তিনি ছিলেন হযরত সওদা (রাঃ)। তিনি বার্ধক্যের জন্যে তাঁর অংশের দিন কটি হযরত আয়েশাকে (রাঃ) দান করেছিলেন। তাই হযরত (সঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে দু'জনের সময় কাটাতেন। মূল ঘটনা খোদাই ভাল জানেন।

আরও একটি রিওয়ায়েত রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে : নবী (সঃ) কোন এক ব্যাপারে হযরত সফিয়ার (রাঃ) ওপরে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হযরত সফিয়া (রাঃ) তখন হযরত আয়েশাকে (রাঃ) বললেন, হযরতকে (সঃ) যদি আমার ওপরে সন্তুষ্ট করে দিতে পার, তা হলে আমার অংশের দিনগুলো তোমাকে দান করব। তিনি বললেন—উত্তম কথা। তারপর হযরত সফিয়ার অংশের রাত এলে হযরত আয়েশা (রাঃ) গিয়ে হযরতের কাছে উপস্থিত হলেন। হযরত (সঃ) তাঁকে দেখে বললেন—আয়েশা! তুমি কি করে এলে ? ফিরে যাও। এ তো সফিয়ার ভাগের রাত।

তিনি জবাব দিলেন—এ হচ্ছে খোদার দান। যাঁকে ইচ্ছে দান করেন। এই বলে তিনি সব ঘটনা খুলে বললেন। নবী (সঃ) তা শুনে হযরত সফিয়ার ওপরে খুশী হলেন। সেই থেকে হযরত সফিয়া তাঁর অংশ হযরত আয়েশাকে দান করেন।

এ বণ্টন ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট ছিল। যদি এ বণ্টন ভাগ করা হয়, তা হলে সাত জনের ভেতরে তা আবার বণ্টিত হতে পারে। অথচ তা সহীহ হাদীছের বিপরীত মত। বণ্টন ব্যবস্থা আটজনের ভেতরেই কায়েম ছিল।

প্রশ্ন জাগে, যদি কারুর দুয়ের অধিক স্ত্রী থাকে এবং কোন স্ত্রী যদি নিজ অংশ অন্য সতীনকে দান করে, তখন স্বামীর কি দানপ্রাপ্তা স্ত্রীর কাছে একই সাথে দু'জনের সময় কাটানো বৈধ হবে ? তা ছাড়া যদি সে দু'জনের প্রাপ্য রাত পরস্পর সংলগ্ন না হয়, তখন যে রাতে দান কারিনী স্ত্রীর কাছে থাকত, সেই রাত দানপ্রাপ্তার কাছে কাটায়, তাও কি জায়েয হবে ?

এ প্রশ্নে ইমাম আহমদ (রঃ) ও অন্যান্যের ভেতরে মতানৈক্য রয়েছে। নবী (সঃ) রাতের শেষ ভাগ এবং রাতের প্রথমার্ধেই যে কোন সময়ে স্ত্রীর কাছে যেতেন। কখনও তিনি গোসল করে শুতেন। কখনওবা ওজু করেই শুয়ে পড়তেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে আসওয়াদ ও তাঁর থেকে আবু ইসহাক সাবীঈ বর্ণনা করেন : কখনও তিনি পানি স্পর্শ না করেই শুয়ে যেতেন।

হাদীছের ইমামরা এটাকে ভুল বর্ণনা বলেছেন। আমি 'তাহজীবে সুনানে আবু দাউদ' গ্রন্থে এর ওপরে যথেষ্ট আলোচানা করেছি। এর প্রতিবন্ধক ও ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো পরিস্কার করে বলে দিয়েছি।

হযরত (সঃ) কখনও কয়েকজন স্ত্রীর সান্নিধ্য নিয়ে একবার মাত্র গোসল করতেন। কখনও আবার প্রত্যেকের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন গোসল করতেন। যখন তিনি সফরে যেতেন, যেই দিন ফিরতেন, সে রাতে ঘরে যেতেন না। এমনকি অন্যকেও নিষেধ করতেন।

হযরতের শয়ন-বসন ব্যবস্থা

কখনও তিনি ভাল বিছানায় শুতেন, কখনও চামরা বিছিয়ে শুতেন, কখনও চাটাইয়ে এবং কখনও শুধু মাটিতে শুয়ে পড়তেন। কখনও খাটে শুতেন, আবার কখনও কালো কম্বল বিছিয়ে শুতেন।

হযরত ইবাদা বিন তামীম বলেন—আমি রসূলকে (সঃ) মসজিদে চিত হয়ে পায়ের উপরে পা রেখে শুতে দেখেছি। তাঁর বিছানাটি চামরার ছিল। তাতে খেজুর গাছের আঁশ ভরা ছিল। তাঁর কাছে একটি পশমের কম্বল ছিল। সেটা দু'ভাজ করে বিছানো হত। একবার চার ভাজ করে বিছানো হলে তিনি নিষেধ করে বলেনঃ আগের মত দু'ভাজ করেই বিছিয়ে দাও। কারণ, আজকের রাতে এ ব্যবস্থা আমাকে নামায থেকে বিরত রেখেছে।

মোট কথা, তিনি বিছানায় শুয়েছেন, লেপ গায়ে দিয়েছেন এবং নিজ পুন্যময়ী বিবিদের বলেছেনঃ তোমাদের ভেতরে (হযরত) আয়েশার বিছানা ছাড়া জিব্রাঈল (আঃ) আর কারুর বিছানায় বসেননি।

তাঁর খেজুর গাছের ছাল বোঝাই চামরার বালিশ ছিল। যখন তিনি ঘুমোবার জন্যে বিছানায় যেতেন, তখন এ দোআ পড়তেন।

اللهم باسمك اموات واحيا

"হে খোদা তোমার নামেই আমি মরি ও বাঁচি।"

তা ছাড়া তিনি দু'হাত তুলে 'কুলহু আল্লাহ' 'কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউজু বিরাব্বিন্নাস' পড়ে ফুঁক দিয়ে সারা শরীরে যতখানি সম্ভব হাত বুলিয়ে নিতেন। মাথা, মুখ-মণ্ডল ও শরীরের সামনের অংশ থেকে তা শুরু করতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। তিনি ডান কাতে শুয়ে ডান হাত ডান গালের নীচে রাখতেন। তারপর এ দোআ পড়তেনঃ

اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك

"হে খোদা ! যেদিন সব বান্দাকে এক জায়গায় জড়ো করবে, সেদিনের শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা কর।"

বিছানার ওপরে যখন তিনি উঠতেন, তখন পড়তেনঃ

الحمد لله الذى اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافى له ولا مؤوى - (مسلم)

"সব প্রশংসাই খোদার জন্যে। তিনিই আমাদের খানা-পিনার ব্যবস্থা করেন। আমাদের জন্যে তিনিই যথেষ্ট। তিনিই আমাদের আশ্রয় দান করেন। এরূপ কতলোক রয়েছে যাদের নির্ভর করার বা আশ্রয় দেবার মত কেউ নেই।"

বিছানায় গিয়ে তিনি এ দোআ পড়তেনঃ

اللهم رب السماوات والارض ورب العرش العظيم فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقران اعوذ بك من شر كل ذى شر انت آخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شئ وانت الاخر

فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن
فليس دونك شيء اقض عنى الدين واغننى من الفقر ٥

"হে খোদা ! হে আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু ও শ্রেষ্ঠতম আসনের অধিপতি ! হে বীজ থেকে অংকুর উদ্গাতা ও তাওরাত, ইঞ্জীল ও কুরআন অবতীর্ণকারী ! আমি তোমার কাছে যত সব অনিষ্টকারী বস্তুর অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাই। তা তোমারই আয়ত্বাধীন। তুমিই আদি। তোমার আগে কিছুই ছিলনা। তুমিই অন্ত। তোমার পরেও কিছু নেই। তুমিই বহির্মণ্ডল। তোমার ওপরে আর কিছুই (প্রকাশমান) নেই। তুমিই অন্তর্জগৎ। সেখানেও তুমি ছাড়া কারুর অস্তিত্ব নেই। আমাকে ঋণ মুক্ত করে দাও ও দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করে সম্পদশালী কর।"

রাতে যখন ঘুম ভেংগে যেত, তখন পড়তেন ঃ

لا اله الا انت سبحانك اللهم استغفرك لذنبي واسألك
رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من
لدنك رحمة انك انت الوهاب ٥

"হে প্রভু ! তুমি ভিন্ন অন্য কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। হে আল্লাহ আমি নিজ পাপের জন্যে তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। তোমার দয়ার প্রত্যাশী। হে খোদা ! আমার বিদ্যা বাড়িয়ে দাও। পথ প্রাপ্তির পরে যেন আবার আমার অন্তর কঠিন হয়ে না যায়। আমাকে তোমার অনুগ্রহ দানে ধন্য কর। নিশ্চয়ই তুমি শ্রেষ্ঠতম দাতা।"

যখন তিনি ঘুম ছেড়ে উঠতেন, তখন পড়তেন ঃ

الحمد لله الذى احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور ٥

"সব প্রশংসাই সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে মরার পরে আবার বাঁচিয়ে তুললেন। তাঁর কাছেই আবার ফিরে গিয়ে সমবেত হতে হবে।"

তারপর তিনি মিসওয়াক করতেন এবং অধিকাংশ সময়ে সূরা আল ইমরানের শেষ দশ আয়াত" ইন্না ফী খালকিস্‌ সামাওয়াতে ওয়াল আরদে' ইত্যাদি পড়তেন। তার সাথে এ দোআটি পড়তেন ঃ

اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن
ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد
انت الحق ووعدك ولقاءك حق والجنة حق والنار حق
والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك
امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت واليك

حاكمت فاغفرلى ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت
انت الهى لا اله الا انت ০

"হে আল্লাহ! প্রশংসা তোমারই জন্যে। তুমিই আকাশ, পৃথিবী ও তার ভেতরকার সব কিছুর আলো। তুমিই এ সব কিছু ধারণ করে আছ। প্রশংসা তাই তোমারই জন্যে। তুমি সত্য তোমার ওয়াদাও সত্য। তোমার দীদার সত্য। জান্নাত সত্য। জাহান্নাম সত্য। নবীরা সত্য। মুহাম্মদ সত্য। কিয়ামাত সত্য। হে খোদা! তোমারই হাতে আত্মসমর্পন করেছি। তোমার ওপরেই ঈমান এনেছি। তোমার ওপরেই নির্ভর করেছি। তোমার দিকেই ঝুঁকেছি। তোমার সাহায্যেই লড়েছি। তোমার দিকেই চালনা করেছি। তাই আমার আগে পিছের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব পাপ মাফ করে দাও। তুমিই আমার প্রভু। তুমি ভিন্ন অন্য কোন নেই।"

রাতের পয়লা প্রহরেই তিনি শুয়ে যেতেন। শেষ প্রহরে জেগে উঠতেন। কখনও মুসলমান-দের কল্যাণের কাজে রাতের প্রথম ভাগেও জেগে থাকতেন। তা ছাড়া চোখ তার বুজে থাকলেও অন্তর সদা জাগ্রত থাকত। তিনি ঘুমোলে নিজের থেকে না জাগলে কেউ জাগাতনা। রাতের শুরুতে যদি তিনি কোন মঞ্জীলে কাটাতেন, ডান দিকে ভর করে কাত হয়ে আরাম নিতেন। আর যদি শেষ রাতে কোথাও নামতেন, তা হলে হাতের ডানায় ভর করে পাঞ্জার ওপরে মাথা রেখে আরাম নিতেন। ইমাম তিরমিজী এ বর্ণনা দিয়েছেন।

আবু হাতিম 'সহীহ' নামক সংকলনে লিখেছেন, 'হযরত (সঃ) যদি রাতের বেলায় কোন মঞ্জীলে অবতরণ করতেন, ডান দিকে ভর করে আরাম নিতেন। এবং শেষ রাতে নামলে বাজু উঁচু করে রাখতেন।' আমি মনে করি এটা বুঝের ভুল। অবশ্য ইমাম তিরমিজী যা বলছেন, তা ঠিক। আবু হাতিম লিখেছেন—তা'রীস (কাত হয়ে বসা) শেষ রাতেই হত। তাঁর নিদ্রা সব চাইতে যথাযথ হত। ডাক্তারদের অভিমত হচ্ছে, রাতের তৃতীয় প্রহরই নিদ্রার উত্তম সময়। দিন রাত হয় আট প্রহরে।

হযরতের যানবাহন

হযরত (সঃ) ঘোড়া, উট, খচ্চর ও গাধা সব কিছুতেই আরোহন করেছেন। কখনও ঘোড়ায় গদী বসিয়ে আরাহণ করেছেন। কখনও খালিপিঠে চড়েছেন। কখনও তা দৌড়িয়ে চালিয়েছেন। বেশী সময়ে তিনি একাই আরোহী হতেন। কখনও আবার উটের পিছনে অন্য কাউকে বসিয়ে নিতেন। কখনও নিজেই পেছনে বসতেন এবং অন্য আরোহীকে সামনে বসাতেন। একবার তিনজন আরোহী হয়েছিলেন। পুরুষ সংগীই বেশী হত। কখনও পুন্যময়ী বিবিদের কেউ থাকতেন।

হযরতের বাহন হিসেবে উট ও ঘোড়াই বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। খচ্চর সম্পর্কে মশহুর রিওয়ায়েত হল এই, তাঁর একটিমাত্র খচ্চর ছিল। এক বাদশাহ তাঁকে হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। আরব ভূখন্ডে খচ্চরের প্রচলন ছিলনা। যখন তিনি একটি খচ্চর উপঢৌকন পেলেন, তখন ঘোড়া ও গাধার সংযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাওয়া হল। তিনি বললেন, এ কাজ নাদানরাই করে থাকে।

হযরতের বকরী ও ক্রীতদাস

হযরতের (সঃ) কাছে একশ বকরী ছিল। এর সংখ্যা বাড়ুক, তা তিনি চাইতেন না। তাই একটি জন্ম নিলে আরেকটি জবেহ করতেন।

তাঁর ক্রীতদাস, ক্রীতদাসীও ছিল। তাদের সংখ্যা তাঁর মুক্তি দেওয়া দাস-দাসীর চাইতে বেশী ছিল। ইমাম তিরমিজী তাঁর সংকলনে আবু ইমামা প্রমুখ থেকে হযরতের একটি বাণী উধৃত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান পুরুষকে মুক্তি দিবে, এর বিনিময়ে সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। মুক্ত ব্যক্তির প্রতিটি অংগ মুক্তিদাতার প্রত্যেক অংগের মুক্তিলাভের জিম্মাদার হবে।"

ইমাম তিরমিজীর মতে বর্ণনাটি সঠিক। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, গোলাম আযাদ করার পুণ্য অনেক। আর একটি ক্রীতদাস দুটি ক্রীতদাসীর সমান। তাই দেখছি, হযরতের হাতে মুক্তি প্রাপ্তদের অধিকাংশই দাস ছিল। যে পাঁচটি স্থানে নারীকে নরের অর্ধেক বলা হয়েছে, এটি তার অন্যতম। দ্বিতীয় স্থানটি হল আকীকার। কারণ, অধিকাংশ ইমামের মতে মেয়ের আকীকায় একটি ছাগল ও ছেলের আকীকায় দুটি ছাগল দরকার হবে। এ মতের সমর্থনে কয়েকটি সহীহ ও হাসান হাদীস রয়েছে। তৃতীয় স্থান হল সাক্ষ্য দান। দুটি নারীর সাক্ষ্যদান একটি পুরুষের সাক্ষ্যদানের সমান। চতুর্থ স্থান উত্তরাধিকার প্রশ্ন। পঞ্চম, দিয়াত (ক্ষতিপূরণ-ব্যবস্থা)।

হযরতের ক্রয়-বিক্রয়

নবুওত লাভের পর তাঁর কেনা বেড়ে গেল ও বেচা কমে গেল। তেমনি হিজরতের পরে তাঁর মাত্র কয়েকটি বেচার কাজ দেখা যায়। আর এ বিক্রয়ের ব্যাপারে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রেতাদের সুবিধা ঘটত বেশী। যেমন, পেয়ালা ও পালান বিক্রয়, ইয়াকুব নামক বিচক্ষণ গোলাম বিক্রয় ও দু'টি দেশী গোলামের বদলে এক হাবশী গোলাম বিক্রয়। আর কেনা-কাটার ব্যাপার তিনি অনেক করেছেন। তা ছাড়া তিনি মজুরী খেটেছেন এবং খাটিয়েছেনও। নিজে মজুরী লাভের চাইতে অপরকে মজুরী দিয়েছেন বেশী। মানে, নিজে যে মজুরী পেয়েছেন, তার চাইতে বেশী মজুরী দিয়ে লোক খাটিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, নবুওত লাভের আগে তিনি মজুরী নিয়ে ছাগল চরাতেন। তা ছাড়া হযরত খাদীজার মাল পত্র নিয়ে সিরিয়ায় ব্যবসা করতেন ঠিকাদার হিসেবেই। আর ব্যবসা যখন চুক্তি ভিত্তিক হয়, তখন যে তা করে তার চারটি অবস্থা দাঁড়ায়। আমীন, আজীর, উকিল ও শরীক।

মাল পত্রের দায়িত্ব ন্যস্ত হওয়ায় 'আমীন' হবে। মাল-পত্র হস্তক্ষেপের অধিকার থাকায় 'উকিল' হবে। নিজেও কাজে অংশ নেয়ার কালে 'আজীর' হবে এবং ব্যবসায়ের মুনাফা পাবে বলে 'শরীক'ও হবে।

ইমাম হাকাম তাঁর সংকলনে রবী' বিন বদর থেকে, তিনি আবু যুবায়ের (রাঃ) থেকে এবং তিনি হযরত জাবির (রাঃ) থেকে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা তুলেছেন। তাতে বলা হয়ঃ "হযরত (সঃ) হযরত খাদীজার (রাঃ) তেজারতের মাল নিয়ে দু'বার বেতনভুক হিসেবে সিরিয়ার জুরশ শহর সফর করেন।" ইমাম হাকামের মতে রিওয়ায়েতটির সূত্র নির্ভরযোগ্য। 'নেহায়া' কিতাবেও জুরশ বলা হয়েছে। জুরশ সিরিয়ার একটি ব্যবসা কেন্দ্র।

আমার মতে রিওয়ায়েতটি সহীহ নয়। কারণ, রবী' ইবনে বদর নির্ভরযোগ্য রাবী নয়। মুহাদ্দিছরা তাকে দুর্বল রাবী বলেছেন। ইমাম নাসায়ী, কুতনী ও ইযদী এটাকে বর্জন করেছেন। হাকামের (রঃ) ধারণা, রবী বিন বদর তালহা বিন উবায়দুল্লার গোলাম। আর সে হযরতের (সঃ) সেই ব্যবসায়ের কাজে একজন অংশী ছিল।

এ শরীকটি পরে যখন তাঁর কাছে হাজির হল, তিনি দেখে বললেনঃ তুমি কি আমাকে চিনতে পারছনা?

সে আরজ করলঃ আপনি আমার শরীক ছিলেন এবং উত্তম শরীক ছিলেন। আপনি কখনো ধোকা দেননি। ঝগড়া করেন নি। 'তুদারী'র শব্দমূল হচ্ছে মুদারাআত। অর্থ হচ্ছে, সত্যের বিরোধীতা করা। যদি শেষাংশ থেকে 'হামযা' তুলে দেয়া হয়, তা হলে শুধু মুদারাত থাকে। তার অর্থ হল ভাল উপায়ে প্রতিবাদ করা।"

তিনি উকিল নিয়োগ করেছেন, নিজেও ওকালতি করেছেন। নিয়োগ করেছেন বেশী। তিনি দক্ষিণা দিয়েছেন, নিয়েছেনও। এ ভাবে বখশিশ দিয়েছেন, নিয়েছেনও। সালমা বিন আকু' বলেন—হযরতের অংশে একটি বাঁদী পড়ল। আমি আরজ করলাম, এটা আমাকে দিন। তাই হযরত (সঃ) আমাকে দিয়ে দিলেন। তার বিনিময়ে আমি মক্কার বন্দী মুসলমানদের ছাড়িয়ে আনলাম।

তিনি বন্ধকী ঋণ ও বন্ধক ছাড়া ঋণ—দুটোই করেছেন। নগদ ও বাকী দু'ভাবেই কিনেছেন। তেমনি যে ভাল কাজ করেছে, তার ভাল কাজের বিনিময় জান্নাত দান সম্পর্কে নিজ প্রভুর পক্ষ থেকে জিম্মাদারী নিয়েছেন। মৃত মুসলমানদের ঋণ শোধের দায়িত্ব নিয়েছেন। নিজের যা ঋণ ছিল, সব আদায় করেছেন। সবার ধারণা, এ হুকুম তাঁর পরবর্তী সবল খলীফা ও আমীরদের

Contents

জন্যে প্রযোজ্য। এ ভাবে মুসলমান বাদশারা যে কোন মুসলমানের ঋণ আদায়ের জন্যে দায়ী হন। যদি সে আদায় করতে না পারে, তা হলে বায়তুল মাল থেকে আদায় করা হবে। আর যদি তার মৃত্যু হয়, তা হলেও বায়তুল মাল থেকে আদায় করা হবে। তেমনি যদি তার পরিবারের কোন অভিভাবক না থাকে, তা হলে বায়তুল মাল (কোষাগার) তার অভিভাবক হয়ে যায়।

হযরতের (সঃ) কিছু জমাজমীও ছিল। তা তিনি খোদার পথে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। তিনি নিজে সুপারিশ করেছেন এবং অপরের সুপারিশ গ্রহণও করেছেন। বুরাইরা (রাঃ) 'রিজা'আত' করার ব্যাপারে হযরতের (সঃ) সুপারিশ মানেননি। তাতে তিনি অসন্তুষ্ট বা রাগ কিছুই হননি। হযরতের ব্যক্তিত্ব ছিল পথের প্রদীপ ও উত্তম নমুনা। আশীরও বেশী বার তিনি শপথ করেছেন। তিনবার খোদাও তাঁকে শপথ করতে হুকুম দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ ○

"তোমার কাছে জানতে চাচ্ছে, এ কি সত্য?' বলে দাও—হাঁ। আমার প্রভুর শপথ। নিশ্চয়ই এটা সত্য।"

আবার বলেন ঃ

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ○

"কাফিররা বলল ঃ আমাদের ওপরে কিয়ামাত ঘটবেনা। বলে দাও—হাঁ, প্রভুর শপথ! অবশ্যই তোমাদের ওপরে কিয়ামাত নেমে আসবে।

আবার বলেন ঃ

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ

ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ○

"কাফিররা দাবী করে, মরে তারা কখনো পুনর্বার উত্থিত হবে না। বলে দাও—হাঁ—খোদার শপথ! অবশ্যই তোমাদের উঠতে হবে। তারপর তোমাদের কীর্তিকলাপ জানানো হবে। আল্লাহর জন্যে এটা খুবই সহজ।"

কাজী ইসমাঈল বিন ইসহাক অধিকাংশ সময়ে আবু বকর মুহাম্মদ বিন দাউদ জাহেরীর সাথে বিতর্ক অনুষ্ঠান করতেন। তাঁকে তিনি ফিকাহবিদ বলে মানতেন না।

একবার আবু বকরের (রঃ) এক প্রতিপক্ষ ঝগড়া করে কাজী ইসমাঈলের দরবারে মোকদ্দমা দায়ের করল। সেখানে বসে প্রতিপক্ষ আবু বকরকে (রঃ) শপথ করতে বলায় তিনি

রাজী হয়ে গেলেন। তখন কাজী ইসমাঈল বললেন : 'হে আব্‌বকর! তোমার মত ব্যক্তি শপথ করতে রাজী হয়ে গেলে? তিনি জবাব দিলেন, "কেন? বাধা কিসে? স্বয়ং খোদা তাঁর নবীকে তিন জায়গায় শপথ নিতে বলেছেন।" কাজী ইসমাঈল প্রশ্ন করলেন : কোন কোন জায়গায়? আব্‌ বকর (রঃ) তখন ওপরের আয়াতগ্‌লো পড়ে শ্‌নালেন। কাজী ইসমাঈল তা শ্‌নে তাঁর ভ্‌য়সী প্রশংসা করলেন। সেদিন থেকে তিনি তাঁকে 'ফকীহ' নামে আখ্যায়িত করলেন।

হযরত (সঃ) কখনও শপথ 'ইস্তিছনা' করতেন। কখনও কাফ্‌ফারা দিতেন। কখনও তার ওপরে বহাল থাকতেন। 'ইস্তিছনা' অর্থ হচ্ছে শপথ ফিরিয়ে নেওয়া। কাফফারা মানে হচ্ছে শপথের ব্যতিক্রমের জন্যে ক্ষতিপ্‌রণ দান। তাই খোদা তার নাম দিয়েছেন শপথ হালাল করা।

হযরত (সঃ) হাসি তামাশাও করতেন। অবশ্য হাসতে হাসতে তিনি সত্য কথাই বলতেন। তিনি হেয়ালীও করতেন। তাতেও সত্য ছাড়া কিছ্‌ থাকত না। যেমন, কার্‌র থেকে কিছ্‌ জানার উদ্দেশ্যে অপর কার্‌র দিকে তাকিয়ে বললেন, তার পথঘাট কির্‌প? সেখানকার পানি কির্‌প? সে ময়দানটি কির্‌প? ইত্যাদি।

তিনি পরামর্শ নিতেন এবং দিতেনও। রোগীর সেবাশ্‌শ্র্‌ষা করতেন। ম্‌তের জানাযায় শরীক হতেন। দাওয়াত কব্‌ল করতেন। বিধবা, মিসকীন ও দ্‌র্বলদের প্রয়োজনে সহায়তা করতেন। তিনি কবিতা শ্‌নে বখশিশ দিয়েছেন। তার ভেতরে তাঁর প্রশংসা ম্‌লক কবিতা ছিল খ্‌বই কম। সত্যম্‌লক কবিতার জন্যে প্‌রস্কার দিতেন। তিনি ছাড়া অন্যের প্রশংসা-ম্‌লক কবিতা অধিকাংশই কাল্পনিক ও মিথ্যা হত। তাই তিনি হ্‌ক্‌ম দিলেন, সামনে প্রশংসা কারীদের ম্‌খে ধ্‌লি নিক্ষেপ কর।

দৌড়ের প্রতিযোগিতায় হযরত (সঃ) জয়ী হতেন। তিনি কুস্তিও লড়েছেন। নিজ হাতে তিনি জ্‌তা সেরেছেন, কাপড় সেলাই করেছেন ও ডোলা তৈরী করেছেন। নিজ হাতে ছাগল দ্‌ইয়েছেন ও কাপড় তালি দিয়েছেন। নিজের ও বিবিদের হক আদায় করেছেন। মসজিদ গড়ার সময়ে তিনি ইট তুলেছেন। কখনও ক্ষ্‌দার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধেছেন। কখনও আবার তৃপ্তি মিটিয়ে খেয়েছেন। তিনি মেহমান হয়েছেন এবং মেহমানদারীও করেছেন। তিনি মাথা ও পায়ে শিংগা লাগিয়েছেন। তিনি ঘাড়ে ও পেছন ভাগে শিংগা লাগিয়েছেন। তিনি চিকিৎসা করেছেন। দাগ দিয়েছেন বটে, দাগ নেন নি। ফুঁ দিয়েছেন বটে, নেন নি। রোগীদের দ্‌ঃখ-দায়ক কথা শোনাতে নিষেধ করেছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের ম্‌লনীতি তিনটি। সতর্কতা, স্বাস্থ্য রক্ষা ও অনিষ্টকর কিছ্‌ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ও তাঁর উম্মতের জন্যে নিজ গ্রন্থে তিনটি জিনিসের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে রোগীকে পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ
أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ۝

"যদি তোমরা রুগ্ন হও, বা সফরে থাক আর সে অবস্থায় কেউ ইস্তিঞ্জা করে কিংবা স্ত্রীর সান্নিধ্য নেয়, তখন পানি না পেলে পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম কর।"

এখানে আল্লাহ তা'আলা রুগ্নকে তায়াম্মুম করার অনুমতি দিয়েছেন। তেমনি দিয়েছেন পানির অভাব দেখা দিলে। এভাবে আল্লাহ তা'আলা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে বলেন ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۝

"তোমাদের যদি কেউ রোগী হও কিংবা সফর করে থাক, তাহলে পরে রোযা পূরা করে নিও।"

এখানে আল্লাহ তা'আলা সফরকারীদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে রোযা ভংগ করার অনুমতি দিয়েছেন। একদিকে সফর ও অন্যদিকে রোযা—এ দুটো কষ্ট একত্রে এসে যাতে বান্দার স্বাস্থ্য ও শক্তি পংগু করে না ফেলে। এভাবে 'মুহরিম' কে ইহরামের অবস্থায় মাথা কামানোর অনুমতি দিয়েছেন। যেমন ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ -

"তোমাদের ভেতর যদি কেউ রুগ্ন হও কিংবা মাথায় কোন ঘা থাকে, তাহলে রোযা বা সদকা কিংবা কুরবানী দিয়ে ক্ষতিপূরণ দাও।"

এখানে রুগ্নকে অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, মাথায় যদি কোন ফোঁড়া বা পাঁচড়া থাকে, তা হলে ইহরামের অবস্থায় হলেও মাথা কামিয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে নাও। অন্যথায় উকুন, পোকা হবার সম্ভাবনা থাকে। কা'আব বিন আজরার এরূপ হয়েছিল। সেরূপ হোক বা অন্য কোনরূপ কষ্ট দেখা দিক, এ অনুমতি থাকবে।

বস্তুত, চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও মূলনীতি হচ্ছে এ তিনটি। খোদাও তাই তার প্রত্যেকটি এক এক করে বলে দিয়ে বান্দার স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখার জন্যে পথের নির্দেশ দিলেন। কারণ, খোদা সব বান্দার কল্যাণ চেয়ে নিজ অনুগ্রহের ছায়ায় রাখতে চান তাদের। তিনিই একমাত্র অনুগ্রাহক।

●

Contents

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

●

হযরতের ব্যবহারিক জীবন

সর্বোত্তম নমুনা :

হযরত (সঃ) যদি কারুর থেকে ঋণ নিতেন, যথাসময়ে সুন্দরভাবে তা আদায় করতেন। কারুর থেকে ধার নিলে তা শোধ করতে গিয়ে তিনি এ দো'আ করতেন :

بارك الله فى اهلك ومالك انما جزاء السلف الحمد والاداء -

"আল্লাহ তা'আলা তোমার ঘর বাড়ী ও ধন সম্পদে বরকত দিন। কর্জের বিনিময় হল স্তুতিপাঠ ও যথাযথ আদায়।"

একজনের কাছ থেকে তিনি চল্লিশ 'সা'আ' খাদ্য দ্রব্য ধার নিয়েছিলেন। পরে ঋণদাতা আনসার নিজেই অভাবে পড়ে হযরতের কাছে যথাসময়ের অনেক আগেই চলে এল। তিনি বললেন : এখন পর্যন্ত আমার হাতে কিছু আসেনি। লোকটি তখন কিছু কথা বলতে যাচ্ছিল। হযরত থামিয়ে দিয়ে বললেন : ঠিকভাবে কথা বল। কারণ, আমি সর্বোত্তম ঋণ আদায়কারী। তারপর তিনি তাকে আশী 'সা'আ' খাদ্য দ্রব্য জোগাড় করে দেন। এ বর্ণনাটি হচ্ছে বাযাযের।

হযরত (সঃ) একটি উট বাকীতে কিনেছিলেন। একদিন সেই বিক্রেতা এল। হযরতের (সঃ) কাছে কড়া তাগাদা শুরু করল। সাহাবারা তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন। হযরত (সঃ) বললেন : ছেড়ে দাও। পাওনাদারের বলার অধিকার আছে।

একবার তিনি একটা দ্রব্য কিনলেন। তাঁর কাছে মূল্য ছিলনা। তিনি সেটা সেখানেই বিক্রী করে লাভবান হন। তা তিনি বনু মুত্তালিবের বিধবাদের ভেতরে বন্টন করেন। তারপর বললেন : এরপর থেকে যখন আমার কাছে কোন দ্রব্যের মূল্য থাকবে, তখনই তা কিনতে যাব।

এ বর্ণনাটি আবু দাউদ উধৃত করেছেন। এ বর্ণনাটি বিক্রেতার জিম্মায় রেখে নির্দিষ্ট কালের জন্যে কিছু ক্রয় করে রাখার বর্ণনাটির বিরোধী নয়। সেটা এক ব্যাপার ও এটি অন্য ব্যাপার।

একবার এক ঋণদাতা অভদ্রভাবে হযরতের (সঃ) কাছে তাগাদা দিচ্ছিল। হযরত উমর (রাঃ) তাকে সাজা দিতে উদ্যত হলেন। হযরত (সঃ) বললেন : হে উমর ! থাম। তোমার উচিত ছিল আমাকে কর্জ আদায়ের জন্যে চাপ দেয়া আর তাকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া।

এক ইয়াহুদী থেকে হযরত (সঃ) নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরে দাম দেবার শর্তে ধারে কিছু মাল কিনেছিলেন। সে ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এসে তাগাদা দিতে লাগলো। হযরত

(সঃ) বললেন ঃ সময় তো এখনো পুরা হয়নি। সে রেগে বলল ঃ হে মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা ভারি ছয় চার করতে পার। সাহাবারা শুনে তাকে পাকড়াও করতে উদ্যত হলেন। হযরত (সঃ) তাঁদের থামিয়ে দিলেন। সে যতই যা তা বকতে লাগল, হযরতের (সঃ) ধৈর্য ততই দৃঢ় হয়ে চলল। তখন ইয়াহুদী বলল ঃ আমি আপনার নবুওতের সব নমুনাই দেখতে পেয়েছি। একটি বাকী ছিল। সেটা এই যে, নবীরা সর্বদা মূর্খদের বকাবকির জবাবে ধৈর্য ধরে চুপ থাকেন। আমি এটাই পরীক্ষা করতে এসেছিলাম। এই বলে সে মুসলমান হয়ে গেল।

হযরতের চলাফেরা ঃ

যখন তিনি হাটতেন, বিনয়ের সাথে চলতেন। সবার চেয়ে দ্রুত চলতেন। তাঁর চলার ভংগিও ছিল সব চাইতে সুন্দর। শান্ত ও দৃঢ় ছিল তাঁর চলার গতি।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন—আমি হযরতের (সঃ) চাইতে সুন্দর পুরুষ আর দেখিনি। তাঁর চেহারায় যেন সূর্যের দ্যুতি জ্বলত। তেমনি আমি তাঁর চাইতে দ্রুত চলায় আর কাউকে দেখিনি। মাটি যেন তাঁর জন্যে বিছিয়ে যাচ্ছিল। আমি শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর নাগাল পেতামনা।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ হযরত (সঃ) যখন চলতেন, বিনয়ের সাথে চলতেন। যেন তিনি উঁচু স্থান থেকে নামছেন। আর 'তাকাল্লু' করে চলতেন অর্থাৎ যেন উঁচু জমি থেকে নীচু জমীতে নেমে আসতেন। এ ধরনের চলায় ব্যক্তিত্ব, সাহস ও বীরত্ব প্রকাশ পায়। এ ধরনের চলা উপযোগী দেহের জন্যে বেশ আরামপ্রদ হয় এবং হয়রান হবার সম্ভাবনা থাকেনা। কারণ, হয়রান হবার চলা হয় থপ থপ করে চলা। যেন মাথায় একখন্ড গাছ নিয়ে চলছে। এ ধরনের চলা হাস্যকর ও নিন্দনীয়। কিংবা আহম্মক উটের চলা। তাই নিন্দনীয়। তা থেকে বুঝা যাবে, লোকটা নির্বোধ। বিশেষ করে চলতে চলতে যারা ডানে বামে দেখতে থাকে এবং আরামে স্থির শান্ত ভাবে চলে, সেটাই খোদার বান্দার চাল চলন হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ٥

"খোদার বান্দারা যখন যমীনের ওপরে চলে, নম্র ও শান্তভাবে চলে।" আগেকার এক বুযুর্গ বলেছেন ঃ এর মানে হচ্ছে, তাঁরা নিরহংকার চালে স্থির ও শান্তভাবে চলতেন, দাপেট চলতেন না। এ ধরনের ব্যক্তিত্বপূর্ণ চলাই চলতেন নবী (সঃ)। তাঁর চলা দেখলে মনে হত যেন তিনি কোন উঁচু জায়গা থেকে নামছেন এবং মাটি যেন তার জন্যে ছুটে আসছে। কেউ আপ্রাণ চেষ্টা করেও হেটে তাঁর নাগাল পেতেন না।

এ থেকে দুটো ব্যাপার জানা যায়। একটা হল এই, তাঁর চলার ধরণ নিরহংকার, সঠিক ও আরামদায়ক ছিল। চলা দশ প্রকারের হতে পারে। তিন প্রকার চলার কথা বলা হয়েছে।

চতুর্থ, দৌড়ান। পঞ্চম, ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ান। এটাকে 'খাবাব' ও বলে। সহীহ হাদীছে হযরত ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে, নবী (সঃ) তাওয়াফের সময়ে তিনবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতেন এবং চারবার আস্তে দৌড়াতেন। ষষ্ঠ কুকুরে দৌড়। এ ধরনের দৌড়ে সহজে হয়রান হয় না আর তেমন কষ্টও হয়না। কোন কোন হাদীছ সংকলনে আছে, বিদায় হজ্জে কিছু লোক হযরতের (সঃ) সাথে ছুটতে গিয়ে কষ্ট অনুভব করছে বলে তাঁর কাছে জানালেন। তিনি বললেনঃ আরেকটু জোরে ছুটতে চেষ্টা কর। সপ্তম, মেয়েদের মত ঝুঁকে ঝুঁকে চলা। তাতে বিনয় নেই, আছে নারীসুলভ গতি। অষ্টম, দৌড় ও হাটার মাঝামাঝি চলন। নবম, কুদে কুদে চলা। দশম, দাম্ভিকতার চলন। অহংকারী ও দাম্ভিকরা এভাবে চলে থাকে।

আর এ ধরণের চলার জন্যেই এক বিরাট দাম্ভিককে আল্লাহ তা'আলা মাটিতে সেঁধিয়ে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত সে এ ভাবেই সেঁধিয়ে যেতে থাকবে। সবচাইতে সঠিক চলন হল স্থির ও শান্তভাবে চলা।

সাহাবাদের সাথে হযরত (সঃ) যখন চলাফিরা করতেন, তাঁরা আগে আগে চলতেন আর তিনি চলতেন তাঁদের পেছনে পেছনে। তিনি বলতেনঃ ফেরেশতাদের অনুসরণের জন্যে আমার পেছন ভাগ তোমরা খালি রেখে চল। এ জন্যেই হাদীছে দেখতে পাই, নবী (সঃ) সাহাবাদের আগে রেখে চলতেন। কখনও তিনি খালি পায়ে আর কখনো জুতা পায়ে চলতেন। সাহাবাদের নিয়েও চলতেন আবার একাও চলতেন।

একবার তিনি এক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর একটি আংগুল কেটে যায় এবং রক্ত ঝরতে থাকে। তখন তিনি বললেনঃ

هل انت الا اصبع دميت - في سبيل الله لقيت

"তুই শুধু একটি আংগুল ছিলি, আজ খুনরাংগা হয়েছিস। খোদার রাস্তায় তুই আঘাত পেয়েছিস।"

দুর্বল সাহাবাদের তিনি সদয়ভাবে চালাতেন এবং নিজ বাহনে বসিয়ে নিতেন। তাঁদের জন্যে খোদার দরবারে মুনাজাত করতেন। এ রিওয়ায়েত আবু দাউদ উধৃত করেছেন।

হযরতের ওঠা বসাঃ

তিনি মাটিতে, চাটাইয়ে, বিনাছায় যখন যেখানে স্থান পেতেন অবাধে বসে যেতেন। কাইলা বিন্তে মাখযামা বলেনঃ আমি একবার হযরতের খিদমতে হাজির হলাম। হযরত পায়ের ওপরে বসা ছিলেন। তাঁকে এরূপ অসহায় অবস্থায় বসা দেখে আমি ভয়ে কেঁপে গেলাম। আদী বিন্ হাতিম যখন এল, হযরত তাকে নিয়ে ঘরে চলে গেলেন। তখন এক বাঁদী তাঁর কাছে একটা বিছানা দিয়ে গেলেন। এটিতে তিনি সাধারণত বসতেন। তিনি সেটাকে আদীর সামনে দিয়ে নিজে মাটিতেই বসে গেলেন। আদী বলেনঃ আমি বুঝে গেলাম যে, ইনি বাদশাহ নন।

কখনও তিনি চিত হয়ে আরাম নিতেন। কখনও তিনি একটি পা আরেকটি পায়ের ওপরে তুলে রাখতেন। কখনও ডান পাঁজরে ও কখনও বাম পাঁজরে ভর করে থাকতেন। যখন তিনি বাইরে বেরোবার প্রয়োজন বোধ করতেন, দুর্বলতার সময়ে সাহাবাদের কাউকে ভর করে বেরোতেন।

হযরতের ইস্তিঞ্জা ঃ

হযরত যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, এ দোআ পড়তেন ঃ

اللهم اعوذ بك من الخبث و الخبائث

"হে খোদা ! আমি বিতাড়িত শয়তানের নোংরামী ও শয়তানী থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।"

সেখান থেকে যখন তিনি বেরিয়ে আসতেন, তখন পড়তেন ঃ غفرانك অর্থাৎ তোমার ক্ষমা লাভের প্রার্থনা জানাই।

কখনও তিনি পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতেন এবং কখনও তার অভাবে পাথর বা মাটি দিয়ে করতেন। কখনও মাটি ও পানি দুটোই ব্যবহার করতেন। যখন তিনি ইস্তিঞ্জার জন্যে বের হতেন, কোন কিছুর সাহায্যে পর্দার ব্যবস্থা করে নিতেন। কখনওে খেজুরের শাখা আর কখনও গাছের ডাল দিয়ে তা করতেন। যখন তিনি কোন শক্ত মাটিতে প্রস্রাব করার জন্যে তৈরী হতেন, একখন্ড কাঠ দিয়ে খুঁড়ে মাটি নরম করে নিতেন। তারপর তাতে প্রস্রাব করতেন। সব সময়ে পেশাবের জন্যে তিনি নরম মাটি খুঁজে নিতেন। সাধারণত তিনি বসেই পেশাব করতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ যদি কেউ বলে, তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, তা বিশ্বাস করবেন না। কারণ, তিনি সব সময়ে বসেই পেশাব করেছেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত (সঃ) দাঁড়িয়েও পেশাব করেছেন।

মুহাদ্দিছরা তার জবাবে বলেন, তাও জায়েয। একদল লিখেছেন, তাঁর সে সময়ে বসে পেশাব করতে কষ্ট হত বলেই তিনি তা করেছেন। অর্থাৎ শরীআত সংগত ওজর ছিল তাঁর। একটি মতে এও বলা হয়েছে, তা তিনি আরোগ্য লাভের জন্যে করেছিলেন। ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন ঃ আরবদের ধারণা, দাঁড়িয়ে পেশাব করলে পিঠের বেদনা দূর হয়। সঠিক মত হল এই, হযরত (সঃ) পেশাবের ছিঁটা থেকে বাঁচার ও দূরে থাকার জন্যেই তা করেছিলেন। কারণ, এ ঘটনাটি একটি শক্ত মাটির টিলার কাছে ঘটেছিল। হযরত (সঃ) মেযবালা নামক চাদর দিয়ে পর্দা করে নিয়েছিলেন। স্থানটি উঁচু ছিল। যদি সেখানে বসে পেশাব করতেন, তা হলে ফিরে তা হযরতের ওপরেই আসত। তিনি টিলাটিকে আড় হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। একদিকে দেয়াল ও

অন্যদিকে টিলা। মাঝখানে তাঁর বসারও সুযোগ ছিলনা। সেই অবস্থায় কেবল তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন।

ইমাম তিরমিজী হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ হযরত (সঃ) আমাকে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে দেখে বললেন, হে উমর! দাঁড়িয়ে পেশাব করোনা। তারপর আমি আর কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি।

মাম তিরমিজী বলেন, এ হাদীছটি আব্দুল করীম বিন আবু মুখারিক থেকে মারফু রিওয়ায়েত হয়ে এসেছে। এ রাবীটি মুহাদ্দিছীনের কাছে 'দুর্বল' বিবেচিত।

মুসনাদে বাযায ইত্যাদিতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন বুরাইদা (রাঃ) তাঁর বাপ থেকে শুনে বর্ণনা করেন ঃ নবী (সঃ) বলেছেন, তিনটি কাজের ভেতরে বাড়াবাড়ি রয়েছে। একটি দাঁড়িয়ে পেশাব করা। দ্বিতীয়, নামায শেষ হবার আগেই কপালের ঘাম মুছা। তৃতীয়, সিজদার জায়গায় ফুং দিয়ে সিজদা করা।

ইমাম তিরমিযীও রিওয়ায়েতটি নিয়েছেন। অবশ্য তিনি এটাকে অরক্ষিত বর্ণনা বলে আখ্যা দিয়েছেন। বাযায (রঃ) বলেন ঃ 'সাঈদ বিন ওবায়দুল্লাহ ব্যতীত আর কেউ হযরত আবদুল্লাহ বিন বুরাইদা থেকে এ হাদীছ রিওয়ায়েত করেছেন বলে আমার জানা নেই।' অবশ্য তিনি এর কোন সমালোচনা করেন নি। ইবনে আবু হাতিম বলেন ঃ এ বর্ণনাকারী বসরা নিবাসী এবং অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী।

হযরত (সঃ) যখন পায়খানা থেকে বাইরে আসতেন, তখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন। পানি হোক বা ঢিলা, ইস্তিঞ্জা তিনি বাম হাতে করতেন। এ ব্যাপারে তিনি সুফীদের মত আজে বাজে কাজ করতেন না। যেমন, পুরুষাংগ ধরে টানা খিঁচা, কাশাকাশি, গলা ঝাড়া, রশি ধরে হেলাদোলা, সিড়ীতে ওঠানামা করা, পুরুষাংগের অগ্রভাবে তুলা ঢুকানো, বারংবার পানি ঢালা আর ঘুরাফিরা করা, এ সব কিছুই কল্পনা বিলাসীদের আবিস্কার!

আবু জাফর উকায়েল বলেন ঃ হযরত (সঃ) যখন পেশাব করতেন, তখন কেউ সালাম দিলে জবাব দিতেন না। এরূপ ঘটনা সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে বাযাযের (রঃ) মুসনাদে বর্ণিত আছে যে, হযরত (সঃ) সালামের জবাব দিয়েছেন। পরে তিনি বলেছেন, আমি এ জন্যে দিলাম যেন তোমার সালামের জবাব দিলামনা একথা না বল। ভবিষ্যতে যদি আমাকে এরূপ অবস্থায় দেখ, সালাম দিবেনা। কারণ আমি সালামের জবাব দিবনা।

কতকের ধারণা, এরূপ ঘটনা দু'বার ঘটেছিল। একদলের ধারণা, মুসলিমের বর্ণনাটি সঠিক। কারণ, তা যিহাক বিন উছমান নাফে' থেকে ও নাফে' ইবনে উমর (রাঃ) থেকে শুনেছেন। পক্ষান্তরে বাযায বর্ণনা করছেন আবু বকর থেকে শুনে এবং আবু বকর হলেন আবদুল্লাহ ইবনে

উমরের (রাঃ) অন্যতম বংশধর তিনিও না'ফে থেকে শ্বনেছেন। এর্‌প মতও রয়েছে যে, ইনি হলেন আবদ্‌ল্লাহ ইবনে উমরের পৌত্র ও উমর বিন আবদ্‌র রহমানের প্‌ত্র। ইমাম মালেক (রঃ) প্রম্‌খ তাঁর কাছ থেকে হাদীছ নিয়েছেন। কিন্তু যিহাকের হাদীছ বেশী নির্ভরযোগ্য।

হযরত (সঃ) যখন পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতেন, তখন হাত মাটিতে ঘষতেন। যখন তিনি ইস্তিঞ্জা করতে বসতেন, মাটির কাছাকাছি না পৌঁছে কাপড় তুলতেন না।

কয়েকটি ব্যাপারে হযরতের রীতি-নীতি

জ্‌তা পরা, চির্‌নী করা, ওজ্‌ করা ও লেন-দেন করার ব্যাপারে তিনি ডান দিক থেকে শ্‌র্‌ করা পসন্দ করতেন। তিনি খেতে বা পান করতে এবং পাকাতে গিয়ে ডান হাতই ব্যবহার করতেন। পক্ষান্তরে খারাপ কিছ্‌ পরিস্কার বা দ্‌র করার জন্যে বাম হাত ব্যবহার করতেন।

মাথা কামানোর ব্যাপারে তাঁর রীতি ছিল এই' হয় প্‌রোপ্‌রি কামিয়ে ফেলতেন, নয় সবটাই রেখে দিতেন। কিছ্‌ কামিয়ে কিছ্‌ রাখতেন না। কেবল কুরবানীর সময়ে তিনি মাথা কামাতেন বলে বর্ণিত আছে।

তিনি মিসওয়াক পসন্দ করতেন। রোযা-বেরোযা সব সময়ে তিনি মিসওয়াক কর্‌তেন। ঘ্‌ম ছেড়ে, ওজ্‌তে বসে, নামাযে ও ঘরে যাবার প্রাক্কালে তিনি দাঁত মাজতেন। তিনি আরাকের মিসওয়াক ব্যবহার করতেন।

স্‌গন্ধি দ্রব্য তিনি অত্যন্ত পসন্দ করতেন। তা সর্বদা ব্যবহার করতেন। বর্ণিত আছে, তিনি 'নাভেরা' ব্যবহার করতেন। প্রথম দিকে তিনি চুল এমনি রেখে দিতেন। পরে তিনি সিঁথী কাটা শ্‌র্‌ করেন। এ ভাবে চুল দ্‌'অংশে ভাগ করে রাখতেন। 'সদল' বলতে পেছনের দিকে চুল উল্টিয়ে রাখা ব্‌ঝায়। সে অবস্থায় তিনি সিঁথী কাটতেন না। তিনি কখনও হাম্মামে যাননি। সম্ভবত তাঁর সময়ে তা ছিলও না। হাম্মাম সম্পর্কিত রিওয়ায়েত সহীহ নয়। হযরতের কাছে একটি স্‌রমাদানী ছিল। প্রতি রাতে শোবার সময়ে তিনি চোখে তিনবার কাঠির পোঁচ দিতেন।

তাঁর খেজাব দান সম্পর্কে সাহাবাদের ভেতরে মতভেদ রয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন: তিনি খেজাব লাগান নি। হযরত আব্‌ হ্‌রায়রা (রাঃ) বলেন—তিনি খেজাব ব্যবহার করেছেন। হাম্মাদ বিন সালমা হোমায়েদ থেকে ও তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—আমি হযরতকে (সঃ) খেজাব লাগাতে দেখেছি। হাম্মাদ বলেন, আবদ্‌ল্লাহ বিন ম্‌হাম্মদ উকায়েদ আমাকে বলেছেন যে, তিনি হযরত আনাসের (রাঃ) সামনে হযরতের (সঃ) চুলে খেজাব লাগানো দেখেছেন।

একদল বলেন, হযরতে (সঃ) এত বেশী স্‌গন্ধি তেল ব্যবহার করতেন যে, তাঁর চুল লাল হয়ে

গিয়েছিল। দর্শক তা দেখে ভাবত, লাল খেজাব লাগানো হয়েছে। আদপে তিনি খেজাব লাগাতেন না।

আবু রিমশা বলেন : আমি হযরতের খেদমতে হাজির হলাম। আমার সাথে আমার পুত্রও ছিল। হযরত জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কি ছেলে আছে? জবাব দিলাম—জীহাঁ! আপনি সাক্ষী থাকুন। তিনি তখন বললেন : ওকে কষ্ট দিওনা। সেও তোমাকে কষ্ট দিবেনা। আমি বার্ধক্যকে লাল দেখছি।

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ প্রশ্নে এই বর্ণনাটি বেশী নির্ভরযোগ্য। কারণ, নবী (সঃ) বৃদ্ধ ছিলেন না।

হাম্মাদ বিন সালমা সিমাক বিন হরব থেকে বর্ণনা করেন : জাবির বিন সামরাকে প্রশ্ন করা হল : হযরতের মাথায় কি বার্ধক্যের নমুনা দেখা দিয়েছিল? তিনি জবাব দিলেন : হযরতের মাথায় সিঁথীর কাছে দু'একটা চুল ছাড়া কোথাও বার্ধক্যের সাদা ছাপ পড়েনি। তিনি যখন তেল দিতেন, তখন তা দেখা যেত।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন : হযরত (সঃ) মাথায় ও দাড়ীতে বেশী করে তেল মাখতেন এবং অধিকাংশ সময়ে মাথায়ও কাপড় রাখতেন। মনে হত যেন তেলের কাপড়। তিনি মাথা আঁচড়াইতে ভাল বাসতেন। কখন তো নিজেই চিরুনী চালাতেন, কখন আবার হযরত আয়েশা (রাঃ) আঁচড়ে দিতেন। হযরতের চুল কম ছিলনা, বেশীও ছিলনা। তাঁর চুল কানের লতি পর্যন্ত ছিল। বেড়ে গেলে তখন চারিটি গুচ্ছে ভাগ করে নিতেন।

হযরত উম্মে হানী বলেন : নবী (সঃ) মক্কায় আমাদের বাড়ী এলেন। তখন তাঁর চুল চারটি অংশে বিভক্ত ছিল। এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ।

নবী (সঃ) কখনও সুগন্ধি দ্রব্য ফিরাতেন না। সহীহ মুসলিমে আছে—'হযরত (সঃ) বলেছেন, যদি কেউ রায়হান পায় তা যেন না ফিরায়। কারণ, সুঘ্রান অল্প সময় থাকে এবং হাল্কা হয়ে থাকে।' বর্ণনাটির এটাই যথাযথ রূপ। একদল বলেন, 'যাকে সুগন্ধি দ্রব্য দেয়া হবে, সে যেন তা না ফিরায়' এর তাৎপর্য ভিন্ন। কারণ, রায়হান নেয়া কোন বিশেষ সৌজন্যের কথা নয়। রায়হান প্রায় সময়ই একে অন্যকে দিয়ে থাকে। পক্ষান্তরে মিশক-আম্বর ও অন্যান্য ধরনের দামী সুগন্ধি দ্রব্য সাধারণত দেয়া-নেয়া হয় না। কিন্তু, উরুয়া বিন ছাবিত হযরত ছুমামা থেকে যে বর্ণনাটি দিয়েছেন, তাতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন : নবী (সঃ) সুগন্ধি দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করতেন না।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে এক মারফু' রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে, তিনি বালিশ, তেল ও দুধ ফেরত দিতেন না। এ বর্ণনাটি ত্রুটিপূর্ণ। ইমাম তিরমিজী এটি নিয়েছেন এবং ত্রুটিগুলো আলোচনা করেছেন। কিন্তু, তাঁর সে সমালোচনা আমার স্মরণ নেই। হাঁ-ইবনে উমর থেকে

মুসলিম বিন জুন্দুব ও তাঁর থেকে আব্দুল্লাহ বিন মুসলিমের একটি বর্ণনায় এবং আবু উছমানের 'মুরছাল' বর্ণনায় বলা হয়েছে : নবী (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কাউকে যদি রায়হান সাধা হয়, তা ফিরিয়োনা। কারণ, তা জান্নাত থেকে এসেছে। হযরতের কাছে একটি আতরদানী ছিল। তা থেকে তিনি আতর ব্যবহার করেছেন। সব চাইতে ভাল বাসতেন তিনি মিশক-আম্বর। 'ফাগিয়া' আতরও তিনি পসন্দ করতেন যথেষ্ট। বলতেন : এ থেকে হাস্নাহেনার ঘ্রাণ আসে।

গোঁপ-প্রসঙ্গ

আবু আমর বিন আব্দুল বার বলেন, হাসান বিন সালেহ সিমাক থেকে তিনি আকরামা ও ইকরামা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ বর্ণনা শুনেছেন : নবী (সঃ) গোঁপ ছেটে ফেলতেন এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাই করতেন।

মুহাদ্দিছদের একদল এ বর্ণনাটিকে হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) ওপরে 'মাওকুফ' বলে থাকেন। তিরমিজী (রঃ) হযরত যায়েদ বিন আরকামের (রাঃ) একটি বর্ণনা উধৃত করেছেন, তাতে বলা হয়েছে : নবী (সঃ) বলেছেন যে ব্যক্তি মোঁচ কাটে না, সে আমার দলের নয়। ইমাম তিরমিজী হাদীছটিকে সহীহ্ বলেছেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত আছে : রসূল (সঃ) বলেছেন, গোঁফ কাট ও দাড়ী বাড়াও। এবং মজুসীদের রীতি অনুসরণ করো না।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্নিত আছে : নবী (সঃ) বলেছেন, 'মুশরিকদের বিপরীত চল। দাড়ী রাখ ও মোঁচ ছাঁট।

সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে : হযরত (সঃ) আরো বলেছেন, চল্লিশ দিন পার না হতেই গোঁপ ও নখ কাটবে।

পূর্ব সূরীদের ভেতরে গোঁপ ছাটা ও কামানো নিয়ে মতভেদ ছিল যে, এর ভেতরে কোনটি উত্তম ? ইমাম মালিক তাঁর 'মুয়াত্তা' সংকলনে লিখেছেন, গোঁপ এতটুকু কাটবে যেন ঠোঁটের কিনারা স্পষ্ট দেখা যায়। ইবনে আব্দুল হাকিম মালিক (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন : মোঁচ 'ই'ফা' করবে ও দাড়ী ঝুলিয়ে দিবে। 'ই'ফা' বলতে মুলোচ্ছেদ করা বুঝায়না; বরং সুন্দরভাবে কেটে ছেটে রাখাকে বুঝায়।

ইবনে কাসিম তাঁর থেকে বর্ণনা করেন : আমার মতে জড়সুদ্ধ গোঁপ কামানো এক ধরনের অংগহানি ঘটানো। মালিক (রঃ) বলেন : নবীর (সঃ) 'ই'ফাউশ শারেব' অর্থ হচ্ছে চারদিক থেকে কেটে ছেটে ঠিক করে রাখা। মালিক (রঃ) উপর ভাগের মোঁচ কামিয়ে ফেলাকেও মাকরূহ মনে করতেন। তিনি বলতেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোঁচ মুড়িয়ে ফেলা বিদআত। আমার মতে

যারা তা করবে, তাদের শারীরিক সাজা হওয়া দরকার। ইমাম মালিক আরো বলেনঃ হযরত উমরের (রাঃ) যখন কোন দুঃখদায়ক কিছু ঘটত, তখন ফুঁসে উঠতেন, পা দুটো বিছানায় লম্বা করে ছড়িয়ে দিতেন এবং গোঁপে তা দিতে থাকতেন।

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ) বলতেনঃ গোঁপ মুন্ডানো সুন্নত। ইমাম তাহাভী বলেনঃ ইমাম শাফেঈ (রঃ) থেকে এ সম্পর্কে আমি কোন অভিমত বা মন্তব্য পাইনি। তবে ইমাম আবু হানীফা (রঃ), আবু ইউসুফ (রঃ), যোফর (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেনঃ গোঁপ ছাটার চাইতে কামানো উত্তম।

ইবনে খোয়ায়েন মিন্দাদ মালিকী ইমাম শাফেঈ (রঃ) সম্পর্কে বলেন, এ ব্যাপারে তিনি আবু হানীফার (রঃ) মতের অনুসারী ছিলেন। আবু উমর (রঃ) ও তাই বলেন।

আছরাম (রঃ) ইমাম আহমদ (রঃ) সম্পর্কে বলেনঃ আমি ইমাম আহমদকে দেখেছি, তিনি গোঁপ মুড়িয়ে ফেলতেন। আমি শুনেছি, তিনি এটাকে সুন্নত ভাবতেন। তিনি বলতেনঃ ভাল করে কামিয়ে ফেল। নবী (সঃ) মোঁচ কামাবার হুকুম দিয়েছেন।

ইমাম হাম্বলী (রঃ) বলেন, আবু আব্দুল্লাহকে প্রশ্ন করা হল—এ সম্পর্কে আপনার কি মত যে, মানুষ কি কিছু গোঁপ কাটবে, না সব কামিয়ে ফেলবে, না অন্য কোন পন্হা অনুসরণ করবে? তিনি জবাব দিলেনঃ একেবারে কামিয়ে ফেলায় কোন দোষ নেই এবং কেটে ছেটে রাখলেও অন্যায় হবে না।

আবু মুহম্মদ 'মুগনী' গ্রন্হে লিখেছেন, একেবারে কামিয়ে ফেলা অথবা কেটে সাফ করে রাখা যেটা ইচ্ছা করতে পার।

তাহাভী বলেন, মুগীরা বিন শো'বা বর্ণনা করেছেনঃ হযরত (সঃ) মিসওয়াকে মোচ রেখে কেটেছেন এবং এভাবে কখনো কামানো সম্ভব হতে পারে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) দুটি মারফু রিওয়ায়েত থেকেও এর সমর্থনে দলীল পেশ করা হয়। এ রিওয়ায়েতে বলা হয়েছেঃ দশটি জিনিস প্রকৃতির ধর্মের নিদর্শন। তার ভেতরে গোঁপ ছোট করাও অন্যতম। এ বর্ণনাটিও সর্বসম্মত শুদ্ধ যে—হযরত আবু হুরায়রা বলেন, ফিতরাতের (প্রকৃতির ধর্ম) পাঁচটি ব্যাপারের একটি হচ্ছে মোঁচ ছাটা।

পক্ষান্তরে মুন্ডনকারীরা মুন্ডানোর সপক্ষে দলীল স্বরূপ একটি বিশুদ্ধ রিওয়ায়েত পেশ করেছেন যাতে হযরতের গোঁপ মুড়ানোর কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছেও বলা হয়েছে, হযরত (রঃ) মোঁচ কামিয়ে ফেলতেন। তাহাভী (রঃ) বলেন, এ হাদীছটিতে কামানোর দিকটাই বেশী প্রকাশ পায়, তা বলে ছাটার সম্ভাবনাও থেকে যায়। মূলত দুদিকই বুঝা যায়।

ইয়া'লা বিন আব্দুর রহমান তাঁর পিতা ও তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এক মারফু রিওয়ায়েত বর্ণনা করেন। তাতে বলা হয়েছে 'মোঁচ মুন্ডাও ও দাড়ী ছাড়।' এখানেও

মোচ মুণ্ডানোর আভাস মেলে। তাছাড়া সেই সূত্রেই লেখা হয়েছে, আবু সাইদ, আবু উসায়েদ, রাফে' বিন খাদীজ, সহল বিন সা'দ, আব্দুল্লাহ বিন উমর ও আবু হুরায়রা (রাঃ) মোচ কামাতেন।

ইব্রাহীম বিন মুহাম্মাদ বিন হাতিব বলেন, আমি ইবনে উমরকে এমন ভাবে মোঁচ মুন্ডাতে দেখেছি যেন তা মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলা হল। কেউ তো এরূপ বলেছেন যে, কামানোর পরে মোচের চিহ্ন লোপ পেয়ে সাদা চামরার রঙ ফুটে উঠত।

তাহাভী বলেন, মোঁচ কাটাই সবার মতে সুন্নত বটে। কিন্তু, মাথা কামানোর ওপরে কিয়াস' করে কামানোকেই উত্তম বলতে হয়। কারণ, নবী (সঃ) মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার ও যারা চুল খাট করে রেখেছে, তাদের জন্যে একবার দোআ করেছেন। এতেই বুঝা যায়, মোচ কামানো উত্তম।

হযরতের আচার-ব্যবহার

হযরত (সঃ) নিখিল সৃষ্টির ভেতরে ভাষা ও আলাপনের বিশুদ্ধতা, মধুরতা, সংক্ষেপণ, ও আকর্ষণীয়তায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর কথা তাই অন্তরে সহজেই ঠাঁই নিত। আত্মাকে করত উদ্বুদ্ধ। হযরতের (সঃ) শত্রুরাও তাঁর এ গুণটিকে অকুন্ঠে স্বীকার করত।

যখন তিনি কথা বার্তা বলতেন, আলাদা আলাদা করে সুস্পষ্ট ভাবে বলতেন। বাক্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাতেন। এত তাড়াতাড়ি বলতেন না যে, শ্রোতার মনে রাখতে অসুবিধা হয়। আবার বাক্যের মাঝে এরূপ বিরতি ঘটাতেন না যাতে করে শ্রোতার বিরক্তি সৃষ্টি হতে পারে। তাঁর বাক-রীতি ও কথা বলার ভংগি সব দিক থেকেই উত্তম ও পরিপূর্ণ ছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ হযরত (সঃ) তোমাদের মত এত তাড়াতাড়ি একের পর এক করে বেশী কথা বলতেন না। ববং তিনি পৃথক পৃথকভাবে এরূপ সুস্পষ্ট-ভাবে কথা বলতেন যেন শ্রোতা মনে গেথে নিতে পারে। এ জন্যে অধিকাংশ সময়ে তিনি একেকটি কথা তিন তিন বারও বলতেন। সালামও তিনবার উচ্চারণ করতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি চুপ থাকতেন। নিস্প্রয়োজনে কথা বলতেন না। কথার শুরু ও শেষ সামঞ্জস্য-পূর্ণ হত। তাঁর অল্প কথায় অনেক ভাবের প্রকাশ ঘটত। কল্যাণকর কথা ছাড়া বলতেন না। কোন কথা অপসন্দ হলে চেহারায় তা প্রকাশ পেত। অর্থহীন ও অশোভন কথা কখনও বলতেন না। দ্রুত কথা বলতেন না।

তাঁর হাসি ছিল মুচকি হাসি। তাঁর হাসির শেষ সীমা ছিল দাড়ী নড়া। বিস্ময়কর দুর্লভ ঘটনা শুনলেই তিনি হাসতেন।

হাসির উদ্রেক কয়েকটি কারণে হয়। একটি তো বলা হল। দ্বিতীয়, খুশীর দোলায় মনে যখন হিল্লোল সৃষ্টি হয়। তৃতীয়, ক্রোধের হাসি। এটা কয়েক কারণে হয়। বক্র বা বিষাক্ত হাসি ঃ এটা প্রকাশ পায় যখন ক্রুদ্ধ ব্যক্তি ক্রোধের কারণ দেখে বিস্ময় বোধ করে অথবা বুঝতে পারে যে, শত্রু হাতের মুঠোয় এসে গেছে। কৃত্রিম হাসি ঃ মনের রাগটাকে চাপা দিয়ে ঘটনার স্রোত ঘুরিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এ হাসি দেখা দেয়।

হাসির মত তাঁর কান্নাও সংযত ছিল। তাতে জোরে চীৎকার তো দূরের কথা, কোন শব্দই হতনা। হাসির মতই নিঃশব্দ ছিল তাঁর কান্না। কান্নার ক্ষেত্রে এতটুকু হত যে, চোখ বাষ্পাকুল হত ও অশ্রু ঝরে পড়ত। বুকের ভেতর থেকে ক্ষীণ কান্নার রোল ভেসে আসত। কখনও মৃতের ওপরে করুণাসিক্ত হয়ে, কখনও উম্মতের বিপদ ভেবে দয়াদ্র হয়ে, কখনও খোদার ভয়ে ও কখনও কুরআন শুনে তিনি কাঁদতেন। এ শেষোক্ত কান্না খোদার প্রেমে ও ভয়ে কাঁদতেন। যখন তাঁর সন্তান ইব্রাহীম (আঃ) মারা গেলেন, তখন চোখে পানি এল এবং কোমল প্রাণের আবেগোচ্ছাসে কেদে ফেললেন। আর বললেন ঃ চোখ কাঁদছে। অন্তর বিষাদে ভরে গেছে। অবশ্য আমি খোদা যাতে রাজী থাকেন তাই করি। হে ইব্রাহীম! তোমার জন্যে প্রাণে আমার অবশ্যই দুঃখ রয়েছে।

তা ছাড়া একদিন এক বিলাপকারীর বিলাপ দেখেও তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদিন তাঁর সামনে সূরা নিসা পড়ছিলেন। যখন এ আয়াত পড়লেন ঃ

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا -

"সেদিন এক অবস্থা দাঁড়াবে যখন উম্মতদের থেকে লোক ডেকে তোমাদের কার্যের সাক্ষ্য নেব এবং তোমাকে ডেকে তাদের সবার কার্যের সাক্ষ্য নেব।"

যখন উছমান বিন মাজউন মারা গেল, তখনও তিনি কেঁদেছিলেন। একবার সূর্য গ্রহণ হল। তিনি 'কসূফ' নামায পড়তে গিয়ে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ প্রভু আমার! তুমি কি আমার সাথে এ ওয়াদা করনি যে, যতদিন আমি এদের ভেতরে থাকব ও যতদিন এরা সবাই ও আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করে চলব, ততদিন কোন আজাব নাযিল করবে না।

একবার তিনি তাঁর এক কন্যার কবরের কাছে গিয়ে কেঁদেছিলেন। কখনও তিনি তাহাজ্জুদের নামাযে কান্না কাটা করতেন।

কান্না কয়েক কারণে হতে পারে। দয়ায় বিগলিত হয়ে কোমল প্রাণের কাঁদা। ভয়ে কাঁদা। ভালবাসায় কাঁদা। আনন্দাতিশয্যে কাঁদা। অসহ্য আঘাতে কাঁদা ও মনোকষ্টে কাঁদা।

কাঁদার পঞ্চম ও ষষ্ঠ কারণ দুটোর ভেতরে পার্থক্য এতটুকু যে, শেষটি কোন হারানো প্রিয় বস্তু বা অতীতের কোন দুঃখ-বিপদ মনে পড়ে দেখা দেয়। পঞ্চমটি অসহনীয়

বিপদ ও যাতনা থেকে দেখা দেয়। আসন্ন বিপদ চিন্তা করে ভয়ের কান্না সৃষ্টি হয়। আনন্দাতিশয্যে কান্না হয় ঠান্ডা ও তাতে মন তৃপ্তিতে ভরে যায়। আর বিরহ-বেদনায় উত্তপ্ত কান্নার সৃষ্টি হয়। মন তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তাই খুশীর কান্নাকে চোখ শীতলকারী বলা হয়। তার জন্যে প্রার্থনা করা হয়, খোদা যেন তার চোখ ঠান্ডা করে। এবং দুঃখের তপ্ত কান্নায় চোখ জ্বালা পোড়া করে বলে বলা হয়, খোদা তার চোখ উত্তপ্ত করুন। সপ্তম প্রকারের কান্না হল দুর্বলতা ও অক্ষমতার কান্না। অষ্টম, কুম্ভিরাশ্রু বা কপট কান্না। তাতে চোখে জল থাকে আর মন থাকে পাথরের মতই শক্ত। বাহ্যত তাকে দেখলে খুবই কোমল প্রাণের মনে হয়। নবম, পেশাগত বা মজুরী নিয়ে কাঁদা। ক্রন্দনকারী পারিশ্রমিক নিয়ে অভ্যাসগতভাবে কেঁদে থাকে। হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) মতে তারা কান্নার ব্যবসারী। পুরুষের দুখ নিয়ে নারীরা এ ব্যবসায়ের দ্বারা উপার্জন করে থাকে। দশম, সহানুভূতির কান্না। কাউকে কাঁদতে দেখে কিংবা কারুর দুঃখ দেখে সহানুভূতিতে কেঁদে ফেলা। এরূপ ক্রন্দনকারী নিজেও বুঝতে পারেনা যে, কেন সে কাঁদছে। শুধু একজনের করুন কান্না দেখে সেও কাঁদছে।

আর যে কান্নায় শুধু অশ্রু দেখা দেয়, আওয়াজ শোনা যায় না তাকে বলে রুদ্ধ কান্না। আর যে কান্নায় আওয়াজও হয় তাকে বলে উচ্চৈস্বরে কান্না। যেমন কবি বলেন,

بكت عينى وحق لها بكاها
وما يغنى البكاء الا العويل

"আমার চোখ কান্নায় ভেংগে পড়েছে। তার কান্নার অধিকারও আছে বটে। কাঁদা আর বিলাপ করা ছাড়া কোন উপায় যে নেই।"

আর যা নেহাৎ কষ্ট করে সৃষ্টি করতে হয়, তাকে কষ্টে-সৃষ্ট কান্না বলে। এটা হয় দু'ধরনের। একটি প্রসংসনীয় ও দ্বিতীয়টি নিন্দনীয়। লোক দেখানোর জন্যে না হয়ে যদি খোদার ভয়ে মনকে নরম করার প্রয়াসে এরূপ কান্নার চেষ্টা করা হয়, তা প্রশংসনীয়। অবশ্য লোক দেখানো কান্নাটি নিন্দনীয়।

হযরত উমর (রাঃ) যখন হযরতকে (সঃ) ও আবু বকরকে (রাঃ) বদর যুদ্ধে বন্দীদের ব্যাপারে কাঁদতে দেখলেন, তখন প্রশ্ন করলেন—"হে খোদার রসুল! কাঁদছেন কেন তা আমাকে বলুন। যদি তাতে আমারও কান্না-এসে যায় তো ভাল কথা। নইলে অন্তত কান্নার ভাব সৃষ্টি করে নেব।" এ কথা শুনে হযরত (সঃ) তাঁকে খারাপ বলেন নি।

আগেকার বুযুর্গরা বলতেন, খোদার ভয়ে কাঁদ। কান্না যদি একান্তই না আসে তো কাঁদার মত অবস্থা সৃষ্টি করে নাও।

হযরতের বক্তৃতাবলী

হযরত (সঃ) ভূমিতে দাঁড়িয়ে, মিম্বরে উঠে, এমনকি উটে চড়েও বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতার সময়ে তাঁর চোখ লাল হয়ে যেত, স্বর উঁচু হয়ে যেত ও তেজস্বিতা বেড়ে যেত। যেন তিনি কোন সেনা দলকে ভয় দেখাচ্ছেন, তোমাদের এটা চরম মুহূর্ত।

তিনি বলতেন: আমাকে ও কিয়ামতকে এমনভাবে পাঠানো হয়েছে যে, আমাদের মাঝখানে এ দুটো আংগুলের মধ্যকার ফাঁকটুকুর মাত্র ব্যবধান বিদ্যমান। এই বলে তিনি বৃদ্ধাংগুলির পরের আংগুল দুটো সামান্য ফাঁক করে দেখাতেন। তারপর বলতেন: কুরআনের বাণীই সর্বোত্তম বাণী আর সর্বোত্তম উপহার হল রসূলের সুন্নত। সব চাইতে নিকৃষ্ট কাজ হল বিভ্রান্তিপূর্ণ বিদাআত (ধর্মে নিত্য নতুন মত ও পথ সৃষ্টি)।

তিনি যে কোন বক্তৃতা শুরু করতেন খোদার প্রশংসা দিয়ে।—ফকীহরা বলেন, তিনি বৃষ্টির জন্যে দোআ প্রার্থনার প্রাক্কালে তওবা প্রার্থনা ও ঈদের খোৎবা তাকবীর দিয়ে শুরু করতেন। কিন্তু এটা তাঁর সুন্নত নয়। সুন্নত হিসেবে খোদার প্রশংসা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করার কথাই প্রমাণিত হয়।

ইমাম আহমদের (রঃ) অনুসারীরা এ মতেরই অনুসারী। আমাদের শায়েখ ইমাম ইবনে তায়মিয়াও এ মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

হযরত (সঃ) দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতেন। 'মারাছীলে আতা' ও অন্যান্য গ্রন্থে লেখা আছে, হযরত (সঃ) যখন মিম্বরের ওপরে দাঁড়াতেন, তখন শ্রোতাদের দিকে মুখ তুলে 'আসসালামু আলাইকুম' বলতেন। ইমাম শা'বী (রঃ) বলেন—হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ) এরূপ করতেন। বক্তৃতা শেষ করতেন তিনি তওবা দিয়ে। অধিকাংশ বক্তৃতায়ই তিনি কুরআনের বাণী আলোচনা করতেন।

সহীহ মুসলিমে উম্মে হিশাম বিন্তে হারিছা রিওয়ায়েত করেন—আমি কুরআন মজীদের যা কিছু শিখেছি, হযরতের (সঃ) মুখে শুনে শুনে শিখেছি। কারণ হযরত (সঃ) প্রত্যেক জুমআয় মিম্বরে উঠে খুৎবা দিতে গিয়ে কুরআন পড়তেন। আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের এক বর্ণনায় রয়েছে: রসূল (সঃ) যখন তাশরীফ আনতেন, তখন পড়তেন:

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بين يدى الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا ۝

"প্রশংসা সবই খোদার জন্যে। আমি তাঁরই সাহায্য চাই। তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। নিজ প্রবৃত্তির অনাচার থেকে আমি খোদার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। খোদা যাকে পথ দেখান তাকে পথ ভুলাতে পারে এমন কেউ নেই। আর যাকে পথ ভুলবার সুযোগ দেন, তাকে পথে আনতে পারে, এমনও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই। এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল। তাঁকে কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে সত্যানুসারীদের সুসংবাদ ও অসত্যের পূজারীদের ভয় দেখাবার জন্যে পাঠানো হয়েছে। যে ব্যক্তি খোদা রসূলের অনুসরণ করবে, পথ পেয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ দু'জনের নাফরমান হবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। খোদার তাতে কিছুই বিগড়াবেনা।"

আবু দাউদে ইউনুস থেকে একটি রিওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। তিনি ইবনে শিহাবকে (রঃ) জুম'আর দিনে হযরতের উক্তরূপ খুৎবা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। ইবনে শিহাব বলেছেন ঃ হাঁ এরূপই ছিল। তবে এটুকু ব্যতিক্রম ছিল ঃ

ومن يعصهما فقد غوى

"যে ব্যক্তি তাঁদের দু'জনের নাফরমানী করবে, তারা বিভ্রান্ত হবে।"

ইবনে শিহাব আরও বলেন ঃ আমি জানিতে পেয়েছি, হযরত (সঃ) খুৎবা দিতে গিয়ে এও বলতেন ঃ যে আসার সে এসে গেছে এবং যা আসবে, তা খুবই কাছাকাছি এসে গেছে। কেউ তড়াহুড়া করলেই খোদা কোন কিছু তাড়াতাড়ি করেন না। তিনি মানুষের পরোয়া করেন না। আল্লাহ তা'আলা যা চান, তাই করেন। মানুষের কথায় কিছু করেন না। খোদা যদি কিছু করতে চান ও মানুষ যদি চায় অন্য কিছু, তা হলে খোদা যা চান, হবে সেটাই। মানুষ যতই অপসন্দ করুক, খোদা যা ঘনিয়ে আনতে চান, তা দূর করার ক্ষমতা কারুর নেই। খোদার অনুমতি ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

হযরতের বক্তৃতায় খোদার স্তুতি-প্রশংসা, তাঁর নিআমত ও গুণাবলী, ইসলামের রীতি-নীতি, বেহেশত-দোযখ, কিয়ামত, খোদাভীতি, খোদার প্রিয় ও অপ্রিয় কাজ ইত্যাদি থাকত। তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলতেন ঃ

হে মানুষ ! আমি যত কিছু বলব, সবই তোমরা পালন করতে পারবে বা করবে, এমন নয়। তবে সরল হয়ে যাও, তবেই তোমাদের জন্যে সুসংবাদ।

যখন কাউকে কিছু বলার হত, যখন যেভাবে ভাল মনে হত, ভূমিকা ছাড়াই বলতেন। কিন্তু যখন বক্তৃতা দিতে দাঁড়াতেন, তখন খোদার প্রশংসাগীতি ও কালিমায়ে শাহাদাত দিয়ে শুরু করতেন। তখন নিজ নাম ধরেই নিজের উল্লেখ করতেন। এরূপ প্রমাণ আছে যে তিনি বলতেন, কালিমায়ে শাহাদাত ছাড়া বক্তৃতা যেন হাত কাটা মানুষ। তিনি যখন হুজরা থেকে বাইরে

আসতেন কোনরূপ বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করতেন না এবং বক্তৃতার জন্যে বিশেষ ধরনের কোন পোষাক-আষাকও পরতেন না।

হযরতের বক্তৃতামঞ্চে তিনটি ধাপ ছিল। যখন তিনি খুৎবার জন্যে সেখানে উঠে সবার দিকে ফিরে বসতেন, তখন মুআজ্জিন দাঁড়িয়ে আজান দিত। আজানের আগে তিনি কিছু বলতেন না এবং পরেও বলতেন না। খুৎবা দিতে দাঁড়িয়ে তিনি লাঠি ব্যবহার করতেন।

আবু দাউদ ইবনে শিহাবের এরূপ এক রিওয়ায়েত উধৃত করেছেন। পরবর্তী তিন খলীফাও এভাবে খুৎবা দিতেন। কখনও তিনি ধনুকে ভর করে বক্তৃতা দিতেন। তরবারিতে ভর করে বক্তৃতা দিয়েছেন কিনা জানা যায়না। একদল মূর্খ বলে থাকে, হযরত (সঃ) তরবারি নিয়ে বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াতেন এবং তার ভেতরে ইংগিত হল এই যে, তরবারির জোরেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত জ্বলজ্যান্ত মূর্খতা। এর কারণ দু'টি। একটা হচ্ছে, হাদীছে তাঁর লাঠি ও ধনুক ভর করে বক্তৃতা দেবার কথাই আছে। দ্বিতীয়, ধর্ম তো ওহীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। হাঁ—কুফরী ও শিরক দূর করার জন্যে তরবারি প্রয়োজন হয়েছে। মদীনা তো শুধু কুরআনের বাণীই জয় করেছে। তরবারির সেখানে তো প্রয়োজনই দেখা দেয়নি।

খুৎবার মাঝখানে তাঁর যদি কোন কাজ দেখা দিত, সেটা শেষ করে আবার খুৎবা দিতেন। একবার তিনি খুৎবা দিচ্ছিলেন, এমন সময়ে ইমাম হাসান ও হুসাইন লাল জামা গায়ে দিয়ে এলেন। হযরত (সঃ) খুৎবা বন্ধ করে মঞ্চ থেকে নেমে এলেন এবং তাঁদের কোলে তুলে নিলেন। তারপর আবার মিম্বরে চড়ে বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঠিকই বলছেন :

إنما أموالكم وأولادكم فتنة

"তোমাদের জন্যে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি একটি বিরাট পরীক্ষা।"

আমি ওদের দু'জনকে লাল জামায় সমুজ্জল হয়ে আসতে দেখে সহ্য করতে পারলাম না। তাই খুৎবা ছেড়ে ওদের কোলে তুলে নিলাম।

আরেকবার হযরতের (সঃ) খুৎবা দেবার সময়ে সালীফ গাতফানী এসে বসল। হযরত (সঃ) খুৎবা থামিয়ে বললেন : হে সালীফ! উঠে সংক্ষেপে দু'রাকাআত নামায পড়ে নাও। তারপর তিনি খুৎবা শুরু করে বললেন : তোমাদের কেউ যখন জুমআর দিনে মসজিদে দেখতে পাবে ইমাম খুৎবা দিচ্ছেন, তখন তার সংক্ষেপে দু'রাকাআত নফল নামায পড়ে নেয়া দরকার।

কখনও তিনি সংক্ষেপে বক্তৃতা শেষ করতেন। প্রয়োজন বোধে তা দীর্ঘ করতেন। ঈদের দিন তিনি নারীদের জন্যে আলাদা খুৎবা পড়তেন। তাদের সদকার জন্যে অনুপ্রাণিত করতেন।

Contents

দ্বিতীয় অধ্যায়

●

হযরতের (সঃ) ইবাদত

Contents

প্রথম পরিচ্ছেদ

●

হযরতের পবিত্রতা অর্জন পদ্ধতি

ওযূঃ

হযরত (সঃ) অধিকাংশ নামাযেই নতুন ওযূ করে নিতেন। কখনও এক ওযূতে কয়েক ওয়াক্ত নামায পড়তেন। কখনও তিনি এক 'মুদ' (প্রায় এক সের) পানি দিয়ে ওযূ করতেন। ওযূ করতে গিয়ে ভালভাবে পানি ব্যবহার করতেন। তথাপি তিনি উম্মতদের পানি খরচের ব্যাপারে অপব্যয় থেকে বাঁচতে বলেছেন। তিনি বলেনঃ আমার উম্মতদের ভেতরে এমন লোকও হবে যারা ওযূতে অহেতুক পানির অপব্যয় ঘটাবে। তিনি আরও বলেনঃ ওযূর সময়ে 'ওলহান' নামক এক শয়তান এসে কুমন্ত্রণা দিতে থাকে। পানির ব্যাপারে তার কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থেক।

একবার তিনি হযরত সা'দের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন ওযূ করছিলেন। হযরত (সঃ) বললেনঃ পানির অপব্যয় করো না। তিনি জবাব দিলেনঃ পানিতেও অপব্যয় হয় ? হযরত (সঃ) জবাব দিলেনঃ হাঁ—তুমি যদি একটা প্রবাহিত নদীর তীরে বসেও ওযূ কর, তথাপি হয়।

হযরত (সঃ) অবস্থা ভেদে একবার করে, দু'বার করে এবং তিনবার করে অংগ ধুতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন রিওয়ায়েতে এরূপও আছে, তিনি একই ওযূতে কোন অংগ দু'বার এবং কোন অংগ তিনবার ধুয়েছেন। কখনও তিনি এক আঁজল পানি দিয়ে কুলি ও নাকে পানি দুটোই সারতেন। কখনও দু'তিন আঁজল দিয়ে এরূপ করতেন। কখনও এক আঁজল পানি থেকে অর্ধেক দিয়ে কুলি করতেন ও বাকী অর্ধেক দিতেন নাকে। যখন দু'তিন আঁজল পানি ব্যবহার করতেন, তখন হয়ত আলাদা আলাদা করতেন কিংবা মিলিয়ে করতেন।

বুখারী ও মুসলিমের হাদীছে আব্দুল্লাহ বিন যায়েদের বর্ণনায় প্রমাণ পাওয়া যায়, হযরত (সঃ) এক আঁজল পানি দিয়ে কুলি ও নাকে পানি দু'টো কাজ সেরেছেন। এভাবে তিনবার করেছেন। এক রিওয়ায়েতে আছে, এ দু'টো তিন আঁজল পানি দিয়ে করেছেন। নাকে পানি ও কুলির ব্যাপারে এটাই অপেক্ষাকৃত সহীহ হাদীছ। কিন্তু, কুলি ও নাকে পানি—আলাদাভাবে করেছেন, তা কোন সহীহ হাদীছে মেলেনা। হাঁ—তালহার একটি রিওয়ায়েতে মিলে। তিনি তাঁর পিতা আর তাঁর পিতা তাঁর দাদা থেকে এ বর্ণনা শুনেছেন। অথচ তাঁর দাদা সাহাবী ছিলেন না।

তিনি ডান হাতে নাকে পানি দিতেন ও বাম হাতে পরিষ্কার করতেন এবং পুরো মাথা মুছ-তেন। কখনও সামনে থেকে মুছে পেছনে আবার পেছন থেকে সামনে হাত নিতেন। এ থেকেই

কেউ দু'বার মোছার কথা বলেন। তবে একবারই সঠিক। অন্যান্য অংগ তিনবার ধুতেন এবং মাথা একবারই মুছতেন। হযরত (সঃ) থেকে এটাই সুস্পষ্ট প্রমাণিত। এর ব্যতিক্রম যা কিছু পাওয়া যায় তা সহীহ নয়। উছমান ও ইবনুল বিলমানীর হাদীছে তিনবার যে মোছার বর্ণনা রয়েছে তা ভুল বর্ণনা। আবু দাউদ বলেন, উছমান থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীছে একবার মোছাই রয়েছে। কোন সহীহ হাদীছে হযরতের (সঃ) আংশিক মাথা মোছার প্রমাণ নেই। কপাল মুছে তিনি পাগড়ীর ওপরে হাত ফিরিয়ে তা পূরা করতেন। আবু দাউদে উধৃত আনাসের (রাঃ) হাদীছে যে বলা হয়েছে, পাগড়ী থাকলে তার নীচে হাত ঢুকিয়ে পরে কপাল মুছতেন, তার অর্থ তিনি পাগড়ী না ভেংগে নীচ থেকে সব চুল মুছতেন। এ থেকে অবশ্য পাগড়ীর ওপরে মাসেহ না করা প্রমাণিত হয় না। মুগীরা বিন শু'বা ও অন্যান্য সাহাবী থেকে তার প্রমাণ রয়েছে। তাই আনাসের (রাঃ) সে ব্যাপারে নির্বাক থাকাতে বিপরীত প্রমাণ হতে পারে না। কুলি ও নাকে পানি ছাড়া তিনি কখনও ওযু করেছেন বলে প্রমাণ নেই। তেমনি তিনি ওযুতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন। তার বিপরীত কখনও কেউ তাঁকে করতে দেখেনি। কখনও তো তিনি পুরোপুরি মাথা মুছতেন। কখন আবার শুধু পাগড়ী মুছতেন। আর কখনও কপাল ও পাগড়ী মুছে মোছার কাজ পূর্ণ করতেন। কিন্তু, শুধু কপাল মুছেছেন, এরূপ প্রমাণ নেই। মাথার সাথে তিনি কানের ভেতর বাহিরও মুছে নিতেন। সে জন্যে নতুন পানি নিতেন না। ইবনে উমরের হাদীছ এর প্রমাণ।

তিনি যেদিন চামড়ার মুজা ব্যবহার না করতেন, এমনকি কাপড়ের মুজাও না থাকত, তখন পা পুরোপুরি ধুয়ে নিতেন। কিন্তু, যদি মুজা পায়ে থাকত, তা হলে মুজা মুছে নিতেন। ঘাড় মোছার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটাও সঠিক নয় যে, ওযুতে প্রথমেই 'বিসমিল্লাহ' ছাড়া অন্য কিছু পড়তেন। এ ধরনের হাদীছগুলো মনগড়া। রসূল (সঃ) থেকে এরূপ কোন কথা জানা যায় না। আর ওযুর সময়ে তিনি পড়তেন ঃ

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الخ -

সুনানে নাসাঈতে আছে ওজুর পরে তিনি পড়তেন ঃ

سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك -

ওযুর প্রারম্ভে তিনি কিংবা সাহাদের কেউ 'অপবিত্রতা দূর করার ইচ্ছা করি কিংবা নামায আদায় করার ইচ্ছা করি'—এরূপ বলতেন বলে প্রমাণ নেই। সহীহ বা যঈফ কোনরূপ হাদীছই এ ব্যাপারে নেই। ওযুতে তিনি কোন অংগ তিনবারের বেশী ধুয়েছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

Contents

তেমনি তিনি কনুই ও পায়ের গীরার ওপরেও ধুয়েছেন বলে প্রমাণ নেই। কিন্তু, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নিজে তা করতেন এবং 'ইতালাতুল গুররাহ্' হাদীছটি থেকে তার প্রমাণ দান করতেন। অবশ্য আবু হুরায়রা (রাঃ) হযরতের ওযু সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাতে কনুই ও পায়ের গীরা ওযুর ভেতরে শামিল হয়।

রসূল (সঃ) ওযুর পরে অংগ-প্রত্যংগ মুছতেন না। কোন সহীহ হাদীছেই সেরূপ প্রমাণ নেই; বরং তার বিপরীত প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু, হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীছে ও মা'আজ বিন জাবালের (রাঃ) হাদীছে যে তাঁর বস্ত্রখন্ড দিয়ে অংগ-প্রত্যংগ মোছার কথা রয়েছে, তা সহীহ নয়। কারণ, প্রথমটিতে সুলায়মান বিন আরকাম বর্জনীয় এবং দ্বিতীয়টিতে আল্ আফরিকী দুর্বল রাবী। ইমাম তিরমিজী বলেন, নবী (সঃ) থেকে এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীছ নেই।

ওযুর পরে তিনি দাড়ী খেলাল করতেন। কিন্তু, তা মাঝে মাঝে করতেন। এ সম্পর্কে অবশ্য হাদীছের ইমামদের ভেতরে মতভেদ রয়েছে। ইমাম তিরমিজী ও অন্য কয়েকজনের মতে হাদীছটি সহীহ। ইমাম আহমদ ও আবু যর'আর মতে দাড়ী খেলাল কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।

তেমনি তিনি আংগুলও খেলাল করতেন। কিন্তু, তাও ধরাবাঁধা ভাবে নয়। সুনানে মুস্তাওরাদ বিন শাদ্দাদের বর্ণনায় এটাই প্রমাণিত হয়। তাই হযরতের (সঃ) ওযু সম্পর্কে যাঁরা ভাল জ্ঞান রাখেন, তাঁদের অর্থাৎ উছমান (রাঃ), আলী (রাঃ), আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রাঃ) প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

হযরত (সঃ) কখনো কখন নিজেই ওযু করতেন। কখনও আবার একজন পানি ঢেলে দিতেন এবং তিনি ওযু করতেন। সহীহদ্বয়ের ভেতরে মুগীরার এক রিওয়ায়েতে আছে, তিনি এক সফরে হযরতকে (সঃ) ওযু করিয়েছিলেন। ওযুর সময়ে আংটি এদিক-ওদিক ঘুরাবার হাদীছটি যঈফ (দুর্বল)। কারণ, হাদীছটি মুআম্মার বিন মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবি রাফে' তার বাপ এবং তার বাবা তার দাদা থেকে শুনেছেন যে, রসূল (সঃ) ওযুর সময় আংটি এদিক-ওদিক ঘুরাতেন। দারে কুতনী' মুআম্মার ও তার বাপকে দুর্বল বর্ণনাকারী আখ্যা দিয়েছেন।

মুজা মোছার প্রশ্ন ঃ

সহীহ রিওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয়, হযরত (সঃ) ঘরে ও প্রবাসে সবখানে মুজার ওপরে 'মাসেহ' করেছেন। তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত তিনি এ নীতি অব্যাহত রেখেছেন। তবে যারা বাড়ী থাকবে, তাদের জন্যে একদিন একরাত ও প্রবাসীদের জন্যে তিন দিন তিন রাত 'মাসেহ' করার সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। সহীহ বা হাসান সব ধরনের হাদীছেই এর প্রমাণ মিলে।

হযরত (সঃ) মুজার উপরিভাগ মুছে নিতেন। নিম্নভাগ মুছেছেন বলে সঠিক প্রমাণ নেই। কেবল সুত্রছিন্ন হাদীছে তার উল্লেখ রয়েছে। সহীহ হাদীছ সবই তার বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। তিনি জুতা ও মুজা দু'টোতেই মোছার নীতি অব্যাহত রেখেছেন। তিনি কপাল সহ পাগড়ীও 'মাসেহ' করেছেন। বেশ কিছু হাদীছ থেকেই তাঁর কথায় ও কাজে এ রীতি অনুসরণের প্রমাণ মিলে। কেউ অবশ্য এটাকে বিশেষ অবস্থায় করা হয়েছে বলে মনে করেন। চামড়ার মুজা খোলার যে অসুবিধা রয়েছে, সেটাই এটাকে সাধারণ হুকুমের পর্যায় থেকে সরিয়ে নিয়েছে। এটাই স্পষ্টত মনে হয়। খোদাই ভাল জানেন। আদপে, হযরত (সঃ) কোন ব্যাপারই অহেতুক অস্বাভাবিক ও কষ্টকর করে তুলতেন না। যদি মুজা পায়ে থাকত, তা খোলা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না ; বরং মুছে নিতেন। আর যদি পা খোলা থাকত, পা ধুয়ে নিতেন। তা বলে মুজা মোছার খাতিরে নিষ্প্রয়োজনে মুজা পরে নিতেন না। আমাদের শায়েখের মতে পা ধোয়াও মুজা মোছার কোনটা উত্তম, এ প্রশ্নের এটাই হচ্ছে সঠিক জবাব।

তায়াম্মুম :

হযরত (সঃ) একবার মাত্র হাত মেরে দু'হাতের বাজু ও মুখমন্ডল মুছতেন। কিন্তু দু'বার হাত মারতেন, এরূপ কোন সহীহ রিওয়ায়েত নেই। আর কনুই পর্যন্ত মুছতে হবে, এরও প্রমাণ নেই। ইমাম আহমদের (রঃ) মতে তা যাঁরা বলেন, নিজের থেকেই বলে থাকেন। যে মাটিতে নামায জায়েয, তা থেকেই তায়াম্মুম করতেন তিনি। হোক তা মাটি, বালু বা লবণের ঢিবি। হযরত (সঃ) বলেছেন : আমার উম্মত যেখানেই নামায পড়বে, সেখানেই নামাযের ও পবিত্রতা অর্জনের ব্যবস্থা দেখতে পাবে। সুতরাং এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, বালুর দেশে পেঁছলে তাতেই নামায পড়বে ও তা দিয়েই পবিত্রতা অর্জন করবে।

যখন নবী (সঃ) সাহাবাদের নিয়ে তবুকের যুদ্ধে গেলেন, পানি খুব কম থাকায় বালুই তায়াম্মুমের জন্যে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি সেখানে মাটি বয়ে নিয়েছিলেন বা কাউকে নিতে বলেছিলেন, এরূপ প্রমাণ নেই। কিন্তু, অধিকাংশ মাটি মিশ্রিত বালুর চাকা দিয়ে তাঁর সাহাবীরা তায়াম্মুম করেছেন। হিজাজের মাটি তেমনি ছিল। আর তা দেখেই মনে করা হয়েছে, বালু দিয়ে তায়াম্মুম চলে। এটাই হচ্ছে অধিকাংশ ইমামের মত।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি যে বলা হয়েছে, বাম হাতের তালু ডান হাতের পিঠ থেকে শুরু করে কনুই পর্যন্ত নিয়ে আবার ঘুরিয়ে হাতের গর্ভভাগ মুছে নেয়া এবং এভাবে দু'হাতের কনুই পর্যন্ত মুছে নেয়া—তা হযরতের (সঃ) কাজ ও কথা থেকে জানা যায় না। তাঁর কোন সাহাবীও সে খবর রাখেন না। এর ওপরে তাই ফতোয়া হয়না।

প্রত্যেক নামাযের জন্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন তায়াম্মুম করেছেন বলেও জানা যায় না। তিনি সে রূপ আদেশও করেননি। পরন্তু, তায়াম্মুমকে তিনি ঠিক ওযুর মর্যাদাই দিয়েছেন। যতক্ষণ এর বিরুদ্ধে কোন প্রমান না মিলে, ততক্ষণ এটাই সঠিক মত।

নামাযের বিধিবিধান

হযরত (সঃ) নামাযে দাঁড়িয়ে প্রথমেই "আল্লাহু আকবর" বলতেন। এর আগে কিছুই পড়তেন না। এমনকি নিয়তও পড়তেন না। এও বলতেন না যে, আমি কা'বামুখী হয়ে ইমাম বা মুক্তাদী হিসেবে চার রাকাআত নামায আদায় করছি। কোন্ ধরনের নামায আর কোন্ ওয়াক্তের নামায তাও বলতেন না। এ সবই বিদআত। হযরত (সঃ) থেকে এরূপ কোন রিওয়ায়েত নেই। সহীহ, যঈফ, মুসনাদ, মুরছাল, মারফু' কোন রিওয়ায়েতই নেই। সাহাবা কিংবা তাবেঈনদের কোন বক্তব্য পর্যন্ত নেই। চার ইমামের কেউই তা বলেন না।

শুধু একদল পরবর্তী কালের আলিম ইমাম শাফেঈর (রঃ) এ মন্তব্যটিতে গোলমালে পড়েছেন যে, 'নামায রোযার মত নয়। তার উল্লেখ না করে কেউ নামায পড়তে পারে না।' এ থেকে তারা বুঝেছেন, নামাযের নিয়াত উল্লেখ করতে হবে। আদপে, ইমাম শাফেঈ উল্লেখ করা বলতে শুধু 'তাকবীরে তাহরীমা'কে বুঝিয়েছেন। আশ্চর্য যে, রসূল (সঃ) তাঁর সাহাবী ও খলীফাদের কেউ যেটাকে সংগত মনে করেন নি, ইমাম শাফেঈ (রঃ) কি করে সেটাকে অপরিহার্য বলতে পারেন ? আমরা যদি এ ব্যাপারে একটি অক্ষরও পেয়ে যেতাম, তা হলে মাথা পেতে মেনে নিতাম। কারণ, নবীর (সঃ) সুন্নত ও সাহাবাদের অনুসৃত কার্যধারার চাইতে উত্তম বস্তু আর কি হতে পারে ?

তাকবীরে তাহরীমার জন্যে হযরত (সঃ) দু'হাত কেবলা মুখী করে কান কিংবা কাঁধ পর্যন্ত এ ভাবে উঠাতেন যেন সব আংগুল ছড়িয়ে যায়। আবু হামীদ আস্ সা'দী ও তাঁর সংগীরা কাঁধ পর্যন্ত উঠানোর কথা বলেছেন। ইবনে উমর (রাঃ) ও তাই বলেছেন। ওয়ায়েল বিন হাজর বলেছেন, কানের লতি পর্যন্ত তুলতেন। বারা বলেছেন, কানের কাছাছাছি নিতেন। কেউ বলেছেন, এর ভেতরে যে কোনটি করার এখতিয়ার দেয়া হয়েছে। একদল বলেছেন, এ ব্যাপারে ঊর্ধে কানের লতি পর্যন্ত তোলা চলবে। তবে কাঁধ পর্যন্ত তুললেও চলবে। ফলে, আর কোন মতভেদ থাকেনা।

তারপর ডান হাত বাম হাতের ওপরে বাঁধতেন। কখনও তিনি এই বলে নামায শুরু করতেন :

اللهم باعد بيني و بين خطاياى كما باعدت بين المشرق و المغرب اللهم اغسلني من خطاياى بالماء و الثلج و البرد اللهم نقني من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس .

"হে আল্লাহ ! আমার থেকে স্খলন পতন পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যকার ব্যাবধানের সমান দূরে সরিয়ে দাও। হে খোদা ! আমার থেকে অন্যায় ও পাপ পানি, বরফ ও ঠান্ডা বস্তু দ্বারা ঠিক সাদা কাপড়ের ময়লা দূর করার মতই ধুয়ে মুছে দাও।"

কখনও বলতেন ঃ

انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا
من المشركين - ان صلواتی ونسكی ومحیای ومماتی لله رب العالمین
لا شریك له وبه ذالك امرت وانا اول المسلمین ○

"আমি পৃথিবী ও আকাশ মন্ডলের স্রষ্টার দিকেই সর্বান্তকরণে লক্ষ্য নিবিষ্ট করলাম। আর নিশ্চয়ই আমি মুশরিক নই। নিঃসন্দেহে আমার নামায, কুরবানী, জীবন ও মরণ সবই খোদার জন্য। এটাই আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি আনুগত্যের ব্যাপারে প্রথম।"

কখন আবার পড়তেন ঃ

اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربی وانا عبدك ظلمت
نفسی واعترفت بذنبی فاغفرلی ذنوبی جمیعها انه لا یغفر الذنوب
الا انت واهدنی لاحسن الاخلاق لا یهدی لاحسنها الا انت واصرف
عنی سیئتی الا خلاق لا یصرف عنی سیئتها الا انت لبیك وسعدیك
والخیر كله بیدیك والشر لیس الیك انا بك والیك تبارکت
ربنا وتعالیت استغفرك واتوب الیك ○

"হে আল্লাহ ! তুমিই মালিক। তুমি ছাড়া কোন প্রভু নেই। তুমি আমার প্রভু ও আমি তোমার দাস। আমি আমার ওপর জুলুম করেছি। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। তাই আমার সব পাপ মাফ কর। তুমি ছাড়া পাপ মাফ করার আর কেউ নেই। আমাকে উত্তম চরিত্রের পথ নির্দেশ কর। তুমি ছাড়া কেউ তা পারে না। আমার চারিত্রিক ত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি ছাড়া কেউ তা করবে না। হে প্রভু। তোমার কাছে হাজির, তোমার মাহাত্ম্য গাই। সব কল্যাণ তোমার হাতে। অকল্যাণের দায়িত্ব তোমার নয়। আমরা তোমারই ও তোমার কাছেই ফিরব। হে আমাদের প্রভু ! তুমি কল্যাণময় ও মহান। তোমার কাছেই ক্ষমা চাই, আর তোমার দিকেই রুজু করি।"

এ দোআটি তিনি সাধারণত রাত জেগে নফল ইবাদতের শুরুতে পড়তেন। কখন আবার এ দোআও পড়তেন ঃ

اللهم رب جبرائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم
الغیب والشهادة انت تحكم بین عبادك فیما كانوا فیه یختلفون ○
اهدنی لما اختلفت فیه من الحق باذنك انك تهدی من تشاء
الی صراط مستقیم ○

"হে আল্লাহ! হে জিব্রাঈল ও মিকাঈলের প্রতিপালক! হে আকাশ ও ভূমন্ডলের স্রষ্টা! হে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য সব কিছুরই সর্বজ্ঞ প্রভু! তুমিই তোমার বান্দাদের বিরোধ-মতভেদের মীমাংসা দাতা। সত্যের ব্যাপারে আমি যে মতবিরোধের সম্মুখীন, তার মীমাংসা কর। তুমিই যাকে ইচ্ছা সরল পথ দেখাও।"

কখনও এরূপ দো'আ পড়তেন ঃ

اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ০

"হে আল্লাহ! সব প্রশংসাই তোমার জন্য। তুমি নভ ও ভূমন্ডলের, এমন কি তার ভেতরকার সব কিছুরই আলোর উৎস।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ হযরত (সঃ) তাকবীর বলে নিয়ে তারপর এ দো'আ পড়তেন।

কখনও তিনি তিনবার আল্লাহু আকবার, তিনবার তাসবীহ, তিনবার হামদ ও তা'উজ পড়তেন। কখনও এগুলো দশবার ও তার সাথে তাহলীল দশবার, ইস্তিগফার দশবার ও দশবার 'আল্লাহুম্মাহ্দিনী ওয়ারযুকনী' এবং দশবার 'আল্লাহুম্মা আউজু বিকা মিনদামায়কি মাকামি ইয়াওমিল কিয়ামাহ' পড়তেন।

এ সব দো'আই হযরত (সঃ) পড়তেন বলে সঠিকভাবে প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) নামাযের শুরু এ দো'আটি দিয়ে করতেন ঃ

سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك
ولا اله غيرك ০

আলী ইবনে আলী রিফাঈ থেকে এ বর্ণনাটি সুনানে উধৃত হয়েছে। এরূপ একটি হাদীছ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমর (রাঃ) হযরতের (সঃ) নামাযের স্থানে দাঁড়িয়ে এ দো'আটি জোরে জোরে পড়ে নামায শুরু করতেন যেন সবাই ভালভাবে তা জানতে পায়।

ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, আমি এ ব্যাপারে উমরের (রাঃ) অনুসারী। কিন্তু, কেউ যদি উল্লিখিত দো'আ গুলোর যে কোনটি দিয়ে নামায শুরু করে, তাও বৈধ হবে।

ইমাম আহমদ দশটি কারণে এ দো'আটি পসন্দ করেছেন। অন্যত্র তার কিছুটা বলা হয়েছে। তার ভেতরে একটি হচ্ছে, সাহাবাদের অবগতির জন্যেই হযরত উমর (রাঃ) এটা জোরে পড়েছেন। দ্বিতীয়, এর ভেতরে কুরআনের পরেই যে কালামের স্থান, তা রয়েছে। তা হচ্ছে, সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদু লিল্লাহি ওয়ালাইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার। তৃতীয়, এ দো'আর ভেতরে তাকবীরে তাহরীমাও রয়েছে। চতুর্থ, প্রারম্ভ খোদার খালেস প্রশংসার দ্বারা হওয়া উচিত। আর

তা দো'আ থেকেও উত্তম। তাই সূরা ইখলাসকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলা হয়েছে। কারণ, এতে খোদার খালেস গুণ ও প্রশংসা রয়েছে। ফলে এ দো'আটিকেও কুরআনের বাণীর পরেই স্থান দেয়া হয়েছে। নামায আরম্ভের জন্যে যে ক'টি দো'আ রয়েছে, স্বভাবতই তার ভেতরে এটি উত্তম। পঞ্চম, অন্যান্য প্রারম্ভিক দো'আগুলো নফল ও ফরয সব নামাযেই প্রযোজ্য, আর এ দো'আটি উমর (রাঃ) ফরয নামাযে পড়েই শুনিয়েছেন। ষষ্ঠ, এ প্রারম্ভিক দো'আটি খোদার প্রশংসার জন্যে এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, তাতে প্রতিটি গুণের পরিপূর্ণতা প্রকাশ পায়। সপ্তম, 'ইন্নি ওয়াজ-জাহতু' দিয়ে আরম্ভ করায় তাতে কেবল বান্দার বন্দেগীর আর প্রভু ও বান্দার পার্থক্যের খবর প্রকাশ পায়। যাঁরা এটি গ্রহণ করেছেন, তাঁরা একটি অসম্পূর্ণ হাদীছ থেকে নিয়েছেন। সে হাদীছের বাকী অংশ তাঁরা ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ যাঁরা 'সুবহানাকা' দ্বারা আরম্ভ করেন তাদের সে অসম্পূর্ণতা নেই।

উপরোক্ত দো'আ পড়ে হযরত (সঃ) তাঊজ ও তাসমিয়াহ শেষ করে সূরা ফাতিহা শুরু করতেন এবং বিসমিল্লাহ সহ কখনও তা জোরে, কখনও আস্তে পড়তেন। কিন্তু বেশীর ভাগ জোরে পড়তেন। তবে এটা নিশ্চিত যে, ঘরে কি প্রবাসে কোথাও তিনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেই জোরে পড়তেন না। তা হলে খুলাফায়ে রাশেদীন, অধিকাংশ সাহাবী, বিশেষ করে মদীনাবাসির কাছে তা গোপন থাকতনা। তাই সেটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার।

হযরতের কিরাআত টানা ছিল। প্রতি আয়াত শেষে থামতেন। তাঁর আওয়াজও শেষ অক্ষরে দীর্ঘ হত। সূরা ফাতিহা শেষ করে 'আমীন' বলতেন। যদি কিরাআত জোরে পড়তেন, 'আমীনও' জোরে বলতেন। মুক্তাদীরা পেছন থেকে তদ্রূপ বলত।

নামাযে দু'জায়গায় তিনি চুপ হতেন। এক, তাকবীর ও কিরাআতের মাঝে। এ সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁকে প্রশ্ন করেও জেনেছেন। দ্বিতীয় স্থানটি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বর্ণিত আছে, সূরা ফাতিহার পরে চুপ হতেন। আরেক দল বলেন, কিরাআতের পর ও রুকু'র আগে। একদল বলেন, প্রথমটি ছাড়াই দু'জায়গায় চুপ থাকতেন। তাহলে তিন জায়গায় চুপ থাকা হয়। আদপে 'সিক্তা' তিনি দু'জায়গায়ই করতেন। তৃতীয়টির হয়ত কোন কারণ ঘটেছিল। হয়ত মানসিক ইতস্ততার জন্যে বিরতি দেখা দিয়েছিল। তাই কিরাআত শেষ হবার সংগে সংগেই রুকু'তে যাননি। দ্বিতীয়ত, মুক্তাদির কিরাআত শেষ হবার সুযোগদানের জন্যেও তা হতে পারে। তৃতীয়ত, কিছুটা জিরিয়ে নেয়ার জন্যেও হতে পারে। তাই এটা খুবই স্বল্প সময়ের জন্যে হয়। যারা এটার উল্লেখ করেননি, সংক্ষেপনের জন্যেই করেননি। যারা করেছেন, তৃতীয় 'সিক্তা' নাম দিয়েছেন। সুতরাং রিওয়ায়েত দুটোয় বিরোধ থাকছেনা। এটাই এক্ষেত্রে স্পষ্টতর অভিমত।

যারা দুটো বিরতির কথা বলেন, তারা সামারা, উবাই বিন কা'ব, ইমরান বিন হাসীনের সহীহ রিওয়ায়েত থেকে দলীল নিয়ে থাকেন। আবু হাতিম তাঁর 'সহীহ' সংকলনের ভেতরে এগুলো

উধৃত করেছেন। সামারা বলতে সামারা বিন জুন্দুব। তিনি বলেন : আমি স্মরণ রেখেছি, রসূল (সঃ) তাকবীরে তাহরীমার পরে ও সূরা ফাতিহার পরে বিরাম নিতেন। অন্য ধরনের বর্ণনায় মোটামুটিভাবে কিরাআতের পরে বিরতির কথা বলা হয়েছে। অথচ প্রথম রিওয়ায়েতে সুস্পষ্টভাবে সূরা ফাতিহার কথা বলা হয়েছে। তাই এটা পরবর্তী মোটামুটি বর্ণনার ব্যাখ্যা স্বরূপ ও তা থেকে সুস্পষ্ট।

এ জন্যেই আবু সালমা বিন আবদুর রহমান বলেন ঃ ইমামের জন্যে 'সিক্তা' দুটি। একটি নামাযের প্রারম্ভে ও দ্বিতীয়টি সূরা ফাতিহার পরে। কাতাদাহ সামারার হাদীছের এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হযরত উমর (রাঃ) এ হাদীছ গ্রহণ করতে অসম্মত হন। তিনি বলেন, আমাদের মনে পড়ে এক সিক্তা। তাই তিনি মদীনার উবাই বিন কা'বের কাছে জানতে চেয়ে লিখলেন। তিনি জবাবে সামারার স্মৃতিশক্তিকেই সমর্থন জানান। সাঈদ বলেন ঃ আমরা কাতাদার কাছে সিক্তার স্থান দু'টো সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। তিনি জবাব দিয়েছেন—"যখন নামায শুরু করবে এবং যখন কিরাআত শেষ করবে। অর্থাৎ 'ওলাদ দাল্লীন' বলবে।" আর তিনি অন্য কিরাআতের পরে বিরতির কথা শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রে সামারার হাদীছই দলীল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

হযরত (সঃ) যখন ফাতিহা পাঠ শেষ করতেন, অন্য সূরা শুরু করতেন। কখনও লম্বা এবং কখনও বিশেষ কারণে ছোট কিরাআত পড়তেন। হোক তা প্রবাসে কিংবা ঘরে। বেশীর ভাগ মাঝা-মাঝি ধরনের কিরাআত পড়তেন। ফজরের নামাযে প্রায় ষাট থেকে একশ আয়াত পড়তেন। কখনও সূরা 'কাফ' কখনও সূরা 'রূম' ও কখনও সূরা 'ইজাশ শামছু কুওয়িরাত' কখনও উভয় রাকআত সূরা 'ইজা যুলযিলাতুল আরদু' এবং সফরে 'কুল আউজুবিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউজু বিরাব্বিন্নাস' দিয়ে পড়তেন। কখনও তিনি সূরা মু'মিনীন দিয়ে শুরু করে প্রথম রাকআতে 'মূসা ও হারূণ' এর উল্লেখ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় রাকআতে অবশিষ্ট অংশ পড়তেন।

জুম'আর দিনে তিনি 'আলিফ লাম-মীম তানযীলুস্ সিজদা' ও 'হাল আতা আলাল ইনসান' সূরা দুটি পুরোপুরি পড়তেন। অধিকাংশ লোক যেমন আজকাল আংশিক সূরা পড়ে থাকেন, তা করতেন না। আর জুমআর উভয় রাকআত শুধুমাত্র সূরা সিজদার দ্বারা আদায় করার পদ্ধতি সুন্নাতের পরিপন্থী। যাঁরা সূরা সিজদার জন্যে জুমআর দিনকে মর্যাদাবান ভাবে, তারা গন্ড মূর্খ। এ ভ্রান্তি দূর করার জন্যই কোন কোন ইমাম জুমআর দিনে সূরা সিজদা পাঠ মাকরূহ বলেন। রসূল (সঃ) উল্লেখিত সূরা দু'টো এ জন্যে পড়তেন যে, তার ভেতরে মানুষের প্রারম্ভ, পরিণতি, আদম সৃষ্টি, জান্নাত-জাহান্নামে প্রবেশ এবং জুমআর দিনে যা কিছু হয়েছে ও হবে সে সবের উল্লেখ রয়েছে। তাই সে দিন ফজরে তিনি উম্মতদের দিনটিতে অনুষ্ঠিত সব কিছুর স্মরণ করিয়ে দিতেন। এ জন্যেই জুমআ ও ঈদের বড় বড় সমাবেশে তিনি

এ ধরনের সূরা পড়তেন। কখনও এরূপ সমাবেশে সূরা 'ক্বাফ', 'ইকতারাবা', 'সাফ' ও 'গাশিয়া' পড়তেন।

জুহর নামাযেও মাঝে মাঝে তিনি দীর্ঘ কিরাআত পড়তেন। আবু সাঈদ বলেন : হযরত (সঃ) জুহর নামাযে দাড়াতেন। কোন মুসল্লী পায়খানা প্রস্রাব সেরে ওযু করে তারপর এসেও হযরতকে পয়লা রাকআতে পেতেন। এ বর্ণনা মুসলিমে পাই।

এ নামাযে তিনি কখনও ,আলিফ লাম মীম তানযীল' কখনও 'সাব্বিহিসমা' বা 'ওয়াল্লাইলে' কখনও 'ওয়াস সামাঈ জাতিল বুরুজ' বা 'ওয়াত্ তারিক' পড়তেন।

আসর নামাযে তিনি জুহরের লম্বা কিরাআতের অর্ধেক পরিমাণ পড়তেন। তার সমান পড়তেন যদি জুহরে ছোট কিরাআত পড়া হত।

মাগরিবে আজকের মানুষ যা করছে, তিনি তাঁর বিপরীতই করতেন। তাতে তিনি সূরা আ'রাফ দুরাকাআতে ভাগ করে পড়তেন। কখনও 'তুর' বা 'মুরসালাত' পড়তেন। আবু উমর বিন আবদুল বার বলেন : নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মাগরিবে তিনি 'আলিফ লাম মীম সোয়াদ' 'আস সাফফাত' 'হা মীম দুখান' 'সাব্বিহিসমা' রাব্বিকা 'ওয়াত্তীন' 'ফালাক' 'নাস' ও 'মুরসালাত' সূরা পড়তেন। মাগরিবে সাধারণত ছোট সূরাগুলো পড়তেন। এ সব সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো সহীহ ও মাশহুর। কিন্তু, সর্বদাই ছোট সূরা পাঠ মারোয়ান বিন হাকামের কাজ। তাই যায়েদ বিন ছাবিত সেটা অস্বীকার করেছেন।

মালিক বলেন : তোমরা সর্বদা ছোট সূরা পড়। অথচ আমি রসূলকে (সঃ) মাগরিবে লম্বা দুটি সূরার একটি পড়তে দেখেছি। আর তা হচ্ছে, সূরা আ'রাফ। আহলে সুনান হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন।

ইমাম নাসায়ী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : নবী (সঃ) মাগরিবের দু'রাকাআতে সূরা আ'রাফ ভাগ করে পড়তেন। তাই ছোট সূরাই সব সময়ে পড়া কিংবা ছোট ছোট আয়াত বাঁধা নিয়মে পড়া সুন্নত পরিপন্থী কাজ। এ কাজ হচ্ছে মারোয়ান ইবনুল হাকামের।

ইশার নামাযে তিনি সূরা 'তীন' পড়তেন। মা'আজ (রাঃ) তাঁর সাথে ইশা পড়তে গিয়ে 'ওয়াশ শামছি' সাব্বিহিসমা' ও 'ওয়াল্লাইল' ইত্যাদি সূরা পড়তে শুনেছেন। তবে মা'আজকে হযরত (সঃ) ইশার নামাযে সূরা বাকারা পড়তে নিষেধ করেছেন। একবার মা'আজ (রাঃ) হযরতের (সঃ) সাথে নামায পড়ে শেষে বণু আমর বিন আওফ গোত্রের কাছে গেলেন। সেখানকার লোকদের ঈশার নামায পড়ালেন এবং তাতে সূরা বাকারা পড়লেন। সে জন্যে হযরত (সঃ) তাঁকে ধমক দিয়ে বললেন : হে মা'আজ! তুমি কি ফ্যাসাদ সৃষ্টিকারী?

এ কথাটি নিয়েই বিরুদ্ধ মতের সমালোচকরা লেগে যান। অথচ এর আগে পরে কি রয়েছে না রয়েছে, তা দেখেন না।

জুমআর নামাযে হযরত (সঃ) সূরা 'জুমআ' ও 'মুনাফিকীন' পুরোপুরি পড়তেন। 'সাব্বিহিসমা' ও 'গাশিয়া' সূরাও পড়তেন। কিন্তু প্রথম সূরা দুটির 'ইয়া আইওহাল্লাজীনা আমানু' থেকে শেষাংশ পড়ে নামায সংক্ষেপ করতেন বলে কোন প্রমাণ নেই। আর তা তাঁর সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত কাজ।

দুঈদে সূরা 'ক্বাফ ও ইকতারাবাত' অথা 'সাব্বিহিসমা' ও 'গাশিয়া'ই পুরোপুরি পড়তেন। ইন্তেকাল পর্যন্ত এটা অব্যাহত রেখেছেন।

খুলাফায়ে রাশেদীন পরে এগুলো অনুসরণ করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ফজরে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সূরা বাকারার যতখানি সম্ভব পড়তেন। মুক্তাদিরা একদিন বললেন ঃ হে রসূলের প্রতিনিধি! সূর্যোদয়ের যে উপক্রম দেখা দেয়। তিনি জবাব দিলেন ঃ আমরা সে ব্যাপারে উদাসীন নই। হযরত উমর (রাঃ) ফজরে সূরা 'ইউসুফ' ও সূরা 'নহল' অথবা সূরা 'হুদ' ও 'বণী ইসরাঈল' এবং তদনুরূপ কোন বড় সূরা পড়তেন। যদি হযরত (সঃ) লম্বা কিরাআত পরে বর্জন করতেন তা খুলাফায়ে রাশেদীনের কাছে গোপন থাকত না। তাঁদের সমালোচক সাহাবীরাও তা জানতে পেতেন। তবে সহীহ মুসলিমের এক হাদীছে জাবির বিন সামারা বলেন ঃ 'নবী (সঃ) ফজরে' ক্বাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ 'সূরা পড়তেন এবং তা তাঁর নামায সংক্ষেপণ নীতির পর থেকে। এখানে 'পর থেকে' বলতে ফজরের পর থেকে অন্যান্য ওয়াক্ত বুঝানো হয়েছে। উম্মে ফজলের বক্তব্য থেকে এর সমর্থন মিলে। তিনি ইবনে আব্বাসকে 'ওয়াল মুরসালাত' পড়তে শুনে বললেন ঃ হে বৎস! তুমি আমাকে বলেছিলে, এ সূরার কিরাআত গুলো তুমি হযরত (সঃ) থেকে শেষবারের মত মাগরিবের নামাযে শুনেছ। আর তা ছিল তাঁর শেষ জীবনের কাজ।

তা ছাড়া সামারা যে 'পর থেকে' বলেছেন, তাতে সংশ্লিষ্ট শব্দটি উহ্য আছে। আর উহ্য শব্দ কেবল বাক্যের ধরন ধারণ ও আকার-ইংগিত থেকেই বুঝতে হয়। যেহেতু সবাই জানে যে, 'পর থেকে' বলতে ফজরের পর থেকেই বুঝায়, তাই 'ফজর' শব্দটি উহ্য রাখা হয়েছে। আর এ থেকে যদি সব নামাযের সংক্ষিপ্তকরণ বুঝা যেত, তা অবশ্যই খুলাফায়ে রাশেদীনের কাছে গোপন থাকত না। তাঁরা তখন এটাকে 'নাসিখ' জেনেও 'মনসুখ' (বর্জিত) নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রসূল (সঃ) যে সংক্ষেপণের উপদেশ দিয়েছেন এবং আনাস (রাঃ) যে বলেছেন, রসূল (সঃ) নামাযের ক্ষেত্রে সংক্ষেপণ নীতির অনুসারী ছিলেন, এ সব তো তিনি যা করতেন, সে সম্পর্কেই বলা হয়েছে। এ নয় যে, তিনি মুক্তাদিদের মর্জী মোতাবেক নতুনভাবে সংক্ষিপ্তকরণ নীতি প্রবর্তন করেন। কারণ, এটা তো হতে পারেনা যে, তিনি একরূপ আদেশ করে নিজে আবার অন্যরূপ করতেন। এও হতে পারে যে, আগে তিনি অত্যন্ত বেশী লম্বা কিরাআত পড়তেন এবং পরে অপেক্ষাকৃত কম লম্বা কিরাআত পড়েছেন এবং হাকাম সেটাকেই হযরতের

(সঃ) স্থায়ী নীতি হিসেবে ধরে নিয়েছেন। তা থেকেই যত ঝগড়ার সৃষ্টি। ইমাম নাসায়ী ইবনে উমর (রাঃ) থেকে এর সমর্থনে একটি বর্ণনা উধৃত করেছেন। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ রসূল (সঃ) আমাদের নামায সংক্ষেপ করার আদেশ দিয়েছেন। তাই ইমাম হয়ে আমরা 'আস সাফফাত' সূরা পড়তাম। এটাই আমাদের প্রতি নির্দেশ ছিল।

নির্দিষ্ট সূরা পাঠ ঃ

হযরত (সঃ) কোন নামাযে বিশেষ কোন সূরা নির্দিষ্ট করে সর্বদা তা পড়তেন না। অবশ্য ঈদ ও জুমআয় সেরূপ পড়তেন। অন্যান্য নামায সম্পর্কে আবু দাউদে উধৃত এক হাদীছে আমর বিন শুয়ায়েব তাঁর পিতা এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে এ বর্ণনা দিয়েছেন ঃ হযরত (সঃ) ফরজ নামাযে না পড়েছেন এমন কোন ছোট বড় সূরা নেই।

হযরত (সঃ) সর্বদা পূর্ণ সূরা পড়তেন। কখনও এক এক রাকআতে আবার কখনও দু'রাক-আতে ভাগ করে। মাঝ থেকে কিরাআত পড়ার প্রমাণ নেই। এক রাকআতে দু'টি সূরা পড়-তেন তিনি নফল নামাযে, ফরজে পড়েছেন বলে কেউ বলেন না। ইবনে মাসউদের হাদীছে যে চার রাকআতে আট সূরার কথা বলা হয়েছে, তাতে ফরজে না নফলে তা কিছু বলা হয়নি। তাই তা অনিশ্চিত। আবু দাউদে যে এক ব্যক্তির এক বর্ণনায় এক সূরা দু'রাকআতে পড়ার কথা রয়েছে, তা ব্যতিক্রম। বর্ণনাকারীই সংশয় প্রকাশ করেছেন, তিনি তা ভুল করে না ইচ্ছা করে পড়েছেন তা বুঝতে পারেন নি।

রাকআতের তারতম্য ঃ

ফজর সহ প্রত্যেক নামাযেই তিনি দ্বিতীয় রাকআতের চেয়ে পয়লা রাকআত লম্বা করতেন। আর ফজর নামায অন্যান্য নামায থেকে লম্বা করতেন। কারণ, ফজরের কুরআন তিলাওয়াতের খোদা ও ফেরেশতারা শ্রোতা হন। কেউ বলেন, ফেরেশতারাই দিন রাত সর্বদা কুরআন তিলা-ওয়াতের সাক্ষী হয়ে থাকেন। আর এ দুটো মতের ভিত্তি হচ্ছে এ মতভেদের ওপরে যে, খোদা তাআলা পয়লা আসমানে কি ফজরের প্রাক্কাল পর্যন্ত থাকেন, না ফজর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত? দু'টি মতের সমর্থনেই দলীল আছে।

রাকআত ছোট-বড় করার বা পয়লা রাকআত লম্বা করার কারণের ভেতরে একটি হচ্ছে, কোন রাকআতে যদি ত্রুটি থাকে, তা শুধরে যাবে। দ্বিতীয়, আরামপ্রিয় মানুষ যেন প্রথম রাকআত লাভের সুযোগ পায়। তৃতীয়, তখনও হয়ত অনেকে জীবিকার ব্যবস্থা করেনি, তাই দ্বিতীয় রাক-আত ছোট করে তাড়াতাড়ি শেষ করা হত। তখন হয়ত এমন অবস্থা হত যে, মানুষের মন-মেজাজ ক্রমে ধৈর্য ও আকর্ষণ হারিয়ে চলত। তাতেও দ্বিতীয় রাকআত সংক্ষেপ করা হত। পক্ষান্তরে প্রথমই হল সবকিছুর ভিত্তি। তাই সে রাকআতের গুরুত্ব দেয়া হত এবং সে জন্যে দীর্ঘ সময়

ধরে আদায় করা হত। শরীআতের রহস্যের অনুসন্ধানীদের কাছে এ সব রহস্যই ধরা দিয়েছে। আল্লাহ মদদগার।

হযরত (সঃ) কিরাআত শেষ করে মনস্থির করার জন্যে একটু থেমে দু'হাত ওপরে তুলতেন এবং তাকবীর বলে রুকুতে যেয়ে দু'হাতে দু'হাটু জড়িয়ে রাখতেন। দু'হাত পাঁজর থেকে পৃথক করে রাখতেন। পিঠ সোজা রাখতেন। মাথা মাঝামাঝিভাবে নোয়ানো থাকত এবং পিঠ সোজা থাকত।

রুকুতে তিনি 'সুবহানা রাব্বিয়াল 'আজীম' কিংবা তার সাথে 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী' যোগ করে পড়তেন। তাঁর রুকু এরূপ লম্বা হত যে, আরামেই দশবার তাসবীহ পড়া যেত। সিজদায়ও তিনি তাই করতেন। তবে বারাআ বিন আযিবের হাদীছে যে হযরতের কিয়াম, রুকু, সিজদা, দু'রাকআতের মাঝে দাঁড়ানো ও বসার সময় প্রায়ই সমান ছিল বলে বলা হয়েছে এবং তা থেকে যে একদল হযরতের রুকু ও সিজদার সময়কে কিয়ামের সময়ের সমান বুঝে নিয়েছে, তার কোন ভিত্তি নেই। কারণ, এটা সবাই জানেন যে, হযরত (সঃ) ফজরের কিয়ামে প্রায় একশ আয়াত পড়তেন। তেমনি মাগরিবেও এক এক কিয়ামে সূরা আ'রাফ, 'তূর' 'মুরসালাত' ইত্যাদি পড়তেন। তাতে যে দীর্ঘ কিয়াম হয়, তত সময় নিয়ে কখনই তিনি রুকু বা সিজদা করতেন না। হযরত আনাসের (রাঃ) হাদীছেও রয়েছে। তিনি বলেন, এ যুবক (উমর ইবনে আব্দুল আযীয) ভিন্ন কাউকে হযরতের (সঃ) মতোন করে নামায পড়তে দেখিনি।' বর্ণনাকারী বলেনঃ আমি হযরত উমর বিন আব্দুল আযীযের রুকু ও সিজদার সময় পরিমাপ করে দেখেছি। তাতে দশবার তাসবীহ্ পড়া যেতে পারে মাত্র। এ ক্ষেত্রে বারাআ কি বলতে চেয়েছেন, তা খোদাই ভাল জানেন।

অবশ্য হযরতের (সঃ) নামাযে সমতা রক্ষিত হত। যদি তিনি লম্বা কিরাআত পড়তেন, রুকু ও সিজদা সেই অনুপাতে কিছুটা লম্বা করতেন এবং যখন কিরাআত ছোট করে নামায তাড়াতাড়ি শেষ করতেন, তখন রুকু সিজদাও সংক্ষিপ্ত হত। তাছাড়া মাঝে মাঝে তিনি রুকুও সিজদা কিয়ামের মতই লম্বা করতেন এবং তা রাত জেগে শুধু নফল নামায পড়ার সময়ে করতেন। চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নামাযেও প্রায় এরূপ করতেন। তিনি প্রায়ই নামাযে সমতা ও সামঞ্জস্য রাখার ওপরে জোর দিতেন।

রুকুতে তিনি কখনও 'সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ' পড়তেন। কখনও পড়তেন "আল্লাহুম্মা লাকা রাকআতুন ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামত্ খাশিআল লাকা সামঈ ওয়া বাসরী ওয়া মাখী ওয়া আজমী ওয়া আসবী।" এ সব অবশ্য তিনি রাত জেগে নফল নামাযে পড়তেন।

এরপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে মাথা তুলতেন এবং আবার দু'হাত ওপরে তুলতেন। এ তিন জায়গায়ই তাঁর 'রফএ য়্যাদাইন' সম্পর্কে রিওয়ায়েত পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে আশারায়ে মুবাশশারা সহ ত্রিশজন সাহাবীর বর্ণনা রয়েছে। এর বিপরীত কোন মতের প্রমাণ আদৌ মিলে না। বরং এটা তাঁর স্থায়ী অনুসৃত নীতি ছিল এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এতে অটল ছিলেন। এ সম্পর্কিত বারাআর হাদীছটি বিশুদ্ধ নয়।

ইবনে মাসউদের (রাঃ) দু'হাত তোলা বর্জন হযরতের (সঃ) জানা পদ্ধতির জন্যে নয়; তাঁর নামাযে তা বর্জন আলাদা ব্যাপার। 'রফএ য়্যাদাইনের' তা পরিপন্থী হয় না। তা তিনি দু'জনের মাঝে ইমাম হয়ে ওয়াকফ ও সিজদায় সমতার খাতিরে নেহাৎ অসুবিধার কারণেই করেন নি। তা ছাড়া এরূপ ক্ষেত্রে তিনি নিজের ঘরে নামায পড়তেন, আজান ও ইকামত ছাড়াই পড়তেন। সর্দারদের পেঁছতে বিলম্বের কারণে তিনি এরূপ করতেন। সুতরাং হাত তোলার পক্ষে এত বেশী সহীহ ও সুস্পষ্ট হাদীছের মোকাবিলায় তা তরক করার কি দলীল রয়েছে? খোদা সত্য বুঝায় তাওফীক দিন।

রুকু ও সিজদার পরে তিনি পিঠ সোজা করে দাঁড়াতেন ও বসতেন এবং বলতেনঃ এ ছাড়া নামায বৈধ হয়না। ইবনে খুযায়মা তাঁর সহীহ সংকলনে এ বর্ণনা উধৃত করেছেন। যখন তিনি রুকু থেকে দাঁড়াতেন 'রাববানা লাকাল হামদ' 'আল্লাহুম্মা ওয়া লাকাল হামদ' এবং 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ' এর যে কোন একটি পড়তেন। এ তিনটি বিশুদ্ধ রিওয়ায়েতে প্রমাণিত হয়। কিন্তু 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ' ভুল। এ কাজে তিনি রুকু ও সিজদায় সমান সময় লাগাতেন। এ সময়ে তিনি এরূপ দোআও পড়তেনঃ

سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء و المجد احق ما قال العبد و كلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد ۝

"আল্লাহ তাঁহার প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনেছেন। হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আসমান যমীনে যত প্রশংসা ধরে, এমনকি তার বাইরেও তুমি যেখানে চাও সেখানেও যা ঠাঁই পেতে পারে, তত প্রশংসারই তুমি যোগ্য। বান্দা যত প্রশংসা করতে পারে তার যোগ্য কেবল তুমিই। আমরা সবাই তোমার বান্দা। তুমি যাকে কিছু দিতে চাও তা ঠেকাবার কেউ নেই। যাকে তুমি দিতে না চাও, তাকে কেউ দিতে পারে না। কোন সম্পদশালী সম্পদের জোরে তোমার হাত থেকে বাঁচতে পারে না।"

আরও পড়তেনঃ

اللهم اغسلني من خطايا بالماء و الثلج و البرد و نقني

من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس
وباعد بيني وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب ○

"হে আল্লাহ ! পানি, বরফ ও শীতল বস্তু দ্বারা আমার পাপ ধুয়ে মুছে দাও। সাদা কাপড় যেভাবে ময়লা থেকে পরিস্কার করা হয়, আমাকে তেমনি পংকিলতা মুক্ত কর। পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে তুমি যে দূরত্ব সৃষ্টি করেছ, আমার ও পাপের মাঝে সেই দূরত্ব সৃষ্টি কর।"

এও সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি এ ভাবে রুকুর সমান সময় দাঁড়িয়ে 'লিরাব্বিয়াল হামদ' পড়তে থাকতেন। এটাও প্রমাণিত হয় যে, তিনি রুকু থেকে দাঁড়িয়ে খুব কম সময়ই থাকতেন। যা থেকে বলা হত, তিনি হয়ত ভুলে গেছেন।

মুসলিমে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ হযরত (সঃ) রুকু ও দু'সিজদার মাঝে এত কম অপেক্ষা করতেন যে, আমরা বিস্ময় প্রকাশ করতাম।

অবশ্য চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নামাযে তিনি এগুলো এত দীর্ঘ করতেন যে, কিয়াম, রুকু, সিজদা প্রায়ই সমান সময় নিত। এসব হযরত (সঃ) থেকে সঠিকভাবে জানা গেছে। কোন প্রকারে এর ব্যত্যয় ঘটতে পারেনা।

এখন বুখারীতে উধৃত বারাআ বিন হাযিবের হাদীছে যে সবগুলোয় সমান সময় নেয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে কিয়াম বলতে রুকুর পরের কিয়াম এবং বৈঠক বলতে দু'সিজদার মধ্যকার বৈঠক বুঝানো হয়েছে। ফলে এক হাদীছের সাথে অন্য হাদীছের বিরোধ থাকেনা। এক্ষণে এটা স্থির হল যে, যেই কিয়াম ও জলসা লম্বা করার কথা বলা হয়েছে, তা কিরাআত পাঠের কিয়াম ও তাশাহুদ পড়ার জলসা। এবং এ দু'টো অন্য সব আরকানের চাইতে দীর্ঘতরই হত। এটাই এ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট অভিমত।

আমাদের শায়েখ বলেন, এ রুকন দুটি বণু উমাইয়ার শাসকরা সংক্ষেপ করে দিয়েছেন। এটা তাঁদের মনগড়া বিদআত। তেমনি তারা তাকবীর পূর্ণ না করা, গরমে বিলম্বে নামায পড়া ও অন্যান্য নানারূপ বিদআত সৃষ্টি করেছেন। সে গুলোকেই তারা সুন্নত বলে চালিয়েছেন।

তারপর তিনি তাকবীর বলে সিজদায় যেতেন হাত না তুলেই। অবশ্য হাত তোলার রিওয়ায়েতও রয়েছে। হাফিজ মুহাম্মদ বিন হাযম (রঃ) সেটাকে সহীহ বলেছেন। সেটা তার অনুমান মাত্র। এটা বিশুদ্ধ নয় আদৌ। এ ধোকা বর্ণনাকারীর ভুলের জন্যে হয়েছে। যাঁরা সহীহ ভাবেন, তাঁদের কাছে বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

সিজদার পদ্ধতি ঃ

নবী (সঃ) সিজদায় গিয়ে প্রথমে হাটু ও পরে তার সামনে হাত রাখতেন। তারপর কপাল ও নাক স্থাপন করতেন। এটাই সহীহ রিওয়ায়েত। হযরত (সঃ) থেকে ওয়াএল বিন হাজার, তাঁর থেকে কুলায়েব, তাঁর থেকে আসিম ও তাঁর থেকে শরীফ এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

'রসূল (সঃ) সিজদায় যেতে আগে হাটু বিছাতেন ও সিজদা থেকে উঠতে গিয়ে আগে হাত তুলতেন।' এর বিপরীত তিনি করেছেন বলে প্রমাণ নেই। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে যে 'মারফূ' হাদীছে বলা হয়েছে, উটের মত সিজদায় যেয়োনা এবং হাটুর আগেই হাত রাখবে' এ সম্পর্কে খোদাই ভাল জানেন। তাতে রিওয়ায়েতটির ভেতরে পরস্পর বিরোধী কথা রয়েছে। কারণ, উটই আগে হাত বিছিয়ে তার পরে হাটু বিছায়। অথচ যারা রিওয়ায়েতটি ঠিক রাখতে চান, তাদের বক্তব্য হল, উটের হাটু পায়ে থাকে না, থাকে সামনের হাতে। তাই যখন সে শুতে যায়, আগে হাটুই পেতে নেয়।

এ জবাবটি কয়েক কারণে ভুল। প্রথম, উট শোবার সময়ে প্রথমে হাত দু'টোই বিছিয়ে নেয় এবং পা দুটো সোজাই থাকে। আবার উঠার সময়ে পা দু'টো আগে ওঠে এবং তখন হাত দু'টো মাটিতে থাকে। সুতরাং এরূপ করা থেকেই রসূল (সঃ) নিষেধ করেছেন। এবং সেটারই বিপরীত তিনি করেছেন। তিনি মাটিতে প্রথমে সেটাই রাখতেন, যেটা মাটির কাছাকাছি আগে যেত। আর আগে সেটাই মাটি থেকে তুলতেন, যেটা উঠতে গিয়ে স্বভাবতই আগে উপরে রয়েছে। সুতরাং প্রথমে তিনি হাটুই মাটিতে রাখতেন। তারপর হাত বিছাতেন। তারপর রাখতেন মাথা। তেমনি যখন উঠতেন, প্রথমে মাথা, তারপর হাত ও শেষে হাটু তুলতেন। আর এটাই উটের বিপরীত কাজ।

দ্বিতীয়, উটের হাতে হাটু থাকে, এটা নির্বোধের কথা। কোন ভাষাবিদ এ ব্যাখ্যা স্বীকার করেন না। পেছনের পায়ে হাটু থাকে। যদি কেউ হাতায় হাটুর কথা বলে ,তা বাড়িয়ে বলতে পারে মাত্র।

তৃতীয়, তারা যে ভাবে বলে থাকে, তিনি যদি তাই বলে থাকেন, তাহলে বলা উচিত ছিল, উটের মতই ভূমি সংলগ্ন হও। তখন তাদের মতলব সিদ্ধি হত। কারণ, উট প্রথমে হাত মাটিতে রাখে। আদপে, এ মাস'আলার রহস্য নিহিত রয়েছে উটের বিশ্রাম লাভের পদ্ধতির ভেতরে। এ প্রশ্নে ওয়াএল বিন হাজারের হাদীছই সঠিক। খোদা সর্বজ্ঞ। ব্যাপারটা আমার কাছে এরূপ মনে হয় যে, আবু হুরায়রার (রাঃ) হাদীছটির রিওয়ায়েতের বাক-বিন্যাসে গোলমাল হয়ে গেছে। আসল রিওয়ায়েত ঠিকই ছিল। রাবীদের বর্ণনায় এরূপ গোলমাল সেহরী সম্পর্কিত ইবনে উমরের (রাঃ) হাদীছেও দেখা দিয়েছে। সেখানে বিলালের স্থলে উম্মে মকতুম এবং উম্মে মকতুমের স্থলে বিলাল বলে দিয়েছে। তেমনি গোলমাল দেখা যায় 'লায়্যাযালু য়্যালকা ফীন্নারি' হাদীছটিতে। তাতে জান্নাতের স্থলে জাহান্নাম ও জাহান্নামের স্থলে জান্নাত বলা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আবু বকর বিন শায়বার রিওয়ায়েত প্রমাণ দিচ্ছে। তিনি বলেন—আমার কাছে মুহাম্মদ বিন ফোজায়েল আব্দুল্লাহ বিন সাঈদ থেকে, তিনি তাঁর বাপ থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল (সঃ) বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন সিজদা

করবে, হাতের আগেই হাটু বিছিয়ে তা শুরু করবে এবং উটের বিশ্রাম নেবার মত সিজদা করবে না। তেমনি সুনানে আছরামের রিওয়ায়েত এবং খুযায়মার 'সহীহ' সংকলনে অনুরূপ হাদীছই রয়েছে। সুতরাং আবু হুরায়রার পূর্ব বর্ণনা যদি ঠিকও থেকে থাকত, তথাপি তা তাঁর পরবর্তী বর্ণনার দ্বারা বাতিল (মানসুখ) হয়ে গেছে। 'আল মুগনী' সংকলিয়তা ও কয়েকজন হাদীছ বেত্তার এটাই মত। এ ছাড়াও হাদীছটিতে দুটি ত্রুটি রয়েছে। প্রথম, ইয়াহ্ইয়া বিন সালমা বিন ফোহাইল এরূপ নির্ভরযোগ্য রাবী নন, যার রিওয়ায়েত দলীল হতে পারে। ইমাম নাসায়ী তাকে বর্জনীয় (মাতরুক) ও ইবনে হাব্বান গ্রহণের অযোগ্য (মুনকার) বলেছেন। তাই তা দলীল হতে পারে না। ইবনে মুঈন তো কিছুই না বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয়, মাসআব বিন সা'দের বর্ণনাকে এক্ষেত্রে মাহফুজ (সুরক্ষিত বা যথাযথ) বলা যেতে পারে। তাতে সমন্বয় প্রয়াস দেখা যায়। তাতে বলা হয়েছে, আমরা সেরূপ করতাম বলে আমাদের আগে হাত বিছাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 'মুগনী' সংকলক আবু সাঈদ থেকে বিপরীত রিওয়ায়েত মিলে। তাতে বলা হয়েছে ঃ আমরা হাটুর আগেই হাত রাখতাম এবং পরে আমাদের আগে হাটু রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে নামের গোলমাল। হাটু ও হাতের ভেতরে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস এতে প্রকট। বর্ণনায় তাই তারতম্য।

মোট কথা, আবু হুরায়রার প্রথম হাদীছটিকে বুখারী, তিরমিজী ও দারে কুতনী ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। ইমাম বুখারী বলেছেন, মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসান অনুসরণ যোগ্য নয়। এবং আসমা আবু্য যানাদের সন্তান কিনা তাও জানিনা। ইমাম তিরমিজি বলেছেন ঃ হাদীছটি গরীব। এ ছাড়া আবু্য যানাদের হাদীছটি আর কোনভাবে জানিনা। দারে কুতনী প্রণেতা বলেন, দুরাওয়ার্দী থেকে এটা 'মুফরাদ' হয়ে এসেছে। তাই আবি হাতিম 'মুনকার' বলেন।

স্থূল কথা, এ ধরনের যত বর্ণনা পাওয়া যায় তা একদিকে যেমন রাবীর দিক থেকে গ্রহণের অযোগ্য, অন্যদিকে তেমনি বর্ণনায়ও সমতা রক্ষিত হয়নি। আর দু'দিক থেকেই সেগুলো মারফু হাদীছ বৈ নয়। পক্ষান্তরে সাহাবাদের সুরক্ষিত 'আছার' এর বিপরীতই বলে। যেমন, হযরত উমর (রাঃ) হাতের আগেই হাটু রাখতেন। তাঁর থেকে আবদুর রাযযাক ও ইবনে মানজার প্রমুখ এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাসউদ থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। তাহাভীও হযরত উমরের (রাঃ) এরূপ রীতির একটি বর্ণনা উধৃত করেছেন। ইবনে মাসউদও এরূপ করতেন বলে বর্ণিত আছে। ইবরাহীম নাখ'ঈ এ ব্যাপারে জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে জবাব দেন ঃ হাত আগে যে রাখে, হয় সে আহম্মক, নতুবা পাগল।

অবশ্য ইমাম নাসায়ী (রঃ) কুতায়বা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ বিন নাফে' থেকে, তিনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ, ইবনুল হাসান উলুভী থেকে, তিনি আবু্য যানাদ থেকে, তিনি আল আ'রাজ থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এ বর্ণনা শুনেছেন ঃ নবী (সঃ) বলেন, তোমাদের কেউ নামাযের ইচ্ছা করলে উটের মতই সিজদায় মাটি সংলগ্ন হয়ো।

Contents

আবু বকর বিন আবু দাউদ বলেনঃ এ সুন্নতটি শুধু মদীনাবাসীই অনুসরণ করে। তাদের জন্যে এ ব্যাপারে দু'টি সূত্র রয়েছে। একটি উপরে বলা হল। আরেকটি হল আব্দুল্লাহ নাফে' থেকে ও নাফে' ইবনে উমর (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা প্রদান করেছেন। আমি বলছিঃ আসবাগ ইবনুল ফারাজ দুরাওয়ার্দী থেকে, তিনি ওবায়দুল্লাহ থেকে, তিনি নাফে' এবং তিনি ইবনে উমর থেকে যে হাদীছ বর্ণনা করেন, তাতে হাটুর আগে হাত রাখার কথাই বলা হয়েছে। তাঁরা বলতেনঃ নবী (সঃ) এরূপই করতেন। এ বর্ণনাটি হাকাম তাঁর 'মুস্তাদরাকে' মুহাম্মদ বিন সালমার মাধ্যমে দুরাওয়ার্দী থেকে নিয়েছেন। তিনি বলেনঃ ইমাম মুসলিমের আরোপিত শর্ত এতে মওজুদ রয়েছে। হাকামে (হিফজ বিন গিয়াছ, তিনি আসেমুল আহওয়ান এবং তিনি) আনাস (রাঃ) থেকে উধৃত এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ নবী (সঃ) যখন সিজদায় যেতেন, হাতের আগে হাটু মাটি স্পর্শ করত। হাকাম এতে বুখারী ও মুসলিম উভয়ের শর্ত রক্ষিত হয়েছে বলে মনে করেন এবং ত্রুটিহীন বলেন। আমি বলছিঃ আব্দুর রহমান বিন আবি হাতিম বলেনঃ আমি আব্বাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তিনি হাদীছটিকে সর্বতোভাবে 'মুনকার' বলেছেন। কারণ স্বরূপ বলেন—হিফজ বিন গিয়াছ থেকে রিওয়ায়েতটি আলা বিন ইসমাঈলুল আত্তারের মাধ্যমে পাওয়া গেছে। অথচ 'সিহা সিত্তার' কোথাও তার নামের উল্লেখ নেই।

ইবনুল মাঞ্জার বলেনঃ ধর্মবেত্তারা এ ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছতে পারেন নি। হাতের আগে যাঁরা হাটু স্থাপনের পক্ষপাতী তাঁরা হলেন উমর ইবনুল খাত্তাব, ইব্রাহিম নাখ'ঈ, মুসলিম বিন ইয়াসার, সুফিয়ান আছ ছাওরী, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ, ইসহাক, মুহাম্মদ, আবু ইউসুফ ও কুফা পন্থীগণ। অন্যদল হাটুর আগে হাত রাখার পক্ষপাতী। তাঁরা হলেন ইমাম মালিক ও আওযাঈ। তাঁরা বলেনঃ সমসাময়িকদের আমরা এ ভাবে করতে দেখেছি। ইবনে দাউদ বলেনঃ এটা হল হাদীছপন্থীদের মত। আমি বলবঃ ইমাম বায়হাকী আবু হুরায়রার (রাঃ) হাদীছটি অন্যভাবে বর্ণনা করেছেন। তা হল এইঃ 'তোমাদের কেউ যখন সিজদা করবে, উটের মত ভূমিতে লুটিয়ে পড়বেনা; বরং হাটুর আগে হাত রাখা চাই।' ইমাম বায়হাকী বলেনঃ যদি হাদীছটির বর্ণনা 'মাহফুজ' (অবিকৃত) হয়ে থাকে, তা হলে সিজদায় যেতে হাটুর আগে হাত রাখার দলীল হতে পারে। তবে ওয়াএল ইবনে হাজারের হাদীছটি কয়েকটি কারণে উত্তম।

এক॥ খাত্তাবী প্রমুখের মতে আবু হুরায়রার (রাঃ) হাদীছ থেকে এরূপ প্রমাণই পাওয়া যায়।

দুই॥ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে প্রাপ্ত হাদীছের বর্ণনায় তারতম্য রয়েছে। কখনও তাতে হাটুর আগে হাত, কখনও হাতের আগে হাটু এবং কখনও হাটুর ওপরে হাত রাখার কথা বলা হয়েছে।

তিন ॥ বুখারী, নাসাঈ, দারেকুতনী ও ইবনে হাব্বান প্রমুখ এটাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন।

চার ॥ একদল ধর্মবেত্তা এ রিওয়ায়েতটিকে 'মানসুখ' মনে করেন। ইবনুল মাঞ্জার বলেন, আমাদের একদল মনে করেন, হাটুর আগে হাত রাখার হুকুম বাতিল হয়ে গেছে।

পাঁচ ॥ রসূল (সঃ) যে নামাযে উটের মত ভূমিতে যেতে নিষেধ করেছেন, তার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষার খাতিরেই ওয়াএলের হাদীছ উত্তম।

ছয় ॥ সাহাবাদের 'আছার' বিশেষত হযরত উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, ইবনে মাসউদ প্রমুখের কার্যধারা ও বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। তারা কেউ আবু হুরায়রার (রাঃ) রিওয়ায়েত অনুসরণ করেননি। শুধু হযরত উমর (রাঃ) আবু হুরায়রার অন্যতম বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

সাত ॥ ওয়াএলের হাদীছের সমর্থনে ইবনে উমর ও আনাসের হাদীছ রয়েছে। কিন্তু আবু হুরায়রার হাদীছের সমর্থনে কোন হাদীছ নেই।

আট ॥ অধিকাংশ ইমাম ও উম্মত ওয়াএলের হাদীছের অনুসারী। শুধু মালিক ও আওযাঈ আবু হুরায়রার হাদীছের অনুসারী।

নয় ॥ ঘটনামূলক হাদীছ বর্ণনামূলক হাদীছের চাইতে সুরক্ষিত (স্মরণযোগ্য), সে হিসেবেও ওয়াএলের হাদীছ উত্তম।

দশ ॥ ওয়াএলের হাদীছে যে ঘটনার অর্থাৎ রসূলের (সঃ) কাজটির বর্ণনা রয়েছে, তা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর সে কাজ সর্বজন বিদিত। তাই এর ওপরেই হুকুম হতে পারে। পরিপন্থী মত এর প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে অক্ষম।

হযরত (সঃ) কপাল ও নাকে ভর করে সিজদা করতেন—পাগড়ীতে নয়। কোন সহীহ হাদীছে পাগড়ীর প্যাচে সিজদা করার প্রমাণ নেই। 'হাসান' হাদীছেও এর সমর্থন নেই। কিন্তু, আব্দুর রাযযাক তাঁর 'মুসান্নাফ' এ আবু হুরায়রার এক রিওয়ায়েত তুলেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ রসূল (সঃ) পাগড়ীর প্যাচের ওপরে সিজদা করেছেন। এ বর্ণনাটি আব্দুল্লাহ বিন মুহরাযের মাধ্যমে এসেছে। অথচ সে মাতরূক বা পরিত্যাজ্য। আবু আহমদ এ ধরনের এক বর্ণনা জাবির থেকে পেয়েছেন। তা পেয়েছেন আমর ইবনে শহর থেকে। তারা দু'জনই মাতরূক।

আবু দাউদ তাঁর 'মারাছীল' এ বর্ণনা করেন ঃ রসূল (সঃ) একদিন একজনকে মসজিদে কপালের ওপরে সিজদা দিতে দেখেন। তার কপাল জুড়ে পাগড়ী বাধা ছিল। রসূল (সঃ) তা সরিয়ে দেন।

রসূল (সঃ) বেশীর ভাগ মাটিতেই সিজদা করতেন। তা ছাড়া ভিজা মাটি, খেজুর আশের তাকিয়া, খেজুর পাতার চাটাই, শুকনো চামড়া ইত্যাদিতেও সিজদা করেছেন।

Contents

যখন তিনি সিজদা করতেন, কপাল ও নাক ভালভাবে মাটিতে ঠেকাতেন। হাত দু'টো পাঁজর থেকে দূরে রাখতেন যেন বগল দেখা যায়। আর মাটি থেকে এতটুকু দূরে থাকতেন যেন ছাগল ছানা তার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে। কাঁধ ও কান বরাবর হাত দু'টো রাখতেন।

সহীহ মুসলিমে বারাআর (রাঃ) এক হাদীছে আছে, রসূল (সঃ) বলেছেন, যখন সিজদায় যাবে, হাত মাটিতে রেখে কনুই তুলে রাখবে।

সিজদায় তিনি পিঠ সোজা রাখতেন। পায়ের আংগুলের মাথাগুলো কিবলামুখী করে নিতেন। এমন ভাবে হাতের আংগুলগুলো ছড়িয়ে দিতেন যেন ছড়ানো ও মিলানোর মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে।

ইবনে হাব্বানের সহীহ সংকলনে আছে ঃ যখন তিনি রুকূতে যেতেন, আংগুল ছড়িয়ে দিতেন এবং সিজদায় তা মিলিয়ে নিতেন।

সিজদায় তিনি 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়তেন এবং তা পড়তে আদেশ দেন। কখনও পড়তেন ঃ সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ। এ ছাড়া পড়তেন ঃ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা লাইলাহা ইল্লা আন্তা—ইন্নী আউজু বিরিদাকা মিন সাখীতকা ওয়া বিমুআফিফাতিকা মিন উকুবাতিকা ওয়া আউজু বিকা মিনকা লা উহ্সা ছানাউ আলাইকা আন্তা কামা উছনিয়াত আলা নাফসিকা।—আল্লাহুম্মা লাকা সাজিদতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু সাজিদা ওয়াজহিয়া লিল্লাজী খালাকাহু ওয়া সাওয়ারাহ ওয়া শাক্কা সামআহু ওয়া বাসারাহু তাবারাকাল্লাহু আহাসানুল খালিকীন—আল্লাহুম্মাগফিরলী জামবী কুল্লাহু দিক্কাহু ওয়া জিল্লাহু ওয়া আউয়ালাহু ওয়া আখিরাহু ওয়া আলানিয়াতাহু ওয়া সিরা'হু—আল্লাহুম্মাগফিরলী খাতিআতি ওয়া জুহলী ওয়া ইসরাফী ফী আমরী ওয়ামা আন্তা আলামু বিহী মিন্নী-আল্লাহুম্মাগফিরলী জদী ওয়া হাযলী ওয়া খাতঈ ওয়া আমাদী ওয়া কুল্লু জালিকা 'ইন্দী-আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামাত ওয়ামা আখখারাত ওয়ামা উসরিরাত ওয়ামা 'উ'লিনাত আন্তা ইলাহী লা ইলাহা ইল্লা আন্তা।—আল্লাহুম্মাজ 'আল ফী কালবী নূরান ওয়া ফী সামঈ নূরান ওয়া ফী বাসরী নূরান ওয়া আন ইয়ামিনী নূরান ওয়া 'আন শিমালী নূরান ওয়া ইমামী নূরান ওয়া খালফী নূরান ওয়া ফাওকী নূরান ওয়া তাহতী নূরান, ওয়াজ আল্লী নূরান ওয়াঅমুর বিল ইজতিহাদ ফীদ্ দোআই ফীস্ সুজুদী।

তিনি বলেন—'এগুলো তোমাদের জন্যে মকবুল দো'আ। এখন এগুলো কি যে কোন সিজদায় বেশী করে পড়ার, না কোন বিশেষ দো'আ উপলক্ষে সমবেত হলে সেখানের সিজদায় পড়ে এগুলো পড়বে, তা বলা হয়নি। এখন এ দু'টোর ভেতরে পার্থক্য নির্ণয় করে যেটা যখন ভাল বিবেচিত হয়, তাই করবে।

আদপে দো'আ দু'ধরনের। বিধিবদ্ধ দো'আ ও প্রশংসামূলক ঐচ্ছিক দো'আ। হযরত (সঃ) অধিকাংশ সিজদায়ই এ দু'ধরনের দো'আই পড়তেন বেশী করে। তাই সিজদায় উভয় দো'আই

পড়তে বলা হয়েছে। কবুলও দু'রকমে হয়ে থাকে। কোন প্রার্থী ইহকালে কিছু পেতে চেয়ে মুনাজাত করে অথবা শুধুমাত্র পারলৌকিক ছাওয়াবের আশায় প্রশংসামূলক দো'আ করে। এর প্রতিটি আবার দু'ধরনের হয়ে থাকে। খোদা বলেন :—

اجيب دعوة الداع اذا دعان

"যে আমাকে যখন ডাকে, তার ডাকে তক্ষুণি আমি সাড়া দেই।"

কিয়াম-সিজদার মর্যাদা বিচার :

কিয়াম ও সিজদার কোনটির মর্যাদা বেশী এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একদল কিয়ামকে প্রাধান্য দিয়েছেন কয়েকটি কারণে।

এক ।। যে রুকনে সর্বোত্তম জিক্র হয়, সেটাই সর্বোত্তম। কিয়ামে কুর্আন পড়া হয়।

দুই ।। খোদা বলেন : কুমু লিল্লাহি কানিতীন (খোদার আনুগত্যের খাতিরে কিয়াম কর)।

তিন ।। হযরত (সঃ) বলেন : উত্তম নামায হচ্ছে দীর্ঘ কিয়ামের নামায।

অন্য দল সিজদাকে প্রাধান্য দেন। তাঁদের দলীল হচ্ছে :

১। হযরতের (সঃ) বাণী 'খোদার কাছে সব চেয়ে প্রিয় বান্দা হল সিজদারত বান্দা।'

২। কোন বান্দা যখন সিজদা করে খোদা তাঁর মর্যাদা এক স্তর বাড়িয়ে দেন এবং তার পাপ কমিয়ে দেন। বর্ণনাটি মা'দান বিন আবি তালহা হযরতের (সঃ) গোলাম ছাওবান থেকে পেয়েছেন। তিনি তাকে কল্যাণকর হাদীছ শোনাতে বলেছিলেন। তাতে ছাওবান তাকে অধিক সিজদা করার আদেশ দিয়ে এ হাদীছটি শুনান। আবু দারদাও তাঁকে এরূপ বলেছেন।

৩। রসূলের (সঃ) কাছে রাব'আ বিন কা'বুল আসলামী জান্নাতে তার সান্নিধ্য লাভের আব্দার জানালে তিনি তাকে খুব করে সিজদা করতে বলেছেন।

৪। দুনিয়ার বুকে প্রথম সূরা অবতীর্ণ হল 'ইকরাঅ বিইসমি রাব্বিকাল্লাজী খালাকা'। আর সেই সূরাটি শেষ করা হয়েছে এই বলে : সিজদা কর এবং নৈকট্য অর্জন কর।

৫। সিজদায় মানুষ নিজের চরম বিনয় ও নীতি প্রকাশ করে। ভৃত্যের জন্যে প্রভুর সকাশে সেটাই সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশ। এভাবে সিজদায় প্রভুর নৈকট্য লাভ ঘটে।

৬। দাসত্বের রহস্যই নিহিত রয়েছে সিজদায়। কারণ দাসত্ব মানেই হল আনুগত্য ও নীতি স্বীকার।

আরেক দল বলেন, রাত্রে দীর্ঘ কিয়াম ও দিনে বেশী করে রুকু-সিজদা করা উত্তম। তাঁদের দলীল হল, রাতের নামাযকে কিয়াম নামেই আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন খোদা বলেন :

'কুমিল্লাইল।' (রাত্রে নামায পড়)। হযরত (সঃ) বলেন : 'কামা রামধানা ঈমানান ওয়া ইহ্তি-সাবান (রমযানের রাতে ঈমান ও নিষ্ঠার সাথে খুব করে নামায পড়)।

এ জন্যে 'কিয়ামুল লায়ল' বলা হয়, 'কিয়ামুন নাহার' বলা হয় না। তাঁরা আরও বলেন : এ জন্যেই হযরত (সঃ) নফল নামায রাতেই পড়তেন। কিন্তু, এগার বা তের রাকাআতের বেশী পড়তেন না। সাধারণত সে সব রাকআতে সূরা বাকারা, আল ইমরান ও নিসা পড়তেন। অথচ দিনের বেলায় এ ধরনের কিছু তিনি করেননি। বরং সুন্নত নামায সংক্ষেপ করতেন।

আমাদের শায়েখ বলেন, মর্যাদা দু'টোরই সমান। কিয়াম উত্তম এ জন্যে যে, উত্তম জিক্র অর্থাৎ কিরাআত রয়েছে তাতে। এবং সিজদা উত্তম এ জন্যে যে, উত্তম অবস্থার প্রকাশ রয়েছে তাতে। তাই সিজদার অবস্থা কিয়ামের অবস্থা থেকে এবং কিয়ামের জিকির সিজদার জিকির থেকে উত্তম।

রসূলে (সঃ) নামাযে সর্বত্র ভারসাম্য বজায় রাখতেন। কিয়াম লম্বা করলে রুকু ও সিজদা তদনুপাতে লম্বা করতেন। যেমন চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নামাযে ও রাতের নফল নামাযে। আবার যখন তিনি কিয়াম ছোট করতেন, রুকু-সিজদাও তদনুপাতে ছোট করতেন। এরূপ করতেন তিনি ফরয নামাযে। বারাআর হাদীছ এ কথাটাই প্রকাশ করেছে যে, তাঁর কিয়াম, রুকু, সিজদা ও সোজা হওয়া প্রায়ই পরস্পর সমান ছিল।

বৈঠক ও তাশাহহুদ :

তারপর হযরত (সঃ) তাকবীর বলে মাথা তুলতেন, 'রাফএ' য়্যাদায়েন' করতেন না। আর হাতের আগে তুলতেন মাথা। তারপর বাম পা পেতে তাতে বসতেন ও ডান পায়ে ঠেক দিতেন। নাসায়ী ইবনে উমর থেকে বর্ণনা করেন : নামাযে সুন্নত হল ডান পা দাঁড় করে তার অংগুলি-গুলো পশ্চিম মুখী করে রাখা এবং বাম পায়ের ওপরে বসা। এ ছাড়া আর কোনরূপ বসার কোন বর্ণনা জানা যায় না। হাত দু'টো তিনি দু'রানে রাখতেন। অর্থাৎ কনুই ভাগ রানে ও তালুর ভাগ হাটুতে রাখতেন। দু'আংগুল দিয়ে একটি চক্র এঁকে শাহাদত আংগুল তুলে সেটাকে নাড়া দিয়ে দোআ পড়তেন। এ বর্ণনাটি ওয়াএল বিন হাজরের।

আবু দাউদ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন : হযরত (সঃ) দোআ পাঠের সময়ে শাহাদত আংগুল দিয়ে ইশারা করতেন, নাড়াতেন না। আদপে এটা হচ্ছে বাড়াবাড়ি। এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে প্রশ্ন রয়েছে। ইমাম মুসলিম এর শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এবং তাঁর উধৃত হাদীছে এ অতিরিক্ত কথাটি নেই। তাতে বলা হয়েছে, হযরত (সঃ) যখন নামাযে বৈঠক দিতেন, বাম পা গীরা ও রানের মাঝে স্থাপন করতেন এবং ডান পায়ের ওপরে বসতেন। বাম হাত বাম রানে ও ডান হাত ডান রানে রাখতেন এবং শাহাদত আংগুল দিয়ে ইশারা করতেন।' আরেক কথা, আবু দাউদের হাদীছে সেরূপ যে নামাযের ভেতরেই

করতেন তা নেই। তা ছাড়া যদি তা নামাযেও হত, সেটা হত নিষেধমূলক। পক্ষান্তরে, ওয়াএলের হাদীছ আজ্ঞামূলক। তাই সেটাই অগ্রগণ্য। তা ছাড়া সে হাদীছটি সহীহ। আবূ হাতিম তাঁর 'সহীহ' সংকলনে তুলেছেন।

তারপর হযরত (সঃ) পড়তেন ঃ

اللهم اغفرلي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني ٥

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, মদদ কর, পথ দেখাও ও রিযিক দাও।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ) এরূপ বর্ণনা দান করেছেন। হুজায়ফা (রাঃ) এ দোআর উল্লেখ করেন ঃ রাব্বিগ্‌ফিরলী, রাব্বিগ্‌ফিরলী।

দু'সিজদার মধ্যকার এ বৈঠকে হযরত (সঃ) সিজদার সময়ই কাটাতেন। সব হাদীছেই তার প্রমাণ রয়েছে। 'সহীহ' সংকলনে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) দু'সিজদার মাঝে এতখানি বসতেন যে, আমরা বলতাম তিনি ভুলে গেছেন—এ সুন্নত সাহাবাদের পরবর্তী অধিকাংশ লোকই বর্জন করেছেন। এ জন্যেই হাতিম বলেন ঃ আনাস (রাঃ) যা করে গেছেন তোমাদের তা করতে দেখছিনা। তিনি দু'সিজদার মাঝে এতখানি সময় বসতেন যাতে আমরা বলাবলি করতাম, ভুলে গেছেন কিংবা শংসয়ে পড়েছেন। আর সেটাই সুন্নত। সুতরাং এর পরে যা হয়েছে, সেদিকে দৃষ্টি দেননি।

তারপর তিনি পা ও হাটুর ওপরে দু'রানে দু'হাত ভর করে দাঁড়াতেন। ওয়াএলের হাদীছেও আবূ হুরায়রা (রাঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি দু'হাত মাটিতে ভর করে উঠতেন না। মালিক ইবনুল হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন ঃ তিনি সোজাসুজি না বসে উঠতেন না। এটাকে বলা হয় আরামের বৈঠক। এ নিয়ে ফকীহদের ভেতরে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে যে, এটাকে নামাযের অন্যতম সুন্নত যা সবাই অনুসরণ করুক তিনি তা চাইতেন, না সুন্নত নয়; বরং তিনি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেরূপ করেছিলেন ?

এ ব্যাপারে দু'টো মত রয়েছে। দুটোই ইমাম আহমদ (রঃ) থেকে এসেছে। আল-খুল্লাল বলেন ঃ ইমাম আহমদ ইবনুল হুয়ায়রিছের আরাম বৈঠক মেনে নিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ আমাকে ইউসুফ বিন মূসা খবর দিয়েছেন যে, আবূ ইমামাকে সিজদা থেকে উঠা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জবাব দেন, রিফা'আর হাদীছ মোতাবেক তা হবে দু'পায়ে ভর করে। ইবনে আজলানের হাদীছও তার দলীল। সাহাবাদের যাঁরা নামায সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তাঁদের কেউই 'আরাম বৈঠকে'র উল্লেখ করেন নি। শুধু আবূ হুমায়েদ ও মালিক বিন হুয়ায়রাহ তার উল্লেখ করেছেন। যদি তা যথার্থই হযরতের (সঃ) স্থায়ী আমল হত, তা হলে নিশ্চয়ই নামায সম্পর্কে বর্ণনাকারী সাহাবীরা তা উল্লেখ করতেন। শুধু তিনি একবার করেছেন বলেই সেটা আমাদের রীতি-নীতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা। এটাই হচ্ছে এ প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব। কারণ, ব্যক্তিগত কারণে যা করা হয়, তা কেউ অনুসরণও করেনা, সেটা শর্তও হতে পারেনা।

Contents

সিজদা থেকে দাঁড়িয়েই তিনি সংগে সংগে কিরআত শুরু করতেন। প্রথম রাকআতের মত কিরাআত আরম্ভের আগে খানিক চুপ থাকতেন না। ফিকাহবিদদের ভেতরে এই মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল যে, এখানে 'তা'উজ' পড়তে হবে কিনা। অথচ এটা প্রারম্ভ নয়। এখানেও দু'টি মত রয়েছে। দু'টোই ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর একদল অনুগামী বলেছেন, যদি প্রতি রাকআতে নতুন সূরা পড়া হয়, তা হলে নতুনভাবে 'আউজু' পড়তে হবে, অন্যথায় নয়। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, নামাযের প্রারম্ভ একটাই। তাই একবার তা'উজই যথেষ্ট। সহীহ হাদীছ থেকেই এটা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। যেমন ঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন—নবী (সঃ) যখন দ্বিতীয় রাকআতে দাঁড়াতেন, সংগে সংগে কিরাআত শুরু করতেন, মাঝখানে থামতেন না।

এটা ঠিক যে, প্রারম্ভ একবারই যথেষ্ট। কারণ, চুপ থেকে দু'কিরাআতের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি ঠিক নয়। জিক্‌র যদিও কিরাআত নয়, তথাপি কিরাআতের মতই। তাতে অন্তরায় সৃষ্টি হয় না। যেমন তাকবীর, তাহমীদ, তাসবীহ, তাহলীল ও দরূদ ইত্যাদি।

হযরত (সঃ) দ্বিতীয় রাকআত শুধু চারটি ব্যাপ্যার ছাড়া প্রথম রাকআতের মতই পড়তেন। সে চারটি হল—কিছুক্ষণ চুপ থাকা, প্রারম্ভিক জিক্‌র ও নিয়ত পাঠ, তাকবীরে তাহরীমা ও রাকআতের দৈর্ঘ্য।

যখন তিনি তাশাহহুদের জন্যে বসতেন, দু'হাত দু'রানে রাখতেন। শাহাদত আংগুল দিয়ে ইশারা করতেন। পুরোপুরি দাঁড় না করিয়ে শুধু নাড়তেন। দু'টি আংগুল দিয়ে একটি চক্র গড়তেন। তারপর শাহাদত আংগুল তুলে সে দিকে দৃষ্টি রেখে দো'আ করতেন। তখন বাম হাত বাম রানে থাকত এবং তার ওপরে ভর রাখতেন।

দু'সিজদার মধ্যকার বৈঠক সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। এখানেও সেরূপ বসতেন। আর মুসলিমে ইবনে জুবায়রের বর্ণনায় যে, বাম পা রান ও গীরার মাঝামাঝি রেখে ডান পা বিছিয়ে পেছনে বসার কথা বলা হয়েছে, তা শেষ তাশাহহুদের কথা। পরে তা বলা হবে। হযরত (সঃ) থেকে যে দু'ধরনের বৈঠক বর্ণিত হয়েছে, সেটা তার অন্যতম।

সহীহদ্বয়ের ভেতরে আবু হুমায়দের হাদীছে বলা হয়েছে, দ্বিতীয় রাকআতের পরে তিনি যখন বসতেন, বাম পায়ে বসে ডান পা খাড়া রাখতেন এবং শেষ রাকআতে যখন বসতেন, বাম পা এগিয়ে নিয়ে ডান পা দাঁড় করিয়ে পেছনে ভর করে বসতেন।

দেখা যাচ্ছে, আবু হুমায়েদ ডান পা দাঁড় করানোর ও ইবনে যুবায়ের তা বিছানোর কথা বলেছেন। কিন্তু এ কথা কেউ হযরত (সঃ) থেকে বর্ণনা করছেন না যে, প্রথম তাশাহহুদে তাঁর বৈঠক এরূপ ছিল। আগেও এরূপ বলার কেউ রয়েছেন বলে জানি না। পরন্তু, একদল তো পেছনে ভর করে বসা উভয় তাশাহহুদে প্রয়োজন ভাবেন। ইমাম মালিকের (রঃ) মাজহাব

এটাই। আরেকদল উভয় তাশাহ্হুদেই বাম পায়ে বসা ও ডান পা দাঁড় করানোর পক্ষপাতী। এ মাজহাব হচ্ছে ইমাম আবু হানীফার (রঃ)। আরেকদল বলেন : সালামের পূর্বের তাশাহ্হুদে পেছনে ভর করে বসতেন এবং অন্যগুলোয় পা বিছিয়ে বসতেন। এ মাজহাব হচ্ছে ইমাম শাফেঈর। অপরদল বলেন, যে নামাযে দুই তাশাহহুদ রয়েছে, তার শেষ তাশাহ্হুদে পেছনে ভর করে বসবে, বৈঠকে পার্থক্য সৃষ্টির জন্যে। এ মাজহাব ইমাম আহমদের। এ ক্ষেত্রে তিনি ইবনে যুবায়েরের হাদীছ অনুসরণ করেন। বলা বাহুল্য, ডান পা কি তখন দাঁড় করানো থাকত, না বিছানো থাকত, এটা নিয়েই মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহই এর রহস্য ভাল জানেন। আমার মতে আদপে এখানে কোন পার্থক্য দেখা দেয় না। কারণ ডান পায়ে কেউ বসে না। সেটাকে ডান দিকে বের করে নেয়। তাই সেটা না দাড়ানো থাকে, না বিছানো। সেক্ষেত্রে বিছানো মানে হচ্ছে সেটার পৃষ্ঠ ভাগ মাটিতে বিছানো থাকে এবং তলায় বসা হয় এবং ঠেক লাগানো মানে হচ্ছে, সেটার পিঠ মাটির দিকে থাকে; কিন্তু তলার ওপরে বসা হয় না। এ অবস্থায় হুমায়দী ও ইবনে যুবায়েরের বর্ণনাই সঠিক প্রমাণিত হয়।

এও বলা যেতে পারে, হযরত (সঃ) দু'টোই করতেন। কখনও পায়ে ঠেক লাগাতেন, কখনও বিছিয়ে নিতেন।

তারপর হযরত (সঃ) এ বৈঠকে সর্বদা তাশাহ্হুদ পড়তেন। সাহাবাদেরকেও এ বৈঠকে এরূপ তাশাহ্হুদ পড়তে বলতেন :

"আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত তাইয়্যিবাতু আসসালামু আলাইকা আইউহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু"।

ইমাম নাসায়ী আবু্য যুবায়েরের মাধ্যমে জাবিরের এক বর্ণনা উধৃত করেন : তিনি কুরআনের সূরার মত আমাদের এ তাশাহ্হুদ শিখাতেন। বিসমিল্লাহি ওয়া বিল্লাহে আত্তাহিয়্যাতু...... ....ওয়া রাসূলুহু, আসআলুল্লাহাল জান্নাতা ও আউজু বিল্লাহি মিনান্নার।

এ হাদীছ ছাড়া আর কোনটিতে তাশাহ্হুদের আগে 'তাসমিআহ্' পড়ার উল্লেখ নেই। অথচ হাদীছটি ত্রুটিপূর্ণ রাবী কর্তৃক বর্ণিত। আর হযরত (সঃ) এ তাশাহ্হুদ অত্যন্ত সংক্ষেপ করতেন। তাঁর থেকে এরূপ অন্যকোন হাদীছই নেই। তা ছাড়া এ তাশাহ্হুদে তিনি জান্নাত কামনা ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্রার্থনাও জানাতেন না। জীবনে ও মরণে ফিতনা মুক্ত থাকা এবং দাজ্জালের বিপদ থেকে মুক্তি লাভের কামনাও এতে করতেন না। যারা এসব এতে মুস্তাহাব মনে করেন, তারা সাধারণভাবে মনে করেন এবং শেষ তাশাহ্হুদে তা বলার স্থান নির্দিষ্ট করে থাকেন।

তারপর হযরত (সঃ) তাকবীর বলে রানে ভর করে হাটু ও পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে যেতেন। মুসলিমে ইবনে উমরের এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ 'নবী (সঃ) এখানেও রাফে' য়্যাদাইন' করতেন।' বুখারীতে অন্যভাবে এটি নেয়া হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ইবনে উমরের এ হাদীছ সর্ববাদী সম্মত নয়। কারণ, তাঁর অধিকাংশ রিওয়ায়েত এ কথা বলেনা। এ ব্যাপারটা বিস্তারিত ভাবে এসেছে আবু হুমায়দ আস্ সা'দীর বর্ণনায়। তিনি বলেনঃ নবী (সঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তাকবীর বলে কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন। তারপর কিরাআত পড়তেন। তা শেষ করে আবার তাকবীর বলে কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন ও রুকুতে যেতেন। সেখানে হাত-দু'টো হাঁটুতে ছড়িয়ে পিঠ সোজা রাখতেন। তারপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে দাঁড়িয়ে আবার কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলতেন। সব অংগপ্রতংগ যথাযথ অবস্থায় ফিরে যেত তখন। তারপর ভূমির ওপরে ঝুঁকে পড়তেন এবং পাঁজর থেকে হাত দূরে রাখতেন। তারপর মাথা তুলে পা দু'টো সংলগ্ন করে তাতে বসতেন এবং যখন সিজদায় যেতেন, পায়ের আংগুল ছড়িয়ে দিতেন। এ ভাবে সিজদা করতেন। তারপর তাকবীর বলে বাম পায়ের ওপরে বসতেন। সব অংগ প্রত্যংগ যথাস্থানে ঠিক হয়ে যেত। তারপর দাঁড়াতেন এবং দ্বিতীয় রাকআতও এরূপে আদায় করতেন। যখন দু'রাকআত শেষ করে তৃতীয় রাকআতে দাঁড়াতেন, প্রারম্ভের মতই 'রাফে' য়্যাদাইন' করতেন। পরে অবশিষ্ট নামায আদায় করতেন। এভাবে সালাম ফিরানোর সিজদা পর্যন্ত করতেন। শেষ বৈঠকে তিনি পা দু'টো বের করে বামদিকে ভর করে মাটিতে বসতেন।

আবু হাতিমের বক্তব্যেও তাই বুঝায়। সহীহ মুসলিমেও এরূপ বলা হয়েছে। তিরমিজী আলী ইবনে আবি তালিবের এক হাদীছে বলেনঃ নবী (সঃ) এখানে 'রাফে'য়্যাদাইন' করতেন।

তারপর তিনি সূরা ফাতিহা পড়তেন। শেষ দু'রাকআতে অন্য কিরাআত পড়ার প্রমাণ নেই। ইমাম শাফেঈর একটি মত হল, এতে অতিরিক্ত কিরাআত মিলানো মুস্তাহাব। এ জন্যে তিনি আবু সাঈদের হাদীছ থেকে প্রমাণ নেন। তাতে বলা হয়েছে, 'হযরত (সঃ) একবার জুহরের নামাযে প্রথম দু'রাকআতে 'আলিফ লাম মীম তানযীলুস সিজদা' সূরার অর্ধেক এবং বাকী দু'রাকাআতে শেষ অর্ধেক পড়তেন বলে জানতে পেয়েছি।' পক্ষান্তরে আবু কাতাদার সর্বজন-স্বীকৃত হাদীছে পরিস্কার ভাবে শেষ দু'রাকআতে শুধু সূরা ফাতিহার কথা বলা হয়েছে। আর তিনি নিজেই তাঁর সাথে সেই নামাযে ছিলেন। মুসলিমে এর উল্লেখ রয়েছে।

দু'টো হাদীছেই ঝগড়ার স্থানটি অস্পষ্ট রয়েছে। আবু সাঈদের হল শোনা কথা, শোনা খবর ও অনুমান যা কখনও হযরতের (সঃ) করা কাজের ব্যাখ্যা হতে পারে না। পক্ষান্তরে আবু কাতাদার হাদীছের ব্যাখ্যা যদিও এরূপ করা হয় যে, প্রথম দু'রাকআতে মাঝে মাঝে তিনি শুধু সূরা ফাতিহা পড়তেন, সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই পরের দু'রাকআত শূন্য থাকত না; বরং তাতেও

সুরা ফাতিহা পড়তেন। তা'হলে সব রাকআতে সুরা ফাতিহা পড়তেন বলে প্রমাণিত হয়। সেক্ষেত্রে যখন তাঁর হাদীছ সংক্ষেপণের প্রমাণ দিচ্ছে, তখন প্রথম দু'রাকআতে কিরাআত পড়লেও শেষের দু'রাকআতে শুধু ফাতিহাই পড়তেন। এ ক্ষেত্রে এও বলা যেতে পারে যে, শেষের দু'রাকআতে কিরাআত মিলানো অতিরিক্ত কাজ। সেটা মাঝে মাঝে তিনি করতেন, যেমুন আবু সাঈদের হাদীছে রয়েছে। এটা হচ্ছে হযরতের (সঃ) ফজরে কখনও লম্বা কিরাআত ও সংক্ষিপ্ত কিরাআতের অনুরূপ ব্যাপার। এরূপ তিনি মাগরিব ছোট-বড় করা, ফজরে কুনুত পড়া ও ছাড়া, জুহর ও আসরে কিরাআত জোরে ও আস্তে পড়া, নামাযে বিসমিল্লাহ শুনিয়ে ও মনে মনে পড়া, মোট কথা নামাযের ভেতরে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম করা তাঁর বিশেষ অবস্থার প্রকাশ মাত্র। তা কখনও ধরাবাঁধা রীতিনীতি ছিল না। এরূপ তিনি এক অশ্বারোহীকে বিশেষ খবর সংগ্রহের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। তারপর নামাযে দাঁড়িয়ে তিনি নামাযের ভেতরে তার আগমন চেয়ে তাকিয়েছিলেন। এটা নিশ্চয়ই তাঁর নামাযের রীতি ছিলনা।

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি রাসূলকে (সঃ) নামাযের ভেতরে অন্যদিকে তাকাবার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি আমাকেজ ানালেন—সেটা শয়তানের লীলা। শয়তান বান্দার নামাযে অমনোযোগ সৃষ্টির জন্যে তা করে থাকে।

তিরমিজীতে সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব আনাস থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সঃ) আমাকে বললেন—বৎস ! নামাযে অন্যদিকে তাকায়োনা কখনও। কারণ, নামাযে এদিক ওদিক তাকনো ধ্বংসের কারণ। যদি অপরিহার্য হয়, নফলে করতে পার—ফরযে নয়।

কিন্তু এ হাদীছটিতে দু'টি ত্রুটি রয়েছে। এক, সাঈদ ও আনাসের ভেতরে যোগাযোগ অজ্ঞাত। দ্বিতীয়, আল্লী ইবনে যায়েদ ইবনে যুদ'আ এ সনদে অন্তরায় হয়ে আছে।

বাযায ইউসুফ থেকে, তিনি সালাম থেকে ও সালাম আবু দারদা থেকে বলেন ঃ 'নবী (সঃ) বলেছেন, এদিক ওদিক দৃষ্টিকারীর নামায হয়না।' পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল (সঃ) নামাযে ডানে ও বামে তাকিয়েছেন, পেছনে তাকান নি।

অবশ্য এ হাদীছটির সমর্থন কোথাও মিলেনা। তিরমিজী এটাকে গরীব (নগন্য) হাদীছ বলেছেন।

খল্লাল বলেন ঃ মায়মুন আমাকে খবর দিয়েছে, আবু আবদুল্লাহকে যখন জানানো হল যে, কিছু লোক হযরতের (সঃ) নামে তিনি নামাযের ভেতরে এদিক ওদিক তাকাতেন বলে রিওয়ায়েত করছে, তিনি দৃঢ়ভাবে তা অস্বীকার করলেন। এমনকি তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল ও শরীরে কম্পন জাগল। তাঁর এরূপ ভীষণ অবস্থা আমি আর কখনও দেখিনি। তিনি বিস্ময়ের সাথে পুনরোধবৃত করলেন 'নবী (সঃ) নামাযের ভেতরে এদিক ওদিক তাকাতেন।' অর্থাৎ তিনি তা সাফ অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, 'এরূপ কোন বর্ণনা তাঁর থেকে নেই।

নিশ্চয়ই সাঈদ বিন মুসাইয়েব এ হাদীছ বর্ণনা করেছে।' আমার সহচররা বলেন, আবু আব্দুল্লাহ সাঈদ বিন মুসাইয়েবের হাদীছ হেয় চোখে দেখতেন এবং তার সূত্র ত্রুটিপূর্ণ বলে আখ্যা দিতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ বলেন—আমি আমার পিতাকে হাস্‌সান ইবনে ইবরাহীমের একটি হাদীছ বর্ণনা করে শুনালাম। হাদীছটি এসেছে আবু ইমামা ও ওয়াএল থেকে। তাতে বলা হয়েছে ঃ 'রাসূল (সঃ) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, ডানে-বামে কখনও তাকাতেন না; বরং সিজদার স্থানে নজর নিবদ্ধ রাখতেন।' তিনি কঠোরভাবে এটা অস্বীকার করলেন। আরও বললেন—তাকে ধরে মার। ইমাম আহমদ এ দু'ধরনের হাদীছই অস্বীকার করেছেন। প্রথমটি করেছেন কঠোরভাবেই। কারণ, সেটার সূত্র ও বাক্য দু'টোই ভুল। দ্বিতীয়টির সূত্র ভুল, যদিও বাক্য ঠিক আছে। খোদাই সর্বজ্ঞ।

যদি প্রথম হাদীছটি ঠিক হয়, তা'হলে অবশ্যই সেটা তিনি বিশেষ কারণে করেছিলেন। সেরূপ ক্ষেত্রে তিনি, আবু বকর, উমর ও জুল য়্যাদাইনের সাথে আমাদের ভেতরে কথাও বলেছেন। মুসলমানদের বিশেষ কল্যাণের খাতিরেই তিনি তা করেছিলেন। আর অশ্বারোহী দূতের দিকে তাকানোর ব্যাপারটি ছিল জিহাদ সংশ্লিষ্ট। তখন তিনি প্রায়ই 'সালাতে খাওফ' (রণাংগনের নামায) পড়ছিলেন। মূল কথা, এগুলো কুরআন ও হাদীছ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকলে একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায়। খোদার ব্যাপারে গাফিলদের নামাযে এদিক-ওদিক তাকানোর সাথে রাসূলের (সঃ) এ বিশেষ অবস্থার তাকানো কিছুতেই এক নয়। তাওফীক দেবার মালিক খোদা।

হযরতের (সঃ) রীতি একটাই ছিল যে, তিনি প্রথম দু'রাকআত শেষের দু'রাকআত থেকে লম্বা করতেন। আবার প্রথম দু'রাকআতের প্রথম রাকআত দ্বিতীয় রাকআত থেকে লম্বা করতেন। এ জন্যে সা'দ (রাঃ) উমরকে (রাঃ) বলেছিলেন ঃ 'আমি কি প্রথম দু'রাকআত বড় করব ও শেষের দু'রাকআত ছোট করব? আমি হযরতের (সঃ) পেছনে এভাবেই পড়েছি।'

এ ভাবে হযরত (সঃ) অন্যান্য নামাযের চাইতে ফজরের নামায লম্বা করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা দু'দু রাকআত করে নামায ফরয করেছিলেন। তারপর যখন তিনি হিজরত করলেন, ফজর ছাড়া 'মুকীম' অবস্থায় দু'দু রাকআত বাড়িয়ে নিলেন। আসর নামায লম্বা কিরাআতের জন্যে যথাযথ ভাবে পড়া হত। আর মাগরিব দিনের 'বিত্‌র' নামায হিসেবে যথাযথ রইল।

আবু হাতিম ও ইবনে হাব্বান তাঁদের সংকলনে হাদীছটি বর্ণনা করেন। সহীহ বুখারী থেকে তাঁরা নিয়েছেন। সব নামাযে হযরতের এটাই রীতি ছিল যে, প্রথম রাকআত তিনি শেষের রাকআত থেকে লম্বা করতেন। সূর্য গ্রহণের নামাযে ও রাতের নফল নামাযেও

তিনি তাই করতেন। আর তাঁর এ রীতি রাতের প্রথম দু'রাকাআত নফল ছোট করে পড়া এবং তার জন্যে আদেশ করার পরিপন্থী নয়। কারণ, সেই দু'রাকাআত ফজরের দু'রাকাআত সুন্নতের মতই উদ্বোধনী নামায মাত্র। এর উদাহরণ আছে। যেমন, হযরত (সঃ) বিতরের নামাযের পরে মাঝে মাঝে কখনো বসে ও কখনো দাঁড়িয়ে দু'রাকাআত নফল নামায পড়তেন। অথচ তাঁর নির্দেশ রয়েছে, 'বিতরকে রাতের শেষ নামায করো।' এ সত্ত্বেও দু'টিতে বিরোধ নেই। তেমনি মাগরিবকে তিনি দিনের 'বিতর' বলেও তার পরে শাফাআত লাভের উদ্দেশ্যে দু'রাকাআত সুন্নত রেখেছেন। এর ফলে মাগরিবের 'বিতর' হওয়ায় ব্যত্যয় ঘটছেনা।

তেমনি হল রাতের বিতরের পরের সুন্নত নামায। রাতের 'বিতরকে' স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েও মাগরিবের সুন্নতের মত হিফাজতকারী হিসেবে এ সুন্নত পড়তেন। মাগরিব ফরয বিধায় তার হিফাজত করা হযরতের (সঃ) জন্যে বেশী প্রয়োজন রাতের বিতরের চাইতে। তাই সেটা নিয়মিত অবস্থায় করতেন। বিতরের সুন্নত সম্পর্কে পরে আরো আলোচনা করা হবে।

হযরত (সঃ) শেষ বৈঠকে পেছনে ভর করে মাটির ওপরে বসতেন। পা দু'টো একদিকে বের করে দিতেন। পেছনে ভর করে বসার ব্যাপারে তাঁর থেকে যে কয়েক ধরনের বর্ণনা রয়েছে, এটি তার অন্যতম। আবু দাউদ আবু হামিদ আস্ সা'দী থেকে আবদুল্লাহ ইবনে লাহিয়ার মাধ্যমে এটি উধৃত করেছেন। আবু হাতিম ইবনে লাহিয়ার মাধ্যম ছাড়াই আবু হামিদ আস সা'দী থেকে বর্ণনা করেন। এটি আগে উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় ধরণ পাই বুখারীতে আবু হামিদেরই বর্ণনায়। তাতে বলা হয় ঃ শেষ রাকআতে যখন তিনি বসতেন, তখন ডান পায়ে ঠেক দিয়ে বাম পা এগিয়ে দিয়ে পেছনে ভর করে বসতেন। এটাও আগের মতই পেছনে ভর করে বসা। পার্থক্য শুধু পা'দু'টো রাখার ভেতরে। তাই এ দু'টো হাদীছে মূলত বিরোধ নেই।

তৃতীয় ধরণ হল মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বর্ণনা। তাতে বলা হয় ঃ তখন তাঁর বাম পা রান ও জানুর মাঝখানে থাকত এবং ডান পা বিছিয়ে দিতেন। আবুল কাসিম আল হারবী তাঁর 'মুহদারা' গ্রন্থে এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছেন। প্রথম দু'টি পদ্ধতি থেকে এটির বৈপরীত্যও হচ্ছে পা রাখার ক্ষেত্রে। সম্ভবত হযরত (সঃ) মাঝে মাঝে এরূপ করতেন। এটাই স্পষ্টতর মনে হয়। এও হতে পারে, বর্ণনায় পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর এ ধরনের বসা সালাম ফিরাবার বৈঠক ছাড়া বসেছেন বলে প্রমাণ নেই।

ইমাম আহমদ ও তাঁর অনুসারীরা বলেন, এ ভাবে তিনি শুধু দু'বৈঠক বিশিষ্ট নামাযেই বসতেন। আর এটা দু'বৈঠকে পার্থক্য সৃষ্টির প্রমাণ দিচ্ছে। কারণ, প্রথম বৈঠকের পরে যেহেতু আবার কিয়াম রয়েছে, তাই সংক্ষেপে বসা সেড়ে দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত থাকতেন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বৈঠকে নামায শেষ বলে নিশ্চিন্ত মনে বসতেন। তা ছাড়া এ দু'বৈঠকের তারতম্য

দু'তাশাহ্হুদের তারতম্যের দিকেও ইংগিত করে। নামাযী যেন তা থেকে সচেতন থাকতে পারে। তা ছাড়া আবু হামিদ হযরতের (সঃ) দ্বিতীয় বৈঠকে বসার পদ্ধতি সম্পর্কে বলেছেন। তিনি পয়লা তাশাহ্হুদে বসার রীতিও বলেছেন। তাতে পা বিছানোর কথা রয়েছে। তারপরে বলেছেন, 'যখন তিনি শেষ রাকআতে বসতেন'। এ ভাবেও বলেছেন—'যখন তিনি চতুর্থ রাকআতে বসতেন'। তিনি অন্যত্র যে বলেছেন, 'যখন তিনি সালাম ফিরাবার বৈঠকে বসতেন; তখন পা দু'টো বের করে পেছন দিক মাটিতে রেখে বসতেন'—এ থেকেই ইমাম শাফেঈ দলীল পেলেন যে, যে বৈঠকেই সালাম ফিরানো হবে (এক তাশাহ্হুদে হোক বা দু'তাশাহ্হুদে) সেখানেই এ আরাম বৈঠক হবে। অবশ্য হাদীছের প্রকাশ্য অর্থে বুঝায়না, বরং হাদীছের ভাবে প্রকাশ পায় যে, এটা চার বা তিন রাকআতের নামাযের সালাম ফিরাবার বৈঠকের কথা। কারণ, পয়লা তাশাহ্হুদের রূপ তিনি বর্ণনা করেছেন আগেই এবং তার পরবর্তী কিয়াম সম্পর্কেও বলেছেন। তারপর বলেছেন সালাম ফিরাবার সিজদার কথা। সুতরাং এ হাদীছ পরিস্কার প্রমাণ করে, দ্বিতীয় বৈঠকেই একদিকে পা বের করে অন্যদিকে মাটিতে পেছনভাগ রেখে বসতেন।

হযরত (সঃ) বৈঠকে বসে ডান হাত ডান রানের ওপরে রাখতেন। তিনটি আংগুল মিলিয়ে নিয়ে শাহাদত আংগুলটি তুলে নিতেন। অন্য রিওয়ায়েত মতে, তিনটি আংগুল মুঠোয় বদ্ধ করে নিতেন। আর বাম হাত বাম রানে রাখতেন। মুসলিমে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে এ ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

ওয়াএল ইবনে হাজর বলেন—ডান কনুই ডান রানে রেখে দু'টো আংগুল মুঠোয় নিয়ে দু' আংগুলে বৃত্ত সৃষ্টি করতেন এবং শাহাদত আংগুল তুলে নাড়াতেন এবং দো'আ পড়তেন। সহীহ মুসলিমে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ তৃতীয় ও পঞ্চমটি জুড়ে নিতেন। আদপে, এ সবগুলো বর্ণনাই এক। যিনি বলেন, তিন আংগুল মুষ্টিবদ্ধ করতেন, তাতে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, মাঝের দু'টো মিলানো ছিল এবং শাহাদত আংগুলের মত উত্তোলিত ছিলনা। যিনি দু'আংগুল মুঠোয় নেয়ার কথা বলেন, তাঁরও বক্তব্য হচ্ছে, শেষের দু'টো আংগুল মিলিয়ে নিয়ে মাঝের দু'আংগুল রেখে দেয়া। আর যিনি তৃতীয় ও পঞ্চম আংগুলে বন্ধন সৃষ্টির কথা বলেন, তিনি মাঝের দু'টো আংগুল একত্র রাখার কথাই বলেন। তবে তা বৃদ্ধাংগুলির সাথে মুষ্টিবদ্ধ হতে পারেনা।

এখানে এসে অনেক শাস্ত্রবিদ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা বলেন, তৃতীয় ও পঞ্চম আংগুল জুড়ে নিলে আগের দু'টো মত থেকে তা আলাদা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এ বন্ধনে কনিষ্ঠ ও অনামিকা স্বভাবতই মিলে যাবে। একদল তার জবাবে বলেনঃ এরূপে মুষ্টি বন্ধনের তৃতীয় আংগুলের দু'টি অবস্থাই ইবনে উমরের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। মূলত শাহাদতের পরবর্তী তিন আংগুল বৃদ্ধাংগুলির সাথে মিলে চক্র সৃষ্টি করে। এতে জটিলতার কিছু নেই। এ হাদীছটি সর্বজন বিদিত।

হাত দ্ব'টো তিনি রানে ছড়িয়ে রাখতেন। কন্বই রানের শেষ প্রান্তে থাকত। বাম হাত লম্বা-লম্বিভাবে বাম রানে থাকত। আংগ্বলগ্বলোকে তিনি 'রাফএ-য়্যাদাইনে' র্বকুতে, সিজদায় ও তাশাহ্হ্বদে কিবলাম্বখী করতেন। তেমনি পায়ের আংগ্বলগ্বলো সিজদায় কিবলাম্বখী করতেন। প্রত্যেক দ্ব'রাকাআতের পর তিনি 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়তেন। নামাযে সাতটি জাগায় তিনি দো'আ পড়তেন ঃ

১। প্রারম্ভে তাকবীরে তাহরীমার পর।

২। কিরাআত শেষ করে র্বকুর আগে বিতরের নামাযে। একটি বর্ণনায় সকালের নামাযেও কুনূত পড়ার কথা বলা হয়েছে। অবশ্য সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

৩। র্বকু থেকে দাঁড়িয়ে। ম্বসলিমে আবদ্বল্লাহ ইবনে আবি আওফা থেকে বর্ণিত আছে ঃ হযরত (সঃ) র্বকু থেকে উঠে এ দো'আ পড়তেন ঃ

سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعده اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ -

৪। র্বকুতে পড়তেন ঃ স্ববহানাকা আল্লাহ্বম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা আল্লাহ্বম্মা-গফিরলী।

৫। সিজদায় তিনি বেশ কিছ্ব দো'আ পড়তেন।

৬। দ্ব'সিজদার মাঝে বসেও পড়তেন।

৭। তাশাহ্হ্বদের পরে ও সালামের আগে পড়তেন।

আব্ব হ্বরায়রা ও ফুজালা ইবনে উবায়েদের হাদীছে এ সব আদেশ রয়েছে। বিশেষত তিনি সিজদায় দো'আ পড়তে বলেছেন। রইল সালাম ফিরিয়ে পশ্চিমম্বখী হয়ে কিংবা ম্বক্তাদী-দের দিকে ফিরে দো'আ পড়া। হযরত (সঃ) থেকে এর্বপ কোন কিছ্বর প্রমাণ নেই। সহীহ বা হাসান কোনর্বপ সনদই নেই এ ব্যাপারে। আর তা (দো'আ) ফজর ও আসরে খাসভাবে করার প্রমাণও নেই। তিনি বা খ্বলাফায়ে রাশেদীনের কেউ এর্বপ করেন নি। যাঁরা এটাকে বৈধ ভেবে-ছেন, তারাও স্বন্নত হিসেবে নয়; বরং ভাল কাজ হিসেবে ভেবেছেন। খোদাই ভাল জানেন।

নামায সম্পর্কিত অন্যান্য যে সব সাধারণ দো'আ বলা হয়েছে, সেগ্বলো হযরত (সঃ) নিজে পড়তেন এবং পড়ার জন্যে আদেশও দিয়েছেন। নামাযীর অবস্থার সাথেই এগ্বলোর যোগ থাকে। কারণ, সে নিজ প্রভুর দিকে মনোযোগ দেয়। যতক্ষণ সে নামাযে থাকে, তাঁরই সাথে শলা-পরামর্শে থাকে। যখনই সালাম ফিরায়, এ শলাপরামর্শ বন্ধ হয়ে যায়। তাঁর সান্নিধ্য থেকে সে দ্বরে সরে যায়। তাই এ সান্নিধ্যের মনোযোগের সময়ে কিভাবে দো'আ বর্জন করা যায়? তা ছাড়া

যখন সে সালাম ফিরায়, প্রার্থনার হাত বাড়িয়ে দেয়। এতে সন্দেহ নেই, সম্পর্ক কেটে দিয়ে পরে হাত পাতার চেয়ে সান্নিধ্যে থাকা কালেই প্রার্থনা করা উত্তম।

স্মরণ রাখবেন, এখানে একটি সূক্ষ্ম রহস্য রয়েছে। নামাযী যখন নামায থেকে আলাদা হয়ে যায়, খোদার কলিমা পড়ে, তাসবীহ পাঠ করে, গুণগান করে, ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে, তখন নামাযীর হযরতের (সঃ) ওপরে দরূদ পাঠ করা প্রয়োজন। তারপর যা ইচ্ছে, দো'আ পড়া। নামাযের পরে মুনাজাত করার চাইতে এ ধরনের দ্বিতীয় ইবাদত সেরে মুনাজাত করা উত্তম। কারণ, সে যখন খোদাকে স্মরণ করল, তাঁর গুণগাণ ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করল, তাঁর সাথে হযরতের ওপরে দরূদ পাঠাল, তখন তার দো'আ কবুল হবে। ফুজালা ইবনে উবাইদের হাদীছে আছে, যখন তোমাদের কেউ নামায পড়বে, তখন খোদার প্রশংসা ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করবে এবং রাসূল (সঃ) এর ওপরে দরূদ পাঠ করবে। তারপর তোমাদের যে দো'আ পড়ার ইচ্ছা হয় পড়বে। ইমাম তিরমিজি হাদীছটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

সালাম ফিরাবার পদ্ধতি ঃ

তারপর নবী (সঃ) ডান দিকে ফিরে 'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলতেন। এভাবে বামদিকে ফিরেও করতেন। পনের জন সাহাবী এ কথা বর্ণনা করেছেন। তাঁদের নাম এই ঃ

"আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, সাহল ইবনে সা'দ সাঈদী, ওয়াএল ইবনে হাজর, আবু মূসা আশ'আরী, হুজায়ফা ইবনে ইয়ামান, আম্মার ইবনে ইয়াসার, আবদুল্লাহ ইবনে উমর, জাবির ইবনে সামারা, বারাআ ইবনে আজিব, আবু মালিক আশ'আরী, হাসান ইবনে আলী, আউস ইবনে আউস, আবু রিমছা ও আদী ইবনে উমায়ের (রাঃ) (খোদা তাঁদের ওপরে সন্তুষ্ট রয়েছেন)।"

হযরত (সঃ) থেকে যে বর্ণিত আছে, তিনি সামনের দিকে একটি মাত্র সালাম বলেই সালাম ফিরানোর কাজ সমাধা করতেন, এটা সহীহ রিওয়ায়েতে জানা যায় না। এ ব্যাপারে সব চাইতে বিশুদ্ধ বর্ণনা হল হযরত আয়েশার (রাঃ)। তিনি বলেন ঃ 'হযরত (সঃ) একটিমাত্র সালাম দ্বারাই সালাম ফিরাতেন। তাঁর শব্দ এত বেশী হত যে, আমরা জেগে যেতাম।'

এ বর্ণনাটিও ত্রুটি পূর্ণ। যদিও সুনানে আছে, তথাপি এ হচ্ছে রাতের নফল নামায সম্পর্কে। যাঁরা দু'সালামের কথা বলেন, ফরয ও নফল সব নামাযে যা দেখেছেন, তাই বলেন। তা ছাড়া, হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীছ এক সালাম প্রমাণের জন্যে যথেষ্ট নয়। কারণ, তিনি বলেন, এক সালাম যখন করতেন, শব্দ শুনে আমরা জেগে যেতাম। দ্বিতীয় সালামের তিনি এখানে উল্লেখ না করে চুপ থেকেছেন। তাঁর এ নীরবতা কখনও যেসব বর্ণনাকারী দু'সালাম জেনে শুনে মনে রেখে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, তার ওপরে স্থান পেতে পারে না। সে সব রিওয়ায়েতের সংখ্যাও অনেক। সে বর্ণনাগুলোও যথাযথ। অধিকাংশই সহীহ এবং কয়েকটি হাসান।

আবু আমর ইবনে আব্দুল বার বলেন, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণনা অনুসারে হযরত (সঃ) একবার সালাম ফিরাতেন। হযরত আনাস (রাঃ) ও সেরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাঁদের বর্ণনা ত্রুটি পূর্ণ। হাদীছ বিশারদরা তা বিশুদ্ধ মনে করেন না। তাঁরা বলেন, এ হচ্ছে সংশয়পূর্ণ ধারণা মাত্র। তাই ভুল। সা'দের হাদীছটি হচ্ছে এই ঃ 'নবী (সঃ) ডানে ও বামে দু'বার সালাম করতেন, আমরা তখন তাঁর গাল দেখতে পেতাম।' ইবনে মুবারকের ধারা ধরে হাদীছটি মাস'আব ইবনে ছাবিত থেকে, তিনি ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সা'দ থেকে এবং তিনি আমের ইবনে সা'দ থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম জুহরী এ হাদীছ সম্পর্কে বলেন ঃ হাদীছের ভান্ডারে আমি এটি দেখতে পাইনি। ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ তা শুনে বলল ঃ আপনি কি রসূলের (সঃ) সব হাদীছই শুনেছেন ? তিনি জবাব দিলেন— না। তখন সে জিজ্ঞেস করল ঃ অর্ধেক শুনেছেন ? তিনি বললেন— হাঁ। তখন সে বলল ঃ যে অর্ধেক শুনেননি, এ হাদীছটিকে তারই অন্যতম ধরে নিন।

এখন প্রশ্ন রইল, হযরত আয়েশা (রাঃ) নবীকে (সঃ) একবার সালাম বলতে শুনেছেন। এ বর্ণনা শুধু যুহায়ের ইবনে মুহাম্মদ হিশাম ইবনে উরুয়া থেকে 'মারফু' সনদে বর্ণনা করেছেন। মানে, তিনি তাঁর বাপ এবং তার বাপ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তারপর আমর ইবনে আবু সালমা প্রমুখ বর্ণনা করেন। অথচ যুহায়ের ইবনে মুহাম্মদ সব মুহাদ্দিছের কাছেই 'অনির্ভরযোগ্য' বিবেচিত। তাঁর বর্ণনায় বহু ভুল থাকে। তাই তাঁর বর্ণনা দলীল হতে পারে না। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন এ রিওয়ায়েতের উল্লেখ করে বলেন—আমর ইবনে আবি সালমা ও যুহায়রের বর্ণনা অনির্ভরযোগ্য। তা দলীল হিসেবে চলেনা। আর হযরত আনাসের (রাঃ) হাদীছ শুধু আইয়ুব সখতিয়ানী থেকে শুনা যায়। অথচ হযরত আনাসের কাছ থেকে সে কিছুই শুনেনি। তিনি আরও বলেন, হযরত হাসান (রাঃ) থেকে 'মুরসাল' রিওয়ায়েত রয়েছে যে, নবী (সঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) একই সালামে নামায শেষ করতেন। অথচ এক সালামের পক্ষপাতীদের কাছে মদীনাবাসির অনুসরণের দোহাই ছাড়া কোন দলীলই নেই। তাদের কথা হল, পূর্ব সূরীদের থেকে তারা এটা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে আসছে। অথচ এ ধরনের কথা কোন দলীল হয়না। কারণ, এটা পরিস্কার যে, এ কাজটি দিনে কয়েকবারই ঘটে। অথচ সমস্ত ফিকাহবিদরা সর্বসম্মতভাবে এ মতের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। আর তাঁরাই সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁৗচেছেন।

তা ছাড়া হযরতের (সঃ) প্রমাণিত সুন্নত কখনও বিশেষ কোন শহরের অনুসৃত রীতির জন্যে বাতিল হতে পারেনা তা সে যে শহরই হোকনা কেন। বিশেষত (উমাইয়া) শাসকরা মদীনা ও অন্যান্য শহরে নামাযে কতগুলো নতুন রীতি-নীতি চালু করে গেছেন। সে সব এলাকায় সে গুলোই অনুসৃত হতে থাকে। কেউ সেদিকে দৃষ্টি দেয়নি। মদীনাবাসী খুলাফায়ে রাশে-

দীনের যুগে যা অনুসরণ করেছে, তা দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু, তার পরে এরূপভাবে যা তারা প্রবর্তন করেছে কিংবা সাহাবাদের যুগ শেষ হবার অনেক পরে করেছে, তার ভেতরে আর অন্যান্য শহরের রীতি-নীতির ভেতরে তারতম্য সৃষ্টির প্রয়োজন থাকেনা। সবাইকে রসূলের সুন্নত অনুসরণ করতেই বলা হয়েছে। হযরত (সঃ) ও তাঁর খলীফাদের অনেক পরে যে রীতির সৃষ্টি তা পালন করতে বলা হয়নি।

নামাযে হযরতের দো'আ ঃ

হযরত (সঃ) নামাযে এ মুনাজাত করতেন ঃ

اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم انى اعوذ بك من المأثم والمغرم ٥

"হে খোদা! কবরের আজাব, দাজ্জালের ফিতনা, জীবন ও মরণের সর্ববিধ ঝঞ্ঝাট এবং পাপ ও ঋণের হাত থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

কখনও বলতেন ঃ

اللهم اغفرلى ذنبى ووسع لى دارى وبارك لى فيما رزقتنى ٥

"হে খোদা' আমাকে ক্ষমা কর। আমার ঘরের দৈন্য দূর কর আর যে রুজী দাওনা কেন, তাতে আয়-উন্নতি দাও।"

কখনও বলতেন ঃ

اللهم انى اسألك الثبات فى الامور والعزيمة على الرشد واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسألك قلبا سليما ولسانا صادقا واسألك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم ٥

"হে খোদা! কাজে-কর্মে আমাকে দৃঢ়তা ও অগ্রগামীতা দান কর। সত্যের ওপরে দৃঢ় মনোবল দান কর। তোমার নিআমতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের শক্তি দাও। তোমার উত্তম ইবাদতের ক্ষমতা দাও। সুস্থ আত্মা ও সত্য ভাষণের অধিকারী কর। তোমার যা কিছু ভাল বলে জানা রয়েছে, তাই দাও আর যত ক্ষতিকর কিছু, তুমি জান, তা থেকে বাঁচাও। যত পাপ তুমি আমার জান, তার জন্যে ক্ষমা চাই।"

কখনও সিজদায় বলতেন ঃ

رب اعطى نفسى تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ٥

"হে খোদা, আমাকে নামাযে পরহেজগারী দান কর। তাতে পবিত্র রাখ। তুমি উত্তম পবিত্রকারী। তুমিই আমার নামাযের অভিভাবক ও প্রভু।"

রুকু, সিজদা, বৈঠক ও রুকুর পরবর্তী কিয়ামে যে সব দো'আ পড়তেন, তার কিছুটা আগেই বলা হয়েছে।

নামাযে হযরতের (সঃ) যেসব দো'আ বর্ণিত আছে, সেগুলো এক বচনে বলা হয়েছে। যেমন ঃ

رب اغفرلى وارحمنى واهدنى -

'হে খোদা ! আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর ও পথ দেখাও।'

এমনকি নামাযের প্রারম্ভিক দো'আও সেরূপ ঃ 'হে খোদা ! বরফ, শীতল বস্তু ও ঠান্ডা পানি দিয়ে আমার পাপ সব ধুয়ে দাও। হে খোদা ! আমার ও আমার পাপের ভেতরে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের ব্যবধান সৃষ্টি করে দাও।'

ইমাম আহমদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হযরত ছাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ কেউ যেন ইমাম হয়ে শুধু নিজের জন্যে দো'আ না করে। যদি তা করল, তবে সে খিয়ানত করল।

ইবনে খুযায়মা তাঁর 'সহীহ' সংকলনে নির্ভুল সূত্রে 'আল্লাহুম্মা আগছিলনী খাতাঈ' হাদীছ তুলে ধরে বলেন, এ হাদীছটি উপরোক্ত 'কেউ যেন ইমাম হয়ে' বিষয়ক হাদীছটি বাতিল করে দেয়। আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াকে বলতে শুনেছি, আমার মতে এ হাদীছটি ইমাম যখন নিজের জন্যে ও তার সাথে মুক্তাদীদের জন্যে সামগ্রিকভাবে দো'আ করবে, সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যেমন, দো'আ কুনূত ও এ ধরণের অন্যান্য দো'আ।

নামাযে অপরের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা ঃ

হযরত (সঃ) যখন নামায পড়তেন, আনত থাকতেন। ইমাম আহমদ এটা বর্ণনা করেন। তাশাহহুদে তাঁর দৃষ্টি আংগুলে ইশারা দান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকত। এ আলোচনা আগে হয়ে গেছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্যে নামাযকে নিআমত এবং আত্মা ও চোখের তৃপ্তিদায়ক করে দিয়েছিলেন। তাই তিনি বলতেন ঃ 'হে বিলাল ! নামাযে ডেকে আমাকে প্রাণ দান কর।' আরও বলতেন ঃ নামাযকে আমার চোখের শান্তি করা হয়েছে।

নামাযে তাঁর এত তন্ময়তা সত্ত্বেও তিনি সেক্ষেত্রে অন্যান্যের সুবিধা-অসুবিধা বিস্মৃত হতেন না। আল্লাহ তা'আলার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ নিয়োজিত করা সত্ত্বেও যখন নামায দীর্ঘ করতে গিয়ে শিশুর কান্না শুনতে পেতেন, নামায সংক্ষেপ করতেন যেন মায়েদের মনোকষ্ট দেখা না দেয়। তিনি একবার একজন অশ্বারোহীকে অগ্রবর্তী সেনার দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। তারপর তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। মাঝখানে যে গোত্রের খবর নিয়ে ফিরে আসছিল, সেদিকে তাকালেন। বস্তুত, তিনি নামাযেও তার খোঁজ নিতে উদাসীন হননি।

তেমনি তিনি একবার তাঁর নাতী ইমামা বিন্তে আবিল আসকে কাঁধে নিয়ে নামায পড়লেন। যখন তিনি রুকু ও সিজদায় যেতেন তাকে পাশে নামিয়ে বসাতেন।

আবার তিনি যখন নামায পড়তেন, হাসান ও হুসাইন (রাঃ) এসে তাঁর পিঠে চড়তো। তিনি তখন দীর্ঘ সিজদা দিতেন যেন তারা পড়ে না যায়।

তেমনি তিনি যখন নামাযে তন্ময় হতেন, এমন সময়ে হয়ত হযরত আয়েশা (রাঃ) এসে দরজার কড়া নাড়তেন। তিনি নামাযের মাঝখানে থেমে দরজা খুলে দিয়ে আবার বাকীটুকু আদায় করতেন। তদ্রূপ তাঁর নামাযের অবস্থায় কেউ তাঁকে সালাম জানালে তিনি ইশারায় জবাব দিতেন।

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন ঃ 'রাসূল (সঃ) আমাকে এক কাজে পাঠালেন। যখন ফিরে এলাম, দেখলাম তিনি নামায পড়ছেন। আমি সালাম জানালাম এবং তিনি ইশারায় জবাব দিলেন।' এ হাদীছটি মুসলিমে উধৃত হয়েছে।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ 'হযরত (সঃ) নামাযে ইশারা করতেন।' ইমাম আহমদ এটা বর্ণনা করেন। হযরত সুহায়েব বলেন, 'আমি হযতের (সঃ) কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। আমি সালাম দিলাম। তিনি ইশারায় জবাব দিলেন।'

রাবী বলেন, সুহায়েব (রাঃ) কি আংগুল দিয়ে ইশারার কথা বললেন, না অন্যরূপ ইশারা, তা আমার মনে নেই। এ রিওয়ায়েতটি সুনানে ও মুসনাদে রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ 'নবী (সঃ) কুবায় যাচ্ছিলেন। পথে তিনি যখন নামায পড়ছিলেন, তাঁর কাছে একদল আনসার এল। তারা হযরতকে (সঃ) সালাম করল। আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, হযরতকে (সঃ) এরূপ ক্ষেত্রে কিভাবে জবাব দিতে দেখেছ। তিনি ইংগিতে বললেন, এ ভাবে দিতেন। তা দেখে জা'ফর ইবনে আউন হাতের পাঞ্জা খুলে তালু নীচে রেখে পৃষ্ঠভাগ উঁচু করে দেখালেন।' সুনান ও মুসনাদে এ বর্ণনাটি রয়েছে।

ইমাম তিরমিজী হাদীছটিকে সঠিক বলেছেন। তবে সেখানে ভাষা হল এই ঃ 'তিনি হাতে ইশারা করতেন।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ 'আবিসিনিয়া থেকে যখন আমি ফিরে এলাম, হযরতের (সঃ) দরবারে হাজির হলাম। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। আমি সালাম জানালাম। তিনি মাথার ইংগিতে জবাব দিলেন।' বায়হাকী এ বর্ণনাটির উল্লেখ করেছেন।

এখন সমস্যা থেকে যায় আবু গাতফান বর্ণিত আবু হুরায়রার (রাঃ) হাদীছটি সম্পর্কে। তাতে বলা হয়েছে ঃ হযরত (সঃ) বলেন, নামাযে যে বোধগম্য ইশারা করবে, সে দ্বিতীয়বার নামায পড়বে।' এ বর্ণনাটি অমূলক। দারে কুতনী এটার উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন—ইবনে আবু দাউদের কাছে আবু গাতফান অজ্ঞাত ব্যক্তি। সহীহ রিওয়ায়েতে হযতের (সঃ) ইশারা করার কথা রয়েছে। হযরত আনাস ও হযরত ছাবিত প্রমুখ তা বর্ণনা করেছেন।

তা ছাড়া হযরত (সঃ) নামায পড়তেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) তার সামনে শুয়ে থাকতেন। যখন তিনি সিজদা করতেন, তাঁকে ইংগিতে সরে যেতে বলতেন। তিনি তাঁর পা সরিয়ে নিতেন। আবার হযরত (সঃ) দাঁড়িয়ে গেলে তিনি পা ছড়িয়ে দিতেন। কখনও হযরত

(সঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন। সেখানে রুকু করে সিজদার জন্যে নীচে নেমে মাটিতে সিজদা করে আবার সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেন।

একবার তিনি দেয়াল সামনে রেখে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় একটি চতুষ্পদ জীব তাঁর সামনে দিয়ে চলল। তিনি সেটাকে সরাতে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত দেয়ালের সাথে ঠেকিয়ে দিলেন।

আরেকবার তিনি নামাযে নিরত থাকাকালে আবদুল মুত্তালিব গোত্রের দু'টি মেয়ে এসে মারামারি শুরু করল। তিনি মেয়ে দু'টোকে ধরে একের হাত থেকে অপরকে ছাড়িয়ে দিলেন। তথাপি তাঁর নামায অব্যাহত রাখলেন। ইমাম আহমদ এর পরেও যোগ করলেন—তারপর মেয়ে-দু'টো হযরতের (সঃ) হাটু আকড়ে ধরল। তিনি দু'জনকে ধরে সরিয়ে দিলেন। তখনও তাঁর নামায অব্যাহত রইল।

তিনি একবার নামাযে দাঁড়িয়ে একটি ছেলেকে সামনে দিয়ে যেতে দেখে ইংগিতে সরে যেতে বলায় সে সরে গেল। তেমনি একটি মেয়েকেও নামাযের ভেতরে ইংগিত দিয়ে সরিয়েছিলেন। সুনানে ইমাম আহমদ উল্লেখ করেছেন, হযরত (সঃ) নামাযে ফু'কতেন। অবশ্য 'নামাযে ফু'কবার' হাদীছটি প্রশ্ন সাপেক্ষ। হযরত (সঃ) থেকে এর কোন সঠিক সূত্র মিলেনা।

নামাযে কখনও তিনি কাঁদতেন, কখনও গলা ঝাড়তেন। হযরত আলী (রাঃ) ইবনে আবি তালিব বলেনঃ 'হযরত (সঃ) বিশেষ বিশেষ সময়ে তাঁর সকাশে উপস্থিত হতে আমাকে অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। সেই অনুসারে আমি যেতাম। কখনও দেখতাম তিনি নামাযে আছেন। সেই অবস্থায় গলা ঝেড়ে তিনি আমাকে ঢুকতে বলতেন। অন্যথায় মুখে বলতেন।' নাসাঈ ও আহমদ এ হাদীছটির উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদের বর্ণনায় এও বলা হয়েছেঃ 'হযরত (সঃ) দিনে ও রাতে দু'বার তাঁর কাছে যাবার অনুমতি দিয়ে রেখেছিলেন। যখন আমি যেতাম, তিনি নামাযে থাকলে কেশে আমাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিতেন।' ইমাম আহমদ এ হাদীছটি অনুসরণও করতেন। গলা ঝাড়াকে তিনি নামায বিনষ্টকারী মনে করতেন না।

হযরত (সঃ) কখনও খালি পায়ে এবং কখনও জুতা পায়ে নামায পড়তেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন এবং জুতা পরে নামায পড়ার তিনি হুকুম দিয়েছেন যেন ইয়াহুদীদের সাথে পার্থক্য প্রকাশ পায়। কখনও তিনি এক কাপড়ে এবং কখনও দু'কাপড়ে নামায পড়েছেন।

●

Contents

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোআ কুনুত প্রসংগ

হযরত (সঃ) ফজরে রুকুর পরে এক মাস দো'আ কুনুত পড়েছেন। তারপর ছেড়ে দিয়েছেন। সর্বদা দো'আ কুনুত পড়া তাঁর সুন্নাত বলে প্রমাণ নেই। এ কথাটি অসম্ভব যে, তিনি রুকু থেকে দাঁড়িয়ে সর্বদা দো'আ কুনুত পড়তেন এবং বলতেনঃ "আল্লাহুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদায়তা ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান তাওল্লাইতা" আর সংগে সংগে সাহাবারা পরে জোরে জোরে 'আমীন' বলতেন। এও অসম্ভব যে, এ কাজ তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল; অথচ উম্মতরা তার খবর রাখেনা। কিংবা অধিকাংশ উম্মত ও সাহাবায়ে কিরাম তা ভুলে গেলেন। কোন কোন সাহাবী তো এটাকে 'মনগড়া' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

সাঈদ ইবনে তারিক আশজাঈ বলেন, 'আমি আব্বাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম (তিনি নবী (সঃ) ও চার খলীফার পেছনে নামায পড়েছেন এবং কুফায়ও পাঁচ বছর পড়েছেন)—হযরত (সঃ) কি সব নামাযেই কুনুত পড়তেন? তিনি জবাব দিলেন—বাবা; এটা 'ইখতেরা (মনগড়া)।' ইমাম আহমদ ও সুনান অনুসারীরা এটা বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিজী হাদীছটিকে 'সহীহ-হাসান' বলেছেন।

দারে কুতনী (রঃ) হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) বলতে শুনেছি, ফজরের নামাযে কুনুত পড়া বিদ'আত।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) হাব্জাজ থেকে বর্ণনা করেন—আমি ইবনে উমরের (রাঃ) সাথে ফজর নামায পড়েছি। তিনি তাতে দো'আ কুনুত পড়েন নি। আমি তাঁকে আরজ করলাম, আপনি যে দো'আ কুনুত পড়লেন না? তিনি জবাব দিলেন—আমার মনে পড়ছেনা কোন সাহাবী এরূপ পড়েছেন বলে।

আর এটা তো অবশ্য জানা কথা যে, যদি হযরত (সঃ) প্রতি ফজরে তা পড়তেন ও সাহাবারা 'আমীন' বলতেন জোরে জোরে, তা হলে হযরতের নামায সম্পর্কিত অন্যসব ব্যাপারের মত এটার বর্ণনাও তাঁর উম্মতের ভেতরে বিদ্যমান থাকত।

এক সুবিবেচক ধর্মবেত্তাই ইনসাফের কথা বলেছেন। তা এই, তিনি কখনও জোরে, কখনও বা আস্তে পড়তেন। আস্তেই বেশী পড়তেন। কখনও পড়তেন, কখনও আবার ছেড়ে দিতেন। কুনুত পড়ার চাইতে না পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন তিনি বেশী।

তা ছাড়া হযরত (সঃ) এক গোত্রের বিপদের মুহূর্তে তাদের দো'আ ও এক শত্রু গোত্রের জন্যে বদ দো'আ করার উদ্দেশ্যে দো'আ কুনুত পড়েন। তারপর যখন মিত্র গোত্র মুক্তি পেল এবং

শত্রু গোত্রও তওবা পড়ে মুসলমান হয়ে হযরতের দরবারে এল, তিনি দো'আ কুনুত পাঠ তরক করলেন। এ ছিল নেহাৎ সাময়িক ও বিশেষ ব্যবস্থা। অবস্থা বদলের সাথে ব্যবস্থাও বদলে গেল।

হযরত (সঃ) যে তা ফজরেই পড়েছেন তা নয়, মাগরিবেও পড়েছেন। ইমাম বুখারী 'সহীহ' সংকলনে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন। মুসলিমে হযরত বারাআ থেকেও তা বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ হযরত (সঃ) জুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরে দো'আ কুনুত পড়তেন। যখন তিনি শেষ রাকআতে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে দাঁড়াতেন, তখন বণূ সালীম, রা'আল, জাকো-য়ান ও ইসিয়া গোত্রের জন্যে বদ দো'আ করতেন। তার পেছনে মুক্তাদীরা 'আমীন' বলত।

আবু দাউদ বর্ণনা করেন—বিপদে আপদে বিশেষভাবে কুনুত পড়া এবং তা দূর হলে ছেড়ে দেয়া হযরতের (সঃ) রীতি ছিল। তিনি ফজর নামাযের জন্যে এটা নির্দিষ্ট করেন নি। তবে সে নামাযেই বেশীর ভাগ পড়তেন। ফজরের নামায দীর্ঘ হত। রাতের নামাযের পরেই তা আসত। সেহরীরও কাছাকাছি নামায। দো'আ কবুলের সময়, ওহী নাযিলের মুহূর্ত। এ সব কারণেই তা করতেন। আর এটা এরূপ বিখ্যাত নামায যে, আল্লাহ ও তাঁর দিন-রাতের ফেরেশতারা এর সাক্ষ্য দান করেছেন বলে বর্ণিত রয়েছে। খোদার বাণী 'ইন্না কুরআনাল ফাজরি কানা মাশহূদা' এর এটাই হচ্ছে ব্যাখ্যা। এক্ষণে ইবনে আবি ফুদাইকের রিওয়ায়েতটি বিবেচ্য। আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ তাবারী তাঁর আব্বা ও তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে তা বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ হযরত (সঃ) ফজরের নামাযের দ্বিতীয় রাকআতে যখন রুকু থেকে মাথা তুলতেন, তখন হাত উঁচু করে এ দো'আ পড়তেন ঃ

اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت
وبارك لي فيما اعطيت وقني شر فيما قضيت انك تقضي ولا يقضى
عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ○

"হে খোদা! যাদের পথ দেখিয়েছ, তাদের দলে শামিল করে আমাকেও পথ দেখাও। যাদের তুমি ক্ষমা করেছ, তাদের দলে শামিল করে আমাকেও ক্ষমা কর। যাদের তুমি অভিভাবকত্ব করছ, আমাকেও সে দলে শামিল কর। আমাকে যা দিয়েছ, তাতে বরকত দাও। যে দুরাদৃষ্ট আমার ভাগ্যে রেখেছ, তা থেকে বাঁচাও। নিশ্চয়ই তুমিই নিয়ন্তা এবং কখনও নিয়ন্ত্রিত নও। নিশ্চয়ই তোমার বন্ধু যে হবে, কখনো সে লাঞ্ছিত হবেনা। হে খোদা! তুমিই বরকতের মালিক ও সর্বোচ্চ।"

যদি এ হাদীছটি সহীহ কিংবা হাসান হত, কত সুস্পষ্ট এক দলীল হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু আবদুল্লাহর রিওয়ায়েত দলীল হবার যোগ্য নয়। যদিও হাকাম কুনুতের ব্যাপারে আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ মুযনীর রিওয়ায়েতটি সঠিক বলেছেন।

Contents

অবশ্য হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সহীহ রিওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলেছেনঃ 'খোদার কসম! আমি তোমাদের সবার চেয়ে হযরতের (সঃ) নামাযের সন্নিকটবর্তী ছিলাম।' তিনি ফজরের শেষ রুকুর পরে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদা' বলে দো'আ কুনুত পড়তেন। মুসলমানদের জন্যে তিনি দো'আ করতেন ও কাফিরদের অভিসম্পাত দিতেন।

এটা সুস্পষ্ট ব্যাপার যে, হযরত (সঃ) এরূপ করতেন এবং পরে ছেড়ে দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) ইচ্ছা ছিল, সবাইকে বলে দেবে এটি সুন্নাত এবং নবী (সঃ) পড়ে গেছেন। তাঁর এ কাজটি কুফাবাসীর প্রতিবাদ স্বরূপ ছিল। তারা ফজরে কিংবা বিপদে-আপদে যে কোন অবস্থায় কুনুত পড়া মাকরূহ মনে করতেন। ত'ারা বলতেন, এ রীতিটি মনসুখ হয়ে গেছে। তাই এটা অনুসরণ করা বিদ'আত। মুহাদ্দিছরা বিপদে-আপদে তা পড়া মুস্তাহাব মনে করেন। আগের দু'দলের চাইতে হাদীছ সম্পর্কে এরা বেশী ওয়াকিফহাল। তাঁরা বলেন – এ কাজ করা ও তরক করা দু'টোই সুন্নাত। এ সত্ত্বেও যারা এ কাজ অনুসরণ করত, তাঁরা তাদের সে কাজে বাধা দিতেন না। পক্ষান্তরে যারা তরক করত, তাদেরও বিদ'আতকারী আখ্যা দিতেন না এবং সুন্নাত বিরোধী মনে করতেন না। তাঁদের ধারণা, যারা পড়ে, ভালই করে। আর যারা পড়েনা, তাঁরাও ভাল করে।

তবে বিবেচনার কাজ হল, দো'আ ও গুণগান করা। নবী (সঃ) এ দু'টি একত্রে করতেন। দো'আ কুনুতও ইবাদত। তাতে এ দু'টোর সমন্বয় ঘটেছে। এ স্থানটি সে জন্যে বেশ উপযোগী। তাই ইমাম যদি কখনও মুক্তাদীদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে জোরে পড়ে, তাতে দোষ নেই। হযরত উমর (রাঃ) শুরুতে মুক্তাদীদের সতর্ক করার জন্যে জোরে পড়তেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা জোরে পড়ে তা যে সুন্নাত সেটা সবাইকে জানিয়ে দিতেন।

জোরে 'আমীন' বলার ব্যাপারটিও তাই। এখানে মতানৈক্যের পূর্ণ অবকাশ রয়েছে। তা করুক বা না করুক, কোনটির জন্যেই দোষারোপ করা যায় না। তেমনি, নামাযে রাফএ য়্যাদায়েন' করা বা না করা কোনটাই নিন্দনীয় নয়। তাশাহহুদের ব্যাপারে মতানৈক্যও তদ্রূপ। আজান ও ইকামতের শ্রেণীভেদ, তামাত্তু, হজ্জব ও কিরাণ হচ্ছে কুরবাণীর প্রকার ভেদ ও অনুরূপ ব্যাপার। আমাদের উদ্দেশ্য তো শুধু হযরতের (সঃ) সুন্নাত বর্ণনা করা। তিনি কি কি করতেন, তা বলা। হাদীছ গ্রন্থের তিনিই লক্ষ্যস্থল। এর যত মর্ম অনুসন্ধানও তাঁর ব্যক্তিত্ব ও কার্যের সাথে জড়িত।

এ গ্রন্থে আমি জায়েয না জায়েযের ঝগড়া তুলিনি। হযরত (সঃ) যে সব কাজ নিজের জন্যে ভাল মনে করে অবলম্বন করেছেন, সেগুলো বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। কারণ তিনি উত্তম ও পূর্ণতম পথের দিশারী। সুতরাং যদি আমি এ কথা বলি যে, তিনি ফজরে সব সময়ে

কুনূত পড়তেন না, জোরে বিসমিল্লাহও সব সময়ে পড়তেন না, তার অর্থ এ নয় যে, এর বিপরীত করা মাকরূহ বা বিদ'আত।

এখন থাকে আবু জা'ফর রাযীর বর্ণনাটি। হযরত রবী' ইবনে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনাটি এসেছে। তিনি বলেনঃ হযরত (সঃ) ইন্তিকাল পর্যন্ত ফজরে সর্বদা কুনূত পড়তেন। মুসনাদ ও তিরমিজী ইত্যাদিতে রিওয়ায়েতটি রয়েছে। ইমাম আহমদ প্রমুখ আবু জা'ফরকে অনির্ভর-যোগ্য বর্ণনাকারী আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে মদীনী বলেছেনঃ তাঁর বর্ণনায় গোলমাল থাকে। আবু যিরআ (রাঃ) বলেনঃ তার বর্ণনায় শংসয় ছিল বেশী। ইবনে হাববান বলেনঃ সে মহান ধর্মবেত্তাদের থেকে মুনকার রিওয়ায়েত বর্ণনার ব্যাপারে অনন্য ছিল। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াও তার রিওয়ায়েতকে দলীলের অযোগ্য বলেছেন। তিনি উদাহরণ স্বরূপ হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কিত একটি হাদীছ বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন যা নেহাৎ ভ্রান্তিপূর্ণ।

এ সত্ত্বেও যদি তার হাদীছটি সহীহ ধরা হয়, তথাপি তা থেকে এ বিশেষ দো'আ কুনূত প্রমাণিত হয়না। কারণ, সাধারণ অর্থে কুনূত বলতে কিয়াম, নীরবতা, ধারাবাহিক ইবাদত, দো'আ, তাসবীহ, খুশু-খুযু (চিত্তসংযোগ) ইত্যাদি বুঝায়। যেমন আল্লাহ বলেনঃ

وله من فى السماوات والارض كل له قانتون ○

"আসমান যমীনের সব কিছুই খোদার। সবই তাঁর অনুগত (কুনূতকারী)।

আবার আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه ○

"কে সেই অনুগত ব্যক্তি যে সারারাত সিজদায় ও কিয়ামে নিরত থাকে, কিয়ামতকে ভয় করে এবং নিজ প্রভুর অনুগ্রহের প্রত্যাশী।"

আরও বলেনঃ

وصدقت بكلمة ربها وكتبه وكانت من القانتين ○

"এবং সে তার প্রভুর বাণীর সত্যতা মেনে নিয়েছে। সে ছিল অনুগতদের অন্যতম।" হযরত (সঃ) বলেনঃ যে নামাযে কুনূত দীর্ঘ হয়, সেটাই সর্বোত্তম নামায।

যায়েদ ইবনে আরকাম বলেনঃ যখন 'কূমু লিল্লাহি কানিতীন' আয়াত অবতীর্ণ হল (আনুগত্যের সাথে দাঁড়িয়ে থাক), তখন আমাদের কথা বন্ধ করে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হল।

হযরত আনাস (রাঃ) ফজরের জন্যেই কুনূত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তার অর্থ এ নয় যে, কুনূত বলতে কাফিরদের জন্যে বদ দো'আই ছিল আর মু'মিনদের জন্যে তাতে দো'আ ছিল না। কারণ, হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত (সঃ) এক মাস পড়ে ছেড়ে দিয়েছেন। এতে বুঝা গেল, তার পরেও যে কুনূত অব্যাহত রেখেছেন, তা কল্যাণকর কুনূত। তা ছাড়া চার খলীফা,

বারাআ ইবনে আযিব, আবু হুরায়রা, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবু মুসা আশ'আরী ও আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) প্রমুখও কুনুত পড়েছেন। এর জবাব কয়েক ভাবে দেয়া যায়।

প্রথম, হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত (সঃ) ফজরে ও মাগরিবে কুনুত পড়তেন। বুখারীও (রঃ) এর উল্লেখ করেছেন। তাতে ফজরকে এ জন্যে নির্দিষ্ট করার প্রমাণ নেই। হযরত বারাআ ইবনে আযিবও এ বর্ণনা দিতে গিয়ে ফজরকে নির্দিষ্ট করেননি। যদি তোমরা বল, মাগরিবের কুনুত মনসুখ হয়েছে। তাহলে তোমাদের কুফার প্রতিপক্ষ বলবে, ফজরের কুনুত মনসুখ হয়েছে। তোমরা মাগরিবের কুনুত মনসুখ করার জন্যে যে দলীল পেশ করবে, সেটা-কেই তারা ফজরের কুনুত মনসুখ করার জন্যে পেশ করবে। আর এটা তো কোনদিনই সম্ভব হবেনা যে, ফজরের কুনুত রেখে মাগরিবের কুনুত বাতিল করার কোন দলীল পাবে। যদি তোমরা বল, মাগরিবের কুনুত আগে অনিয়মিত ছিল, নিয়মিত কুনুত ছিলনা। তোমাদের জবাবে তখন মুহাদ্দিছরা বলবেন—হাঁ, এ অবস্থাই ফজরের কুনুতের। তা হলে দুটোয় পার্থক্য কিসে? কুফার দলও বলছে, ফজরের কুনুত নিয়মিত ছিলনা। স্বয়ং হযরত আনাসও সে খবর দিয়েছেন। অথচ নিয়মিত কুনুত সম্পর্কে তাঁকেই ভিত্তি করা হয়ে থাকে। তিনিই বলেছেন: এ ছিল বিপদকালের সাময়িক কুনুত এবং হযরত (সঃ) তা তরক করেছিলেন। সহীহদ্বয়ে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন—হযরত (সঃ) এক মাস কুনুতে নাযিলা পড়ে তা বর্জন করেন। তিনি এক আরব গোত্রের জন্যে বদ দো'আ করছিলেন, পরে তিনি তা পরিহার করেন।

দ্বিতীয়, শাবাবা-কায়েস ইবনে রবী' ও তিনি আসিম ইবনে সুলায়মান থেকে বর্ণনা করেন: আমি আনাস ইবনে মালিককে জিজ্ঞেস করলাম—একদল লোক মনে করে, হযরত (সঃ) ফজরে সর্বদা কুনুত পড়েছেন। তিনি জবাব দিলেন—তারা মিথ্যা বলে। বরং নবী (সঃ) একমাস পর্যন্ত কুনুত পড়েছেন। মুশরিকদের একটি গোত্রের জন্যে তিনি বদ দো'আ করেছিলেন।

যদিও কায়েসকে ইয়াহিয়া অনির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন, তথাপি কিছু লোক তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন।

দ্বিতীয় বর্ণনাটি হল আবু জা'ফর রাযীর। তার বর্ণনায় রয়েছে, 'হযরত (সঃ) ইন্তিকাল পর্যন্ত সর্বদা কুনুত পড়েছেন।' এটা কি করে দলীল হতে পারে? কায়েস তো তার চেয়ে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। অন্তত তার সমান তো হবেই। কারণ, আবু জা'ফরকে নির্ভরের অযোগ্য বলার লোক কায়েসকে বলার লোকের চাইতে সংখ্যায় অনেক বেশী। ইয়াহিয়া কায়েসের বর্ণনার দুর্বলতা ও তার কারণগুলো বিবৃত করেছেন।

আহমদ ইবনে সাঈদ ইবনে মরিয়াম বলেন: আমি ইয়াহিয়ার কাছে কায়েস ইবনে রাবী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে—তিনি তাকে নির্ভরের অযোগ্য বলেছেন এবং তার হাদীছ লিখতে নিষেধ করেছেন। কারণ, সে উবায়দা থেকে হাদীছ বর্ণনা করে। আদপে সে তার বদলে মনসুর থেকে হাদীছ বর্ণনা করে।

Contents

অবশ্য এ উদাহরণ দ্বারা কোন রাবীর বর্ণনা বাতিল করা যায়না। কারণ, বেশী হলে বলা যায় যে, মনসুরের স্থলে ভুলে বা সন্দেহের বশে সে উবায়দার নাম বলেছে।

তৃতীয়, হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, তিনি কুনূত পড়তেন। আর তা হযরত (সঃ) থেকেই পেয়েছেন। হযরত (সঃ) রা'আল ও জাকোয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে তা পড়তেন। সহীহদ্বয়ে হযরত আব্দুল আযীয ইবনে সুহায়েব হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন ঃ হযরত (সঃ) সত্তর ব্যক্তিকে কাজে পাঠালেন। যাদের 'কারীর' বলা হত। এক কূপের কাছে বণু সালীমের রা'আল ও জাকোয়ান শাখা তাদের বিরুদ্ধে নামল। এ কূপকে 'বী'রে মাউনা' বলে। সাহাবারা বললেন— খোদার কসম ! আমরা তোমাদের কাছে আসিনি। বরং আমরা হযরতের (সঃ) নির্দেশে একটা কাজে যাচ্ছি। তথাপি তারা সেই সাহাবাদের শহীদ করল। তাই নবী (সঃ) এক মাস অবধি ফজরের পরে কুনূত পড়তেন। এ হচ্ছে কুনূতের আদি কথা এবং আমরা তারপর আর কুনূত পড়তাম না।

এ থেকে জানা যায়, হযরত (সঃ) হামেশা কুনূত পড়তেন না। হযরত আনাস যে বলেছেন 'এ ছিল কুনূতের আদিকথা আর তা একমাস পড়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন' তাতেই প্রমাণ হয়, এ ছিল বিপদাপদের বিশেষ কুনূত। এ ভাবে তিনি এ কুনূত ইশায়ও একমাস পড়েছিলেন। তা সহীহ-দ্বয়ে ইয়াহিয়া ইবনে আবু কাছীর আবু সালমা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ হযরত (সঃ) ইশায় একমাস কুনূত পড়েন এবং তাতে এ দো'আ পড়েন ঃ

اللهم انج الوليد بن وليد اللهم انج سلمة بن هشام اللهم انج عياش بن ابى ربيعة اللهم انج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطاتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف ০

"হে খোদা ! ওলিদ ইবনে ওলিদকে মুক্তি দাও। সালমা ইবনে হিশাম ও আইয়াশ ইবনে রবীআকে মুক্তি দাও। হে খোদা ! দুর্বল মু'মিনদের মুক্তি দাও। হে খোদা ! মুযির গোত্রের ওপরে তোমার পাকড়াও কঠিনতর কর এবং তাদের ওপরে ইউসুফ গোত্রের মত দুর্ভিক্ষ অবতীর্ণ কর।"

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ 'নবীকে (সঃ) একদিন ফজরে কুনূত পড়তে না দেখে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন ঃ তোমরা যা দেখেছিলে, তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।' সুতরাং ফজরের কুনূতও সাময়িক ছিল এবং বিশেষ কারণে পড়া হত। তাই আনাস (রাঃ) তা একমাস পড়ার কথা বলেছেন।

আর হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে প্রাপ্ত বর্ণনায় বলা হয় ঃ তিনি ফজরে একমাস কুনূত পড়েছেন। এ দু'টোই সহীহ। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে হযরত ইকরামার বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ হযরত (সঃ) একমাস পর্যন্ত জুহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজরে কুনূত পড়েন। আবু দাউদ এটির উল্লেখ করেন। এও সহীহ। তিবরানী (রঃ) 'মু'জিম' এ মুহাম্মদ ইবনে

আনাস থেকে, তিনি মাতরাফ ইবনে তরীফ থেকে, তিনি আবু জুহম থেকে এবং তিনি হযরত বারাআ ইবনে আযিব থেকে বর্ণনা করেনঃ হযরত (সঃ) যে নামাযই পড়তেন তাতে দো'আ কুনুত পড়তেন।

ইমাম তিবরানী বলেন, মাতরাফ থেকে শুধু মুহাম্মদ ইবনে আনাসই হাদীছ বর্ণনা করেন। যদিও সূত্রতা বিচারে দলীল হবার যোগ্যতা রাখেনা, তথাপি অর্থের দিক থেকে সঠিক। কারণ, কুনুত দো'আকে বলে। এটা তো জানা কথা যে, হযরত (সঃ) এমন কোন নামায ছিলনা যাতে দো'আ না পড়তেন। আবু জা'ফরের রিওয়ায়েত যদি সঠিক হয়, তা হলে তাতেও আনাসের (রাঃ) বক্তব্য এটাই। আমার এতে সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র যে, তিনি ইন্তিকাল পর্যন্ত ফজরে সর্বদা দো'আ পড়তেন।

চতুর্থ, হযরত আনাসের সব বর্ণনা ধারাই উদ্দেশ্যকে সুস্পষ্ট করে তোলে। এক অংশ আরেক অংশের সমর্থন জানায় এবং পরস্পর বিরোধী নয়। সহীহদ্বয়ে হযরত আসিম আহওয়াল থেকে বর্ণিত আছেঃ তিনি আনাস ইবনে মালিকের কাছে ফজরের কুনুত সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি জবাব দিলেন—হাঁ (পড়তে হবে)। আমি জিজ্ঞেস করলাম রুকুর আগে? জবাব দিলেন—হাঁ, আগে। তখন বললামঃ অমুক আমাকে বলেছে, আপনি নাকি বলেছেন, হযরত (সঃ) রুকুর পরে কুনুত পড়তেন? তিনি জবাবে বললেনঃ মিথ্যে কথা। আমি বরং বলেছি, তিনি একমাস রুকুর পরে পড়েছিলেন।

একদলের ধারণা, হাদীছটি ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, সে একাই এরূপ হাদীছ বলেছেন। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য সব হাদীছ এর বিপরীত প্রমাণ দেয়। জবাব এইঃ আসিম নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। সে শুধু দু'কুনুতের দু'টি স্থানের উল্লেখ করে আনাসের (রাঃ) অনুসারীদের সাথে বিরোধ সৃষ্টি করেছেন। হাফিজ এটাকে ধারণামাত্র বলেছেন। জাওয়াদ কাতিল বলেছেন, ইমাম আহমদ এটাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। বস্তুত, ইছরাম বলেনঃ আমি আবু আব্দুল্লাহ অর্থাৎ আহমদ ইবনে হাম্বলকে প্রশ্ন করলাম—আসিম আহওয়াল ছাড়া রুকুর আগে নবীর কুনুত পড়ার কথা আর কেউ বলেছে কি? তিনি জবাব দিলেন—সেরূপ আর কাউকে জানিনা। সব রিওয়ায়েতই আসিমের বিরুদ্ধে প্রমাণ দেয়। হিশাম কাতাদার মাধ্যমে আনাস (রাঃ) থেকে, তায়মী আবু জা'ফরের মাধ্যমে আনাস (রাঃ) থেকে, আইয়ুব মুহাম্মদের মাধ্যমে আনাস (রাঃ) থেকে, এবং হাঞ্জালা সাদোসী চার সূত্রে আনাস (রাঃ) থেকে হযরতের (সঃ) রুকুর পরে কুনুত পড়ার কথা বর্ণনা করেন। এখন রইল আসিমের বর্ণনা। আমি তার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করায় সে মিথ্যা বলেছে বলে জানিয়েছেন। আরও বলেছেনঃ নবী (সঃ) রুকুর পরে একমাস কুনুত পড়েছেন। তাকে প্রশ্ন করা হলঃ আসিম থেকে কারা বর্ণনা করেছে? তিনি জানালেনঃ আবু মুআবিয়া প্রমুখ। তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হলঃ সব বর্ণনায়ই কি রুকুর পরে বলা হয়েছে? তিনি বললেনঃ সবই; বরং খাযফাফ ইবনে ঈসা ইবনে রুখসা ও আবু হুরায়রা

থেকেও সব বর্ণনাই এরূপ। আবার তাঁকে প্রশ্ন করলাম ঃ তা হলে রুকুর আগে কুনূত পড়ার অনুমতি দেয় কি করে? তিনি জবাব দিলেন ঃ ফজরের কুনূত রুকুর পরেই এবং বিতরের কুনূত ঐচ্ছিক। কারণ, সে ব্যাপারে হযরতের সাহাবাদের ভেতরে মতানৈক্য প্রকাশ পেয়েছে। এখন থাকে ফজরে রুকুর পরে পড়ার প্রশ্ন। বলতে হয়, সে সব সহীহ হাদীছের ত্রুটি আবিষ্কার বিস্ময়কর! কারণ, সেগুলোর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সবাই একমত। ইমামরা সে সব রাবীদের স্মৃতি শক্তিকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আবু জা'ফর রাযী, কায়েস ইবনে রবী, আমর ইবনে আইয়ুব, আমর ইবনে উবায়েদ, দীনার ও জা'ফর জা'ফীর বর্ণনাকে সবাই দলীলযোগ্য বলেছেন।

মোট কথা, হযরত আনাসের (রাঃ) সব হাদীছই সঠিক ও একে অপরের সহায়ক। সেগুলোয় পরস্পর বিরোধ নেই। তাতে রুকুর পরে যে কুনূতের কথা বলা হয়েছে, তা রুকুর আগের কুনূত থেকে আলাদা। তার সময়ও আলাদা। রুকুর আগে যা, তার মানে হচ্ছে কিরাআতের জন্যে লম্বা কিয়াম। নবী (সঃ) যে সম্পর্কে বলেন ঃ লম্বা কুনূতের (কিয়ামের) নামাযই উত্তম নামায। আর যে কুনূত রুকুর পরে হত, তা হচ্ছে দো'আর জন্যে দীর্ঘ কিয়াম। হযরত (সঃ) একদলের কল্যাণ ও অন্যদলের অকল্যাণ চেয়ে একমাস এ কুনূত পড়েছিলেন। তারপর তিনি এ রুকনটি 'দো'আ' ও 'ছানা' পাঠের জন্যে আমরন লম্বা রেখে গেছেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত ছাবিত হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের সেরূপ নামায পড়াব যেরূপ হযরত (সঃ) আমাদের পড়িয়েছেন।' ছাবিত বলেন ঃ 'আনাস (রাঃ) নামাযে এমন একটা কাজ করে গেছেন, যা আজ তোমরা করছ না। যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, সোজা দাঁড়িয়ে থাকতেন। এমনকি লোকে বলাবলি করত, হয়ত ভুলে গেছেন। এই হচ্ছে কুনূত যা আমরণ হযরত (সঃ) করে গেছেন।' আর এটাতো জানা কথা যে, এ দীর্ঘ সময়ে তিনি চুপচাপ থাকতেন না। বরং নিজ প্রভুর জন্যে গুণগান করতেন ও দো'আ পড়তেন। এ দো'আ অবশ্যই সেই একমাসের বিশেষ কুনূত ছিলনা। কারণ তা ছিল একদলের জন্যে বদ দো'আ ও অপরদলের জন্যে দো'আ।

এখন থাকে ফজর নামাযের সাথেই একে জুড়ে দেয়ার ব্যাপারটি। সেটা ছিল প্রশ্নকর্তার চাহিদা পূরণের জবাব। কারণ, সে ফজরের কুনূত সম্পর্কেই প্রশ্ন করেছিল। তিনি তার জবাব দিয়েছেন। অন্য নামাযের চাইতে হযরত (সঃ) ফজর নামায দীর্ঘ করতেন। ষাট থেকে একশ আয়াত পড়তেন। বারাআ ইবনে আযিবের বর্ণনায় তাই বলা হয়েছে, হযরতের (সঃ) রুকু, কিয়াম, সিজদা সবই প্রায় সমান সময় নিত। অন্যসব নামাযের চাইতে ফজরে হযরতের যে দীর্ঘ কিয়াম সর্বজন বিদিত, সেটাই হচ্ছে তাঁর কুনূত। এতে আমাদের কখনও সন্দেহ দেখা দেয়নি, দিবেও না। হযরত (সঃ) আমরণ যে দো'আ কুনূত পড়ে গেছেন, সর্ব সাধারণ মুসলমান ও ধর্মবেত্তাদের মুখে তা শুনতে পাই এরূপ ঃ আল্লাহুম্মাহ্‌দিনী ফীমান হাদাইতা—ইত্যাদি।

এটাই হযরত (সঃ) সর্বদা ফজরে পড়তেন। পরে খুলাফায়ে রাশেদীন ও সাহাবাদের একদল কুনুত বলতে দো'আ কুনুতই শুধু পাঠ করতেন। তাই তা ছাড়া অন্যসব দো'আ আর কুনুত নামে পরিচিত হলনা। সন্দেহ নেই, হযরত (সঃ) ও তাঁর সাহাবারা সে দো'আ প্রতি ফজরে পড়তেন। অথচ এ নিয়েই অধিকাংশ ধর্মবেত্তার ভেতরে মতানৈক্য দেখা দিল। তাঁরা বললেন—কুনুত পড়া হযরতের নিয়মিত ব্যাপার ছিলনা। তিনি তা আদৌ করেছেন কিনা তারও প্রমাণ নেই। এ ব্যাপারে বেশী হলে একটিমাত্র বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত (সঃ) হাসান ইবনে আলীকে উপরোক্ত দো'আ শিখিয়েছিলেন। মুসনাদ ও চার সুনানে এর উল্লেখ রয়েছে। তিরমিজী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। আরও বলেছেন, কুনুতের ব্যাপারে হযরত (সঃ) থেকে এর চেয়ে ভাল হাদীছ আর নেই।

হযরত হাসান বলেনঃ আমাকে হযরত (সঃ) বিতরের নামাযে পড়ার জন্যে এ দো'আ শিখিয়েছেনঃ 'আল্লাহুম্মাহ্দিনী——তাবারাকতা রাব্বানা ওয়া তা'আলায়তা।' ইমাম বায়হাকী শেষে যোগ করেছেন "লায়ুজাল্লু মান ওয়াল্লায়তা ওয়ালা য়্যুআযযু মা আদায়তা' (তোমার বন্ধু লাঞ্ছিত হবে না ও তোমার শত্রু মর্যাদা পাবেনা)।

হযরত আনাসের যে বর্ণনায় রুকুর পরে কুনুত বলা হয়েছে, তা হচ্ছে দো'আ ও ছানা'র জন্যে কিয়াম। সুলায়মান ইবনে হারব এরূপ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমাকে আবু হিলাল ও তাকে হযরত কাতাদার মসজিদের ইমাম হাঞ্জালা (আমার মতে সাদোসী) এ কথা বলেনঃ আমি ও কাতাদা নামাযে কুনুতের স্থান নিয়ে একমত হতে পারলাম না। তিনি বললেন, রুকুর আগে এবং আমি বললাম রুকুর পরে। অবশেষে আমরা হযরত আনাসের (রাঃ) কাছে গেলাম। তিনি বললেনঃ "আমি হযরতের (সঃ) পেছনে ফজর নামায পড়েছিলাম। তিনি তাকবীর বলে রুকু করলেন। তারপর মাথা তুলে দাঁড়ালেন, তারপর সিজদায় গেলেন। সিজদা থেকে উঠে দ্বিতীয় রাকআতের জন্যে দাঁড়ালেন, আবার তাকবীর বলে রুকু করলেন। রুকু থেকে মাথা সোজা করে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর সিজদায় গেলেন।"

এ বর্নাটি হযরত ছাবিতের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং কুনুত সম্পর্কে হযরত আনাসের (রাঃ) ধারনাটি খুলে ধরে। তিনি এটা পরিষ্কার বলে দিলেন, রুকুর পরের কুনুত, কিয়াম লম্বা ছিল। এটাই আনাসের (রাঃ) কুনুত সম্পর্কিত ধারণা। সুতরাং সব হাদীছে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হল।

এখন রইল সাহাবাদের বর্ণনা। তা দু'ধরনের। একটি হল বিপদের জন্যে কুনুত। যেমনঃ মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের সাথে কিংবা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের লড়াইয়ের সময় হযরত আবু বকরের (রাঃ) কুনুত এবং মুআবিয়া ও সিরিয়াবাসির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময়ে হযরত আলীর (কঃ) কুনুত। দ্বিতীয়টি হল সাধারণ কুনুত। নামাযের ভেতরে লম্বা কিয়ামে খোদার গুণগান ও নিজেদের কল্যাণ কামনা হল সেই কুনুত।

Contents

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

●

ভুলের সিজদা

নবী (সঃ) থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, তিনি বলেছেন যে, আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। তোমাদের যেরূপ ভুল হয়, তেমনি হয় আমারও। তাই যখনই আমার ভুল হবে, স্মরণ করিয়ে দিও।

নামাযে তাঁর ভুল মূলত তাঁর উম্মতের ওপরে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও নিআমত পূর্ণ হবার একটা উসিলা বৈ কিছু ছিলনা। উম্মতের ভুল সংশোধনের খোদা-নির্ধারিত ব্যবস্থা তাঁরই অনুসরণ করে তারা শিখবে। মুআত্তায় সূত্রছিন্ন এক বর্ণনায় রয়েছে—আমি ভুলে যাই কিংবা ভুলানো হয়, যেন তার উপায় খুলে ধরি। বস্তুত, হযরতের (সঃ) ভুলের কারণেই ভুল সংশোধনের বিধান গড়ে উঠল। তা মহাপ্রলয় পর্যন্ত উম্মতের জন্যে জারী থাকবে।

একবার হযরত (সঃ) চার রাকআতের নামাযে দু'রাকআত পড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং প্রথম তাশাহহুদে বসলেন না। যখন নামায শেষ হল, সালাম ফিরাবার আগে দু'টি সিজদা করে সালাম ফিরালেন। এ থেকেই উম্মতরা একটা রীতি জেনে নিল যে, আরকান ছাড়া নামাযে অন্য কিছু যদি ভুলে বাদ পড়ে যায়, তা হলে সালামের আগে ভুলের সিজদা দিলেই চলবে।

কোন কোন রিওয়ায়েত থেকে প্রমাণ মিলে যে, যদি তিনি একটি রুকন ভুল করে অন্য রুকনে চলে যেতেন, তখন সেটা থেকে ফিরে পূর্ব রুকনে আসতেন না। যখন তিনি প্রথম তাশাহহুদ ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন, সাহাবারা 'সুবহানাল্লাহ' বলা সত্ত্বেও তিনি তাদের দাঁড়িয়ে যেতে ইংগিত করলেন।

তাঁর এ ভুলের স্থানটি নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। সহীহদ্বয়ে আবদুল্লাহ ইবনে বুহাইনা থেকে বর্ণিত আছেঃ হযরত (সঃ) জুহরের নামাযে দু'রাকআতের পরে না বসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। যখন নামায শেষ করলেন, দু'টি সিজদা করে নিয়ে সালাম ফিরালেন। এক সর্ব-সম্মত হাদীছ মতে, তিনি সালামের আগে বসা অবস্থায় প্রতিবারে তাকবীর বলে সিজদা করেন। মুসনাদে হযরত ইয়াযীদ ইবনে হারুণ থেকে, তিনি সাউদী থেকে এবং তিনি যিয়াদ ইবনে আলাকা থেকে একটি রিওয়ায়েত উধৃত করেন। যিয়াদ বলেনঃ হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা আমাদের নামায পড়ান। যখন তিনি দু'রাকআত পড়ালেন, না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। মুক্তাদীরা 'সুবহানাল্লাহ' বলে উঠল। তিনি তখন তাদের ইংগিতে দাঁড়াতে বললেন। তিনি যখন নামায পূর্ণ করলেন, সালাম ফিরালেন। তারপর দু'সিজদা দিয়ে আবার সালাম ফিরালেন। তারপর বললেনঃ হযরত (সঃ) এভাবে করেছেন। তিরমিজী এ বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

ইমাম বায়হাকী আবদুর রহমান ইবনে শিমাসা মুহরীর একটি বর্ণনা উধৃত করেন। আবদুর রহমান বলেন ঃ "হযরত উকবা (রাঃ) ইবনে আমের জুহনী আমাদের নামায পড়িয়েছেন। তাঁর যেখানে বসার ছিল, দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন সবাই 'সুবহানাল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' বলতে লাগলো। হযরত উকবা (রাঃ) বসলেন না। নামায চালিয়ে গেলেন। অবশেষে নামাযের শেষ অংশে পৌঁছে তিনি বসে বসে দু'সিজদা দিলেন। তারপর সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ আমি তোমাদের 'সুবহানাল্লাহ' পড়তে শুনেছি, যা আমাকে বসাবার জন্যে পড়েছ। অথচ আমি যা করেছি সেটাই সুন্নাত।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়নার বর্ণনাটি তিনটি কারণে উত্তম। প্রথম, হযরত মুগীরার (রাঃ) বর্ণনা থেকে তা বেশী নির্ভুল। দ্বিতীয়, বেশী স্পষ্ট। কারণ, মুগীরা (রাঃ) নিজে করে বলেছেন, রসূল (সঃ)এরূপ করেছেন। তাই তাঁর তখনকার কৃত সবকিছুই তাতে বুঝাতে পারে। কখনও নবী (সঃ) সালামের আগে এক সিজদা ও পরে এক সিজদা দিয়েছেন। সুতরাং ইবনে বুহায়না যা দেখেছেন, তাই বলেছেন আর মুগীরা যা দেখেছেন, তা বলেছেন। এ হিসেবে দু'-টোই জায়েয। এও হতে পারে, হযরত মুগীরা এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত (সঃ) দাঁড়িয়ে যাবার পরে ফিরে আর বসেননি। তারপর ভুলের সিজদা দিয়েছেন। তৃতীয়, মুগীরা (রাঃ) হয়ত সালামের আগের সিজদার কথা ভুলে গেছেন। তাই পরের সিজদা করেছেন। এটা ভুলের সিজদা। তাই তা সালামের আগে হওয়ার ধারণা কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। ভুলের সিজদার অবস্থা পাঁচটি।

১। হযরত (সঃ) একবার ইশা, জুহর কিংবা আসরের দু'রাকআত পড়ে সালাম ফিরিয়ে কিছু কথাও বললেন, তারপর নামায পূর্ণ করে আবার সালাম ফিরালেন। তারপর ভুলের দু'-সিজদা দিলেন। তিনি জোরে তাকবীর বলে সিজদায় গিয়ে আবার জোরে তাকবীর বলে মাথা তুললেন। এভাবে দু'সিজদা দিলেন।

২। আবু দাউদ ও তিরমিজীতে বর্ণিত হয়েছে ঃ নবী (সঃ) সবাইকে নামায পড়ালেন। তারপর দু'বার সিজদা করে তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরালেন। ইমাম তিরমিজী হাদীছটিকে হাসান ও গরীব বলেছেন।

৩। একবার হযরত (সঃ) আসরের তিন রাকআত নামায পড়িয়ে ঘরে চলে গেলেন। সাহাবারা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি ফিরে এসে বাকী রাকআত পড়ে দু'টি ভুলের সিজদা করলেন।

৪। একবার তিনি এক রাকআত কম নামায পড়িয়ে চলে যাচ্ছিলেন। তখন তালহা (রাঃ) আরয করলেন ঃ 'আপনি নামাযে এক রাকআত ভুল করেছেন।' তা শুনে তিনি ফিরে এসে মসজিদে ঢুকলেন এবং বিলালকে নির্দেশ দিলেন ইকামাতের জন্যে। তারপর তিনি দ্বিতীয়বার নামায পড়ালেন। ইমাম আহমদ এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেন।

৫। একবার তিনি জ্‌ুহরের চার রাকআতের স্থলে পাঁচ রাকআত পড়েন। যায়েদ (রাঃ) ইংগিতে জানালে তিনি সবাইকে প্রশ্ন করলেন—কি ব্যাপার ? সবাই জানাল, আপনি পাঁচ রাকআত নামায পড়েছেন। তা শ্‌ুনে তিনি সালামের পরে দ্‌ু'টি সিজদা দেন এবং আবার সালাম ফিরান।

ভুলের সিজদা সম্পর্কে যে পাঁচলি বর্ণনা রয়েছে তা এই।

হযরত (সঃ) ভুলের সিজদা সালামের আগেও করেছেন এবং পরেও করেছেন। ইমাম শাফেঈর (রঃ) ধারণা, তিনি সব ভুলের সিজদাই সালামের আগে করেছেন। ইমাম আব্‌ু হানীফা (রঃ) বলেন, হযরত (সঃ) ভুলের সিজদা যতবার করেছেন, সালামের পরেই করেছেন।

ইমাম মালিক (রঃ) বলেন—যখন হযরত (সঃ) নামাযে কোন ভুল করেছেন, অর্থাৎ কোন রাকআত কম পড়েছেন, তখন সালাম ফিরাবার আগে ভুলের সিজদা করেছেন। কিন্তু, যদি কোন রাকআত বেশী পড়েছেন, তা হলে সালাম ফিরানোর পরে সিজদা করেছেন। যদি কোন নামাযে দ্‌ু'টো ভুলই একত্রে করেছেন, তখন সালাম ফিরাবার আগে সিজদা করেছেন। আব্‌ু উমর বলেন ঃ এটাই তাঁর মাজহাব। যদি তাঁর কাছে কেউ এর ব্যতিক্রম করত, তাতেও তিনি কিছ্‌ু ভাবতেন না। কারণ, তার কাছে এটায় মতভেদের অবকাশ রয়েছে।

ইছরাম বলেন ঃ ইমাম আহমদকে (রঃ) ভুলের সিজদা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল যে, তা কি সালাম ফিরাবার আগে দিতে হবে, না পরে ? তিনি জবাব দিলেন—কোন ক্ষেত্রে আগে এবং কোন ক্ষেত্রে পরে। হযরতের কাজ থেকে এটাই প্রমাণিত হয়।

তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় রাকআতে যদি কেউ সালাম ফিরিয়ে বসে, তা হলে 'জ্‌ুল য়্যদায়েন' সম্পর্কিত আব্‌ু হ্‌ুরায়রার হাদীছ ও আমর ইবনে হিসীনের হাদীছ অন্‌ুসারে সালামের পরে ভুলের সিজদা আদায় করবে। যদি কেউ দ্‌ু'রাকআতের পরে না বসে দাঁড়িয়ে যায়, ইবনে ব্‌ুহায়নার হাদীছ অন্‌ুসারে সালামের আগে ভুলের সিজদা দান করবে। সংশয়ের ক্ষেত্রে আব্‌ু সাঈদ আল খ্‌ুদরীর ও আব্দ্‌ুর রহমান ইবনে আউফের হাদীছ অন্‌ুসারে সালামের আগে ভুলের সিজদা দেবে।

ইছরাম বলেন ঃ ইমাম আহমদকে প্রশ্ন করলাম, এ ছাড়া অন্যান্য ভুলের জন্যে কখন সিজদা করতে হবে ? জবাব দিলেন—আর সব ভুলের জন্যে সালামের আগেই করতে হবে। কারণ, এ সিজদা নামাযের ক্ষতি প্‌ুরণের জন্যে। যদি নবী (সঃ) থেকে কোন রিওয়ায়েত না পেতাম, সবগ্‌ুলোই আমি সালামের আগে করতাম। কারণ, নামায শেষ করার আগেই ক্ষতিপ্‌ুরণ প্রয়োজন। তাই নবী (সঃ) থেকে যেক্ষেত্রে সালামের পরে সিজদা বর্ণিত আছে, সে সব ক্ষেত্র ভিন্ন সবগ্‌ুলোই আমার মতে সালামের আগে হবে।

আব্‌ু দাউদ বলেন, হযরত (সঃ) যে পাঁচটি ব্যাপারে ভুলের সিজদা করেছেন, তা ছাড়া আর কোন কারণে তা করা চলবেনা।

সংশয়ের ব্যাপারে হযরত (সঃ) ফিরে নামায পড়েননি। বিশ্বাস যেদিক চাপবে, সে অনুসারে নামায সম্পাদন করে সালামের আগে সিজদা করবে। ইমাম আহমদ বলেন, সংশয় দু'ধরনের হয়, একীন ও তাহার্রী। একীনের ক্ষেত্রে সালামের আগে সিজদা দিবে। আবু সাঈদ খুদরীর হাদীছ তাই বলে। আর তাহার্রীর ক্ষেত্রে সালামের পরে দিবে। ইবনে মাসউদের হাদীছে তার সমর্থন মিলে।

আবু সাঈদ আল খুদরীর হাদীছ বলছেঃ যদি তোমাদের কেউ নামাযের ভেতরে সংশয়ে পড়ে যাও, তিন রাকআত পড়েছ না চার রাকআত পড়েছ তা ঠিক করতে না পার, তখন একটা নিশ্চিত ধারণায় পেঁছে সেটা করে সালামের আগে দু'টো সিজদা দিবে।

ইবনে মাসউদের হাদীছ বলছেঃ তোমাদের কারুর যদি নামাযে সংশয়ের উদ্রেক হয়, তখন একটা ঠিক ধরে নিয়ে নামায সমাপনান্তে সালাম ফিরিয়ে দু'টো সিজদা দিবে।

সহীহদ্বয়ে হাদীছ দু'টোর উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আহমদ এ মতই গ্রহণ করেছেন। তার মতে কেউ ইমাম অবস্থায় যদি ভুল করে, তাহলে যেদিকে বিশ্বাস চাপবে, সেটা করে সালামের পরে সিজদা দিবে। এটাই তাহার্রী। আর কেউ যদি একা নামায পড়ে, তা হলে একটা নিশ্চিত ধারণায় পেঁছে তা করে সালামের আগে সিজদা দিবে।

হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী অধিকাংশ সাহাবার মত এরূপ। ইমাম আহমদ থেকে আরও দু'টি রিওয়ায়েত রয়েছে। একটা হল পুরোপুরি একীনের ওপরে ভিত্তি করা। ইমাম শাফেঈ ও মালিক (রঃ) এ মতের সমর্থক। আরেকটি হল, ধারণা যেদিকে চাপে, সেটাকে ভিত্তি করা। হাদীছ দু'টো এ পার্থক্যের প্রমাণ দেয়। একটি হচ্ছে, বিশ্বাস ভিত্তিক সংশয়। আরেকটি হচ্ছে, ধারণা ভিত্তিক সংশয়। দ্বিতীয়টিকে তাহার্রী করতে হয়। সংশয় সম্পর্কিত হাদীছ দু'টো এ দু'টির ওপরে নির্ভরশীল। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেনঃ যদি এ অবস্থাটি এই প্রথম বারে দেখা দেয়, তাহলে নামায নতুন করে পড়বে। আর যদি বারংবার ঘটে, তাহলে ধারণা যেদিকে চাপবে, সেটাই করবে যদি তা বিশ্বাসের পর্যায়ে নাই পেঁছে।

নামাযে চোখ বন্ধ করা

এটা বলা হয়েছে যে, হযরত (সঃ) তাশাহহুদে দো'আ পড়ার সময়ে আংগুলের দিকে তাকাতেন। সে দৃষ্টি ইশারার আংগুলের বাইরে যেতনা। বুখারীতে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে একটি পর্দা ছিল। সেটাকে তিনি ঘরের বিশেষ দিকে টানিয়ে নিতেন। হযরত (সঃ) সেটিকে সরিয়ে ফেলতে বললেন। কারণ স্বরূপ বললেন—এর ওপরে ছবি সর্বদা আমার নামাযে বাধ সাধে। যদি তিনি নামাযে চোখ বুজে থাকতেন, তা হলে তো তা বাধ সাধতনা।

এ হাদীছ থেকে প্রমাণ করা অবশ্য প্রশ্ন সাপেক্ষ। কারণ, সে ছবিই তো নামাযের অন্তরায় হতে পারে তা তিনি দেখুন বা না দেখুন। অথবা সেটা দেখাও অন্তরায় হতে পারে। দু'টোরই সম্ভাবনা রয়েছে। হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণনায় যেটা পরিস্কার হয়েছে তা এই, 'হযরত (সঃ) চিত্র অংকিত একটি চাদরে নামায পড়লেন। যখন তিনি নামায শেষ করলেন, বললেন চাদরটি আবু জুহমের কাছে নিয়ে যাও এবং তার চাদর আমাকে এনে দাও। কারণ, প্রারম্ভে এটি আমার নামাযের অন্তরায় হয়েছিল।' এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, সেদিকে তাঁর লক্ষ্য আকৃষ্ট হওয়ায়ই নামাযে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা বলে জিহাদের প্রয়োজনে প্রেরিত অশ্বারোহীর দিকে তাকানোর ব্যাপারটিকে নামাযের অন্তরায় বলা চলবেনা। কারণ, সেটা বিশেষ ক্ষেত্রের বিশেষ ঘটনামাত্র। জিহাদের গুরুত্ব প্রকাশের জন্যেই তা করেছিলেন।

তেমনি হযরতের (সঃ) সূর্য গ্রহণের নামাযে জান্নাত দেখতে পেয়ে তার আংগুর ছেড়ার জন্যে হাত তোলা, জাহান্নাম দর্শন ও তার ভেতরে বিড়ালের মালিক ইত্যাদি দেখা, নামাযের সামনে থেকে চতুষ্পদ জন্তু সরিয়ে দেয়া ও ছেলে মেয়েদের দূর করা, নামাযে সালামের জবাব দেয়া ও শয়তান দেখা ইত্যাদি হাদীছগুলো নামাযে তাঁর চোখ খোলা থাকারই প্রমাণ দেয়।

তবে ফিকাহবিদরা চোখ বন্ধ রাখার ব্যাপারে মতৈক্যে পেঁৗছেন নি। ইমাম আহমদ সেটাকে মাকরূহ বলেছেন। তাঁর মতে তা হচ্ছে ইয়াহুদীর কাজ। একদল সেটাকে মুবাহ বলেন। তাদের মতে তার ফলে কখনও নামাযে অধিক মনোনিবেশ ঘটে। নামাযের প্রাণই হচ্ছে মনঃসংযোগ। তবে এ ব্যাপারে সঠিক মত এটাই হতে পারে যে, যদি চোখ খোলা থাকায় নামাযে ক্ষতি না হয়, তাহলে সেটাই উত্তম। আর যদি তার ফলে অন্যকিছুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ও নামাযে চিত্তসংযোগের ক্ষেত্রে অন্তরায় দেখা দেয়, তা হলে অবশ্যই চোখ বন্ধ করা মাকরূহ নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বরং বন্ধ রাখাই শরীআতের উদ্দেশ্য ও নিয়ম-নীতির বিচারে উত্তম।

●

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

●

নামাযোত্তর কার্যাবলী ও দো'আ

হযরত (সঃ) নামায শেষ করে কিভাবে বসতেন, কত তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করতেন ও উম্মতের জন্যে কি কি দো'আ করতেন, এ পরিচ্ছেদে সেটাই আলোচ্য বিষয়।

হযরতের (সঃ) অভ্যাস ছিল সালাম ফিরিয়েই তিনি তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করতেন। তারপর পড়তেন ঃ

اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ০

"হে খোদা' তোমার নাম শান্তি। তোমাতেই শান্তি। হে প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ! বরকত তোমাতেই নিহিত।"

এতটুকু বলা পর্যন্ত কিবলামুখী থেকে সংগে সংগে মুক্তাদীর দিকে ফিরতেন। ডানে বামে চেহারা মুবারক ফিরিয়ে নিতেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, কয়েকবার আমি তাঁকে বাম দিকে ফিরে থাকতে দেখেছি। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন—আমি তাঁকে বেশীর ভাগ ডান দিকেই ফেরা দেখেছি।

প্রথম বর্ণনাটি সহীহদ্বয়ে রয়েছে। দ্বিতীয়টি শুধু মুসলিম শরীফে রয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন—আমি হযরতকে (সঃ) নামাযে ডানে ও বামে চেহারা ফিরাতে দেখেছি। তারপর তিনি সোজাসুজি মুক্তাদিদের দিকেই ফিরতেন, অন্য কোন দিকে নয়। আর যখন তিনি ফজর পড়ে নিতেন, মুসাল্লায় সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে থাকতেন। প্রত্যেক ফরজ নামাযের পরে তিনি এ দো'আ পড়তেন ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على
كل شئ قدير ০ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت
ولا ينفع ذا الجد من الجد ০

'একক খোদা ভিন্ন অন্য কোন প্রভু নেই। তাঁর কোন অংশী নেই। রাজকীয় অধিকার আর প্রশংসা বলতে সবই তাঁর। সর্বোপরি তিনিই ক্ষমতাবান। হে খোদা ! তুমি দান করলে তা কেউ ঠেকাতে পারেনা আর তুমি না দিলে কেউ দিতেও পারেনা। কোন মর্যাদাবানের মর্যাদাই তোমার মোকাবেলায় কোন কল্যাণে আসেনা।"

আবার পড়তেন ঃ

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ○ ولا حول ولا قوة إلا بالله ـ لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ـ له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ـ مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ○

"আল্লাহ ছাড়া প্রভু নেই। তিনি একক ও অংশীহীন। রাজত্ব তাঁর ও প্রশংসা তাঁরই। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ছাড়া আমার কোন ভরসাস্থল বা শক্তি নেই। তাঁকে ছাড়া আমি আর কারো ইবাদত করিনা ও তিনি ছাড়া কোন প্রভু নেই। নিআমত তাঁর, বখশিস তাঁর, প্রশংসাও তাঁর। তিনি ছাড়া প্রভু নেই। তাঁকে ছাড়া আমরা কারো ইবাদত করি না। আমরা দ্বীনের জন্য নিবেদিত, কাফিরদের যদিও তাতে অন্তর্দাহ দেখা দেয়।"

ইমাম আবু দাউদ হযরত আলী (কঃ) ইবনে আবি তালিব থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূল (সঃ) নামায থেকে সালাম ফিরিয়ে অবসর হয়ে এ দো'আ পড়তেন ঃ

اللهم اغفرلي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت الاخر لا إله إلا انت ○

"হে আল্লাহ! আমার সামনে ও পেছনের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব পাপ মাফ কর। তুমিই সব ভাল জান। অতীতও তুমি আর ভবিষ্যতও তুমি। তুমি ছাড়া কোন প্রভু নেই।"

হযরত আলীর (কঃ) লম্বা রিওয়ায়েতের এ হচ্ছে একটি অংশ। ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরতের (সঃ) নামাযের প্রারম্ভ সম্পর্কিত বর্ণনায় এর উল্লেখ করেছেন। এ দো'আ তিনি রুকু ও সিজদায় পড়তেন। এ সম্পর্কে ইমাম মুসলিম (রঃ) দু'টি মত পোষণ করেন। একটি হচ্ছে, হযরত (সঃ) তাশাহহুদ ও সালামের মাঝখানে এ দো'আটি পড়তেন। এটাই সঠিক মত। দ্বিতীয়টি হল, তিনি সালাম ফিরিয়ে পড়তেন। সম্ভবত দু'জাগায়ই তিনি পড়তেন। খোদাই সর্বজ্ঞ।

ইমাম আহমদ (রঃ) যায়েদ ইবনে আরকামের এক বর্ণনা উধৃত করেন। তাতে বলা হয়, হযরত (সঃ) প্রত্যেক নামাযের পরে এ দো'আ পড়তেন ঃ

اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد انك الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان محمد ا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان العباد كلهم اخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك واهلي

Contents

فی کل ساعة من الدنیا والاخرة یاذا الجلال والاکرام اسمع واستجب الله اکبر الله اکبر الله نور السماوات والارض الله اکبر الاکبر حسبی الله ونعم الوکیل الله اکبر الله اکبر ٥ (ابوداؤد)

"হে আল্লাহ! হে আমাদের, ও সবকিছুর প্রতিপালক! আমি সাক্ষী, নিশ্চয় তুমি একক প্রভু! তোমার কোন অংশীদার নেই। হে আল্লাহ! হে আমাদের ও সকল কিছুর প্রতিপালক! আমি সাক্ষী, নিশ্চয় মুহাম্মদ তোমার বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! হে আমাদের ও সবকিছুর প্রতিপালক! আমি সাক্ষী, নিশ্চয় বান্দারা সব ভাই ভাই। হে আল্লাহ! হে আমাদের ও অন্য সবকিছুর প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবারকে দুনিয়া ও আখিরাতের প্রতি মুহূর্তে তোমার নিঃস্বার্থ দাস বানাও। হে মহা প্রতাপান্বিত ও মহা মর্যাদাশীল প্রভু। আমার আবেদন শ্রবণ কর ও কবুল কর। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। ভূমণ্ডল ও নভমণ্ডলের আলো দাতা। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। আর কত উত্তম সেই অভিভাবক। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ! (আবু দাউদ)।

সকল উম্মতের জন্যে প্রত্যেক নামাযের পরে তেত্রিশবার 'সুবহানাল্লাহ' তেত্রিশ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' তেত্রিশ বার 'আল্লাহ আকবার' পড়ে 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর' দ্বারা একশ পূর্ণ করা মুস্তাহাব। অপর রিওয়ায়েতে 'আল্লাহু আকবার' চৌত্রিশবার পড়ে একশ'পূর্ণ করার কথা রয়েছে।

অন্য এক রিওয়ায়েতে পঁচিশ বার 'তাসবীহ', পঁচিশ বার 'তাহমীদ', পঁচিশ বার 'তাকবীর'ও পঁচিশ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর' পড়তে বলা হয়েছে।

আরেকটি পদ্ধতি এরূপ বলা হয়েছেঃ তাসবীহ দশবার, তাহমীদ দশবার ও তাকবীর দশবার ও অন্য এক পদ্ধতিতে এগার বারের কথা বলা হয়েছে। সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রার এক রিওয়ায়েতে প্রতি নামাযের পরে তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর এগারবার করে তেত্রিশবার পড়ার কথা বলা হয়েছে। এ থেকে বুঝা যায়, এ হচ্ছে বর্ণনাকারীদের ব্যাখ্যা জনিত নাক গলানোর ফল।

এর বিশ্লেষণ এ ভাবে করা যায় যে, হাদীছেই এ কথা আছে যে, "প্রত্যেক নামাযের পরে তাসবীহ, তাহমীদ ও তাকবীর তেত্রিশ বার পড়বে।" এর অর্থ ছিল এই, প্রত্যেকটি তেত্রিশবার পড়বে। কারণ, এ হাদীছের রাবী মুসা সালেহ থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন। সালেহ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার এমন ভাবে বল যেন প্রতিটি তেত্রিশবার বলা হয়।

এখন রইল এগারবার নির্দিষ্ট করার ব্যাপার। জিক্‌রের ক্ষেত্রে এর উদাহরণ মিলে না। পক্ষান্তরে একশবার পড়ার উদাহরণ আরও আছে। দশবার পড়ার উদাহরণ সুনানে হযরত আবু জরের বর্ণনায় রয়েছে। তিনি বলেন: "রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের পরে আসন পেতে বসে কিছু বলার আগে' লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু য়্যুহ্‌য়ী ওয়া য়্যুমীতু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর' দশবার পড়বে, তার নামে দশটি পুণ্য লিখা হবে ও তার দশটি পাপ মুছে ফেলা হবে। উন্নতির পথে সে দশ স্তর এগিয়ে যাবে এবং সেদিন সে সব রকম অঘটন থেকে বেঁচে থাকবে। শয়তানের খপ্পর থেকে রেহাই পাবে ও শিরক ছাড়া কোন পাপই তাকে আটকাতে পারবে না।" ইমাম তিরমিজী হাদীছটিকে নির্ভুল বলেছেন।

ইমাম আহমদের 'মুসনাদে' উম্মে সালমার একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে: হযরত (সঃ) নিজ কন্যা ফাতিমাকে (রাঃ) এ কলিমা ক'টি শিখিয়েছেন। তিনি যখন পিতার কাছে একটি ভৃত্যের জন্যে প্রার্থনা জানালেন, তখন তিনি বললেন:

"শোবার সময়ে তুমি তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও তেত্রিশবার আল্লাহু আকবার পড়বে। আর যখন ফজর পড়া হবে, তখন দশবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর' পড়বে। মাগরিবের পরেও তাই করবে।"

ইবনে হাব্বানের 'সহীহ' সংকলনে আবু আইয়ুব আনসারী থেকে এক মারফু হাদীছে বলা হয়: "যে ব্যক্তি ফজরে 'লাইলাহা......শায়ইন কাদীর' দশবার পড়বে, তার দশটি পুণ্য লেখা হবে, দশটি পাপ মুছে যাবে, দশ ধাপ উন্নতি দেখা দেবে, চারটি ক্রীতদাস মুক্তির ছাওয়াব পাবে ও শয়তানের খপ্পর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁচবে। আর যে ব্যক্তি মাগরিবে আবার তা পড়বে, সকাল পর্যন্ত এসব কল্যাণ সে পেতে থাকবে।"

নামাযের প্রথম দিকে হযরতের (সঃ) এ বাণীটির উল্লেখ হয়ে গেছে। তাতে আছে, আল্লাহু আকবার দশবার, আলহামদু লিল্লাহ দশবার, সুবহানাল্লাহ দশবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দশবার ও আস্তাগফিরুল্লাহ দশবার। তেমনি 'আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়াহ্‌দিনী ওয়ারযুকনী' দশবার ও কিয়ামত সংকটের পরিত্রাণ কামনা দশবার। দো'আ ও জিক্‌রে দশ সংখ্যাটির উল্লেখ এরূপ অনেক রয়েছে। কিন্তু, এগার সংখ্যাটির উল্লেখ হযরত আবু হুরায়রার একটি রিওয়ায়েত ছাড়া আর কোথাও মিলে না।

সহীহ আবু হাতিমে আছে, নবী (সঃ) নামায শেষ করতে গিয়ে পড়তেন:

اللهم اصلح لى دينى الذى جعلته عصمة امرى واصلح لى
دنياى التى جعلت فيها معاشى اللهم انى اعوذ برضاك من

سخطك و اعوذ بعفوك من نقمتك و اعوذ بك منك لا مانع لما اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ০

"হে খোদা! আমার দ্বীনকে ঠিক করে দাও যা আমার কার্যাবলীর পর্যবেক্ষক। আমার দুনিয়াকে ঠিক করে দাও যেখানে আমার জীবিকা রেখেছ। হে খোদা! তোমার অসন্তোষের বদলে সন্তোষ লাভের জন্যে তোমারই দুয়ারে আশ্রয় চাই। তোমার প্রতিকার ব্যবস্থার হাত থেকে তোমার ক্ষমার ছায়ায় আশ্রয় চাই। তোমার শাস্তি থেকে তোমার দয়ার আশ্রয় চাই। তুমি দিলে কেউ ফিরাতে পারে না। আর না দিলেও কেউ দিতে পারে না। তোমার সামনে কোন মর্যাদাবানের মর্যাদাই কাজে আসে না।"

হাকামের 'মুস্তাদরাকে' হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেন: আমি যখন হযরতের (সঃ) পেছনে নামায পড়েছি, তাঁকে নামাযের পরে এ দো'আ পড়তে শুনেছি:

اللهم اغفرلى خطاياى و ذنوبى كلها اللهم ابعثنى و احينى و ارزقنى و اهدنى لصالح الاعمال و الاخلاق انه لا يهدى لصالحها و لا يصرف سيئها الا انت ০

"হে খোদা! আমার সব পাপ ও ত্রুটি ক্ষমা কর। হে খোদা! আমাকে পাঠাও, জীবন দাও ও রিযিক দাও। আমাকে পুণ্যবানের চরিত্র ও কার্য বলে দাও। কারণ, তুমি না দেখালে সে পথ আর কেউ দেখাতে পারে না। পাপ থেকে কেবল তুমিই দূরে রাখতে পার।"

ইবনে হাব্বানের 'সহীহ' সংকলনে হারিছ ইবনে মুসলিম তামিমী বলেন: নবী (সঃ) আমাকে বলেন, যখন তুমি ফজর শেষ করবে, কোন কথা বলার আগে সাতবার এ কথা ক'টি বলে নিও:

اللهم اجرنى من النار

"হে খোদা! আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।" কারণ, যদি তুমি সেদিন মারা যাও, খোদা তোমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন। তেমনি মাগরিবেও বলবে। কারণ, সে রাতে মারা গেলে খোদা তোমার মুক্তি লিখে দিবেন।

ইমাম নাসায়ীর 'কবীরে' হযরত ইমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন: হযরত (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে 'আয়াতুল কুরসী' পড়বে, মৃত্যু ছাড়া তার জান্নাতের পথে আর কোন অন্তরায় থাকবে না।

মুহাম্মদ ইবনে হুমায়ের একাই মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ ইলহানী থেকে বর্ণনা করেন। ইলহানী আবু ইমামা থেকে বর্ণনা করেন। ইমাম নাসায়ী পেলেন হুসায়েন ইবনে বাশার থেকে আর তিনি পেয়েছেন মুহাম্মদ ইবনে হুমায়ের থেকে। একদল হাদীছটিকে 'সহীহ' বলেন। হুসায়েন ইবনে বাশার বলেন, ইমাম নাসায়ী হাদীছটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ক্ষতির কিছু নেই এতে।

তিনি অন্যত্র এটিকে 'সঠিক' বলেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) নিজ সংকলনে উভয় মুহাম্মদকে প্রমাণযোগ্য বলেছেন। হাদীছবেত্তাদের মতে হাদীছই নির্ভর করে তাঁর রীতি-নীতির ওপরে। পক্ষান্তরে কেউ আবার হাদীছটিকে 'মওজু' বলেছেন। আবুল ফারাজ জাওযী তাঁর গ্রন্থে হাদীছ-টিকে 'মওজু' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এবং মুহাম্মদ ইবনে হুমায়েরই এর সবকিছু বলে মন্তব্য করেছেন।

আবু হাতিম রাযী বলেন, এ থেকে প্রমাণ দান সঠিক হবেনা। ইয়াকুব ইবনে সুফিয়ান বলেন, হাদীছটি জোরদার নয়। একদল 'হাফিজে হাদীছ' এ অভিমত স্বীকার করেন নি। তাঁরা মুহাম্মদকে নির্ভরযোগ্য (ছিকা) বর্ণনাকারী বলেছেন। আরও বলেছেন, তাঁর থেকে মওজু রিওয়ায়েত হতে পারেনা। তিনি সে স্তরের অনেক উর্ধে। তা ছাড়া সহীহ বুখারীতে এ রিওয়া-য়েত উধৃত হয়েছে, এটাই প্রামাণ্য হাদীছ হবার জন্যে যথেষ্ট। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন অত্যন্ত জোরের সাথে এটার বিশুদ্ধতা সমর্থন করেছেন। তিবরানীর 'মু'জিম'এ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাসান ইবনে হাসান তাঁর বাপ থেকে এবং তিনি তাঁর বাপ থেকে বর্ণনা করেনঃ রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়বে, পরবর্তী নামায পর্যন্ত সে খোদার জিম্মায় থাকবে।

এ রিওয়ায়েত হযরত আবু ইমামা (রাঃ), আলী (রাঃ), ইবনে উমর (রাঃ), মুগীরা (রাঃ), জাবির (রাঃ) ও আনাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। অথচ এ সব ক'টির সূত্রেই দুর্বলতা রয়েছে। কিন্তু রিওয়ায়েতের পারস্পরিক সম্পর্ক ও বিভিন্ন সূত্রে তা প্রাপ্তি থেকে এটা বুঝা যায়, হাদীছটি মওজু' নয়; বরং এর মূলে নিশ্চয়ই কিছু সত্যতা আছে। আমি শুনেছি, আমার ওস্তাদ আবু আব্বাস ইবনে তায়মিয়া (রাঃ) বলেছেন, 'আমি কখনই কোন নামাযের পরে আয়াতুল কুরসী পড়তে ছাড়িনি।'

মুসনাদে ও সুনানে উকবা ইবনে আমের বর্ণনা করেনঃ আমাকে খোদার রাসূল (সঃ) প্রতি নামাযের পরে মাউজাত ('কুল আউজু' সূরাদ্বয়) পড়তে বলেছেন।

আবু হাতিম, সহীহ ইবনে হাব্বান ও মুস্তাদরাকে হাকাম বলছে, ইমাম মুসলিমের বর্ণিত শর্ত অনুসারে হাদীছটি সহীহ। তিরমিজীতে 'মাউজাত' এর স্থলে 'মাউজাতাইন' শব্দ এসেছে। তিবরানীর মু'জিমে ও আবু ইয়ালী মুসেলীর মুসনাদে' আমর ইবনে নাবহান থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। জাবিরের এক প্রশ্ন সাপেক্ষ মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) বলেছেনঃ

'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে এ কাজগুলো করে চলবে, সে যে দুয়ার দিয়ে ইচ্ছা করবে বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং যাদু-নয়না হুর তাদের সাথী হবে। (ক) নিজ হত্যাকারীকে যে ক্ষমা করল (খ) গোপনে ঋণ চুকিয়ে দিল (গ) প্রতি ফরজ নামাযের পরে সূরা ইখলাস পড়ল।

হযরত আবু বকর (রাঃ) আরজ করলেন : 'হে খোদার রাসূল ! এর যে কোন একটি কাজ করলেও কি ?' তিনি জবাবে বললেন—হাঁ, একটিও যদি করে।

হযরত (সঃ) মা'আজকে (রাঃ) অসিয়াত করেছেন প্রত্যেক নামাযের পরে যেন এ দো'আ পড়ে :

اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ○

"হে খোদা ! আমাকে তোমার জিক্‌র, শুক্‌র ও উত্তম ইবাদতের তাওফীক দাও।" নামাযের পেছনে বলতে সালামের আগে বা পরে দু'টোই হতে পারে। আমাদের ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ) সালামের আগে হওয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর যুক্তি হল, নামাযের পেছনে বলতে তাই বুঝাবে যা কোন জীবের পেছনে বলতে বুঝায়।

নামাযের সুত্‌রা

হযরত (সঃ) যখন দেয়াল সামনে নিয়ে নামায পড়তেন, মাঝে একটা বকরী যাবার মত ফাঁক থাকত মাত্র। তিনি নামাযের সামনে আড় সৃষ্টিকারী বস্তু কাছাকাছি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যখন তিনি কোন কাঠ, গম্বুজ কিংবা গাছ সামনে রেখে নামায পড়তেন, সেটা ডান কিংবা বাম পাশে রাখতেন। সফরে কিংবা ময়দানে কোন হাতিয়ার সামনে গেড়ে নামায পড়তেন। কখনও বাহন সামনে রেখে নামায পড়তেন। নামাযীদের খোলা জাগায় নামাযের সময়ে তীর বা লাঠি যা দিয়ে হোক আড় সৃষ্টি করে নিতে বলেছেন। কিছু না মিললে সামনে অন্তত একটা রেখা টেনে নিতে বলেছেন।

আবু দাউদ (রঃ) বলেন, আমি আহমদ ইবনে হাম্বল থেকে এরূপ বর্ণনা পেয়েছি যে, তিনি বলতেন— রেখাটি আড়াআড়িভাবে নতুন চাঁদের মত এঁকে নিবে। পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ বলেন— লম্বালম্বিভাবে এঁকে নিবে। রইল লাঠির প্রশ্ন। সেটা সোজা গেড়ে নিবে। যদি কোন আড় সৃষ্টি করে না নেয়া হয়, তা হলে নারী, গাধা বা কালো কুকুর দ্বারা নামায নষ্ট হতে পারে বলে সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায়। এটা আবু জর (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাগফালের (রাঃ) রিওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এ সব হাদীছের বিরোধী হাদীছগুলো হয় বিশুদ্ধ ও অস্পষ্ট, নয় অশুদ্ধ ও স্পষ্ট। তাই তা দিয়ে ওপরের হাদীছগুলো অগ্রাহ্য করা যায় না।

রাসূলের (সঃ) নামাযের সামনে হযরত আয়েশা (রাঃ) শুয়ে থাকতেন, এটা উপরোক্ত মাসআলার পরিপন্থী নয়। কারণ, নামাযের সামনে দিয়ে চলা হারাম, অবস্থান মাকরূহ নয়। সুতরাং নারী যদি নামাযের সামনে দিয়ে যায়, তা হলে নামায নষ্ট হবে, সামনে অবস্থান করলে তা হবে না।

●

Contents

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

●

সুন্নাত নামায

নবী (সঃ) আবাসে নিয়মিত দশ রাকআত নামায আদায় করতেন। ইবনে উমর (রাঃ) সে সম্পর্কে বলেনঃ আমি নবী (সঃ) থেকে দশ রাকআত নামায মাহফুজ রেখেছি। জুহরের আগে ও পরে দু'দু'রাকআত পড়তেন, মাগরিবের পরে ঘরে পড়তেন দু'রাকআত, ইশার পরে দু'রাকআত ঘরে পড়তেন ও দু'রাকআত ফজরের আগে পড়তেন। এ কয় রাকআত তিনি সফর ভিন্ন কখনও বর্জন করেন নি। যদি জুহরে কখনো দু'রাকআত বাদ পড়ত, আসরের পরে পড়ে নিতেন। এটা ছিল তাঁর স্থায়ী সুন্নাত। তিনি যা করতেন, নিয়মিত চালু রাখতেন। নিষিদ্ধমুহূর্তে অনাদায়ী নামায আদায় করা তাঁর ও উম্মতের জন্যে সমান পাল্য। তবে, উক্ত দু'রাকআত সুন্নত নিষিদ্ধ সময়ে আদায় করাটি তাঁর একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাঁর বিশেষ ব্যাপারগুলো আলোচনা প্রসংগে ইনশা আল্লাহ এর বিশ্লেষণ দান করব।

কখনও তিনি জুহরের আগে চার রাকআত নামায পড়তেন। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) জুহরের আগের চার রাকআত কখনও বাদ দিতেন না। তেমনি বাদ দিতেন না ফজরের আগের দু রাকআত।

এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, যখন তিনি ঘরে পড়তেন, চার রাকআত পড়তেন এবং মসজিদে পড়লে দু'রাকআত পড়তেন। এটাই স্পষ্ট মনে হয়। এও বলা যেতে পারে যে, কখনও তিনি দু'রাকআত এবং কখনও চার রাকআত পড়তেন। সুতরাং দু'টো বর্ণনাই ঠিক। বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) দু'জনই যে যা দেখেছেন বলেছেন। সেক্ষেত্রে কাউকে দোষারোপ করা চলেনা।

এও বলা যেতে পারে, এ চার রাকআত জুহরের সুন্নাত নয়; বরং সূর্য হেলার পরে হযরত (সঃ) স্বতন্ত্রভাবে এ চার রাকআত পড়তেন। ইমাম আহমদ আব্দুল্লাহ ইবনে সাএব থেকে বর্ণনা করেনঃ 'রসূল (সঃ) সূর্য হেলার পরে চার রাকআত নামায পড়তেন। (এ সম্পর্কে) তিনি বলেন, এটা হচ্ছে এমনি এক সময় যখন আকাশের দরজাগুলো খোলা হয়। আমি চাই, এ সময়ে আমার কিছু পুণ্য সেখানে উঠে যাক।'

সুনানেও হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—হযরত (সঃ) জুহরের আগে যদি চার রাকআত নামায কখনও কোন কারণে আদায় করতে না পারতেন, পরে পড়তেন। ইবনে মাজাহ বলেনঃ হযরতের (সঃ) যদি জুহরের আগের চার রাকআত বাদ পড়ে যেত, আছরের পরে তা আদায় করতেন।

তিরমিজীতে হযরত আলীর (রাঃ) এরূপ এক বর্ণনা রয়েছে ঃ হযরত (সঃ) জুহরের ফরযের আগে চার রাকআত ও পরে দু'রাকআত নামায পড়তেন।

ইবনে মাজায় হযরত আয়েশার (রাঃ) এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ 'হযরত (সঃ) জুহরের আগে চার রাকআত নামায পড়তেন। তাতে কিয়াম লম্বা হত। রুকু ও সিজদায় বেশ সময় নিতেন।' এ চার রাকআত সম্পর্কেই তিনি বলেছেন, হযরত (সঃ) কখনও বাদ দিতেন না। খোদাই সর্বজ্ঞ।

এখন থাকে জুহরে আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের বর্ণিত দু'রাকআতের প্রশ্ন। এর ব্যাখ্যা হল এই, সব নামাযেরই সুন্নত দু'রাকআত করে। ফজরে যথেষ্ট সময় থাকা সত্ত্বেও দু'রাকআত সুন্নত। পক্ষান্তরে জুহরের আগে চার রাকআত সুন্নত স্বতন্ত্র নামায। সূর্যের অস্ত পথে যাত্রা ও দিনের অর্ধেক কেটে যাবার এ মুহূর্তটিতে তিনি বিশেষ কারণে তা পড়তেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ সময়ে আট রাকআত নামায পড়তেন। তিনি বলতেন, এ নামায রাত জেগে যে নামায পড়া হয়, তার সমান-মর্যাদা রাখে। এর রহস্য হচ্ছে এই (খোদা সর্বজ্ঞ), দুপুর বেলা দুপুর রাতের বিনিময়ে এসে থাকে। তাই সামঞ্জস্য রয়েছে দু'য়ের ভেতরে।

সূর্য হেলার পরে আকাশের দ্বার উন্মুক্ত হয়। অর্ধরাতের পরে খোদা নেমে আসেন এবং অর্ধ দিবসের পরবর্তী সময়ের সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে। এ দু'টো সময় আকাশের দ্বার মুক্ত হওয়া ও খোদার পৃথিবী সন্নিহিত আকাশে অবতীর্ণ হওয়ার কারণে খোদার নৈকট্য ও অনুগ্রহ লাভের সময়।

ইমাম মুসলিম হযরত উম্মে হাবীবার (রাঃ) এক বর্ণনা উদ্ধৃত করেন। তাতে বলা হয় ঃ "যে ব্যক্তি দিনে রাতে বার রাকআত সুন্নাত পড়বে, তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী হবে।" নাসায়ী ও তিরমিজী এর সাথে যোগ করেছেন, "জুহরের আগের চার রাকআত ও পরের দু'রাকআত, মাগরিবের পরের দু'রাকআত, ইশার পরের দু'রাকআত ও ফজরের আগের দু'রাকআত।" তিরমিজী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। নাসায়ীতে 'ইশার পরে দু'রাকআত এর স্থলে আসরের আগে দু'রাকআত বলা হয়েছে।

ইবনে মাজাহ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এক মারফূ বর্ণনায় বলেন ঃ "যে ব্যক্তি বার রাকআত সুন্নাত নামায নিয়মিত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তাঁর জন্যে একটি ঘর তৈরী করাবেন। (তা হচ্ছে) জুহরের আগে চার রাকআত ও পরে দু'রাকআত, মাগরিবের পরে দু'রাকআত, দু'রাকআত ইশার পরে ও ফজরের আগে দু'রাকআত।" আবু হুরায়রার (রাঃ) একটি বর্ণনাও তিনি উদ্ধৃত করেছেন। তাতে প্রথম অংশের পরে বলা হয়েছে ঃ ফজরের আগে দু'রাকআত, জুহরের আগে দু'রাকআত ও পরে দু'রাকআত, দু'রাকআত (আমার মনে পড়ে যেন) আসরের আগে, দু'রাকআত মাগরিবের পরে এবং দু'রাকআত (আমার ধারণা) ইশার পরে। হয় এ ব্যাখ্যা কোন বর্ণনাকারী ঢুকিয়েছেন, নয় তা হযরত (সঃ) থেকে মারফূ হয়ে এসেছে। খোদা সর্বজ্ঞ। হযরত (সঃ) আসরের

আগে চার রাকআত পড়েছেন বলে কোন সহীহ রিওয়ায়েত নেই। শুধু আসিম ইবনে যমরাহ আলী (রাঃ) থেকে একটি লম্বা হাদীছ বর্ণনা করেন। তাতে বলা হয়ঃ "হযরত (সঃ) দিনে ষোল রাকআত নামায পড়তেন। সূর্য জুহরের ওয়াক্তের পর্যায়ে এলে চার রাকআত পড়তেন। তারপর জুহরের নামাযের আগে চার রাকআত ও পরে দু'রাকআত পড়তেন। আসরের আগে চার রাকআত, (এক বর্ণনায় আছে) যখন সূর্য আসরের কাছাকাছি সময়ে পেঁাছে তখন দু'রাকআত ও যখন সূর্য জুহরের কাছাকাছি সময়ে পেঁাছত, তখন চার রাকআত। অথবা জুহরের আগে চার রাকআত ও পরে দু'রাকআত এবং আসরের আগে চার রাকআত। প্রতি দু'রাকআত নিকটবর্তী ফেরেশতা, মুক্তাদী ও নবীদের ওপরে সালাম বলে স্বতন্ত্র করে নিতেন।"

শুনেছি, ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রাঃ) হাদীছটি অস্বীকার করেছেন। এর বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হাদীছটি মওযূ' (মনগড়া)। আবু ইসহাক জুর্যানীও তাঁর এ অস্বীকৃতির কথা বলেছেন।

ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিজী হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে এ বর্ণনা দান করেন ঃ "রসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আসরের নামাযের আগে যে চার রাকআত সুন্নত পড়বে, তাকে যেন অনুগ্রহ করেন।" বর্ণনাটির বিশুদ্ধতা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনে হাব্বান সহীহ বলেছেন। পক্ষান্তরে আর সবাই ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। ইবনে আবু হাতিম বলছেন যে, আমি আব্বাকে বলতে শুনেছি ঃ আমি আবুল ওয়ালিদ আত্-তায়ালসীকে ইবনে উমর থেকে (রাঃ) মুহাম্মদ ইবনে মুসলিমের বর্ণিত হাদীছ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দিলেন—ছেড়ে দাও ওসব। আমি বললাম—আবু দাউদও এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন—ইবনে উমর (রাঃ) বলতেন, 'আমি রসূল (সঃ) থেকে দিনে-রাতে দশ রাকআত নামাযের কথা মনে রেখেছি।' তাই অনুরূপ কিছু হলে তা তিনি বলতেন। আব্বা বলতেন—আমার মনে আছে বার রাকআতের কথা। এদু'টি বর্ণনায় আদপে বিরোধ নেই। কারণ, ইবনে উমর (রাঃ) নিজে যা দেখেছেন, তাই বলেছেন। অন্য কেউ কিছু দেখে থাকলে, তা তো আর তিনি বলতে যান নি।

মাগরিবের আগের দু'রাকআত হযরত (সঃ) পড়েছেন বলে কোন বর্ণনা মিলেনা। অবশ্য সাহাবাদের পড়তে দেখেছেন বলে সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি সাহাবাদের সর্বদা পড়তে দেখেছেন। তা বলে তিনি না নির্দেশ দিয়েছেন পড়ার জন্যে, না নিষেধ করেছেন।

সহীহদ্বয়ে আব্দুল্লাহ আল মুযনী বলেন, নবী (সঃ) বলেছেন—'মাগরিবের আগে নামায পড় (আরেক বর্ণনায়) যার পড়তে ইচ্ছে হয় পড়।' কেউ যেন আবার সুন্নত ভেবে বাঁধাবাঁধিভাবে অনুসরণ না করে সে জন্যেই তিনি এরূপ বলেছেন। এ ব্যাপারে সঠিক কথা হল এই, অন্যান্য নিয়মিত সুন্নতের মত এ দু'রাকআত নয়। এ হচ্ছে মুস্তাহাব নামায। এ সব নফল তিনি

২৪—

ঘরে বসে এমনিই পড়তেন। মাগরিবের দু'রাকআত সম্পর্কে এমন কোন বর্ণনা নেই যে, তিনি তা মসজিদে পড়েছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, এ ব্যাপারে সুন্নত তরীকা হচ্ছে ঘরে এসে দু'রাকআত পড়া। নবী (সঃ) ও সাহাবাদের থেকে এরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। সাএব ইবনে ইয়াযীদ বলেন, হযরত উমরের (রাঃ) যুগে মানুষকে দেখেছি মাগরিবের ফরয পড়ে সবাই ঘরে চলে যেত। কেউই মসজিদে থাকতনা। যেন তারা মাগরিবের পরে ঘরে না ফিরে সে নামায পড়তোনা।

এখানে প্রশ্ন জাগে, যদি কেউ সে দু'রাকআত মসজিদে পড়ে, তা কি জায়েয হবেনা ? আর তাতে কি সে দু'রাকআত আদায় হবেনা ? এ ব্যাপারে তাঁর বিভিন্ন মত দেখতে পাই। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ তাঁর থেকে বর্ণনা করেনঃ "এক ব্যক্তি (তিনি নাম বলেছিলেন) নাকি বলছে, মাগরিবের পরে মসজিদে যদি কেউ দু'রাকআত সুন্নাত পড়ে, তা আদায় হবেনা। লোকটি চমৎকার বলেছে। সে উত্তম গবেষণা করেছে।"

আবু হিফস (রঃ) বলেনঃ এর কারণ হল, হযরত (সঃ) এ নামায ঘরে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মারুযী বলেছেন—যে ব্যক্তি মাগরিবের দু'রাকআত সুন্নত মসজিদে পড়বে, সে গুনাহগার হবে বলে আমি জানিনা। আমি বললাম—আবু ছুর তাকে গুনাহগার বলেছেন বলে বর্ণনা মিলে। তিনি বললেন—হয়ত সে রাসূল (সঃ) কর্তৃক ঘরে পড়ার নির্দেশের পরি-প্রেক্ষিতেই তা বলেছে।

আবু হিফস (রঃ) বলেন, রাসূলের সে নির্দেশের ব্যাখ্যা হল এই, যদি কেউ ফরযও মসজিদ ছেড়ে ঘরে পড়ে, জায়েজ হবে। সুন্নতের অবস্থাও তাই। ইমাম আহমদ এ ব্যাখ্যা স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন, সুন্নতের জন্যে যেহেতু জামাত ও স্থান শর্ত নয়। তাই ঘরেও পড়া চলবে। মসজিদে তো চলবেই। আল্লাহই ভাল জানেন।

মাগরিবের সুন্নত নামাযে দু'টি সুন্নত কাজ রয়েছে। প্রথম, ফরয ও সুন্নতের মাঝখানে কথা বলবেনা। ইমাম আহমদ থেকে মায়মুনী ও মারুযী বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মাগরিবের পরের দু'রাকআত সুন্নত আদায়ের আগে কথা না বলা মুস্তাহাব। হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ বলেন—ইমাম আহমদকে দেখেছি মাগরিবের ফরয পড়েই তিনি কারুর সাথে কোন কথা না বলে উঠে পড়তেন এবং ঘরে না গিয়ে অন্য কোন নামায মসজিদে পড়তেন না।

আবু হিফস এর ব্যাখ্যায় বলেন, মাকহুলে বর্ণিত হাদীছে হযরত (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মাগরিবের নামাযের পরে কোন কথা বলার আগে দু'রাকআত সুন্নত পড়বে, তার নামায ঈল্লীনে তুলে নেয়া হবে।' আরেকটি কারণ হল, এর ফলে ফরয ও নফল একত্রেই আদায় হয়।

দ্বিতীয়ত, সুন্নত হলো ঘরে আদায় করা। ইমাম নাসায়ী, তিরমিজী ও আবু দাউদ কা'ব ইবনে আজযা থেকে বর্ণনা করেনঃ নবী (সঃ) বণূ আব্দুল আশহালের মসজিদে পদার্পণ করলেন ও

মাগরিব পড়লেন। যখন সবাই সুন্নত নামায শেষ করল, দেখতে পেল যে, তিনি বসে বসে তাসবীহ পড়ছেন। তখন তিনি সবাইকে বললেন ঃ এটা তো ঘরের নামায।

ইবনে মাজাহ এ বর্ণনাটি রাফে' ইবনে খাদীজ থেকে নিয়েছেন। তাতে আছে, এ দু'রাকআত ঘরে পড়ে নিও।

মূল কথা, হযরতের (সঃ) এ পবিত্র সুন্নতটি সব নফল ও সুন্নত নামাযের জন্যে ছিল। তিনি তা সবই ঘরে পড়তেন। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণিত এক সহীহ হাদীছে আছে ঃ আমি হযরতের (সঃ) কার্য থেকে দশ রাকআত নামাযের কথা মনে রেখেছি। জুহরের আগে দু'রাকআত, মাগরিবের বাদে ঘরে পড়তেন দু'রাকআত, ইশার পর দু'রাকআক ঘরে পড়তেন এবং ফজরের নামাযের আগে দু'রাকআত।

সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ 'হযরত (সঃ) আমার ঘরে বসে জুহরের প্রথম চার রাক'আত পড়ে নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সবাইকে নামায পড়াতেন। তারপর ঘরে ফিরে দু'রাকআত নামায পড়তেন। এ ভাবে মাগরিব ও ইশার সুন্নতও ঘরে পড়তেন।' তেমনি ফজরের সুন্নত সম্পর্কেও তাঁর থেকে বর্ণিত আছে, 'তিনি তা ঘরেই পড়তেন।' হযরত হাফসার (রাঃ) বর্ণনায় তা দেখতে পাই। সহীহদ্বয়ে হযরত হাফসা ও ইবনে উমর থেকে বর্ণিত আছে ঃ হযরত (সঃ) জুমআর পরে দু'রাকআত নামায এসে ঘরে পড়তেন।

জুমআর আগে ও পরের অন্যান্য সুন্নত নামায সম্পর্কে জুমআর পরিচ্ছেদে বলব।

এ কাজ তাঁর এ বাণীর সাথে সামঞ্জস্য রাখে—'হে মানব! যার যার ঘরে নামায পড়। ফরয ছাড়া যে কেউর জন্যে উত্তম নামায হল তার ঘরের নামায।' সুতরাং হযরতের (সঃ) নফল ও সুন্নত নামায বিশেষ কারণ ছাড়া ঘরে পড়ার রীতি ছিল। তেমনি ফরয পড়তেন তিনি বিশেষ কারণ না ঘটলে মসজিদেই। অর্থাৎ সফরে, রুগ্ন হয়ে কিংবা বিশেষ কারণে মসজিদে না আসতে পারার কারণে। সব নফলের ভেতরে তিনি ফজরের সুন্নতের প্রতি জোর দিতেন বেশী। আবাসে কিংবা প্রবাসে বিতর ও ফজরের সুন্নত ছাড়তেন না। সফরে তিনি এ দু'টো নামায ছাড়া অন্য কোন সুন্নত পড়েছেন বলে জানা যায় না। তাই ইবনে উমরকে (রাঃ) কখনও সফরে দু'রাকআতের বেশী নামায পড়তে দেখা যেতনা। তিনি বলতেন ঃ নবী (সঃ), আবু বকর (রাঃ) ও উমরের (রাঃ সাথে সফর করেছি। তাঁরা দু'রাকআতের বেশী পড়তেন না।

এ থেকে ধরা যায় যে, তাঁরা সফরে চার রাকআত পড়তেন না। তা ছাড়া সুন্নতও পড়তেন না। কিন্তু ইবনে উমরকে (রাঃ) সফরে জুহরের সুন্নত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন—"আমি যদি ইবাদত করি তো নিশ্চয়ই তা পড়ব।" এ ছিল তাঁর বেশী পরহেযগারীর পরিচায়ক। আদপে খোদা পাকই যখন ফরয দু'রাকআত ছাড়তে বলেছেন, সেক্ষেত্রে তার আগে বা পরে যদি দু'রাকআত বাড়ানো চলে, তখন ফরয পুরা করাই উত্তম।

ধর্মবেত্তাদের ভেতরে দু'টি নামাযের মধ্যে কি ফজরের সুন্নত, না বিতর ওয়াজিব ছিল, এ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের মতভেদের দরুণ বিতরের ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণ করা সম্ভব হয় না। তেমনি ফজরের সুন্নতকেও অপরিহার্যতার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ধর্মবেত্তারা মতৈক্যে পৌঁছতে পারেন নি। আমি শুনেছি, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া ফজরের সুন্নতকে নামাযের প্রারম্ভ এবং বিতরকে তার পরিণতি হিসাবে দু'টোকেই অপরিহার্য বলেছেন। এ কারণেই হযরত (সঃ) ফজরের সুন্নত ও বিতর নামায সূরা ইখলাস দিয়ে পড়তেন। কারণ, এ দু'টো নামায শিক্ষা ও কাজের ঐক্য, ইচ্ছা ও অভিজ্ঞানের সমন্বয় এবং বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যে চরম একত্ব সৃষ্টিকারী।

পক্ষান্তরে সূরা ইখলাসও শিরকের ধারণা ও দর্শনকে একত্বের ধারণা ও দর্শনে রূপান্তরিত করে, একক প্রভুর অভাবহীনতা ঘোষনার দ্বারা তাঁর ভেতরে সর্ববিধ শক্তি ও গুণের পূর্ণতা প্রকাশ করে এবং পিতা বা পুত্র হবার কথা অস্বীকার করে তাঁর স্বয়ং সম্পূর্ণতা ও অসমকক্ষতা ঘোষণা করে। মোট কথা, এ সূরা তাঁর ভেতরে সর্ববিধ শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণত্ব প্রমাণ করে এবং সব ধরণের অসম্পূর্ণতা ও অভাব অস্বীকার করে। তাঁর শরীক অস্বীকার করার মাধ্যমে তাঁর সত্তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রূপ দান করে। শিক্ষা ও বিশ্বাসগত একত্ববাদের এগুলোই হচ্ছে মূলনীতি। এর অনুসারীরা বিভ্রান্ত মুশরিকদের থেকে এ জন্যেই বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। এ কারণেই সূরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান মর্যাদা লাভ করেছে।

কুরআনে দু'ধরণের বক্তব্য রয়েছে। বিবৃতিমূলক কিংবা নির্দেশ সূচক। নির্দেশসূচক বাণীগুলো আবার হয় আদেশ সূচক, নয় নিষেধমূলক অথবা আজ্ঞা বা অনুমোদনবাচক। বিবৃতি বা বর্ণনাও দু'ধরণের। স্রষ্টা সম্পর্কিত বর্ণনা, তাঁর নামাবলী, গুণাবলী ও বিধানাবলীর বর্ণনা। আরেকটি হল, সৃষ্টি সম্পর্কিত বর্ণনা। সূরা ইখলাস নির্দিষ্ট হয়েছে শুধু স্রষ্টা সম্পর্কিত বর্ণনার জন্যে। তাই তাকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এর পাঠক ঈমানদারগণ জ্ঞানগত শিরক থেকে মুক্তিলাভ করে। পক্ষান্তরে সূরা 'কাফিরুন' বাস্তব, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যমূলক শিরক থেকে মুক্তিদান করে। কোন কিছু বাস্তবায়নের আগে প্রয়োজন সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন। ফলে দেখা যায়, শিক্ষাই হচ্ছে কাজের চালক, নায়ক, পথ প্রদর্শক ও প্রভু এবং রূপদানকারী। তাই সূরা 'ইখলাস' কুরআনের এক তৃতীয়াংশ বলে বিবেচ্য।

পক্ষান্তরে সূরা 'কাফিরুন' এক চতুর্থাংশের মর্যাদা পেয়েছে। হাকাম তাঁর মুস্তাদরাকে এ বর্ণনাটি তুলে দিয়ে বলেছেন, বর্ণনাটি বিশুদ্ধ।

যখন শিরকের অসারতা ও ক্ষতি জানা সত্ত্বেও মানুষ রিপুর তাড়নায় শিরকের ইচ্ছাপোষণ করে ও বাস্তব রূপদানে তৎপর হয় এবং তার ভেতরে নিজ স্বার্থগুলো জড়িত দেখতে পায়, তখন সেই বাস্তব শিরক থেকে মানুষকে বিরত রাখা বিদ্যাগত শিরক দূর করার চাইতে কঠিন ও দুঃসাধ্য

ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, ইচ্ছাবিহীন অজ্ঞতা প্রসূত শিরক জ্ঞান ও প্রমাণ দ্বারা দূর করা যায়, অহেতুক কেউ অস্বাভাবিক কাজকে স্বাভাবিক ভাবেনা। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা প্রসূত বাস্তব শিরক দূর করা অসম্ভব। কারণ, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে রিপুর তাড়নায় স্বেচ্ছায় করার জন্যে প্রবৃত্ত হয়। অথচ এ সম্পর্কিত জ্ঞান তাকে এর অসারতা ও ক্ষতি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়। এ কারণেই, সূরা 'কাফিরূনে' এ ধরনের শিরক দূর করার জন্যে বারংবার জোর দিয়ে কথাগুলো বলা হয়েছে। সূরা 'ইখলাসে' তা করা হয়নি।

কুরআনের দু'টি দিক রয়েছে। একদিকে পার্থিব বিধি-বিধান ও তদসংশ্লিষ্ট ব্যাপার সমূহ এবং তা অনুসারীদের বাস্তব জীবনের কার্যকলাপ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্য দিকটিতে পরকাল এবং সেখানে অনুষ্ঠানের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে। 'ইজা যুলযিলা' সূরাটিতে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আখিরাতের বর্ণনাই রয়েছে। দুনিয়া বা দুনিয়াবাসির অবস্থা সম্পর্কে এতে কিছুই বলা হয়নি। সুতরাং এ সূরাটি অর্ধ কুরআনের মর্যাদা রাখে।

এ বর্ণনাটিকে বিশুদ্ধ বলা হয়েছে। এ কারণেই হযরত (সঃ) এ সূরা দু'টি তাওয়াফের দু'রাকআতে পাঠ করতেন। যেহেতু প্রথমোক্ত সূরা দু'টি ইখলাস ও তাওহীদমূলক, তাই তিনি তা দিয়ে দিনের কাজ শুরু করে, রাতের কাজও তা দিয়েই শেষ করতেন। এমনকি এ দু'টো তাওহীদের অন্যতম নিদর্শন হজ্জেও পাঠ করতেন।

হযরত (সঃ) ফজরের সুন্নতের পরে ডানদিকে কাত হয়ে কিছুটা আরাম নিতেন। সহীহ-দ্বয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এ বর্ণনা রয়েছে। তিরমিজীতে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ "হযরত (সঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ ফজরের আগের দু'রাকআত সুন্নত আদায় করবে, ডান কাতে কিছুক্ষণ আরাম করবে।" ইমাম তিরমিজী হাদীছটিকে 'হাসান সহীহ গরীব' বলেছেন।

ইমাম ইবনে তায়মিয়া হাদীছটিকে বাতিল বলেছেন। বলেছেন, কাজটির সহীহ প্রমাণ রয়েছে। তা বলে কাজের নির্দেশটি সহীহ নয়। আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ একাই এটি বর্ণনা করেছে এবং এতে ভুলও করেছে।

অথচ ইবনে হাযম ও তার অনুসারীরা আরাম নেয়া ওয়াজিব ভেবে বসেছেন। এ হাদীছ থেকে তিনি এ সিদ্ধান্তে পেঁছেছেন যে, আরাম না নিলে নামাযই বাতিল হবে। এ ক্ষেত্রে ইমা-মদের ভেতরে তিনি একাই এ মতের পরিপোষক। আমি তাঁর শিষ্যের একখানা কিতাব পড়েছি। তাতে তিনি (আইয়ুব থেকে ও আইয়ুব ইবনে সিরীন থেকে, বর্ণনা করেন—আবু মূসা, রাফে' ইবনে খাদীজ ও আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) ফজরের সুন্নতের পরে কাত হয়ে আরাম নিতেন এবং এরূপ করার জন্যে নির্দেশ দিতেন।

নাফে' থেকে আইয়ুব ও তাঁর থেকে মি'মার বর্ণনা করেন ঃ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এ কাজ করতেন না এবং বলতেন, সালাম ফিরানোই আমাদের জন্যে যথেষ্ট।

ইবনে জারীজ বলেন, আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জেনেছি, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন, নবী (সঃ) সুন্নতের জন্যে আরাম নিতেন না; বরং রাত জাগার পরিশ্রমের জন্যে নিতেন।

ইবনে আবু শায়বা থেকে আবু সিদ্দীক আন্‌নাজী বর্ণনা করেন, ইবনে উমর (রাঃ) এক গোত্রকে ফজরের সুন্নতের পরে কাত্ হয়ে আরাম নিতে দেখলেন। তাদের কাছে একজনকে পাঠিয়ে তিনি তা থেকে বারণ করলেন। তারা জবাবে জানালেন—আমরা এভাবে সুন্নত পালন করতে চাই। ইবনে উমর (রাঃ) আবার তাদের কাছে লোকটিকে পাঠিয়ে বলে দিলেন যে, তাদের জানিয়ে দাও, এ কাজ বিদআত।

আবু মুসলিম বলেন ঃ ইবনে উমরকে (রাঃ) আমি এ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন—শয়তান তোমাদের নিয়ে খেলা করছে। তিনি আরও বলেন, একদল মানুষের হল কি যে তারা দু'রাকআত নামায পড়েই গাধার মত শুয়ে পড়ে।

বস্তুত, দু'টি দল এ আরাম নেয়ার ব্যাপারটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে ও একটি দল কেবল ঠিক রয়েছে। প্রকাশ্য অর্থ গ্রহনকারীর (আহলে জাহির) একদল এটা ওয়াজিব মনে করেন। ইবনে হাযম ও তাঁর অনুসারীরা তো এ ছাড়া নামাযই হবেনা বলেছেন। পক্ষান্তরে ফিকাহবিদদের একটি দল এ কাজটিকে মাকরূহ ও বিদআত মনে করেন। তবে ইমাম মালিক (রঃ) প্রমুখ এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁাছেছেন। তিনি বলেন, যদি কেউ নিছক আরাম নেয়ার জন্যে এরূপ করে তো ক্ষতি নেই। কিন্তু তা যদি সুন্নত মনে করে করতে চায়, তা হলে মকরূহ।

একদল এ কাজকে মোটামুটিভাবে মুস্তাহাব বলেছেন। তা আরাম নেবার জন্যে হোক আর না হোক। এ দলটি আবু হুরায়রার (রাঃ) হাদীছ থেকে প্রমাণ দেন। যারা মকরূহ বলেন, তাঁরা ইবনে উমর (রাঃ) প্রমুখ সাহাবাদের বক্তব্য থেকে দলীল পেশ করেন। কেউ যদি এরূপ করত, ইবনে উমর (রাঃ) তাকে কাঁকর মারতেন। একদল তো হযরত (সঃ) এরূপ কাজ করেছেন বলেই স্বীকার করেন না। তাদের মতে কাত হয়ে আরাম নেয়ার কাজটি বিতরের পরে ও ফজরের সুন্নতের আগে তিনি করতেন। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনায় এর সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়।

এখন রইল হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীছ। আলী ইবনে শিহাব এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। কারণ, ইমাম মালিক (রঃ) তাঁর থেকে বলেছেন, হযরত (সঃ) রাতের নামায শেষ করে কাত হয়ে আরাম নিতেন। যখন মুআজ্জিন ফজরের আজান দিত, তিনি উঠে দু'রা-কআত সংক্ষেপে আদায় করতেন। এ থেকে জানা যায়, ফজরের সুন্নতের আগেই তিনি আরাম নিতেন। ইবনে শিহাবের অন্য অনুসারীরা তাঁর থেকে বর্ণনা করেন ঃ মুআজ্জিন যখন ফজরের আজান দিতে উঠতেন এবং তিনি শেষ রাতের সাদা আভাস দেখতেন, তখন মুআজ্জিন মসজিদে এলেই তিনি উঠে সংক্ষেপে দু'রকাআত নামায পড়তেন। তারপর ডান কাতে আরাম নিতেন।

যাঁরা ফজরের সুন্নতের আগে হযরতের আরাম নেয়ার কথা বলেন, তাঁদের এ ক্ষেত্রে বক্তব্য হচ্ছে, ইবনে শিহাবের অনুসারীদের ভেতরে যখন মতানৈক্য দেখা দিয়েছে, তখন ইমাম মালিকের (রঃ) বর্ণনাই ঠিক হবে। কারণ, তাঁদের ভেতরে তিনিই সবচাইতে বেশী স্মরণ রাখতে পারতেন এবং সযত্নে বর্ণনা সুরক্ষিত রাখতেন।

পক্ষান্তরে প্রতিপক্ষ দল বলছেন, ইমাম মালিক (রঃ) ভিন্ন অন্য সবাই যে মত পোষণ করেন, সেটাই সঠিক। আবু বকর খতীব বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে উরুয়া (রাঃ), তাঁর থেকে যুহরী (রঃ) ও তাঁর থেকে ইমাম মালিক (রঃ) বর্ণনা করেন: হযরত (সঃ) রাত জেগে এগার রাকআত নামায পড়তেন এবং তার মধ্যে এক রাকআত পড়তেন বিতর। যখন অবসর হতেন, ডান কাতে আরাম নিতেন। যখন মুআজ্জিন এসে হাজির হত, তখন উঠে তিনি সংক্ষেপে দু'রাকআত নামায পড়তেন।

পক্ষান্তরে আকীল, ইউনুস, শোয়াএব ইবনে আবি জুআয়েব ও আওযাঈ ইমাম মালিকের (রঃ) সাথে মতৈক্যে পৌঁছেননি। তাঁরা ইমাম যুহরী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন—নবী (সঃ) ফজরের দু'রাকআত সুন্নত নামায আদায় করে ডান কাতে বিশ্রাম নিতেন। এমনকি মুআজ্জিন এসে তাঁর সাথে বাইরে যেতেন।

দেখা যায়, এ ক্ষেত্রে ইমাম মালিকই সুন্নতের আগে বিশ্রামের কথা বলেন। আর সবাই সুন্নতের পরে বিশ্রামের কথা বলছেন। তাই ধর্মবেত্তারা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ইমাম মালিক (রঃ) এ ব্যাপারে ভুলই করেছেন। অন্য সবাই একসুরে যা বলছেন সেটাই ঠিক।

আবু তালিব বলেন—আমি ইমাম আহমদকে বললাম, আমাকে নবী (সঃ) সম্পর্কে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে (আবু সুহায়েল তাঁর থেকে আবু কুরায়েব ও তাঁর থেকে) আবুস সিলাত এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন—"নবী (সঃ) ফজরের দু'রাকআত পড়ে কাত হয়ে বিশ্রাম নিতেন। শো'বা বলেন—ইমাম আহমদ বর্ণনাটিকে মারফু করতেন না। তাই আমি আরয করলাম: না শোয়া হলে কোন ক্ষতি আছে কি? তিনি বললেন—না। হযরত আয়েশা (রাঃ) সেরূপ কিছু বর্ণনা করেন নি। পক্ষান্তরে ইবনে উমর (রাঃ) এটা অস্বীকার করেছেন।

জালাল বলেন—"মারুযী আমাকে খবর দিয়েছে যে, আবু আব্দুল্লাহ বলেছেন, আবু হুরায়রার বর্ণনাটি এরূপ নয়। তা শুনে সে বলল—আ'মাশ আবু সালেহ্‌র মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনাই করেছেন। তিনি বললেন—শুধু আব্দুল ওয়াহিদই এ হাদীছটি বলে থাকে।

ইবরাহীম ইবনুল হারিস বলেন—ফজরের সুন্নতের পরে আরাম নেবার ব্যাপারে আবু আব্দুল্লাহকে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, 'আমি এরূপ করিনা। কেউ যদি করে করতে পারে।'

Contents

যদি আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদের বর্ণনা তাঁর কাছে নির্ভরযোগ্য হত, তা হলে কাজটিকে অন্তত তিনি মুস্তাহাব মনে করতেন। বলা হয়, হযরত আয়েশা (রাঃ) কখনও এভাবে এবং কখনও ওভাবে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত, হযরত (সঃ) কখনও এরূপ এবং কখনও ওরূপ করতেন। এর ভেতরে মতভেদের কিছু নেই। কারণ, এটা মুবাহ কাজ বৈ নয়।

তাঁর ডান কাতে আরাম নেবার ভেতরেও একটা রহস্য রয়েছে। তা এই, অন্তর ডানদিকে থাকে। যদি কেউ বামদিকে শোয়, তার পূর্ণ ঘুম পায়। কারণ, আরামপূর্ণ শোয়া হয় তখন। পক্ষান্তরে ডান কাতে অস্বস্তিপূর্ণ শোয়া হয়। ফলে, অন্তরের যথাযথ শয়নের চাহিদা তাকে সুনিদ্রার কবলে পড়তে দেয়না। এ কারণেই জালিমরা বাম কাতে শোয়া পসন্দ করে। উদ্দেশ্য, পূর্ণ আরামের সাথে গভীর ঘুমে অচেতন থাকা। পক্ষান্তরে এ খরগোশী ঘুমের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্যে শরীআত প্রবর্তক ডানকাতে শোয়া পসন্দ করে গেছেন। উদ্দেশ্য, রাতের ইবাদত থেকে যেন বঞ্চিত না হন। আদপে ডানকাতে শোয়া অন্তরের ও বামকাতে শোয়া দেহের জন্যে কল্যাণকর। খোদাই ভাল জানেন।

●

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

●

তাহাজ্জুদ নামায

পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীদের ভেতরে এ মতভেদই ক্রমাগত চলে আসছে—'তাহাজ্জুদ নামায কি হযরতের জন্যে ফরয ছিল ?' দু'দলই দলীল হিসেবে খোদার বাণী পেশ করে থাকেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ -

"রাতের কিছু অংশ জেগে থেকো। তোমার জন্যে সেটা কল্যাণকর"।

একদলের ধারণা, এ আয়াতটি রাত জেগে ইবাদত ওয়াজিব না হবার কথাই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। অপর দল বলেন—

يَا اَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا

"হে আবৃত ব্যক্তি ! রাতের কিছু অংশ ছাড়া সবটাই জেগে কাটাও"—এ আয়াতে হযরতকে (সঃ) পরিষ্কার নির্দেশ দান করা হয়েছে। এ আয়াত বাতিলকারী অন্য কোন আয়াতও নেই। এখন রইল, 'নাফিলাতাল লাকা' কথাটি। সেখানে 'নাফিলাতান' বলতে 'অতিরিক্ত' বুঝানো হয়েছে। অতি বেশী ইবাদত বলতেই যে নফল ইবাদত তা নয়। যেমন আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نَافِلَةً

"আমি তাকে ইসহাককে দান করলাম ও ইয়াকুবকে অতিরিক্ত হিসেবে।"

তেমনি হযরতের (সঃ) রাত জেগে 'নফল' ইবাদত বলতে তাঁর মর্যাদা ও ছাওয়াব বাড়ানোর কথাই বুঝানো হয়েছে। আর এ প্রয়োজনেই সেটা তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট ও ফরয করা হয়েছে। অপরের জন্যে তা মুবাহ মাত্র এবং গুনাহের কাফ্ফারা (বিনিময়) স্বরূপ। হযরতকে (সঃ) যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সর্ববিধ পাপ থেকে মুক্ত করেছেন, তাই তাঁর এ ইবাদত মর্যাদা ও ছাওয়াব বৃদ্ধির জন্যে হবে এবং উম্মতের জন্যে হবে পাপ মুক্তির ইবাদত।

মুজাহিদ (রঃ) বলেন—এ কারণেই এ ইবাদত হযরতের (সঃ) জন্যে নফল ও অন্যান্যের জন্যে কাফ্ফারার ইবাদত।

ইবনে মাঞ্জার (রঃ) তাঁর তাফসীরে বলেন—মুজাহিদ থেকে ইবনে কাছীর, তাঁর থেকে ইবনে জারীজ, তাঁর থেকে হাজ্জাজ, তাঁর থেকে আলী ইবনে উবায়দা বলেছেন, ফরয ছাড়া সবই নফল

Contents

নামায। কারণ, ফরয নামায পাপের ক্ষতিপূরণ হয়না। তাই নফল কখনও অপরাপরের জন্যে মর্যাদা বৃদ্ধিকরও হয়না। মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যাপারটি শুধু হযরতের জন্যেই নির্দিষ্ট। অন্য সবাই পাপের ক্ষতিপূরণ হিসেবেই নফল ইবাদত করে।

হযরত হাসান (রাঃ) থেকে আবু উছমান, তাঁর থেকে কাবীসা ও সাঈদ, তাঁদের থেকে আমর, তাঁর থেকে আব্দুল্লাহ, তাঁর থেকে নসর ও তাঁর থেকে মুহাম্মদ উক্ত আয়াত সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, হযরত (সঃ) ছাড়া কারুর জন্যে সেটা নফল বা মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে অতিরিক্ত নামায হতে পারে না।

যিহাক (রঃ) বলেন—নফল (অতিরিক্ত) ইবাদত শুধু হযতের (সঃ) বেলায়ই প্রজোয্য। সুলায়মান ইবনে হাব্বান বলেন—আমাকে আবু গালিব আবু ইমামার (রাঃ) সূত্র দিয়ে বলেছেন—যখন তুমি ওযু সম্পন্ন করলে, ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে দাঁড়ালে। তারপর যখন নামাযে দাঁড়ালে, তা তোমার মর্যাদা ও ছাওয়াব বৃদ্ধির কারণ হয়ে গেল।

তা শুনে এক ব্যক্তি বলল—হে আবু ইমামা! তোমার কি ধারণা এই যে, সে নামাযে দাঁড়ালে তার জন্যে তখন তা 'নাফেলা' (মর্যাদা বৃদ্ধিকর অতিরিক্ত) হয়ে যাবে?

তিনি জবাব দিলেন—না। নফল তো শুধু হযরতের জন্যেই হবে। অন্য কারুর জন্যে তা কি করে হতে পারে? কারণ অন্য সবাই তো পাপে ডুবে আছে। অবশ্য তার ছাওয়াব ও মর্যাদা লাভের সহায়ক হবে।

আমার মতে আয়াতটিতে 'নফল' বলতে সেরূপ ইবাদত বুঝানো হয়নি যা না করলেও চলে। হযরতের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে এ অতিরিক্ত নামাযটিকে নির্দিষ্ট ও অপরিহার্য করার ফলে এটি নফল ও ফরয দু'টোরই গুণে গুণান্বিত হয়েছে। সুতরাং তাঁর জন্যে তাহাজ্জুদ ফরয ধরা হলে আয়াত তার পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় না। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে।

নবী (সঃ) আবাসে কি প্রবাসে কখনও তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। যদি কোন কারণে রাত্রে বাদ পড়ে যেত, দিনে বার রাকআত পড়ে নিতেন।

আমি এ সম্পর্কে ইমাম ইবনে তায়মিয়াকে বলতে শুনেছি, বিতরের নামায তাহিয়্যাতুল ওযু, সালাতুল কসূফ ও সালাতুল ইস্তেসকার মতই কাযা হয়না তার প্রমাণ এখানে মিলে। দিনের শেষ নামায যেরূপ মাগরিব, তেমনি রাতের শেষ নামায হলো বিতর। তাই রাত শেষ হবার পরে সকালে যা পড়া হবে তা বিতরের স্থলাভিষিক্ত হবে না।

নবী (সঃ) থেকে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), তার থেকে ইবনে মাজাহ এবং আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেন, যদি কেউ বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে কিংবা তা ভুলে যায়, তাহলে সকালে স্মরণে আসামাত্র তা পড়ে নিবে।

কিন্তু এ বর্ণনাটিতে কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। প্রথম, বর্ণনাটি আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ আসলামের মাধ্যমে এসেছে। সে যঈফ বর্ণনাকারী। দ্বিতীয়, সঠিক ব্যাপ্যার এই, সে নিজ পিতা ও তিনি হযরতের (সঃ) থেকে 'মুরসাল' রিওয়ায়েত পেয়েছেন। ইমাম তিরমিজীও (রঃ) বলেন, এটাই সঠিক কথা অর্থাৎ মুরসাল রিওয়ায়েত। তৃতীয়, ইবনে মাজাহ (রঃ) আবু সাঈদের হাদীছ বর্ণনা করেই মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া থেকে বর্ণনা করেন—'নবী (সঃ) বলেছেন, সকাল হবার আগেই বিতর পড়ে নাও।' এটিকে তিনি সহীহ বলেছেন। তিনি আরও বলেন, আব্দুর রহমানের হাদীছের অসারতার দলীল হলো এ হাদীছ।

হযরত (সঃ) রাত্রে এগার কিংবা তের রাকআত নামায পড়তেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা মিলে। সহীহদ্বয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—রাসূল (সঃ) রমযান কিংবা অন্য সময়ে এগার রাকআতের বেশী পড়তেন না। সহীহদ্বয়ে তাঁর থেকে আরেকটি বর্ণনায় বলা হয়—রাসূল (সঃ) রাতের বেলায় তের রাকআত নামায পড়তেন। তার থেকে পাঁচ রাকআত বিতর সহ আলাদা একই বৈঠকে পড়তেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত প্রথম হাদীছটিই ঠিক। দ্বিতীয় বর্ণনায় যে দু'রাকআত বেশী দেখা যায়, তা ফজরের দু'রাকআত সুন্নত। সহীহ মুসলিমে ফজরের সুন্নত সহই তের রাকআতের বর্ণনা রয়েছে। অবশ্য বুখারীতে বলা হয়েছে যে, হযরত (সঃ) তের রাকআত পড়তেন। তারপর ফজরের আজান শুনে দু'রাকআত সংক্ষেপ নামায পড়তেন।

সহীহদ্বয়ে কাসিম ইবনে মুহাম্মদ বলেন—হযরত আয়েশাকে (রাঃ) বলতে শুনেছি, রাসূল (সঃ) রাত্রে দশ রাকআত নামায পড়ে এক সিজদায় বিতর পড়তেন। তারপর ফজরের দু'রাকআত সুন্নত পড়তেন। সব মিলিয়ে তের রাকআত হত। এ ব্যাখ্যাটিই সুস্পষ্ট।

এখন রইল ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা। তা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সহীহদ্বয়ে হযরত আবু হামযাহ (রাঃ) তাঁর থেকে বর্ণনা করেন—'হযরতের (সঃ) রাতের নামায ছিল তের রাকআত।' কিন্তু, তার ব্যাখ্যা এইভাবে বর্ণিত আছে যে, তা ফজরের দু'রাকআত সুন্নত মিলিয়ে হত।

শা'বী বলেন—আমি ইবনে উমর (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হযরতের (সঃ) রাতের নামায সম্পর্কে জানতে চাইলে তাঁরা বলেন, তের রাকআত হচ্ছে—আট রাকআত তাহাজ্জুদ, তিন রাকআত বিতর ও দু'রাকআত ফজরের সুন্নত।

সহীহদ্বয়ে কুরায়েব থেকে তাঁর খালা উম্মুল মু'মিনীন হযরত মায়মুনার (রাঃ) ঘরে একরাত অবস্থানের কাহিনী বর্ণিত আছে। তাতে তিনি বলেন—রসূল (সঃ) তের রাকআত নামায পড়েন। তারপর নাক ডেকে নিদ্রা যান। যখন তিনি বুঝতে পেলেন, ফজরের সময় হয়েছে, উঠে দু'রাকআত সংক্ষেপ নামায পড়ে নিলেন।

বর্ণনাটি এ ভাবেও এসেছে যে, তিনি প্রথমে দ্'রাকআত, তারপর দ্'রাকআত, তারপর দ্'-রাকআত, তারপর দ্'রাকআত পড়েন ও তারপর দ্'রাকআতের সাথে এক রাকআত মিলিয়ে বিতর পড়েন। তারপর নিদ্রা যান। যখন ম্আজ্জিন এল, তিনি উঠে দ্'রাকআত সংক্ষেপ নামায পড়ে নিলেন। তারপর তিনি ফজর পড়ার জন্যে বেরিয়ে গেলেন।

এখানে এগার রাকআত সম্পর্কে কোন মতানৈক্য রইল না। শেষ দ্'রাকআত নিয়েই মত-ভেদ দেখা দিয়েছে যে, এ দ্'রাকআত কি রাতের, না ফজরের ?

এ ভাবে ফরয ও স্ন্নত (নিয়মিত) মিলিয়ে হযরতের (সঃ) দিনে-রাতে মোট চল্লিশ রাকআত হয়। ফরয সতের রাকাআত, নিয়মিত স্ন্নত দশ কিংবা বার রাকআত ও এগার রাকআত তাহাজ্জ্দ। এ চল্লিশ রাকআত ছাড়া যা পড়েছেন, তা নেহাৎ সাময়িক নামায ছিল। যেমন : সফর থেকে ফিরে আট রাকআত, স্র্যোদয়ের পরের নামায, যিয়ারতের নামায, সালাতুল-ফাতহ, তাহিয়্যাতুল মসজিদ ইত্যাদি নামায। তাই প্রত্যেক বান্দার উচিত এ চল্লিশ রাকআত নামায নিয়মিত আদায় করা। কারণ, দিনে-রাতে চল্লিশবার কার্র দরজায় ঘা দিলে তা অত্যন্ত তাড়াতাড়িই খোলা হয়। একমাত্র আল্লাহই সহায়ক।

●

Contents

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

●

বিতরের নামায

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হযরত (সঃ) যখনই ইশা পড়ে ঘরে ফিরেছেন, চার কিংবা দু'-রাকআত নামায আদায় করে বিছানায় গিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—তাঁর সাথে যে রাত কাটিয়েছি, দেখেছি, ইশা পড়ে তিনি ফিরে এসে কিছু নামায পড়ে নিদ্রা গিয়েছেন।

এ দু'টো বর্ণনাই আবু দাউদে উধৃত হয়েছে।

হযরত (সঃ) ঘুম থেকে জেগে প্রথম মিসওয়াক করতেন। তারপর খোদার নাম স্মরণ করতেন। ঘুম থেকে জেগে তিনি কি দো'আ পড়তেন, তা আগেই বলা হয়েছে। তারপর তিনি ওয করে সংক্ষেপে দু'রাকআত নামায পড়তেন। সহীহ মুসলিমে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণিত আছে ঃ নবী (সঃ) ঘুম থেকে জেগে উঠে সংক্ষেপে দু'রাকআত নামায পড়তেন।

আবু হুরায়রার (রাঃ) হাদীছে এ জন্যে নির্দেশও রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের কেউ যখন রাতের ঘুম ছেড়ে উঠবে সংক্ষেপে দু'রাকআত নামায পড়ে নিবে (মুসলিম)।

কখনও তিনি অর্ধরাত পেরুলে, কখনও তারও পরে, আবার কখনও তার আগেই তিনি জাগতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি মোরগের প্রথম ডাক শুনে জাগতেন এবং তা প্রায়ই রাতের দ্বিতীয়ার্ধে হতো। কখনও তিনি বিচ্ছিন্নভাবে নামায আদায় করতেন এবং কখনও ক্রমাগত জারী রাখতেন। অধিকাংশ সময়ই বিচ্ছিন্নভাবে জারী রাখতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরতের (সঃ) সাথে রাত কাটাবার কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে বলেন—নবী (সঃ) যখন জেগে উঠলেন, প্রথমে মিসওয়াক করলেন ও ওযু করলেন। তারপর পড়লেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ٥

"নিশ্চয়ই আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন রহস্য ও দিন-রাতের প্রভেদ তত্ত্ব জ্ঞানীদের জন্যে নিদর্শন স্বরূপ।"

এ সূরার শেষ পর্যন্ত তিনি পড়লেন। তারপর দাঁড়িয়ে দীর্ঘ কিয়াম, রুকু ও সিজদা সহ দু'রাকআত নামায পড়লেন। তারপর নাক ডেকে নিদ্রা গেলেন। এভাবে তিনি তিনবার উঠে দু'রাকআত নামায পড়লেন। প্রতি বারেই মিসওয়াক করে ওযু করলেন ও উক্ত আয়াত

পড়লেন। তারপর তিনি তিন রাকআত বিতর পড়লেন। ইত্যবসরে মুয়াজ্জিন আযান দিল। তিনি নামাযের জন্যে বেরিয়ে গেলেন। তখন এ দোআ পড়ে চললেন ঃ

اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى لسانى نورا واجعل فى سمعى نورا واجعل فى بصرى نورا واجعل من خلفى نورا ومن اما مى نورا واجعل لى من فوقى نورا ومن تحتى نورا اللهم اعطنى نورا ٥

"হে আল্লাহ! আমার অন্তরে, জিহবায়, কানে, চোখে, পেছনে সামনে, উপরে ও নীচে নূর সৃষ্টি কর। হে আল্লাহ আমাকে নূর দান কর।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) যেভাবে দু'রাকআত সংক্ষেপ নামাযের দ্বারা শুরু করার কথা উল্লেখ করেছেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) তা করেন নি। তা এ জন্যে যে, তিনি কখনও সেরূপ করতেন, কখনও এরূপ করতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) যা স্মরণ রেখেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) তা পারেন নি। কারণ, তিনিই সর্বদা হযরতকে (সঃ) দেখতেন এবং গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখতেন। সৃষ্টি জগতে তিনিই হযরতের (সঃ) রাত জেগে কাটাবার বিবরণ সম্পর্কে বেশী জানেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তো শুধু খালার কাছে বেড়াতে এসে এক রাতের ব্যাপারে দেখেছেন। তাই যেখানে হযরতের (সঃ) রাত জাগার বিবরণ নিয়ে এ দু'জনের ভেতরে মতভেদ দেখা দেয়, সেখানে হযরত আয়েশার (রাঃ) মতই নির্ভরযোগ্য।

তাঁর তাহাজ্জুদ ও বিতর কয়েক ধরনের ছিল। একটি হলো হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় যেরূপ দেখা যায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, হযরত আয়েশার বর্ণনার অনুরূপ। দু'রাকআত সংক্ষেপ নামায দিয়ে শুরু করে এগার রাকআতে শেষ করা। প্রতি দু'রাকআতে সালাম ফিরাতেন। শেষের বার এক রাকআত মিলিয়ে বিতর পড়তেন। তৃতীয় হল, এ ধরনের তের রাকআত আদায় করা। চতুর্থ, তিনি এভাবে প্রতি দু'রাকআতে সালাম ফিরিয়ে আট রাকআত পড়ে একই সালামে বিতর সহ পাঁচ রাকআত পড়তেন। পঞ্চম, নয় রাকআত পড়তেন। ক্রমাগত আট রাকআত পড়ে প্রথম বৈঠকে বসে বেশ কিছু দোআ কালাম পড়ে দাঁড়িয়ে নবম রাকআত পড়ে শেষ বৈঠকে সালাম ফিরাতেন। তারপর বসে দু'রাকআত পড়তেন। ষষ্ঠ, পঞ্চম প্রকারের মতই সাত রাকআত পড়ে নিয়ে বসে বসে দু'রাকআত পড়তেন। সপ্তম, দু' দু'-রাকআত করে তাহাজ্জুদ শেষ করে শেষের বারে অবিচ্ছিন্নভাবে তিন রাকআত বিতর পড়তেন। ইমাম আহমদ (রঃ) এ ধরনের নামাযের কথা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—'তিনি তিন রাকআত বিতর অবিচ্ছিন্নভাবে পড়তেন।' ইমাম নাসায়ী (রঃ) তাঁর থেকেই বর্ণনা করেন—'তিনি বিতরের দু'রাকআতে সালাম ফিরাতেন না।' এটা অবশ্য ভেবে দেখার ব্যাপার।

আবু হাতিম ও ইবনে হাব্বান নিজ নিজ সংকলনে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে হযরতের (সঃ) এ বর্ণনা উধৃত করেন—'তিন রাকআত দিয়ে বিতর পড়োনা ; বরং পাঁচ অথবা সাত রাকআত দিয়ে পড়। এবং মাগরিবের নামাযের সাথে মিলিয়ে ফেলোনা।'

ইমাম দারে কুতনী বলেন—এ হাদীছের সব বর্ণনাকারীই নির্ভরযোগ্য। তিনি আরও বলেন, বিতরের ব্যাপারে আমি আবু আবদুল্লাহ থেকে সঠিকভাবে জানতে চেয়েছিলাম যে, তিনি নিজে দু'রাকআতে সালাম ফিরান কিনা। তিনি জবাব দিলেন—হাঁ। আমি তখন প্রশ্ন করলাম—কেন? তিনি জবাবে জানালেন, দু'রাকআতে সালাম ফিরাবার ব্যাপারে হযরতের (সঃ) থেকে প্রাপ্ত হাদীছ অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও অধিক সংখ্যক। যুহরী (রঃ) হযরত উরুয়া (রাঃ) থেকে ও তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—হযরত (সঃ) দু'রাকআতে সালাম ফিরাতেন।

হারিছ বলেন—ইমাম আহমদের (রঃ) কাছে বিতর সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন—দু'রাকআতে সালাম ফিরাতে হবে। যদি সালাম না ফিরানো হয়, আমি আশা করি, তাতেও কোন ক্ষতি হবেনা। তবে, নবী (সঃ) থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে।

আবু তালিব বলেন—আমি আবু আবদুল্লাহকে প্রশ্ন করলাম, বিতরের ব্যাপারে আপনি কোন্ হাদীছটির প্রাধান্য দেন?

তিনি জবাব দিলেন—সব ক'টি হাদীছের। যে ব্যক্তি পাঁচ রাকআত পড়ে শেষ রাকআতে সালাম ফিরায়, কিংবা সাত রাকআত পড়ে শেষ রাকআতে যে সালাম ফিরায় দু'জনই ঠিক। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে যিরারাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত (সঃ) নয় রাকআত দিয়ে বিতর পড়ে অষ্টম রাকআতে বসতেন। কিন্তু, এক রাকআত দিয়ে বিতর করার হাদীছ বেশী নির্ভরযোগ্য ও জোরদার বলেই আমি সেটি অনুসরণ করি।

আমি আরয করলাম—হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তিন রাকআত বলেন। তিনি জবাব দিলেন—হাঁ, ইবনে মাসউদ হযরত সা'দের (রাঃ) এক রাকআত নিয়ে আপত্তি তোলায় তিনিও জবাবে কিছু বলেছিলেন।

অষ্টম, ইমাম নাসায়ী (রঃ) হযরত হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরতের (সঃ) সাথে রমযান মাসে নামায পড়েছিলেন। তাতে তিনি রুকুতে তাসবীহ এত বেশী পড়েছেন যে, তা কিয়ামের মতই দীর্ঘ হয়ে গেল। তেমনি তিনি বসে গিয়ে 'রাব্বিগ্‌ফিরলী' দীর্ঘ সময় নিয়ে পড়লেন। তিনি এ ভাবে মাত্র চার রাকআত পড়তেই বিলাল (রাঃ) হাজির হয়ে ফজরের নামাযের জন্যে ডাক দিলেন।

হযরত (সঃ) রাতের প্রথম ভাগে, মধ্যভাগে ও শেষভাগে বিতর পড়েছেন। কখনও সারা রাত দাঁড়িয়ে সকাল পর্যন্ত একই আয়াত পড়তে থাকতেন। তা ছিল এই ঃ

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۝

"যদি তুমি তাদের সাজা দাও, তবু তারা তোমারই বান্দা।"

তিনি তিনভাবে রাতের নামায পড়তেন। অধিকাংশ সময়ে দাঁড়িয়ে পড়তেন। দ্বিতীয়, বসে বসে পড়তেন। তৃতীয়, কিরাআত বসে বসে পড়ে দাঁড়িয়ে রুকু দিতেন। এ তিন ধরনের কথা সহীহ হাদীছে প্রমাণিত হয়েছে। আর দাঁড়িয়ে শুরু করে মাঝখানে বসে যেতেন বলে 'সুনানে নাসায়ী'তে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে আবদুল্লাহ ইবনে শাকীকের এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, তা এই ঃ আমি রসূলকে (সঃ) 'তারাব্বু' করে নামায পড়তে দেখেছি।

ইমাম নাসায়ী বলেন, আবু দাউদ জা'ফরী ছাড়া আর কেউ এ হাদীছ বর্ণনা করেন নি। অথচ তিনি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। আর আমি তো হাদীছটিকে ভুল ছাড়া ভাবতে পারি না। খোদাই সর্বজ্ঞ।

দো'আ কুনূত ঃ

নবী করিম (সঃ) থেকে প্রমাণ রয়েছে, কখনও বিতরের পরে তিনি বসে দু'রাকআত নামায পড়তেন এবং কখনও কিরাআত বসে পড়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে রুকু করতেন। সহীহ মুসলিমে আবু সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ আমি হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে হযরতের (সঃ) নামায সম্পর্কে জানতে চাওয়ায় তিনি জবাবে বলেছেন—তিনি আট রাকআত নামায পড়তেন। তারপর বিতর পড়তেন এবং সর্বশেষে দু'রাকআত বসে বসে পড়তেন। তখন রুকু করতেন দাঁড়িয়ে। তারপর আজান ও ইকামাতের মাঝখানে ফজরের দু'রাকআত সুন্নত পড়তেন।

মুসনাদে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—নবী (সঃ) বিতরের পরে বসে সংক্ষেপে দু'রাকআত নামায পড়তেন। ইমাম তিরমিজী বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ), আবু ইমামা (রাঃ) প্রমুখ অনেকেই হযরত (সঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন।

মুসনাদে আবু ইমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ 'রসূল (সঃ) বিতরের নামাযের পরে বসে দু'রাকআত নামায 'ইজা যুলযিলাত' ও 'কাফিরূন' সূরা দিয়ে পড়তেন।' দারে কুতনী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এরূপ এক বর্ণনা উধৃত করেছেন।

অধিকাংশ আলিমরা এ সব হাদীছ নিয়ে বিভ্রাটে পড়েছেন। কারণ, এ হচ্ছে হযরতের (সঃ) 'বিতরকে রাতের শেষ নামায কর' নির্দেশের পরিপন্থী। ইমাম মালিক (রঃ) তো এ দু'রাকআত সাফ অস্বীকার করেছেন। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, আমি নিজে এ দু'রাকআত পড়িনা এবং কাউকে পড়তে বারণও করি না। ইমাম মালিক (রঃ) নিষেধ করেন বটে।

একদল বলেন—হযরত (সঃ) এ দু'রাকআত বিতরের পরে নামাযের বৈধতা দেখাবার জন্যে পড়েছেন। যদি এ দু'রাকআত পড়ে থাকেন, তা হলে অন্য নফল পড়া নিষিদ্ধ হবার কারণ থাকে না। তারা 'রাতের শেষের নামায বিতরকেই কর' নির্দেশকে মুস্তাহাব অর্থে এবং তার পরের নফলকে মুবাহ বলে গ্রহণ করেছেন।

সঠিক কথা এই, এ দু'রাকআত তিনি বিতরের পরিপূরক সুন্নাত হিসেবে পড়তেন। কারণ, বিতর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নামায। বিশেষ করে এ নামায ওয়াজিব। মাগরিবের পরে দু'রাকআত সুন্নাতের স্থলাভিষিক্ত হলো এ দু'রাকআত। দিনের বিতর মাগরিবের পরিপূরক দু'রাকআত সুন্নাতের মতই বিতরের পরিপূরক এ দু'রাকআত।

হযরত (সঃ) বিতরে কুনূত পড়েছেন বলে ইবনে মাজায় উধৃত আলী ইবনে মায়মূনের হাদীছ ভিন্ন আর কোথাও জানা যায় না। উবায় ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে আব্দুর রহমান ইবনে আবযী, তার থেকে সাঈদ ইবনে আব্দুর রহমান, তার থেকে যায়েদ ইলয়্যাসী, তার থেকে সুফিয়ান, তার থেকে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ও তার থেকে আলী ইবনে মায়মূন আররিক্কী ইবনে মাজার কাছে বর্ণনা করেন—রাসূল (সঃ) বিতর পড়ার সময়ে রুকুর আগে দো'আ কুনূত পড়তেন।

ইমাম আহমদের নিজ পুত্র আবদুল্লাহ্‌র এক বর্ণনা মোতাবেক জানা যায়, রুকুর পরেই তিনি দো'আ কুনূত এখতিয়ার করেন। আদপে কুনূত পড়া সম্পর্কে হযরত (সঃ) থেকে যা কিছু প্রমাণ রয়েছে তা সবই ফজর নামাযে রুকু থেকে মাথা তুলে। বিতরের কুনূত তিনি রুকুর পরেই পড়তেন। বিতরে কুনূতের আগে বা পরে তিনি কিছু পড়েছেন বলে জানা যায় না।

জালাল বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া আল কাহ্‌হাল খবর দিয়েছেন যে, তিনি আবু আব্দুল্লাহকে বিতরের কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি জবাবে বলেন—হযরত (সঃ) এ সম্পর্কে কিছু বলেছেন বলে জানা যায় না। তবে হযরত উমর (রাঃ) বছর ঠিকা কুনূত পড়তেন।

ইমাম আহমদ ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত হযরত হাসান ইবনে আলী থেকে বর্ণনা করেন—আমাকে হযরত (সঃ) বিতরে পড়ার জন্যে কয়েকটি কালাম শিখিয়েছেন। তা এই ঃ

اللهم اهدنى فيمن هديت وعافنى فيمن عافيت وتولنى فيمن توليت وبارك لى فيما اعطيت وقنى شر ما قضيت انك تقضى ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت -

বায়হাকী ও নাসায়ী এর সাথে আরও যোগ করেন—

ولا يعز من عاديت -

নাসায়ী তার বর্ণনায় আরও যোগ করেছেন—

وصلى الله على النبى -

হাকাম তাঁর মুস্তাদরাকে এ ভাবে বর্ণনা করেছেন—আমাকে নবী (সঃ) বিতর নামায সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন (রুকু থেকে) মাথা তুলব ও সিজদা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবেনা, তখন এ দো'আ পড়ব।

ইবনে হাব্বান তাঁর সংকলনে যে বর্ণনা নিয়েছেন, তাঁর ভাষা এই ঃ আমি রাসূল (সঃ) কে এ দো'আ পড়তে শুনেছি।

ইমাম তিরমিজী বলেন, ইমাম হাসানের এ রিওয়ায়েত 'হাসান'। আবুল জওরা আস সা'দী ছাড়া কারুর থেকে এ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তার মূল নাম হল রবিআ ইবনে শায়বান। কুনুত সম্পর্কে নবী (সঃ) থেকে এর চাইতে সঠিক কোন বর্ণনা আর পাওয়া যায় না।

আমর ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বিতরে কুনুত পড়ার রিওয়ায়েত মিলে। তবে তাঁর থেকে ফজরে কুনুতের রিওয়ায়েতই বেশী সহীহ। হযরত (সঃ) থেকেও বিতরের কুনুতের চাইতে ফজরের কুনুতের ব্যাপারে প্রাপ্ত বর্ণনা অধিকতর বিশুদ্ধ।

আবু দাউদ, তিরমিজী ও নাসায়ী হযরত আলীর (রাঃ) এক হাদীছ উধৃত করে বলেন— হযরত (সঃ) বিতরের শেষে এ দো'আ পড়তেন ঃ

اللهم انى اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك
واعوذ بك منك لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت
على نفسك ۝

এখন সংশয়ের হলো এই যে, এটা কি নামায শেষ করে পড়তেন, না আগেই ? নাসায়ী থেকে এক বর্ণনায় প্রমাণ মিলে, যখন তিনি নামায শেষ করে বিছানায় যেতেন, তখন এ দো'আ পড়তেন। তাতে 'ছানাউ আলাইকা' এর পরে শুধু 'ওলাও হারাসতু' রয়েছে।

পক্ষান্তরে তিনি এ দো'আ সিজদায় পড়তেন বলেও প্রমাণ রয়েছে। হয়ত তিনি নামাযে এবং নামাযের পরেও পড়তেন।

মুস্তাদরাকে হাকাম হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রাসূলের (সঃ) নামায ও বিতর সম্পর্কিত একটি বর্ণনা তুলেছেন। তাতে এ কথাও আছে যে, 'তারপর তিনি বিতর পড়লেন এবং বিতরে তাঁকে এ দো'আ পড়তে শুনেছি।'

اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى بصرى نورا وفى سمعى
نورا وعن يمينى نورا وعن شمالى نورا وفوقى نورا
وتحتى نورا وامامى نورا وخلفى نورا واجعل لى يوم لقا
ئك نورا ۝

কুরায়েব কুনুত সম্পর্কে বলেন—আমি আব্বাস তনয়দের একজনের সাথে দেখা করায় তিনি উক্ত দো'আ শুনালেন। তাতে এও ছিল ঃ

لحمي ودمي وعصبي وشعري وبشري -

তারপর তিনি দু'টি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করলেন।

নাসায়ীর এক রিওয়ায়েতে "এবং তিনি সিজদায় পড়তেন" বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে মুসলিমে উদ্ধৃত এক বর্ণনায় আছে—"তিনি নামায অর্থাৎ ফজর নামাযের জন্যে বাইরে এলেন এবং পড়ে চললেন"—তারপর উক্ত দো'আটি তুলেছেন। তার অন্য রিওয়ায়েতে আছে ঃ

وفي لساني نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا -

আরেক রিওয়ায়েতে "ওয়াজ'আলনী নূরান" বলা হয়েছে।

আবু দাউদ ও নাসায়ী উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন—'রাসূল (সঃ) বিতরের নামাযে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকা', 'কাফিরূন' ও 'সূরা ইখলাস' পড়তেন। সালাম ফিরিয়ে তিনবার 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' পড়তেন এবং তৃতীয়বারে জোরে ও টানিয়ে পড়তেন।' এ হলো নাসায়ীর ভাষায়। দারে কুতনী বাড়িয়ে এরূপ বলেছেন—'রাব্বুল মালাইকাতি ওয়াররূহ।'

Contents

সপ্তম পরিচ্ছেদ

তিলাওয়াত ও কিরাআত

হযরত (সঃ) থেমে থেমে আয়াত পড়তেন ও আয়াতের শেষে থামতেন। 'আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল' পড়ে চুপ হতেন। আবার পড়তেন 'আর রাহমানির রাহীম'। একটু থেমে আবার পড়তেন 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন'।

ইমাম যুহরী বলেন—রাসূল (সঃ) প্রত্যেক আয়াতের শেষে থেমে থেমে কিরাআত পড়তেন। আয়াতের সম্পর্ক পরবর্তী আয়াতের সাথে থাকলেও বিরতি উত্তম। একদল পাঠ-বিশারদের ধারণা, আয়াতের শেষে যেখানে বক্তব্য ও উদ্দেশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটে, সেখানেই থামা উচিত এবং এ ক্ষেত্রে হযরতের (সঃ) সুন্নাত অনুসরণ করা উত্তম। ইমাম বায়হাকী ও অন্যান্য কতিপয় মুহাদ্দিছ শো'বুল ঈমানে লিখেছেন ঃ

"আয়াতের শেষে বিরতিই উত্তম। যদিও তার সম্পর্ক পরবর্তী আয়াতের সাথে থেকে থাকে।"

নবী (সঃ) যথাযথভাবে সূরা পড়তেন তা যত বড়ই হোক। কখনও একই আয়াতের ফজর পর্যন্ত বারংবার পুনরাবৃত্তি ঘটাতেন। যথাযথ উচ্চারণ ও বিরতির সাথে কম আয়াত পড়া ভাল, না তাড়াতাড়ি করে অনেক আয়াত পরা ভাল, তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ যথাযথভাবে মর্ম উপলব্ধি সহকারে কম আয়াত পড়াকে উত্তম বলেছেন। তাঁদের দলীল হলো, ধীরে সুস্থে বুঝে শুনে কিরাআত পড়ায় কিরাআত পাঠের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। তা হচ্ছে, কুরআনের মর্ম গ্রহণ ও তার বাস্তবায়ন। একদল পূর্বসূরী বলে গেছেন, 'কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে বাস্তবায়িত হবার জন্যে। তাই তা এমনভাবে পাঠ কর, যেন (বুঝে ও স্মরণ রেখে) তা কার্যকরী করতে পার।' তাই 'আহলে কুরআন' একাধারে কুরআনের আলিম ছিলেন এবং তা আমলও করতেন। যদিও কুরআন তাঁদের মুখস্থ ছিল না। পক্ষান্তরে কুরআন যারা না বুঝে মুখস্থ করে ও তা কার্যকরী না করে, তাদের কুরআনপন্থী বলা চলে না। যদিও সে পট পট করে সব মুখে মুখে বলে দিতে পারে। তাঁরা আরও বলেন—সর্বোত্তম আমল হলো ঈমান। কুরআন উপলব্ধি ও অনুধাবন ঈমান সৃষ্টি করে থাকে।

এখন প্রশ্ন জাগে, না বুঝে কুরআন তিলাওয়াতের ফল কি ? সে কাজ তো ভাল-মন্দ মু'মিন, মুনাফিক সবাই করে থাকে। নবী (সঃ) বলেন ঃ মুনাফিক কুরআন পাঠকারীর উদাহরণ হলো রায়হান ফুল। যার ঘ্রাণ সুন্দর বটে ! কিন্তু স্বাদ তিক্ত।

Contents

ঐ ব্যাপারে চারটি দল সৃষ্টি হয়েছে। সর্বোত্তম দল হলো, 'ঈমানদারতাহলে কুরআন। দ্বিতীয় দল হলো, কুরআন ও ঈমান থেকে বঞ্চিত। তৃতীয় দল কুরআন পেলেও ঈমান থেকে বঞ্চিত। চতুর্থ দল ঈমানদার হয়েও কুরআন থেকে বঞ্চিত।

তাঁদের বক্তব্য হলো, যার ঈমান আছে, অথচ কুরআন জানেনা, সে ব্যক্তি যে কুরআন পেয়েও ঈমান থেকে বঞ্চিত, তার থেকে উত্তম। তেমনি কুরআন তিলাওয়াতের সময়ে তা বুঝবার ও তা নিয়ে ভাববার সৌভাগ্য যার হয়েছে সেব্যক্তি; যে না বুঝে তাড়াতাড়ি বহু আয়াত গড়-গড়িয়ে পড়ে যায়, তার চেয়ে উত্তম। তাঁরা আরও বলেন—এটাই নবীর (সঃ) সুন্নাত। তিনি যথাযথভাবে ভেবে চিন্তে কুরআন পড়তেন। ফলে সূরা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে যেতো। এমনকি সকাল পর্যন্ত হয়ত এক আয়াত পড়েই দাঁড়িয়ে কাটাতেন।

ইমাম শাফেঈর (রঃ) অনুসারীদের মতে তিলাওয়াত যত বেশী করা যায়, ততই উত্তম। তাঁরা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এর বর্ণনা থেকে দলীল নিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে—রাসূলে (সঃ) বলেন, যে ব্যাক্তি খোদার কালাম থেকে একটি অক্ষর পড়লো, তার জন্যে দশটি পাপ মোচনকারী একটি পূণ্য লেখা হবে। আমি এ বলছিনা যে, 'আলিফ লাম মীম' একটি অক্ষর। বরং আলিফ একটি, লাম একটি ও মীম একটি অক্ষর (তিরমিজী)। ইমাম তিরমিজী হাদীছটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। তাঁরা বলেন—হযরত উছমান (রাঃ) প্রত্যেক রাকআতে অনেক আয়াত পাঠ করতেন বলে বহু পূর্বসূরীদের থেকেই জানা যায়।

এ সমস্যার সঠিক সমাধান এরূপ বলা যায়, কুরআন যথাযথভাবে ভেবে চিন্তে পড়া উত্তম। পক্ষান্তরে কুরআন যত বেশী পরিমাণ পড়া যায়, ছাওয়াবের মাত্রা তত বেশী হয়। প্রথমটির উদাহরণ এই, কেউ বিরাট একটা কিছু সদকা করল অথবা দামী একটা গোলাম আধাদ করল। দ্বিতীয়টিকে বেশ কিছু টাকা সদকা দেয়া কিংবা কম দামী কয়েকটি গোলামের মুক্তিদানের সাথে তুলনা করা যায়।

সহীহ বুখারীতে হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, 'আমি হযরত আনাসের (রাঃ) কাছে নবীর (সঃ) তিলাওয়াত সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি জবাবে বলেন—তিনি টেনে টেনে পড়তেন।'

শো'বা বলেন—আমকে আবু হামযা (রাঃ) বলেছেন, 'ইবনে আব্বাসের (রাঃ) কাছে আমি তাড়াতাড়ি তিলাওয়াত করি বলে এবং প্রায় রাতেই এক বা দু'বার কুরআন খতম করি বলে জানালাম। তিনি জবাব দিলেন—তুমি যা করছ, তার চাইতে আমি একটি সূরা পড়া বেশী পসন্দ করি। যদি তুমি সেরূপ করতে চাও, তাহলে এমন ভাবেই কর যেন তোমার কান শুনে ও মনে থাকে।

ইবরাহীম (রঃ) বলেন—হযরত আলকামা (রাঃ) হযরত ইবনে মাসউদের (রাঃ) কাছে কুরআন পাঠ করলেন। তাঁর আওয়াজ অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তা শুনে তিনি বললেন, তোমার চরণে

আমার মা-বাপ উৎসর্গ হোক। তবে, যথাযথভাবে ধীরে সুস্থে কুরআন পড়। সেটাই হলো কুরআনের অলংকার। কুরআনকে কবিতার মত আওড়িয়ো না। কিংবা গল্পের মতও গড়গড়িয়ে পড়ে যেও না। যেখানে যেখানে থামা উচিত, সে সব স্থানে থেমে অন্তরকে দোলায়িত কর। কুরআন শেষ করাই যেন তোমাদের উদ্দেশ্য না হয়।

আব্দুল্লাহ বলেন—যখন তোমরা আল্লাহ তা'আলার আয়াত 'ইয়া আইউহাল্লাজীনা আমানু...' শুনতে পাও, তখন চেতনা চাংগা করে তা শুন। কারণ, এক্ষণে তোমাদের ভাল কিছু করতে বলা হবে ও কোন অন্যায় থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হবে।

আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা বলেন—এক মহিলার কাছে বসে সূরা 'হূদ' পড়ছিলাম। তিনি বললেন, হে আব্দুর রহমান! তুমি এভাবে সূরা 'হূদ' পড়ছ? খোদার কসম! আমি ছ'মাস ধরে এ সূরা পড়ে আজও শেষ করতে পারি নি।

রাসূল (সঃ) রাতের নামাযে কখনও আস্তে এবং কখন জোরে সূরা পড়তেন। কখনও দীর্ঘ কিয়াম করতেন, কখনও সংক্ষেপ করতেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি রাতের শেষ ভাগে বিতর পড়তেন। কখনও প্রথম বা মধ্যমভাগেও পড়তেন। সফরে তিনি বাহনে বসে দিন-রাত নফল ইবাদত করতেন। বাহন যেদিকে চলত, সেদিক ফিরেই নামায পড়তেন। তিনি ইশারায় রুকু ও সিজদা করতেন। সিজদার বেলায় রুকু থেকে কিছু বেশী ঝুঁকতেন।

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ হযরত আনাস থেকে বর্ণনা করেন—'রাসূল (সঃ) যখন বাহনে বসে নফল পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন কিবলার দিকে ফিরে নিয়ে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধতেন। তারপর বাহন স্বাধীনভাবে যেদিকে চলত, তিনি সেদিকে ফিরেই নামায পড়তে থাকতেন।' এ জন্যেই ইমাম আহমদ থেকে দু'ধরনের মত পাওয়া যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ঠিকভাবে পড়ার ক্ষমতা ও সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এরূপ করা চলবে কিনা?

নামাযের ভেতরে ঘুরে গিয়ে যদি কেবলা ঠিক রাখা সম্ভবপর হয়, তা যেখানেই থাক, করতে হবে। কারণ, তার জন্যে তা সম্ভব। পক্ষান্তরে বাহন বা জীবের ওপরে থেকে ইচ্ছা মতো ঘুরা বা ঘুরানো সম্ভবপর নয়। ইমাম আহমদ থেকে আবু তালিব এ বর্ণনা শুনান যে, বাহনে ঘুরে কিবলা ঠিক রাখা কঠিন। তাই তা যেদিকে চলে, সেদিকে ফিরেই নামায পড়া চলবে। তবে, বাহনে সিজদার পদ্ধতি নিয়ে তাঁর থেকে বিভিন্ন মত দেখা যায়। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ তাঁর থেকে বর্ণনা করেন—যদি বাহনে সিজদা দান সম্ভব হয়, তা হলে দিবে। পক্ষান্তরে মায়মুন (রঃ) তাঁর থেকে বর্ণনা করেন—যদি বাহন হয়, তাতে সিজদা করবে। কারণ, বাহনে সিজদা দান সম্ভব। ফযল ইবনে যিয়াদ তাঁর থেকে বলেন—বাহনে সিজদা দেয়া যদি সম্ভবপর হয়, তবে দাও। জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ তাঁর থেকে বলেন—যদি বাহনে থাক, উচুঁ স্থানে সিজদা দিও। অনেক সময়ে হযরত (সঃ) উটে মাথা ঠেকাতেন। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ইশারায় পড়তেন এবং সিজদায় রুকু থেকে বেশী ঝুঁকতেন। এ বর্ণনাটি আবু দাউদও উধৃত করেছেন।

●

Contents

অষ্টম পরিচ্ছেদ

●

চাশত নামায

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, 'আমি রাসূলকে (সঃ) কখনো চাশত নামায পড়তে দেখিনি; কিন্তু, আমি পড়ে থাকি।'

মুরিকুল আজলী থেকেও বর্ণিত আছে—আমি ইবনে উমরকে (রাঃ) প্রশ্ন করলাম, আপনি কি চাশত নামায পড়েন? তিনি জবাব দিলেন, না। প্রশ্ন করলাম উমর (রাঃ) পড়তেন? জবাব দিলেন, না। বললাম—আবু বকর (রাঃ)? জবাব দিলেন—না। প্রশ্ন করলাম—হযরত (সঃ) পড়তেন? জবাব দিলেন, তিনিও পড়তেন না। তাঁর কোন জুড়ি নেই।

ইবনে আবি লায়লা বলেন—নবীকে (সঃ) চাশত নামায পড়তে দেখেছে, এ কথা আমাকে কেউ শুনায়নি। শুধু উম্মে হানী (রাঃ) বলেছেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (সঃ) আমার ঘরে ঢুকে গোসল করলেন। তারপর আট রাকআত নামায পড়লেন। আমি তাঁকে এত সংক্ষেপ নামায আর পড়তে দেখি নি। হাঁ—তিনি রুকু ও সিজদা পূর্ণভাবে আদায় করেছিলেন।

সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণিত আছে—আয়েশা (রাঃ) কে হযরত (সঃ) চাশত নামায পড়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করলাম, তিনি জবাব দিলেন—না। শুধু সফর থেকে ফিরে তা পড়তেন। জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি সূরাগুলো ধারাবাহিকভাবে পড়ে যেতেন? জবাব দিলেন—বিচ্ছিন্নভাবে পড়তেন।

সহীহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—রাসূল (সঃ) সাধারণত চার রাকআত চাশত নামায পড়তেন। তারপর খোদা যতটুকু সুযোগ দিতেন, পড়তেন।

সহীহদ্বয়ে উম্মে হানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—মক্কা বিজয়ের দিনে তিনি আট রাকআত চাশত নামায পড়েছেন।

হাকাম তাঁর মুস্তাদরাকে বলেন—আনাস (রাঃ) থেকে আব্দুল্লাহ, তাঁর থেকে যিহাক, তাঁর থেকে বকর ইবনুল আশাজ, তাঁর থেকে উমর ইবনুল হারছ, তাঁর থেকে বকর ইবনে মুযির, তার থেকে ইবনে আবি মরিয়াম, তাঁর থেকে আস সুনআনী ও তাঁর থেকে আসিম আমার কাছে বর্ণনা করেন: রাসূলকে (সঃ) সফরে আট রাকআত চাশত নামায পড়তে দেখেছি। নামায শেষ করে তিনি বললেন, আমি আশা ও আশংকার নামায পড়লাম। তাতে আমি আমার প্রভুর কাছে তিনটি বস্তু প্রার্থনা করেছি। তা থেকে দু'টো আমাকে দিলেন ও একটি দিলেন না। আমি আরয করেছি, আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হতে দিওনা। আল্লাহ তা'আলা তা কবুল

করেছেন। আবার আরয করেছি, তাদের ওপরে শত্রুর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করো না। তিনি তাও কবুল করে নিয়েছেন। সর্বশেষ আবেদন জানালাম, তাদের ভেতরে বিভেদ ঘটতে দিও না। এ প্রার্থনা নামঞ্জুর হয়েছে।

হাকাম বলেন, রিওয়ায়েতটি সহীহ্। আমার মতে যিহাক ইবনে আব্দুল্লাহর বর্ণনায় নির্ভরতা প্রশ্নাতীত নয়। হাকাম তাঁর 'ফযলুয যোহা' গ্রন্থে লিখেছেন—হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে যাজান, তাঁর থেকে হিলাল ইবনে ইয়াসাফ, তাঁর থেকে খালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল হিসীন, তার থেকে মুহাম্মদ ইবনে সালেহ আদ দাওলানী, তার থেকে বশর ইবনে ইয়াহিয়া ও তাঁর থেকে আবু বকর আল ফকীহ আমাদের কাছে বর্ণনা করেন ঃ রসূল (সঃ) চাশত নামায পড়লেন। তারপর এ দো'আ পড়লেন ঃ

اللهم اغفرلي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم الغفور ٥

এমনকি তিনি একশ'বার এ দো'আটি পড়লেন।

আমাকে আবুল আব্বাসআল আসিম, তাঁকে আসাদ ইবনে আসিম, তাঁকে হিসিন ইবনে হাফস, তাঁকে সুফিয়ান, তাকে উমর ইবনে জর, তাকে হযরত মুজাহিদ (রাঃ) বলেন—রাসূল (সঃ) চাশত নামায দু'রাকআত, চার রাকআত, ছ'রাকআত ও আট রাকআত পড়েছেন।

ইমাম আহমদ বলেন—আমাকে আবু সাঈদ মাওলা ইবনে হাশিম, তাঁকে উছমান ইবনে আব্দুল মালিক উমরী, তাঁকে আয়েশা বিন্তে সা'দ ও তাঁকে উম্মে মুর্রাহ বলেছেন ঃ আমি হযরত আয়েশাকে (রাঃ) চাশত নামায পড়তে দেখেছি। তিনি বলতেন, আমি নবীকে (সঃ) শুধু চার রাকআত নামায পড়তে দেখেছি।

হাকাম বলেন—আমাকে আবু আহমদ বকর ইবনে মুহাম্মদ মারুযী, তাঁকে আবু কিলাবা, তাঁকে আবু ওয়ালিদ, তাঁকে আবু এওয়ানা, তাঁকে হিসীন ইবনে আব্দুর রহমান, তাঁকে আমর ইবনে মুর্রাহ, তাঁকে আম্মারা ইবনে উমায়ের, তাঁকে ইবনে যুবায়ের ইবনে মুতঈম, তাঁকে তাঁর মাননীয় পিতা বলেছেন—তিনি রাসূলকে (সঃ) চাশত নামায পড়তে দেখেছেন।

হাকাম আরও বলেন—আমাকে ইসমাঈল ইবনে মুহাম্মদ, তাঁকে মুহাম্মদ ইবনে আদী ইবনে কামিল, তাঁকে ওহাব ইবনে বাকিয়া ওয়াস্তি, তাঁকে খালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তাঁকে মুহাম্মদ কয়েস ও তাঁকে হযরত জাবির (রাঃ) ইবনে আব্দুল্লাহ বলেছেন—নবী (সঃ) দু'রাকআত নামায পড়েছেন।

হাকাম আবার বলেন—আমাকে ইসহাক ইবনে বশীরুল মুহামিলী, তাঁকে ঈসা ইবনে মূসা, তাঁকে জাবির, তাঁকে উমর ইবনে সাবীহ, তাঁকে মুকাতিল ইবনে হাব্বান, তাঁকে মুসলিম ইবনে সাবীহ, তাঁকে মাসরূক ও তাঁকে হযরত আয়েশা (রাঃ) ও উম্মে সালমা (রাঃ) বলেছেন—'হযরত (সঃ) বার রাকআত চাশত নামায পড়তেন।' তাঁরা তার এক দীর্ঘ বর্ণনা দান করেন।

হাকাম বলেন—আমাকে আবু আহমদ বকর ইবনে মুহাম্মদুস সারাফী; তাঁকে আবু কিলাবআর রুক্কাশী, তাঁকে আবুল ওয়ালিদ, তাঁকে শো'বা, তাঁকে আবু ইসহাক, তাঁকে আসিম ইবনে হামযা ও তাঁকে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ 'নবী (সঃ) চাশত নামায পড়তেন।' তেমনি আবুল ওয়ালিদকে আবু ইওয়ানা, তাঁকে হিসীন ইবনে আব্দুর রহমান, তাঁকে আমর ইবনে মুররাহ, তাঁকে আম্মারা উমায়েরর আব্দী, তাঁকে ইবনে যুবায়ের ইবনে মুতঈম ও তাকে তাঁর পিতা বলেছেন ঃ তিনি রাসূলকে (সঃ) চাশত নামায পড়তে দেখেছেন।

হাকাম বলেন, এ ব্যাপারে বর্ণনাদানকারী পুরুষ সাহাবাদের ভেতরে রয়েছেন—হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), আবু জর গাফফারী (রাঃ), যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ), বুরায়দা আসলামী (রাঃ), আবুদ দার্দা (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে উবায় আওফী (রাঃ), উতবান ইবনে মালিক (রাঃ), আনাস ইবনে মালিক (রাঃ), উতবা ইবনে আব্দুল্লাহ সালমী, নুঈম ইবনে হুমার গাতফানী এবং আবু ইমামা আল বাহিলী (রাঃ)। নারীদের ভেতরে আয়েশা বিন্তে আবু বকর (রাঃ), উম্মে হানী (রাঃ) ও উম্মে সালমা (রাঃ)। এঁরা সবাই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, নবী (সঃ) চাশত নামায পড়েছেন।

ইমাম তিবরানী হযরত আলী (রাঃ), আনাস (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) ও জাবির (রাঃ) এর উধৃতি দিয়ে বলেছেন—নবী (সঃ) ছ'রাকআত চাশত নামায পড়েছেন।

এ সব রিওয়ায়েতের সূত্র নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। একদল বর্জনের হাদীছের ওপরে অনুসরণের হাদীছকে ঠাঁই দিয়েছেন। কারণ, প্রতিষ্ঠাকারী হাদীছগুলো বিলোপকারী হাদীছের চাইতে বেশী লোকে জানে। তাঁরা বলেন—এও হতে পারে, অনেকেই ব্যাপারটি জানে না। মাত্র কিছু লোক থেকে এটি জানতে পারা যায়। কিন্তু, তাঁরা হচ্ছেন হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ), হযরত জাবির (রাঃ) ও হযরত উম্মে হানী (রাঃ)। তাঁরা সবাই বলেছেন, রাসূল (সঃ) চাশত নামায পড়েছেন। তা ছাড়া নিম্ন হাদীছগুলোতে তার সমর্থন মিলে। এমনকি সেই নামাযের অনেক ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে এবং তা পড়ার জন্যে অসিয়ত করা হয়েছে।

সহীহদ্বয়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন—আমার অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আমাকে প্রতিমাসে তিনদিন রোযা রাখার, দু'রাকআত চাশত নামায পড়ার ও শোবার আগে বিতর নামায পড়ে নিবার জন্যে অসিয়ত করে গেছেন।

সহীহ মুসলিমে আবু দার্দা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা মিলে। এ সংকলনেই হযরত আবু জর (রাঃ) এর এক মারফু রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে—হযরত (সঃ) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই সদকা দেয়া ওয়াজিব। বস্তুত, প্রতিটি তাসবীহ সদকা, প্রতিটি হাম্দ্ সদকা, প্রতিটি তাহলীল

(লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) সদকা, প্রতিটি তাকবীর সদকা, প্রতিটি ন্যায়ের নির্দেশ দান সদকা ও প্রতিটি অন্যায় রোধের কাজই সদকা। অথচ দু'রাকআত চাশত নামায ঐ সব কিছুর জন্যে যথেষ্ট।

ইমাম আহমদের মুসনাদে হযরত মু'আজ ইবনে আনাস জুহনী থেকে বর্ণিত আছে—রাসূল (সঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ফজর শেষ করেও নিজ জায়নামাযে বসে থাকে, এমনকি চাশতের দু'রাক-আত নামায আদায় করে, এবং ভাল কথা ছাড়া কিছু বলেনা, তার পাপ সমুদ্রের তরংগরাশির মত অগন্য হলেও খোদা ক্ষমা করে দেন।

তিরমিজী ও সুনানে ইবনে মাজায় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি চাশত নামায অক্ষুণ্ণ রাখল, তার সমুদ্র তরংগবৎ অসংখ্য পাপরাশি খোদা মাফ করে দেবেন।

মুসনাদ ও সুনানে নঈম ইবনে হাম্মাদ থেকে বর্ণিত আছে—নবীয়ে পাককে (সঃ) বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ হে আদম সন্তান ! দিনের শুরুতে চার রাকআত পড়তে যেন ভুল করো না। তা হলে সারা দিন আমি তোমাদের জন্যে জিম্মাদার থাকবো।" জামে'তিরমি-জীতে ও সুনানে ইবনে মাজায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকে মারফু রিওয়ায়েতে ও ইমাম তিরমিজী (রঃ) হযরত আবু দার্দা ও আবু জর (রাঃ) থেকে সরাসরিভাবে এ বর্ণনা দান করেন ঃ

'যে ব্যক্তি বার রাকআত চাশত নামায পড়লো, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি সোনার মহল তৈরী করবেন।'

সহীহ মুসলিমে হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ তিনি কুবা মসজিদে একদল লোককে চাশত পড়তে দেখে বললেন, এ সময় ছাড়া অন্য সময়ে যে এ নামায আদায়ে বেশী ফযীলত রয়েছে, তা কি এরা জানে না ? রাসূল (সঃ) বলেছেন, সূর্য তপ্ত হয়ে উঠলেই আওয়াবীন নামাযের ওয়াক্ত হয়। 'তারমিদুল ফিসাল' বলতে দিনের তাপ প্রখর হওয়াকে বুঝায়। অর্থাৎ যখন দেহ দ্বিপ্রহরের তাপ অনুভব শুরু করে।

সহীহ রিওয়ায়েতে আছে, হযরত (সঃ) উতবান ইবনে মালিকের ঘরে দু'রাকআত চাশত নামায পড়েছেন। হাকামের মুস্তাদরাকে তিনি খালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওয়াস্তী থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে উমর থেকে, তিনি আবু সালমা থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা থেকে এ বর্ণনা প্রাপ্ত হন যে, রাসূল (সঃ) বলেছেন ঃ

"চাশত নামায কেবল খোদার দিকে আকৃষ্ট ব্যক্তিরাই পড়ে থাকে।" এ হাদীছটি মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজের হাদীছের মতই প্রামাণ্য। মুসলিম তাঁর ওস্তাদ থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে উমর থেকে, তিনি আবু সালমা থেকে ও তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ

নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এক নবীকে কুরআন ভালভাবে তিলাওয়াত করার জন্যে যতখানি তাগাদা দিয়েছেন, আর কোন নবীকে কোন কিছুর জন্যে এত বেশী হুকুম করেন নি।

হাকাম বলেন—পূর্ব রিওয়ায়েত সম্পর্কে বলা হয়েছে, হাম্মাদ ইবনে সালমা ও আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ দিরাওয়ার্দী মুহাম্মদ ইবনে উমর থেকে 'মুরসাল' বর্ণনা পেয়েছেন। জবাবে বলা যায়, খালিদ ইবনে আব্দুল্লাহ নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে অতিরিক্ত কিছু পেলে তা গ্রহণযোগ্য।

হাকাম বর্ণনা করেন—তাঁকে আব্দান ইবনে ইয়াযীদ, তাঁকে মুহাম্মদ ইবনে মুগীরা সুকরী, তাঁকে কাসিম ইবনে হাকাম উরফী, তাঁকে সুলায়মান ইবনে দাউদ ইয়ামামী, তাঁকে ইয়াহিয়া ইবনে কাছীর, তাঁকে আবু সালমা ও তাঁকে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন—রাসূল (সঃ) বলেছেন, জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে। তার নাম বাবুযযোহা। যখন কিয়ামত হয়ে যাবে, এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন, যারা চাশত নামায পড়তে, তারা খোদার দয়ায় এ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।

জামে' তিরমিজীতে রয়েছে, আমাকে আবু কুরায়েব মুহাম্মদ ইবনে আলা, তাঁকে ইউনুস ইবনে বুকায়ের তাঁকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, তাঁকে মূসা ইবনে খুল্লাল, তাঁকে ছুমামা ইবনে আনাস ইবনে মালিক ও তাঁকে মালিক ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন—রাসূল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বার রাকআত চাশত নামায পড়লো, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্যে সোনার একটি ঘর তৈরী করবেন।

ইমাম তিরমিজী হাদীছটি 'গরীব' শ্রেণীর বলেছেন। তিনি বলেন, এর একটি মাত্র সূত্রই রয়েছে।

ইমাম আহমদ এ ব্যাপারে উম্মে হানীর বর্ণনাটিকেই অধিকতর বিশুদ্ধ মনে করেন। আমার বক্তব্য এই, মূসা ইবনে খুল্লাল মূলত মূসা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুছান্না ইবনে আনাস ইবনে মালিক।

জামে' তিরমিজীতে আতিয়া আওফীর এক বর্ণনা রয়েছে। তিনি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনাটি পেয়েছেন। তিনি বলেছেন, রাসূল (সঃ) এরূপ ধারাবাহিক চাশত নামায পড়তেন, যাতে করে আমাদের ধারণা হত, এ নামায তিনি আর বাদ দিবেন না। তারপর আবার এমনভাবে বাদ দিতেন যে, মনে হত তিনি আর তা পড়বেন না।

ইমাম তিরমিজী হাদীছটিকে 'হাসান গরীব' আখ্যা দিয়েছেন।

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে বলেন—আমার কাছে আবু ইয়ামান, তাঁর কাছে ইসমাঈল ইবনে আউয়াল, তাঁর কাছে ইয়াহিয়া ইবনে হারিছ, তাঁর কাছে কাসিম, তাঁর কাছে আবু ইয়ামামা ও

তাঁর কাছে নবী (সঃ) থেকে এ বর্ণনা পৌঁচেছে—যে ব্যক্তি ওযূ করে ফরয নামায আদায় করতে চলল, সে একজন মুহাররিম হাজীর ছাওয়াব পেল। আর যে ব্যক্তি চাশত নামায আদায় করতে গেল, সে ব্যক্তি একজন উমরাকারীর ছাওয়াব পেল। আর তার নামাযের ছাওয়াব ইল্লীনে যথা-যথভাবেই রক্ষিত থাকবে।

আবূ ইমামা বলেন—এ সব মসজিদে সকাল সন্ধ্যায় নামাযে গমন জিহাদ ফী ছাবীলিল্লাহর শামিল।

হাকাম বলেন, আমাকে আবুল আব্বাস তাঁকে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক সুনে'আনী, তাঁকে আবুল মোযে' মুহাজির ইবনুস সাওদা, তাঁকে আবুল আহওয়াস ইবনে হাকীম, তাঁকে আব্দু-ল্লাহ ইবনে আমের ইলহানী, তাঁকে মুনীব ইবনে আয়নিয়া ইবনে আব্দুল্লাহিস সালমীও তাঁকে আবূ ইমামা এ বর্ণনা শুনিয়েছেন—যে ব্যক্তি মসজিদে জামাতে ফজর নামায আদায় করল এবং সেখানে চাশতের ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করে চাশত নামায আদায় করল, তাকে এমন একজন হাজী ও একজন মু'তামিরের ছাওয়াব দান করা হবে যাদের হজ্ব ও উমরা পূর্ণভাবে আদায় হয়েছে।

ইবনে আবি শায়বা বলেন—আমাকে হাতিম ইবনে ইসমাঈল, তাঁকে হামীদ ইবনে সাখর, তাঁকে আল মাকবিরী, তাঁকে আল আরাজ ও তাঁকে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) এ বর্ণনা শুনান—নবী (সঃ) একদল সৈন্য এক অভিযানে পাঠালেন। তারা যথেষ্ট যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়ে অতি শীঘ্র ফিরে এল। তখন এক ব্যক্তি বলল ঃ হে রাসূল! আমি এত তাড়াতাড়ি কোন সেনাদলকে যুদ্ধ জয় করে ফিরতে দেখিনি। এমনকি এত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিয়েও কোন বাহিনীকে ফিরে আসতে দেখিনি। তা শুনে হযরত (সঃ) বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন এক ব্যক্তির সংবাদ শুনাবনা যে ব্যক্তি সব চাইতে বেশী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সহ সর্বাগ্রে প্রত্যাবর্তন করে? যে ব্যক্তি নিজ ঘরে বসে উত্তমভাবে ওযূ করে মসজিদের দিকে যায় ও সেখানে ফজর ও চাশত নামায আদায় করে, নিশ্চয়ই সে ব্যক্তি সর্বাধিক সম্পদ নিয়ে সর্বাগ্রে প্রত্যাবর্তন করে। এ ব্যাপারে এ ধরনের আরও কয়েকটি হাদীছ রয়েছে।

হাকাম বলেন—আমি হাদীছের একদল হাফিজের সাথে কিছুদিন ছিলাম। তাঁদের চার রাকআতই পসন্দ করতে দেখেছি। তাঁরা সহীহ ও মুতাওয়াতির (পর পর বহু জনের বর্ণিত) হাদীছ মোতাবেকই তা করেছেন। আমার নীতিও এটাই। সাহাবা ও মাশায়েখদের বর্ণনায় এ মতের দিকেই আহবান জানানো হয়েছে।

ইবনে জারীর তাবারী (রঃ) বলেন—চাশত নামায ও বিভিন্ন ধরনের মুনাজাত সম্পর্কে বহু মারফু হাদীছ পাওয়া যায়। কোন হাদীছই বিশেষ কোন মতানুসারীর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে যথেষ্ট নয়। যেমন বর্ণিত আছে যে, হযরত (সঃ) চার রাকআত চাশত নামায পড়েছেন।

হতে পারে বর্ণনাকারী তাঁকে ততটুকু করতেই দেখেছেন। দ্বিতীয় বর্ণনাকারী দু'রাকআত পড়তে দেখেছেন বলেই সেরূপ বর্ণনা করেছেন। কেউ দু'রাকআত, কেউ আট রাকআত, কেউ আবার বার রাকআত পড়ার জন্যে হয়ত তাঁকে উৎসাহিত করতে দেখেছেন। মোট কথা যিনি যা শুনেছেন বা দেখেছেন তাই বর্ণনা করেছেন।

তিনি আরও বলেন—আমার এ বক্তব্যের সমর্থন হযরত যায়েদ ইবনে আসলামের রিওয়ায়েতে পাই। তিনি বলেছেন, আমি হযরত আবু জরকে (রাঃ) লক্ষ্য করে আবদুল্লাহ ইবনে উমরকে (রাঃ) বলতে শুনেছি, হে চাচা! আমাকে কিছু উপদেশ দিন।

তিনি জবাবে বললেন—তোমারই মত আমি রাসুলুল্লাহর (সঃ) কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। রাসুল (সঃ) তখন বলেছেন, যে ব্যক্তি দু'রাকআত চাশত নামায পড়বে, তাকে গাফিল ধরা হবে না। যে ব্যক্তি চার রাকআত পড়ল তাকে আবিদ ধরা হবে। যে ব্যক্তি ছ'রাকআত পড়বে আর সেদিন কোন পাপে লিপ্ত হবে না এবং যে ব্যক্তি আট রাকআত নামায পড়বে, তাদের কানেত (খোদায় নিবিষ্ট চিত্ত) বলে গণ্য করা হবে। আর যে ব্যক্তি দশ রাকআত পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।

মুজাহিদ বলেন—রাসুল (সঃ) একদিন চাশত নামায দু'রাকআত পড়েন। একদিন আবার চার রাকআত, একদিন ছ'রাকআত ও একদিন আট রাকআত পড়েন। তারপর ছেড়ে দেন।

এ সব থেকে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে ব্যক্তি যেভাবে দেখেছেন বা শুনেছেন, তিনি সেভাবেই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এ প্রশ্নে যার যে মত অনুসরণ করার করতে পারে।

পূর্বসুরীদের একদলও এ মত পোষণ করে গেছেন। আমাকে ইবনে হামীদ, তাঁকে জারীদ ও তাঁকে ইব্রাহীম এ বর্ণনাটি শুনিয়েছেন—এক ব্যক্তি হযরত আসওয়াদের (রাঃ) কাছে কত রাকআত চাশত নামায পড়তে হবে, তা জানতে চাওয়ায় তিনি জবাবে বলেছেন, যত রাকআত তোমার ইচ্ছা হয়।

আরেক দল চাশ্ত বর্জনের পক্ষে গিয়েছেন। সনদের বিশুদ্ধতা ও সাহাবাদের কার্যধারাকে ভিত্তি করেই তাঁরা এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) ইবনে উমর (রাঃ) থেকে এক রিওয়ায়েত উধৃত করে বলেন—ইবনে উমর (রাঃ), আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) প্রমুখ কেউই চাশত পড়তেন না। তাঁর কাছে রাসুলের (সঃ) নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দিয়েছেন, তিনিও পড়তেন না। তাঁর কোন জুড়ি নেই।'

ওয়াকী' (রাঃ) বলেন—আমাকে সুফিয়ান আছ ছাওরী (রাঃ), তাঁকে আসিম ইবনে কালীব, তাঁকে তাঁর পিতা ও তাঁকে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন—আমি নবীকে (সঃ) মাত্র একদিন চাশত নামায পড়তে দেখেছি।

Contents

আলী ইবনে মাদীনী বলেন—আমাকে মু'আজ ইবনে মা'আজ, তাঁকে শো'বা, তাঁকে ফুযায়েল ইবনে ফুযালা, তাঁকে আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) এ বর্ণনা শুনান ঃ আবু বকর (রাঃ) একদল লোককে চাশত নামায পড়তে দেখে বললেন, তোমরা সেই নামায পড়ছ যা না রসূল (সঃ) পড়েছেন, না তাঁর কোন সাহাবা পড়েছেন ?

মুয়াত্তায় ইমাম মালিক (রঃ) ইবনে শিহাব থেকে, তিনি উরুয়া থেকে তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—রসূল (সঃ) কখনও চাশত নামায পড়েন নি। অথচ আমি পড়ি। আদপে রসূল (সঃ) কিছু কাজ ক'দিন করেই ছেড়ে দিতেন, অথচ তিনি তা করতে পসন্দ করতেন। কিন্তু, এ জন্যে ছেড়ে দিতেন যেন উম্মতের ওপরে তা অপরিহার্য হয়ে না যায়।

আবুল হাসান আলী ইবনে বাত্তাল বলেন ঃ পূর্ববর্তীদের একটি দল হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীছ গ্রহণ করে চাশত নামায অস্বীকার করেছেন। একদল বিদআত বলেছেন।

শা'বী কায়েস ইবনে উবায়েদ থেকে বর্ণনা করেন—আমি হযরত ইবনে মাসউদের (রাঃ) সুন্নাত নামাযের ব্যাপারে মতানৈক্য পোষণ করি। তাঁকে চাশত নামায পড়তে দেখিনি।

শো'বা সা'দ ইবনে ইবরাহীম থেকে, তিনি নিজ পিতা থেকে আব্দুর রহমান ইবনে আউফের আমল সম্পর্কে বর্ণনা করেন—তিনি চাশত নামায পড়তেন না।

মুজাহিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন—আমি ও হযরত উরুয়া ইবনে যুবায়ের মসজিদে গেলাম। দেখলাম, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) হযরত আয়েশার (রাঃ) হুজরার কাছে বসে আছেন। লোকদের দেখলাম সেখানে চাশত নামায পড়তে। তখন আমরা তাঁর কাছে এ নামায সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন—বিদআত। আবার বললেন—ভাল বিদআত (বিদআতে হাসানা)।

ইমাম শা'বী (রঃ) বলেন—ইবনে উমরকে (রাঃ) বলতে শুনেছি, মুসলমানরা চাশত নামাযের চাইতে উত্তম বিদআত আর কিছুই সৃষ্টি করেনি।

হযরত আনাস ইবনে মালিকের কাছে চাশত নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দেন—নামায পাঁচ ওয়াক্ত।

তৃতীয় একদল এখনও এ নামায পড়া মুস্তাহাব বলেন। তাই কোন কোন দিন পড়তে বলেন। ইমাম আহমদ থেকে প্রাপ্ত দু'টি বর্ণনার অন্যতম হল এটি। ইমাম তাবারী (রঃ) একদল থেকে এ মতটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা জারীরের (রাঃ) বর্ণনা থেকে দলীল নিয়েছেন। জারীর আব্দুল্লাহ ইবনে শাকীক থেকে বর্ণনা করেন—আমি হযরত আয়েশার (রাঃ) কাছে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত (সঃ) কি চাশত নামায পড়তেন ? তিনি জবাব দিলেন—না। তবে হাঁ, সফর থেকে ফিরলে তখন পড়তেন। তাঁরা তারপর আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ) হাদীছটি উল্লেখ করেছেন।

তাতে বলা হয়েছে, কখনও তিনি এভাবে পড়া শুরু করতেন যেন কখনও বাদ দেবেন না। আবার কখনও এমনভাবে ছেড়ে দিতেন যেন আর পড়বেন না। পূর্ববর্তীদের যারা মাঝে মাঝে পড়া মুস্তাহাব ভাবতেন, তাঁরা এগুলোর উল্লেখ করেছেন।

শো'বা হাবীব ইবনে শাহীদ থেকে, তিনি ইকরামা থেকে বলেন—ইবনে আব্বাস (রাঃ) চাশত নামায পড়তেন একদিন এবং বাদ দিতেন দশ দিন।' শো'বা আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেন—উমর (রাঃ) চাশত নামায পড়তেন না। তবে প্রতি শনিবার যখন কুব্বা মসজিদে আসতেন, তখন পড়তেন।

সুফিয়ান মানসুর থেকে বর্ণনা করেন—তাঁরা ফরয নামাযের মত ধরাবাঁধাভাবে এ নামায পড়তেন না। কখনও পড়তেন, কখনও ছাড়তেন।

হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণিত আছে—আমি চাশত বাদ দিয়ে থাকি। অথচ ইচ্ছা থাকে পড়ার। তা এ জন্যে করি যেন নিজের ওপরে ফরযের মত না চাপাই।

মাসরুক (রঃ) বলেন, আমরা মসজিদে পড়তাম। ইবনে মাসউদ (রাঃ) চলে যাবার পরেও আমরা মসজিদে অপেক্ষা করতাম। চাশতের সময় এলে দাঁড়িয়ে তা পড়তাম। অবশেষে হযরত ইবনে মাসউদ এ কথা জানতে পেলেন। তখন আমাদের বললেন—খোদা যে বোঝা তাঁর বান্দার ওপরে চাপান নি, তোমরা তা চাপাচ্ছ কেন ? যদি একান্তই এরূপ কর, তা ঘরে বসে করো।

আবু মুজলিয (রঃ) নিজের ঘরে বসে চাশত নামায পড়তেন। তিনি বলেন, এটাই উত্তম পন্থা। কেউ যেন আবার তা দেখতে পেয়ে ওয়াজিব অথবা নিয়মিত সুন্নাত ভেবে না বসে। তাই হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'বাপ মাকে যিন্দা ফিরিয়ে দিলেও এ নামায ছাড়ব না।' অথচ তিনি তা ঘরে সংগোপনে পড়তেন। কেউ দেখতে পেতনা।

চতুর্থ দল বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) পড়তেন এক কারণে আর হযরত (সঃ) পড়তেন অন্য কারণে। নবী (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিনে খুশী প্রকাশের জন্যে আট রাকআত চাশত নামায পড়েছিলেন। তাই যুদ্ধ জয়ের বেলায় আট রাকআত চাশত নামায পড়া সুন্নাত। শাসকরা এ নামাযকে 'সালাতুল ফাত্‌হ' বলতেন। ইমাম তাবারী (রাঃ) তাঁর ইতিহাসে শা'বী থেকে একটি বর্ণনা উধৃত করে বলেছেন, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ যখন হীরা জয় করলেন, তখন একই সালামে আট রাকআত 'সালাতুল ফাত্‌হ' পড়লেন।

মুহাদ্দিছরা বলেন—উম্মে হানীর (রাঃ) মতে এটা চাশত নামায ছিল। তার অর্থ এই যে, সেটা চাশত বা 'যোহা'র ওয়াক্ত ছিল। তা বলে এমনিতেই এ নামাযের এরূপ নাম হয়নি।

মুহাদ্দিছরা বলেন—উতবান ইবনে মালিকের (রাঃ) ঘরে তিনি যে নামায পড়েছেন তা বিশেষ কারণে। উতবান (রাঃ) বলেন—আমি আরয করেছিলাম, আমার দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। আমার সম্প্রদায়ের মসজিদ ও আমার ঘরের মাঝখানে পানি উঠে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। তাই আমার আকাংক্ষা এই যে আপনি, আমার ঘরে এসে নামায পড়বেন যেন আমার ঘর মসজিদ হয়ে

যায়। হযরত (সঃ) ইনশাআল্লাহ্ বলে সম্মত হলেন। তিনি পরদিন সকালে আমার বাড়ী এলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) ও তাঁর সাথে ছিলেন। তখন দিনের আলো প্রখর হয়ে উঠেছিল। নবী (সঃ) ঘরে ঢুকবার অনুমতি চাইলে আমি অনুমতি দিলাম। ঘরে ঢুকে তিনি না বসে জিজ্ঞেস করলেন, কোনখানে নামায পড়াতে চাও? আমি আমার মনোনীত স্থানটি দেখিয়ে দিলাম। তখন তিনি সেখানে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমারাও তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। নামায শেষে তিনি যখন সালাম ফিরালেন, আমরাও ফিরালাম (সহীদদ্বয়)।

এ নামাযের এটাই হল মূল ঘটনা। বুখারীতে বর্ণনাকারী এ বর্ণনাটির সংক্ষেপ রূপ দান করেছেন। তাতে বলা হয়েছে—রসূল (সঃ) আমার ঘরে চাশত নামায পড়েন, তাঁর পেছনে সাহাবারা মুক্তাদী হয়ে তাঁরাও নামায আদায় করলেন।

এখন হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীছে যে বলা হয়েছে, হযরত (সঃ) কেবল সফর থেকে ফিরে এ নামায পড়তেন। তাতে পরিস্কার বুঝা যায় যে, এর বিশেষ কোন কারণ ছিল। কারণ, তিনি যখন সফর শুরু করতেন, তখন মসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়তেন। এটা তাঁর ব্যক্তিগত সুন্নাত ছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) এরূপ বিশেষ নামাযের কথাই বলেছেন। আর তিনি যে বলেন, হযরত (সঃ) কখনও চাশত নামায পড়েন নি, তাতে বুঝা যায় যে, সফর থেকে ফিরা বা যুদ্ধ জয় করা কিংবা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সাথে দেখা হওয়া ইত্যাদি কারণে হয়ে থাকবে। যেমন, নামায পড়ার জন্যে কুবা মসজিদে গমন।

ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব বর্ণনা করেন—তাঁকে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর, তাকে সালমা ইবনে রিজা, তাকে শা'ছা বলেছেন—আমি ইবনে আবু আওফাকে আবু জাহিলের মাথা কাটার সুসংবাদ পেয়ে দুরাকআত চাশত নামায পড়তে দেখেছি। যদি ঘটনা সত্য হয়, তা হলে তা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামায হবে যা ঘটনাচক্রে চাশতের ওয়াক্তে পড়েছিলেন। যুদ্ধ জয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামায সেই বিশেষ কারণ ছাড়া পড়তেন না। অথচ তা পরবর্তী লোকেরা বিনা কারণেই পড়ে চলছে। অবশ্য তিনি এটাকে মাকরূহ কিংবা সুন্নাত পরিপন্থীও বলেন নি। তবে তাঁর নির্ধারিত সুন্নাতও নয়। তিনি এ নামাযের জন্যে উপদেশ দিয়েছেন, উৎসাহ জুগিয়েছেন এবং ভাল বলেছেন। তিনি অবশ্য এ নামাযের বদলে রাত জেগে নামায পড়া অনুসরণ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝

"তিনিই সেই প্রভু, যিনি দিন ও রাতকে একে অপরের স্থলাভিষিক্ত করে দেন যেন যে চায় তাতে খোদার বিধান পালন করতে পারে এবং যে চায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।"

ইবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান (রাঃ) ও কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, এ দু'টো নামায একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। কারণ, কোন কাজ যদি কোন কারণে যথা সময়ে না করা যায়, তাহলে অন্য সময়ে তা আদায় করা চাই।

কাতাদাহ (রাঃ) বলেন, দিন-রাত ভুর খোদার জন্যে ভাল কাজ কর। কারণ, সেগুলো তোমার কাছ থেকে লুটে নেয়া হচ্ছে। মানুষ মরণের দিকে ছুটে চলছে। দূর নিকট হয়ে চলছে। সব নতুন জিনিস পুরনো হয়ে যাচ্ছে। কিয়ামত পর্যন্ত সব কিছুই আবর্তিত হয়ে চলছে।

শাকীক বলেন, হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের (রাঃ) কাছে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করল—আমি রাতের নামায আদায় করতে পারিনি। তিনি জবাব দিলেন, যা রাতে হারাবে, দিনে তা পুরা করবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'খোদাই দিন ও রাতকে পরস্পরের স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। যে চায় তাতে উপদেশ গ্রহণ করে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।'

মুহাদ্দিছরা বলেন—সাহাবাদের কার্যকলাপ এ মতেরই সমর্থন জানায়। কারণ, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদিন পড়তেন ও দশদিন ছাড়তেন। ইবনে উমর (রাঃ) তো পড়তেনই না। হযরত (সঃ) কুব্বা মসজিদে গেলে এ নামায পড়তেন। তিনি প্রতি শনিবারে সেখানে যেতেন।

সুফিয়ান (রঃ) হযরত মানসুর (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবারা (রাঃ) ফরয নামাযের মত ধরাবাঁধাভাবে এ নামায পড়া মাকরূহ ভাবতেন। তাঁরা কখনও পড়তেন, কখনও ছাড়তেন।

মুহাদ্দিছরা বলেন—এ ব্যাপারে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে সহীহ হাদীছ এসেছে। তাতে আছেঃ 'এক স্থূলকায় আনসার হযরতের (সঃ) খিদমতে এসে আরয করল, আমি কি আপনার সাথে নামায পড়তে পারি? সে হযরতকে (সঃ) খাবার দাওয়াত দিল। তাঁকে বাড়ীতে নিয়ে এল এবং চাটাইয়ের এক অংশে হযরতের (সঃ) জন্য পানি ছিটিয়ে দিল। হযরত (সঃ) সেখানে দু'রাকআত নামায পড়লেন। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, এদিন ছাড়া তাঁকে আমি আর কখনও চাশত নামায পড়তে দেখিনি (বুখারী)

নবীর হাদীছ ও সাহাবাদের বক্তব্য ও কার্যধারা নিয়ে যারাই একটু চিন্তা করেন, তারা অবশ্যই জানতে পাবেন যে, তা সবই এ মতের পরিপোষক। উৎসাহ ও অনাগ্রহ সৃষ্টিকারী হাদীছ এ ব্যাপারে আবু হুরায়রা (রাঃ) ও আবু জার (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। অথচ তাঁদের থেকেও এ প্রমাণ নেই যে, এ নামায নিয়মিত সুন্নাত। আবু হুরায়রাকে (রাঃ) হযরত (সঃ) চাশত নামায পড়ার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ, এরূপ বর্ণিত আছে যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) রাতের নামা-যের বদলে তখন কুরআন তিলাওয়াত পসন্দ করতেন। তাই হযরত (সঃ) তাঁর রাতের নামাযের

২৮—

Contents

বদলে চাশত নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন। এ কারণেই তিনি আবু হুরায়রাকে (রাঃ) বিতর না পড়ে ঘুম যেতে নিষেধ করেছেন। অথচ হযরত আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবাদের সেরূপ আদেশ দেন নি।

এ ব্যাপারে সাধারণভাবে যত হাদীছ পাওয়া যায়, সেগুলোর সূত্র প্রশ্ন সাপেক্ষ। কিছু ছিন্ন-সূত্র ও কিছু মনগড়া যা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন, হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এক মারফু রিওয়ায়েতে বলা হয়েছে : 'যে ব্যক্তি চাশত নামায নিয়মিতভাবে আদায় করবে ও কখনই বাদ দেবেনা, সে ও আমি (হযরত (সঃ)) একটি নূরের সমুদ্রে এক নূরের কিশতীতে অবস্থান করব।' যাকারিয়া ইবনে দরীদ কান্দী হাদীছটি হামীদ থেকে রিওয়ায়েত করার নামে সৃষ্টি করেছে।

এখন ইয়ালী ইবনে আশদাকের বর্ণনা সম্পর্কে প্রশ্ন রয়ে গেল। সে আব্দুল্লাহ ইবনে জার্দ থেকে ও সে নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন :

"তোমাদের ভেতরে যে ব্যক্তি চাশত নামায পড়বে, সে যেন নিয়মিত আদায় করে। কারণ, কেউ কেউ কিছুদিন এক সুন্নাত আদায় করে আবার তা ভুলে যায় ও ছেড়ে দেয়। আমি তার দিকে চেয়ে এমনভাবে বিলাপ করি যেমন উটনী নিজ সন্তান হারিয়ে বিলাপের চীৎকার করে।"

আশ্চর্য মানুষ হাকাম! কি করে এরূপ রিওয়ায়েত দিয়ে তিনি প্রমাণ দেন? কি করে তিনি চাশত নামাযের অধ্যায়ে তাঁর গ্রন্থে এ বর্ণনা গ্রহণ করলেন! অথচ ইয়ালী ইবনে আশদাকের হাদীছের নুসখা হযরতের (সঃ) নামে যত সব মওযু হাদীছে ভরপুর।

ইবনে 'আদী বলেন—ইয়ালী ইবনে আশদাক তার চাচা আব্দুল্লাহ ইবনে জার্দ থেকে এবং সে নবী (সঃ) থেকে বেশীর ভাগ অগ্রহণযোগ্য হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

এ ব্যক্তি ও তার চাচা দু'জনই অপরিচিত রাবী। আমাকে আবু মুসহার বলেছেন, আমি ইয়ালী ইবনে আশদাকের কাছে বললাম, তোমার চাচা নবী (সঃ) থেকে কোন হাদীছ শুনেন নি। সে জবাবে বলল—জামে' সুফিয়ান, মুয়াত্তায়ে মালিক ও অন্যান্য সংকলন থেকে তিনি কাজ নেন।

আবু হাতিম ইবনে হাব্বান বলেন—ইয়ালী ও আব্দুল্লাহ ইবনে জার্দের সাথে দেখা শুনা ছিল। বড় হয়ে সে সেই বেদীনের সাহচর্য নিয়েছিল। বস্তুত, সে প্রায় একশ হাদীছে নানা কথা সৃষ্টি করে নিয়েছিল এবং তাই সে বর্ণনা করত। অথচ হাদীছ সম্পর্কে সে কিছুই জানত না। তাই আমাদের কোন এক উস্তাদ বলতেন—তুমি আব্দুল্লাহ ইবনে জার্দ থেকে কি কিছু শুনেছ? তার সংকলন ও সুফিয়ানের সংকলন থেকে কোন অবস্থায়ই রিওয়ায়েত গ্রহন বৈধ নয়।

তেমনি উমর ইবনে সাবীহ মুকাতিল ইবনে হাব্বানের সূত্র দিয়ে হযরত আয়েশার (রাঃ) এ রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন : 'রসূল (সঃ) বার রাকআত চাশত নামায পড়তেন।' এ বর্ণনাটি

বেশ লম্বা। হাকাম তাঁর সংকলনে চাশ্‌ত নামাযের অধ্যায়ে সেটির উল্লেখ করেছেন। এ রিওয়া-য়েতটিও মওযূ। উমর ইবনে সাবীহ মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত।

ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন—আমাকে ইয়াহিয়া ইবনে আলী ইবনে জুবায়ের বলেছেন—আমাকে উমর ইবনে সাবীহ বলেছে যে, সে হযরতের (সঃ) খুৎবা তৈরী করেছে। ইবনে আদী (রাঃ) তাকে মুনকার হাদীছ বর্ণনাকারী বলেছেন। ইবনে হাব্বান বলেন, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বরাত দিয়ে সে বর্ণনা নিজে তৈরি করে নেয়। শুধু বিস্ময় প্রকাশের জন্যেই তার হাদীছ সংক-লন ব্যবহার বৈধ হতে পারে। দারে কুতনী তাকে বর্জনীয় বলেছেন। ইযদী তাকে চরম মিথ্যাবাদী বলেছেন।

তেমনি এক মারফূ হাদীছ আব্দুল আযীয ইবনে আবান ইমাম ছাওরী (রঃ) থেকে, তিনি হাজ্জাজ ইবনে ফারাযিজা থেকে, তিনি মাকহুল থেকে ও তিনি আবু হুরায়রার (রাঃ) বরাত দিয়ে বলেছেন—'যে ব্যক্তি চাশত নামায নিয়মিত পড়বে, তার সব পাপ মাফ করা হবে। হোক তা সমুদ্রের ফেনার চাইতেও বেশী।'

হাকাম (রঃ) হাদীছটি উধৃত করেছেন। ইবনে নুমায়ের আব্দুল আযীযকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। ইয়াহিয়া বলেছেন, তার কোন মূল্যই নেই। সে মিথ্যাবাদী ও জঘন্য হাদীছ জন্ম দেয়। ইমাম বুখারী, নাসায়ী ও দারে কুতনী তাকে 'বর্জনীয়' বলেন।

নুহাস ইবনে ফাহমের বর্ণনার দশাও এই। সে শাদ্দাদের সূত্র ধরে আবু হুরায়রার (রাঃ) বরাত দিয়ে মারফূ হাদীছ বর্ণনা করেছে ঃ যে ব্যক্তি চাশত নামায নিয়মিত পড়ল, তার সব পাপ মাফ হয়ে যাবে, হোক তা সমুদ্রের ফেনার চাইতেও অগণ্য।

নুহাস সম্পর্কে নাসায়ী ও ইয়াহিয়া (রঃ) বলেন—'একদম বাজে ও যঈফ। ইবনে আব্বাস ও আতা থেকে 'মুনকার' বর্ণনা করে। ইবনে আদীও তাকে বাজে আখ্যা দেন। ইবনে হাব্বান (রঃ) বলেন, খ্যাতনামা সাহাবাদের নামে সে গ্রহণের অযোগ্য হাদীছ বর্ণনা করে এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিরোধীতাই কাম্য হয়। তাই তার বর্ণনা থেকে প্রমাণ সংগ্রহ বৈধ নয়। ইমাম দারে কুতনী বলেন, সে হাদীছের ভেতরে এদিক-ওদিক কথা বলে। ইয়াহিয়া ইবনে কাত্তান তাকে বর্জন করেছেন।

তেমনি হামীদ ইবনে সাখার মাকবারীর সূত্রে আবু হুরায়রার (রাঃ) বরাত দিয়ে বলেছে ঃ নবী (সঃ) ছোট একটি সেনাদল অভিযানে পাঠান ইত্যাদি। এখানে হামীদকে নাসায়ী ও ইয়া-হিয়া (রঃ) যঈফ আখ্যা দিয়েছেন। অন্য একদল অবশ্য তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তবে তার কিছু বর্ণনা মেনে নেন নি। বিশেষ করে সে একা যে হাদীছ বর্ণনা করে তা থেকে তারা প্রমাণ উত্থাপন বৈধ মনে করেন না।

এখন মুহাম্মদ ইবনে ইসহাকের বর্ণনা বিবেচ্য। সে মূসা থেকে ও তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুছান্না থেকে, তিনি আনাস থেকে তিনি তার চাচা থেকে ও তিনি হযরত আনাসের (রাঃ) বরাত দিয়ে এ মারফু হাদীছ বর্ণনা করেছেন: 'যে ব্যক্তি চাশত নামায পড়বে, খোদা তার জন্যে জান্নাতে একটা সোনার ঘর তৈরী করবেন।'

রিওয়ায়েতটি 'গরীব'। ইমাম তিরমিজী বলেন, এ ব্যক্তি ছাড়া আর কারুর কাছে আমি এ বর্ণনা শুনিনি।

এখন থাকে নঈম ইবনে হুমায়েরের 'হে আদম সন্তান!...জিম্মাদার থাকব' রিওয়ায়েতটি। আবু দার্দা ও আবু জারের (রাঃ) বর্ণনা দু'টোও এ ধরনের। ইমাম ইবনে তায়মিয়া বলেন— এ হাদীছগুলোয় ফজরের চার রাকআত নামাযের কথা বলা হয়েছে।

●

Contents

নবম পরিচ্ছেদ

●

শোকরানা নামায ও তিলাওয়াতের সিজদা

শোকরানা নামায ঃ

নতুন কোন নিয়ামত লাভের কিংবা বিপদ দূর হবার ব্যাপারে আনন্দ প্রকাশ করার জন্যে রসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের কৃতজ্ঞতামূলক নামায আদায়ের রীতি ছিল।

মুসনাদে আবু বকরা থেকে বর্ণিত আছে—হযরত (সঃ) এর সামনে যখন কোন খুশীর ব্যাপার আসত, খোদার কৃজ্ঞতা প্রকাশের সিজদা দান করতেন।

ইবনে মাজায় আনাস থেকে বর্ণিত আছে—নবীকে (সঃ) এক ব্যাপারে সুসংবাদ দান করায় তিনি খোদার দরবারে সিজদা দান করেন।

ইমাম বায়হাকী ইমাম বুখারীর আরোপিত সূত্র জনিত শর্ত মোতাবেক এ বর্ণনা উধৃত করেন ঃ হযরত আলী (রাঃ) যখন হামদান গোত্রের ইসলাম গ্রহণের সংবাদ লিখে পাঠান, তা হাতে পেয়ে হযরত (সঃ) শোকরানা সিজদা আদায় করেন। তারপর মাথা তুলে বলেন ঃ আস্সালামু আলা হামদান ! আস্সালামু আলা হামদান !!

মুসনাদে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত আছে ঃ রসূলকে (সঃ) যখন খোদার তরফ থেকে এ সুসংবাদ দান করা হল, 'যে ব্যক্তি তোমার জন্যে দরূদ পড়বে আমি তাকে দয়া করব ও যে ব্যক্তি তোমার জন্যে সালাম পাঠাবে, আমি তাকে শান্তি দান করব' তখন তিনি কৃজ্ঞতার সিজদা দেন।

আবু দাউদের সুনানে হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত আছে ঃ 'নবী (সঃ) উপরে হাত তুলে বেশ কিছু সময় ধরে খোদার সকাশে প্রার্থনা জানালেন, তারপর তিনবার সিজদা করে বললেন—আমি আমার প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি আমার উম্মতের শাফাআত করে। তিনি আমার উম্মতের এক তৃতীয়াংশ পাপ ক্ষমা করলেন। তাই কৃতজ্ঞতার সিজদা দিলাম। আবার প্রার্থনা জানালাম, তিনি দু'তৃতীয়াংশ ক্ষমা করলেন। তাই দ্বিতীয় সিজদা দিলাম। আবার প্রার্থনা জানালাম, তিনি তৃতীয়াংশও ক্ষমা করলেন। তাই আমার প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্যে সিজদায় চলে গেলাম।' বুখারীতে আছে, কা'ব ইবনে মালিককে যখন সুসংবাদ দেয়া হল, আল্লাহ তা'আলা তার তাওবা কবুল করেছেন, তখন তিনি কৃতজ্ঞতার সিজদা দান করেন। ইমাম আহমদ হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি যখন জুল মাদিয়াকে নিহত খারিজীদের ভেতরে দেখতে পেলেন, তখন

কৃতজ্ঞতার সিজদা দান করলেন। সাঈদ ইবনে মানসুর বর্ণনা করেন ঃ হযরত আবু বকর (রাঃ) মুসায়লামার নিহত হবার সংবাদ পেয়ে কৃতজ্ঞতার সিজদা আদায় করেন।

তিলাওয়াতের সিজদা ঃ

হযরত (সঃ) যখন তিলাওয়াতের ভেতরে কোন সিজদার স্থান অতিক্রম করতেন, তাকবীর বলে সিজদায় যেতেন। অধিকাংশ সময়ে তাতে এ দো'আ পড়তেন ঃ

سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ۝

"আমার মুখমন্ডল তাঁরই সিজদায় রত হল যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন, তার আকার দান করেছেন ও তাকে নিজ ক্ষমতাবলে শ্রবণ ও দর্শণ শক্তি দান করেছেন।"

কখনও এ দো'আ পড়তেন ঃ

اللهم احطط عني بها وزرا واكتب لي بها اجرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داؤد ۝

"হে খোদা ! এ সিজদার বদৌলতে আমার পাপের বোঝা দূর কর। তার বদলে আমাকে পুণ্য দান কর। তোমার কাছে এটাকে আমার সঞ্চয় করে নাও। হযরত দাউদের (আঃ) সিজদা যেভাবে কবুল করেছ, আমার সিজদাও তেমনি কবুল করে নাও।"

সুনান সংকলয়িতারা এ দু'টো দো'আর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, এ সিজদা থেকে উঠতে গিয়ে তিনি তাকবীর বলতেন কিনা তা উল্লেখ করেন নি। তাই খারকী বা পূর্বসূরীদের কেউ এর আলোচনা করেন নি। এ সিজদায় হযরত (সঃ) তাশাহহুদ বা সালাম কোন কিছু করতেন বলে জানা যায় না। ইমাম আহমদ ও শাফেঈ (রঃ) এতে সালামের কথা অস্বীকার করেছেন। ইমাম শাফেঈ (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এতে সালাম বা তাশাহহুদ কিছুই নেই। ইমাম আহমদ সালামের ব্যাপারে কিছু জানেন না বলেছেন। এটাই সঠিক মত। এ ছাড়া কিছু বলা ঠিক নয়।

সহীহ রিওয়ায়েতে নবী (সঃ) থেকে প্রমাণ রয়েছে, তিনি নিম্ন সূরাগুলোয় সিজদা করতেন 'আলিফ লাম মীম তানযীল' 'সোয়াদ' আননাজমু,' 'ইজাস সামাউন শাক্কাত' 'ইকরা' বিইসমি রাব্বিকাল্লাজী।'

আবু দাউদ হযরত আমর ইবনে আস থেকে বর্ণনা করেন, রসূল (সঃ) সিজদার পনেরটি স্থানের উল্লেখ করেছেন। তার ভেতরে তিনটি 'মুফাসসাল' সূরায় ও সূরা হাজ্বে দু'সিজদা। হযরত আবু দারদা' বলেন—আমি রসূলের (সঃ) সাথে এগারটি সিজদা দিয়েছি। তার ভেতরে একটিও মুফাসসাল সূরায় নেই। তা হল, আল আ'রাফ, আর রা'আদ, আন নহল, বণী ইসরাঈল, মরিয়ম, আল হাজ্জ, সিজদাতুল ফুরকান, আন নামল, আস সিজদা, সোয়াদ ও সিজদাতুল হা-ওয়া-মীম।

আবু দাউদ বলেন, আবু দার্দা (রাঃ) হযরত (সঃ) থেকে এগার সিজদা বর্ণনা করেছেন। তার সূত্র প্রশ্ন সাপেক্ষ। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে যে বক্তব্য আছে, হযরত (সঃ) মদীনায় মুফাসসাল সূরায় কোন সিজদা দেন নাই, তার সূত্র যঈফ। কারণ, তার অন্যতম বর্ণনাকারী আবু কুদামা আল হারিছ ইবনে উবায়েদের বর্ণনা প্রামান্য নয়। ইমাম আহমদ তাকে 'মুযতারাব' বলেছেন। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন যঈফ বলেছেন। নাসায়ী 'মুনকার' বর্ণনাকারী আখ্যা দিয়েছেন। আবু হাতিম তাকে সরল বৃদ্ধ অনুমানকারী বলেছেন। ইবনুল কাত্তান তার বর্ণনাকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন। তারই মত স্মৃতি বিভ্রম ঘটত মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবু লায়লার। মুসলিমের ওপরে তার হাদীছ গ্রহনের জন্যে দোষারোপ করা হয়। আদপে এটা তাঁর দোষ নয়। কারণ, স্মৃতিশক্তির বিভ্রাটের জন্যে হাদীছের ত্রুটি অনেক নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকেও দেখা দেয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সহীহ রিওয়ায়েত রয়েছে, তিনি রসূলের (সঃ) সাথে 'ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাজী' ও 'ইজাস সামাউন শাক্কাত' সূরায় সিজদা দান করেছেন। অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরতের মদীনায় আসার পরে ছয় অথবা সাত হিজরীতে। যখন এ দু'টি হাদীছের ভেতরে পুরোপুরি বিরোধ বিদ্যমান, তখন আবু হুরায়রার হাদীছটি অগ্রাধিকার পাবে। কারণ, তাঁর হাদীছে অধিক জ্ঞাতব্য রয়েছে। হয়ত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) তা জানা ছিলনা। তা ছাড়া আবু হুরায়রার হাদীছের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মতৈক্য রয়েছে। তেমনি মতৈক্য রয়েছে ইবনে আব্বাসের বর্ণনাটির দুর্বলতা সম্পর্কে। খোদাই সর্বজ্ঞ।

দশম পরিচ্ছেদ

●

জুমআর পটভূমি

সহীহদ্বয়ে নবী (সঃ) থেকে প্রমাণ মিলে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিনে অগ্রবর্তী দলে, পশ্চাদবর্তী দলে এবং অতিক্রমকারী দলে আমরাই থাকব। অবশ্য আমাদের আগে অন্যান্যের আমলনামা দেয়া হবে। তারপর এ (জুমআর) দিনটি তাদের জন্যেও ফরয হয়েছিল। তারা এ নিয়ে মতান্তর ঘটাল। বস্তুত, আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে আমাদের সঠিক পথ বাতলে দিলেন। অন্য সবাই এ ক্ষেত্রে আমাদের পরে ঠাঁই পেল। ইয়াহুদীরা শনিবার ও ঈসায়ীরা রবিবার পসন্দ করল।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হযরত হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (সঃ) বলেনঃ যারা আমাদের অগ্রবর্তী দল ছিল, আল্লাহ তা'আলা জুমআর দিন থেকে তাদের সরিয়ে দিলেন। এখন ইয়াহুদীদের শনিবার ও ঈসায়ীদের রবিবার হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ তা'আলা আমাদের আনলেন। আমাদের জুমআর ব্যাপারে পথ দেখালেন। এভাবে তিনি প্রথমে জুমআ, তারপর শনি ও পরে রবিবার রেখে দিলেন। এভাবে কিয়ামতেও তারা আমাদের পেছনে পড়ে যাবে। আমরা দুনিয়ায় তাদের পরে এসেও কিয়ামতে তাদের আগে আগে চলব।

মুসনাদ ও সুনানে আওস ইবনে আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—নবী (সঃ) বলেন, তোমাদের সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন হল জুমআ। এদিনে আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছেন। এ দিনে তাঁর প্রাণ হরণ করা হয়েছে। এ দিনে শিংগা ফুঁকা হবে। এ দিনেই কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে। তাই এ দিনে আমার ওপরে বেশী করে দরূদ পাঠাও। কারণ, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়।

উপস্থিত শ্রোতাদের একজন বলে উঠল—হে আল্লাহর রসূল ! আপনি যখন মাটির সাথে মিশে যাবেন, তখন কি করে দরূদ পেশ করা হবে ?

তিনি বললেনঃ আল্লাহ তা'আলা নবীদের (সঃ) দেহ ভক্ষণ মাটির জন্যে হারাম করে দিয়েছেন।

জামে' তিরমিজীতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—নবী (সঃ) বলেছেন, সূর্যোদয় ঘটার ফলে যত দিন সৃষ্টি হয়, তার ভেতরে সর্বোত্তম দিন হল, শুক্রবার। এ দিনে আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছেন। এ দিনেই তাঁকে জান্নাতে নিয়েছেন। এ দিনেই আবার তাঁকে সেখান থেকে বহিস্কার করেছেন। কিয়ামতও এ দিনেই ঘটবে।

ইমাম মালিক (রঃ) তাঁর 'মুয়াত্তা'য় আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে মারফু রিওয়ায়েত নিয়েছেন। তাতে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন : 'সূর্য যতগুলো দিন দেখেছে, তার ভেতরে সর্বোত্তম হল শুক্রবার। এ দিনে হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীতে তাঁকে এ দিন নামিয়ে দেয়া হয়েছে। এ দিনে তাঁর তওবা কবুল করা হয়েছে। এ দিনে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। কিয়ামতও এ দিনেই ঘটবে। জিন ও ইনসানের এমন কেউ নেই, জুমআর দিনে যে কিয়ামতের ভয়ে ভীত না থাকে। এ দিনটিতে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যখন মুসলমানরা কোন প্রার্থনা যদি নামাযের পরে খোদার সকাশে জানায়, তা অবশ্যই খোদা কবুল করেন।'

হযরত কা'ব (রাঃ) প্রশ্ন করলেন : 'এটা কি প্রতি বছরই ঘটে ?' তিনি বললেন : না ; বরং প্রতি জুমআয়। তা শুনে কা'ব (রাঃ) তাওরাত পড়লেন। তারপর বললেন—রসূলুল্লাহ (সঃ) ঠিকই বলেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) আরও বলেন : তারপর আমি আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে দেখা করলাম। তাঁর সামনে কা'বের (রাঃ) ঘটনা বললাম। তিনি বললেন, সেটা কোন্ মুহূর্তটি, তা আমি জানি। আমি আরয করলাম—তা হলে আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন—তা হল শুক্রবারের শেষ মুহূর্তটি। তা শুনে আমি আরয করলাম—তা কি করে সম্ভব ? রসূল (সঃ) বলেছেন, সে মুহূর্তটিতে যদি কেউ নামায পড়ে দো'আ করে, তা হলে আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই কবুল করবেন। অথচ তিনিই বলেছেন, দিনের এই শেষ মুহূর্তটিতে নামায পড়া যাবেনা। তিনি বললেন : রসূল (সঃ) কি এ কথা বলেননি যে, কেউ যদি কোথাও বসে নামাযের অপেক্ষা করতে থাকে, সে যেন নামাযেই নিরত থাকে ?

ইমাম শাফেঈর (রাঃ) 'মুসনাদে' আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে : হযরত জিব্রাঈল (আঃ) সাদা একটি আয়না নিয়ে হযরতের (সঃ) কাছে উপস্থিত হলেন। তাতে একটি ফোঁটা ছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন—এটা কি ? জিব্রাঈল (আঃ) জবাব দিলেন : এটা শুক্রবার। আপনাকে ও আপনার উম্মতকে এটা দিয়ে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করা হল। ইয়াহুদী ও নাসারা এ ব্যাপারে আপনাদের অনুগত হবে। এ দিনটিতে আপনাদের জন্যে অশেষ কল্যাণ রয়েছে। এর ভেতরে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যাতে কোন মু'মিন যদি ভাল কোন দো'আ করে, আল্লাহ তা'আলা তা অবশ্যই কবুল করেন। আপনাদের জন্যে এটা হল 'ইয়াওমুল মযীদ'।

নবী (সঃ) প্রশ্ন করলেন—'ইয়াওমুল মযীদ' কাকে বলে ?

তিনি জবাবে বললেন : আপনার প্রতিপালক ফিরদাউসে একটি প্রান্তর রেখেছেন; সেখানে মিশকের একটি টিপি রয়েছে। শুক্রবার দিন আল্লাহ তা'আলা নিজ ইচ্ছা মোতাবেক সেখানে ফেরেশতা অবতরণ করান। তার চারপাশে নূরের মিম্বর পাতা থাকে। তাতে নবীরা (সঃ) আসন

২৯—

নেবেন। যেগুলো সোনা দিয়ে গড়া ও যেগুলোর চারপাশে ইয়াকুত ও যবরযদ পাথরে মোড়াই করা রয়েছে, সেগুলোর ওপরে শহীদ ও সিদ্দীকগণ বসবেন। অন্যরা এসে তাদের পরে পেছনে আসন নেবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন ঃ আমি তোমাদের প্রতিপালক। আমি তোমাদের সাথে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেছি মাত্র। এখন তোমরা 'মযীদ' (অতিরিক্ত) যা চাবার চাও। আমি তা দেব। তখন তাঁরা আরয করবেন—'হে প্রতিপালক! আমরা শুধু তোমার সন্তুষ্টি চাই।' এ কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা খুশী হয়ে যাবেন। বলবেন ঃ তোমরা যা চাইবে, তাই পাবে। কারণ, আমার কাছে তোমাদের জন্যে এ 'মযীদ' দিনটি (অতিরিক্ত ইনআম) রয়েছে।' তাই জান্নাতীরা এ শুক্রবারটি ভালবাসে। কারণ, এ দিনেই তাঁদের প্রতিপালক যা কিছু কল্যানকর, তা দান করেন। এ দিনেই আমার প্রতিপালক আরশে আসন নেন। এ দিনে তিনি আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেন এবং এ দিনটিতেই কিয়ামত ঘটবে।

এ হাদীছটি ইমাম শাফেঈ (রঃ) ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ থেকে, তিনি মূসা ইবনে উবায়দা, তিনি আবুল আজহার মু'আবিয়া ইবনে ইসহাক ইবনে তালহা, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উবায়েদ ও তিনি উমায়ের ইবনে আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরও বলেন, আমাকে ইব্রাহীম, তাঁকে আবু ইমরান ইব্রাহীম ইবনে জা'আদ ও তাঁকে আনাস এরূপ বর্ণনা শুনিয়েছেন।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) তাঁর উস্তাদ ইব্রাহীম সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু, ইমাম আহমদ বলেন, তিনি মু'তাযিলী, যুহমী ও কাদরী মতবাদের। তার ভেতরে সব ত্রুটিই বিদ্যমান।

আবুল ইয়ামানুল হাকাম ইবনে নাফে' বর্ণনা করেন, আমাকে সাফওয়ান আনাসের মাধ্যমে রসূল (সঃ) থেকে জিব্রাঈলের (আঃ) এ বর্ণনাটি শুনিয়েছেন। তেমনি আনাস থেকে মুহাম্মদ ইবনে শুয়াএব ও আবু তাইয়েবা এরূপ বর্ণনা করেন। আবু বকর ইবনে আবু দাউদ এগুলোর সমাবেশ ঘটান।

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে হযরত আলীর (রাঃ) মাধ্যমে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—নবীকে (সঃ) প্রশ্ন করা হল, জুমআর দিনের নাম এরূপ রাখা হল কেন? তিনি জবাব দিলেন—কারণ, এ দিন তোমাদের আদি পিতা হযরত আদমের (আঃ) রূপ দেয়া হয়েছে। এ দিন কিয়ামত ও পুনরুত্থান ঘটবে। এ দিন সবাইকে পাকড়াও করা হবে এবং এ দিনের শেষে তিনটি মুহূর্ত রয়েছে যার একটি মুহূর্তে অবশ্যই মুনাজাত কবুল হবে।

হযরত হাসান ইবনে সুফিয়ান নসবী তাঁর মুসনাদে লিখেছেন—আমাকে আবু মারওয়ান হিশাম ইবনে খালিদ, তাঁকে হাসান ইবনে ইয়াহিয়া খুখশী, তাঁকে উমর ইবনে আব্দুল্লাহ ও তাঁকে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলকে (সঃ) বলতে শুনেছি—'আমার কাছে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসেছিলেন এবং তাঁর হাতে সাদা একটা আয়নার মত কিছু ছিল। তাতে একটি

Contents

কালো বিন্দু ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিব্রাঈল, এটা কি? তিনি জবাব দিলেন, এ হচ্ছে জুমআ। এটা দিয়ে আমাকে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছে। আপনার ও আপনার উম্মতের জন্যে এটি ঈদের দিন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—হে জিব্রাঈল! এতে আমাদের জন্য কি রয়েছে? তিনি জবাব দিলেন—এতে আপনাদের জন্যে অশেষ কল্যাণ ও বরকত রয়েছে। আপনারা সর্বশেষ উম্মত হয়েও (এর বদৌলতে) কিয়ামতে সর্বাগ্রে থাকবেন। এর ভেতরে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে, যদি কোন মুসলমান নামাযের অবস্থায় তখন কিছু প্রার্থনা জানায়, তা হলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তা কবুল করেন।

আমি প্রশ্ন করলাম: হে জিব্রাঈল! এ কালো দাগ কিসের? তিনি জবাব দিলেন—এ হচ্ছে জুমআর দিনের সেই মুহূর্তটি। সব দিনের সেরা এ দিন। আমরা ফেরেশতারা এটাকে 'ইয়াওমুল মযীদ' (অধিক নিয়ামত লাভের দিন) বলে থাকি।

আমি প্রশ্ন করলাম—হে জিব্রাঈল! 'ইয়াওমুল মযীদ' কাকে বলে?

তিনি জবাব দিলেন, তা হচ্ছে এরূপ: আপনার প্রভু জান্নাতে একটি প্রান্তর রেখেছেন। সেখানে সাদা মিশকের ঘ্রাণ ছড়িয়ে থাকে। সপ্তাহের শেষে যখন শুক্রবার আসে, তিনি নিজ কামরা থেকে নেমে কুরসীতে আসন নেন। কতগুলো নূরের মিম্বর সেই কুরসীর চারপাশে পাতা থাকে। তাতে নবীরা বসেন। সেগুলোর চারপাশে সোনার কুরসী পাতা রয়েছে। তাতে শহীদ ও সিদ্দীকরা বসেন। তখন বালাখানার বাসিন্দারা বেরিয়ে এসে মিশকের টিলার ওপরে বসে যায়। তারা মিম্বর ও কুরসীর লোকদের মর্যাদা দেখতে পায়না। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সামনে আত্ম প্রকাশ করেন এবং বলেন—আমার কাছে কোন প্রার্থনা থাকলে জানাও।

তারা সবাই বলে ওঠে—হে প্রতিপালক! তোমার সন্তুষ্টিই আমাদের কাম্য। তিনি তখন তাঁর সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারপর বলেন—এবারে আমার কাছে কিছু প্রার্থনা কর। তারা তখন নিজ নিজ প্রার্থনা জানায়। এমন কি প্রত্যেক বান্দার প্রতিটি দাবী পূর্ণ করা হয়। তারপর তিনি তাদের এমন সব নিআমত দান করেন যা তারা কোন দিন দেখেনি এবং শুনেও নি। এমন কি কেউ তা কল্পনাও করে নি।

তারপর আল্লাহ তা'আলা কুরসী ছেড়ে আরশের দিকে অগ্রসর হন। বালাখানার লোক বালাখানায় চলে যায়। সে সব বালাখানা মতি, পান্না, লাল জহরত ও নীল পাথরে তৈরী। তার কোনটিই জীর্ণ বা পুরনো হয়না। সব উজ্জ্বল। তার পাশ দিয়ে ঝর্ণাধারা বয়ে যাচ্ছে। তাতে ফল-মূল ঝুলানো থাকে। স্ত্রী ও দাস-দাসী নিয়ে তারা সেখানে থাকে। জান্নাতবাসী জুম'আর দিন একে অপরকে সুসংবাদ দেন, যেভাবে দেয় দুনিয়াবাসি বৃষ্টির সুসংবাদ।

ইবনে আবিদ দুনিয়া তাঁর 'সিফাতুল জান্নাত' গ্রন্থে লিখেন—আমাকে আযহার ইবনে মারওয়ান রাক্কাশী, তাঁকে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাদাহ শায়বানী, তাঁকে কাসিম ইবনে তাইয়েব,

তাঁকে আ'মাশ ইবনে আবিল ওয়াএল, তাঁকে হযরত হুজায়ফা (রাঃ) রসূল (সঃ) থেকে এ বর্ণনা শুনান—আমার কাছে জিব্রাঈল (আঃ) এলেন। তাঁর হাতে একটি অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সুন্দর আয়না ছিল। তার মাঝখানে একটি কালো সুস্পষ্ট বিন্দু ছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এ সুস্পষ্ট কালো দাগটি কিসের দেখছি? তিনি জবাব দিলেন—জুমআর। আমি প্রশ্ন করলাম, জুমআ কি জিনিস? তিনি জবাব দেন—মহান খোদার দিনগুলোর একটি। আমি আপনার সামনে দুনিয়ায় এর মর্যাদা সম্পর্কে ও এদিনে মানুষ যা আশা রাখে সে সম্পর্কে এবং বিশেষ করে পরকালে এ দিনের গুরুত্ব সম্পর্কে বলছি।

দুনিয়ায় এর মর্যাদার ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তা'আলা এদিনে মানুষ সৃষ্টি করেন। দুনিয়াবাসি এ দিনে যা আশা রাখে তা হল এই, এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে সময়ে কোন মুসলিম নর কিংবা নারী যদি কোন ভাল কিছু প্রার্থনা করে, তা অবশ্যই দেয়া হয়। আর পরকালে এর মর্যাদার ব্যাপার হল এই, যখন আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসিদের জান্নাতের দিকে ও জাহান্নামীদের জাহান্নামের দিকে পাঠাবেন, তাদের ওপরেও দিন ও রাত আসবে। তবে তা আজকের ছোট দিন-রাতের মত নয়। খোদাই সেই দিন ও রাতের পরিমাপ জানেন। এভাবে যখন আবর্তিত হয়ে জুমআর দিন আসবে, তখন জুমআর নামাযের ওয়াক্তে জান্নাতবাসিদের এক আহ্বায়ক আহ্বান জানাবেন—হে জান্নাতবাসি! 'মযীদ' প্রান্তরে চল। 'মযীদ' প্রান্তরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অনুমান করা অসম্ভব। তাতে এত উঁচু উঁচু মিশকের টিলা রয়েছে যার শীর্ষভাগ আকাশে ঠেকেছে।

তিনি আরও বলেন: তারপর নবীরা নূরের ও মু'মিনরা ইয়াকুতের কুরসীতে আসন নিবে। তাদের ভৃত্যেরা সেগুলো এনে সাজিয়ে রাখবে। সবার শ্রেণীমতে যথাযথভাবে বসা হলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপরে 'মুছীরা' নামক সুগন্ধি হাওয়া বয়ে দেবেন। মিশকের ঘ্রাণ তাতে ছড়িয়ে যাবে। তা তাদের আসন-বসন শরীর-মন সব কিছু জুড়িয়ে দেবে। জানা উচিত, দুনিয়ায় যদি কোন নারী সেই মিশক ব্যবহার করে, তা হলে সারা দুনিয়া তার সুগন্ধে ভরপুর হয়।

তারপর আল্লাহ তা'আলা আরশবাহীদের বলবেন, আসন কাঁধে তুলে নাও। তখন প্রথমে এভাবের একটি আওয়াজ আসবে: 'হে মানব! যারা আমাকে না দেখেও অনুগত রয়েছিলে, তারা আমার কাছে যা চাবার চেয়ে নাও। এটাই হচ্ছে 'ইয়াওমে মযীদ'। তারা সবাই একবাক্যে বলবে, আমরা তোমাকে নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলাম। হে প্রতিপালক! তুমি আমাদের ওপরে সন্তুষ্ট থাক। তখন আল্লাহ তা'আলা তাহাদের দিকে ফিরে বলবেন—হে জান্নাতবাসি! যদি আমি তোমাদের ওপরে সন্তুষ্ট না হতাম, তা হলে তোমাদের নিজ ঘরে ঠাঁই দিতাম না। তাই আজ আমার কাছে যা কিছু কামনা চেয়ে নাও। আজ ইয়াওমুল মযীদ।

তখন সবাই একবাক্যে বলবে—হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার দর্শন লাভের আকাংখী। আল্লাহ তা'আলা তখন তাঁর আবরণ সরিয়ে দেবেন এবং নিজকে সবার সামনে প্রকাশ করবেন। যেইমাত্র তারা তাঁর নূরের সামান্য ছটা দেখতে পাবে, অমনি হতভম্ব ও অচেতন হবে। আল্লাহ তা'আলা যদি তাদের রক্ষার বিধান না রাখতেন, তা হলে জ্বলে ছারখার হয়ে যেত।

তারপর সবাইকে নিজ নিজ ঘরে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হবে। তারা সবাই যার যার পথ ধরবে। উক্ত ঘটনার প্রভাবে তাদের দুর্বলতা দেখা দেবে। যখন তারা নিজ নিজ স্ত্রীদের কাছে পৌঁছবে, তখন সেই নূরের প্রভায় তারা স্ত্রীদের ও স্ত্রীরা তাদের কাছে এরূপ সমুজ্জ্বল হয়ে ধরা দেবে যে, সবার চোখ ঝাপসে যাবে। পরে যখন তাদের দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেয়া হবে, তখন নিজ নিজ রূপ দেখতে পাবে। তখন স্ত্রীরা বলবে, আমাদের এখান থেকে তোমরা যে রূপ নিয়ে গিয়েছিলে, তা বদলে নতুন রূপ নিয়ে এসেছ। তারা বলবে, এর কারণ হল, আল্লাহ তা'আলা আমাদের ওপরে তাঁর নূরের আলো ছড়িয়েছিলেন। আমরা তাঁর দ্যুতি দেখেছিলাম। তারপর তারা প্রতি সপ্তাহে জান্নাতের নিআমত ও সুগন্ধি লাভ করতে থাকবে।

রসূল (সঃ) বলেন—এটাই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতের মর্ম:

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

"তাদের কেউ জানে না যে, তাদের জন্যে চোখ জুড়ানো কি কি ব্যাপার গোপন রাখা হয়েছে। তা হচ্ছে তাদের ভাল কাজের ফল।"

আবু নাঈম 'সিফাতুল জান্নাত' এ ইসমত ইবনে মুহাম্মদের এক হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন--আমাকে মূসা ইবনে উকবা আবু সালেহর সূত্র দিয়ে আনাস (রাঃ) থেকে এরূপ এক বর্ণনা শুনিয়েছেন।

আবু নাঈম এ গ্রন্থে আল মাসউদী থেকে, তিনি আল মিনহাল, তিনি আবু উবায়দা ও তিনি আব্দুল্লাহ থেকে এরূপ বর্ণনা শুনেন: দুনিয়ায় জুমআর জন্যে দ্রুত ছুটে যাও। কারণ, আল্লাহ তা'আলা প্রতি জুমআয় জান্নাতবাসিকে দর্শন দান করেন। তাই তোমাদের এ দ্রুততা হয়ত তাঁর কিছুটা কাছাকাছি থাকার সৌভাগ্য দান করবে এবং নতুন কোন বুযুর্গী ও সম্মান দান করবে যা আগে তোমাদের ছিলনা।

●

Contents

একাদশ পরিচ্ছেদ

জুমআর সূত্রপাত

ইবনে ইসহাক বলেন—আমাকে মুহাম্মদ ইবনে আবু ইমাম ইবনে সাহল, তাঁকে তার পিতা, তাঁকে আব্দুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালিক এ বর্ণনাটি শুনিয়েছেনঃ যখন আমার পিতার দৃষ্টি শক্তি লোপ পেয়ে চলল, তখন জুমআর নামাযে আমি তাঁকে পথ দেখিয়ে নিতাম। যখন আমি তাঁর সাথে জুমআর জন্যে বের হতাম এবং তিনি জুমআর আজান শুনতে পেতেন, তখন আসআদ ইবনে যিরারার জন্যে দো'আ করতেন। আমি তা শুনে মনে মনে ভাবলাম, এ সম্পর্কে কিছু জানতে না চাওয়া ঠিক নয়। তাই অভ্যেস মতে আরেক দিন যখন তাঁকে নিয়ে জুমআ পড়তে চললাম এবং তিনি আজান শুনতে পেয়ে সেরূপ দো'আ করলেন, তখন আরয করলাম, যখনই আপনি আজান শুনেন, আস'আদ ইবনে যিরারার জন্যে দো'আ করেন কেন ?

তখন তিনি জবাব দিলেন—বৎস ! রসুলের (সঃ) মদীনায় আগমনের আগে আসআদই প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি হুর্রা ইবনে বিয়াযার বিরান ভূখণ্ডে জুমআ পড়িয়েছেন। সে স্থানটি ছিল কবরস্থান। তাকে বলা হত 'বাকীউল খাযমাত'।

আমি প্রশ্ন করলামঃ আপনারা তখন ক'জন (মুসল্লী) ছিলেন ? তিনি জবাব দিলেনঃ সর্বসাকুল্যে চল্লিশজন। মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও ইমাম বায়হাকী বলেন—বর্ণনাকারী নির্ভর-যোগ্য এবং হাদীছটি 'হাসান-সহীহ'। আমার মতে জুমআর এটাই সূত্রপাত।

তারপর হযরত (সঃ) যখন মদীনায় এলেন, বণু আমর ইবনে আওফদের সেখানে কুব্বায় অবস্থান করলেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে সোম, মংগল, বুধ ও বৃহস্পতিবার এ ক'দিনে সেখানে মসজিদের ভিত্তি গড়ে তোলা হয়। তারপর জুমআর দিন তাঁরা সেখান থেকে চললেন এবং বণু সালিম ইবনে আওফের এখানে এসে জুমআর নামাযের ওয়াক্ত হল। তখন তিনি সেই প্রান্তরে অবস্থিত মসজিদে নামায আদায় করলেন। মদীনায় এটাই ছিল তার পয়লা জুমআ। এ জুমআ মসজিদে নববীর ভিত গড়ে উঠার আগে পড়া হয়েছিল।

ইবনে ইসহাক বলেন—আবু সালমা ইবনে আব্দুর রহমানের মাধ্যমে আমি হযরতের (সঃ) প্রদত্ত পয়লা খুতবা শুনেছি। হযরতের (সঃ) নামে কোন ভুল কথা বলা থেকে খোদা আমাকে রক্ষা করুন। তিনি এ খুতবা আল্লাহ তা'আলার যথাযথ হামদ ও ছানা পড়ে শুরু করেন। তারপর বলেনঃ হে মানব ! নিজের জন্যে পুণ্য আগেই পাঠাও। স্মরণ রেখ, খোদার শপথ

করে বলছি, মরণ যখন সহসা তোমাদের ওপরে চাপবে, তোমাদের বকরীগুলো রাখাল শূন্য হয়ে যাবে। মৃত ব্যক্তি অসহায়ভাবে সরাসরি খোদার সকাশে গেলে তার প্রতিপালক জিজ্ঞেস করবেন—তোমার কাছে কি আমার রসূল যায়নি ? তোমাকে কি সে আমার বাণী পৌঁছায়নি ? আমি তোমাকে কি সম্পদ দেইনি ? তোমাকে কি বিভিন্ন মর্যাদায় ভূষিত করিনি ? তা হলে তুমি তোমার জন্যে আগাম কি পাঠিয়েছ ? তখন সে অবশ্যই ডানে ও বামে তাকাতে থাকবে। কিন্তু, সে কিছুই দেখতে পাবে না। তারপর সে নিজের সামনে জাহান্নাম দেখবে। সুতরাং একটা খেজুর দান করে হলেও যতটুকু পার, সেই ভীষণ আগুন থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা কর। তাও যে পারবেনা, সে অন্তত পবিত্র কলিমা পাঠ কর। কারণ, তা পুণ্য কাজের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। তার পুণ্য দশ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত হবে। তোমাদের ওপরে শান্তি ও বরকত নেমে আসুক।

ইবনে ইসহাক বলেন—তারপর হযরত (সঃ) একবার এ খুতবা পাঠ করেন ঃ

ان الحمد لله احمده و استعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان احسن الحديث كتاب الله قد افلح من زينه الله فى قلبه وادخله فى الاسلام بعد الكفر فاختاره ما سواه من احاديث الناس انه احسن الحديث وابلغه احبوا ما احب الله احبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقس عنه قلوبكم فانه قد سماه خيرته من الاعمال والصالح من الحديث ومن كل ما اوتى الناس الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله صالح ما تقولون بافواهكم وتحابوا بروح الله بينكم ان الله يغضب ان ينكث عهده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته -

"সব প্রশংসাই খোদার জন্যে। তাঁরই প্রশংসা করছি এবং তাঁরই সাহায্য কামনা করছি। এবং আমরা নিজের আত্মার ক্ষতিসাধন থেকে ও পাপ কার্য থেকে খোদার কাছে আশ্রয় চাই। খোদা যাকে পথ দেখান, কেউ তাকে বিভ্রান্ত করতে পারেনা এবং খোদা যাকে বিভ্রান্ত হতে দেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কেউ প্রভু নেই। তিনি একক ও অংশীহীন। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম বাণী হল খোদার কালাম। খোদা যার অন্তরকে তা দিয়ে অলংকৃত করেছেন এবং কুফরী থেকে যাকে ইসলামে এনেছেন, সে অবশ্যই সফল হল। অন্যান্য

বাক্য থেকে এ কালামকে বৈশিষ্ট্য দান করা হয়েছে। কারণ, এ হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ আলংকারিক বাক্য। খোদা যাকে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাসবে। নিজ অন্তরের সব ভালবাসা খোদার জন্যে উৎসর্গ কর। খোদার কালাম পাঠ ও তাঁর স্মরণ থেকে বিরত হয়োনা। তোমাদের অন্তর যেন পাক কালামের ব্যাপারে কঠিন না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা সেটাকে উত্তম কাজ ও সর্বোত্তম বাণী আখ্যা দিয়েছেন। তাতে মানুষের জন্যে যা কিছু হালাল বা হারাম বলা হয়েছে, তা মওজুদ আছে। তাই খোদার বন্দেগী কর। তাঁর সাথে কাউকে কিছু-মাত্র শরীক করোনা। তাঁকে ভয় করার মত ভয় কর। মুখ থেকে যত বাক্য নিসৃত কর, তার ভেতরে সর্বোত্তম ভাষা দিয়ে খোদার সত্যতা স্বীকার কর। খোদার দয়ায় পরস্পরকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ওয়াদা ভংগকারীর ওপরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। তোমাদের ওপরে খোদার তরফ থেকে শান্তি, বরকত ও রহমত নাযিল হোক।"

খুতবার অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত সবকিছু আলোচিত হবে।

●

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জুমআর বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা

আলিমদের ভেতরে জুম'আ ও ইয়াওমে আরাফাতের কোনটি শ্রেষ্ঠ তা নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি মতই রয়েছে। ইমাম শাফেঈর অনুসারীরা জুমআর শ্রেষ্ঠত্বের ক'টি কারণ দেখিয়েছেন।

প্রথম, রসূল (সঃ) জুমআর দিন ফজরে 'আলিফ লাম মীম তানযীল ও হাল আতাআলাল ইনসান' সূরা পড়তেন। যারা এর রহস্য জানে না তাদের অনেকেই ভাবত, এ দিনের ফজরটি অতিরিক্ত একটা সিজদা দ্বারা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। তাই সেই সিজদাকে জুমআর সিজদা বলত। যদি কেউ তাতে এ দু'টো সূরা না পড়ে, তা হলে মুস্তাহাব এটাই যে, সিজদা রয়েছে যে সূরায়, তা পড়বে। এ সব দেখেই একদল আলিম জুমআর ফজরে ধরাবাঁধা নিয়মে এ সূরা দু'টো পড়া মাকরূহ বলেছেন। এর ফলে যেন জাহিলদের উক্ত ধারণালোপ পায়।

আমি শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াকে বলতে শুনেছি, 'নবী (সঃ) জুমআর দিন সকালে এ সূরা দু'টি এ জন্যে পড়তেন যে, এ সূরা দু'টোর এমন সব ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, যা এই দিনটিতে ঘটেছে অথবা ঘটবে। কারণ, তাতে আদম সৃষ্টি, পরকাল, পুনরুত্থান এবং হাশর মাঠে সমবেত হওয়া ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে। এ সবই শুক্রবারে হবার। তাই এদিন সকালে এগুলো পাঠের মাধ্যমে উম্মতকে সেই সব আসন্ন ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য। আদপে সিজদা উদ্দেশ্য নয়। বরং এটা তো ঘটনার সাথে এসে গেছে। নামাযের তিলাওয়াতে সহসা এটা এসে গেছে। তাই জুমআর দিনের ঐ সব ব্যাপারকেই মূল বৈশিষ্ট্য ধরা যায়।

দ্বিতীয়, এদিনে হযরতের ওপরে দরূদ বেশী করে পাঠ করা মুস্তাহাব। তিনি বলেছেন, জুমআর দিনে ও রাতে আমার জন্যে বেশী করে দরূদ পাঠ কর। হযরত (সঃ) গোটা সৃষ্টি জগতের অধিনায়ক। জুমআর দিনটিও সকল দিনের অধিনায়ক। তাই এদিনে তাঁর ওপর দরূদ পাঠের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্য দিনে নেই। তা ছাড়া এর ভেতরে একটি রহস্য নিহিত আছে। এ উম্মত দুনিয়া ও আখিরাতের যত কল্যাণ লাভ করেছে, তা সবই হযরতের (সঃ) দান। তাঁর কারণেই আল্লাহ তা'আলা তা দান করেছেন। এটা তাদের বিরাট মর্যাদার ব্যাপার। অথচ এ মর্যাদাটি শুক্রবারেই তারা লাভ করছে। এ দিনটিতে তাদের জান্নাতে নিয়ে যার যার মহলে ঢুকানো হবে। তাদের জন্যে জান্নাতে এ দিনটি 'ইয়াওমুল মযীদ' হবে। পরকালেও এ দিনটি তাদের ঈদের দিন হবে। কারণ, এ দিনে আল্লাহ তা'আলা সেখানে তাদের যে কোন মনোবাঞ্ছা

পূর্ণ করবেন। কারুর কোন কামনাই বিফল হবেনা। এ সব বখশিশ এ উম্মত লাভ করবে শুধু হযরতের (সঃ) বদৌলতে। তাই তাঁর জন্যে শোকর ও হামদ যতই আদায় করা হোক, এ সবের তুলনায় নেহাৎ নগণ্য। এ জন্যে দিন-রাত হর-হামেশা তাঁর ওপরে দরূদ পাঠানো প্রয়োজন।

তৃতীয়ঃ ইসলামের ফরযসমূহের ভেতরে জুমআর নামায সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামী সমাবেশগুলোর ভেতরে এক মহান সমাবেশ। আরাফার সমাবেশ ছাড়া এটাই সর্বাধিক-গুরুত্ব রাখে। নিছক অবহেলা ভরে যদি কেউ এ সমাবেশ বর্জন করে, খোদা তার অন্তরের দ্বার রুদ্ধ করে দেন। জুমআর দিবসে যে ব্যক্তি ইমামের যত কাছে থাকে ও সে জন্যে যত আগে নামাযে হাজির হয়, সে পরকালে জান্নাতেও ততখানি আগে গিয়ে খোদার তত বেশী কাছাকাছি থাকবে।

চতুর্থঃ এ দিনটিতে গোসল ওয়াজিব করা হয়েছে। এ ওয়াজিবের ওপরে সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। বিতরের ওয়াজিব, নামাযে বিসমিল্লাহ পড়ার ওয়াজিব, স্ত্রী কিংবা লিংগ স্পর্শের পরে ওযু করার ওয়াজিব, নামাযে শব্দ করে হাসা ও নাকছীর কিংবা বমনের জন্যে ওযু করার ওয়াজিব, শেষ তাশাহহুদের পরে হযরতের (সঃ) জন্যে সালাত পাঠের ও মুক্তাদীর জন্যে কিরাআত পাঠের ওয়াজিব থেকেও জোরদার এ ওয়াজিব।

অবশ্য এ গোসল ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কে উম্মতের ভেতরে তিনটি মত সৃষ্টি হয়েছে। একদল ওয়াজিব বলেছেন এবং একদল তা অস্বীকার করেছেন ও একদল মুস্তাহাব বলেন। দু'টি মতের সামঞ্জস্য এ ভাবে হতে পারে যে, যার শরীরে গোসল না করার কারণে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়, তার জন্যে ওয়াজিব এবং যার তা হয়না, তার জন্যে মুস্তাহাব। তিনটি মতই হাম্বলীদের।

পঞ্চমঃ এ দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করা চাই এবং তা অন্যান্য দিনে ব্যবহৃত সুগন্ধির চাইতে উত্তম হওয়া চাই।

ষষ্ঠঃ এ দিনে মিসওয়াক করা অন্যান্য দিনের মিসওয়াকের চাইতে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। তাই এই দিনে অবশ্যই মিসওয়াক করা চাই।

সপ্তমঃ নামাযের জন্যে তাকবীর (দ্বিতীয় আজান) বলা।

অষ্টমঃ ইমামের আগমন অপেক্ষায় নামায, তিলাওয়াতে কুরআন ও জিকিরে লিপ্ত থাকা।

নবমঃ চুপ করে খুৎবা শোনা। সহীহ মতে খুৎবার সময়ে চুপ থাকা ওয়াজিব। যদি কেউ তা অমান্য করে তাহলে বেহুদা কাজে লিপ্ত হবে এবং যে বেহুদা কাজে লিপ্ত হবে, তার জুমআ ব্যর্থ হবে। মুসনাদে মারফু রিওয়ায়েতে আছে, যদি কেউ তখন নিজের সাথীকে চুপ করতে বলে তার জুমআও ব্যর্থ হবে।

দশমঃ এ দিনে সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা। কারণ, নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার পা থেকে আকাশ পর্যন্ত নূর বিছিয়ে দেয়া

হবে। কিয়ামতের দিন তা থেকে আলো পাবে এবং দু'জুমআর মধ্যবর্তী সময়কার পাপ মাফ করা হবে। সাঈদ ইবনে মানসুর-আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে একথা শুনেছেন।

একাদশঃ ইমাম শাফেঈ (রঃ) ও তাঁর শিষ্যদের মতে এ দিনে সূর্য হেলার মুহূর্তে নামায পড়াও মাকরূহ নয়। আমাদের উস্তাদ আবুল আব্বাস ইবনে তায়মিয়া ও (রঃ) এ মতটি গ্রহণ করেছেন। তিনি লায়েসের হাদীছের ওপরে নির্ভর করেন নি। লায়েস মুজাহিদ থেকে, তিনি আবু খলীল থেকে, তিনি আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে ও তিনি নবী করীম (সঃ) থেকে এ কথা শুনেছেন যে, জুমআর দিন ছাড়া দ্বিপ্রহরে নামায পড়া মাকরূহ। জুম'আ ভিন্ন অন্যদিন এ সময়ে জাহান্নামের আগুন উত্তপ্ত করা হয়।

তিনি নির্ভর করেছেন সেই রিওয়ায়েতটির ওপরে যাতে বলা হয়েছে, 'জুমআর নামাযে হাজির হয়ে ইমাম না আসা পর্যন্ত নামাযে রত থাক।' এ ছাড়া সহীহ হাদীছে রয়েছে, যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে গোসল করবে এবং যথাসম্ভব পবিত্রতা অর্জন করবে, কোন সুগন্ধি তৈল বা অন্য কিছু গায় মেখে জুমআর জন্যে বের হবে, মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ সৃষ্টি না করে যেখানে স্থান পায় দাঁড়িয়ে নির্দিষ্ট নামায আদায় করবে, ইমাম যখন খুৎবা পড়বে, চুপ করে শুনবে, তার এক জুম'আ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত যত পাপ আছে, সব মাফ হয়ে যাবে (বুখারী)। তাই যার যতটুকু ক্ষমতায় কুলায় ইমাম না আসা পর্যন্ত নামায পড়তে থাকবে। কোন কিছুই সে পথে অন্তরায় হবে না।

এ কারণেই পূর্বসূরীদের একদল বলেছেন—'ইমামের আগমন নামাযের জন্যে ও খুৎবা কথা-বার্তার জন্যে অন্তরায় হবে।' এ দলে উমর (রাঃ) রয়েছেন। ইমাম আহমদও এ মতের অনুসারী। এখানে ইমামের আবির্ভাবকেই নামাযের জন্যে অন্তরায় বলা হয়েছে, দ্বিপ্রহরকে নয়।

তা ছাড়া সবাই তখন ছাদের নীচে বসা থাকে। তাই কখন বেলা হেলে তা জানতে পায় না। আর যে ব্যক্তি নামাযে মশগুল থাকবে, স্বভাবতই সূর্য হেলার মুহূর্তটি সে জানতে পাবে না। তার জন্যে এও সম্ভব নয় যে, বারংবার মানুষের কাতার ভেদ করে তা জানার জন্যে বাইরে ছুটা-ছুটি করবে। এরূপ করা কারুর জন্যে জায়েযও নয়। এ ছাড়া এ মতের সমর্থনে ইমাম শাফেঈ (রঃ) তাঁর কিতাবে আরও সাক্ষী সংগ্রহ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তাঁকে সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ ও তাঁকে আবু হুরায়রা (রাঃ) এ বর্ণনা শুনিয়েছেন যে, নবী করীম (সঃ) জুমআ ছাড়া অন্যান্য দিনে দ্বিপ্রহরে সূর্য না হেলা পর্যন্ত নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।

তিনি 'ইখতিলাফুল হাদীছ' কিতাবেও এ ধরনের বর্ণনা দিয়েছেন। 'আল জুমআ' কিতাবে তিনি লিখেছেন—আমি শুনেছি ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ থেকে ও তিনি ইসহাক থেকে, তিনি আবু খালিদ আহমার থেকে, তিনি মদীনার এক উস্তাদ থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে সাঈদ

মাকবারী থেকে, তিনি হযরত আব্ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে এবং তিনি রস্লুল্লাহ (সঃ) থেকে এ বর্ণনাটি শুনেছেন।

ইমাম বায়হাকী তাঁর 'আল মা'রিফাত' কিতাবে আতা ইবনে ইজলান থেকে, তিনি আব্ নুযরা থেকে ও তিনি আবু সাঈদ ও আব্ হুরায়রা (রাঃ) থেকে শুনেছেন—'নবী (সঃ) জুমআ ছাড়া অন্যান্য দিন দুপুরে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন।' অবশ্য এর বর্ণনার সূত্র নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য নয়। ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেন, তথাপি কাতাদার (রাঃ) বর্ণনার সমর্থন জানানোর ফলে সেটি আরও জোরদার হল। ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন—মানুষের তো চাই এটাই যে, জুমআর জন্যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায় ও ইমাম আসা পর্যন্ত নামায পড়তে থাকে।

ইমাম বায়হাকী বলেন—ইমাম শাফেঈ (রঃ) যেদিকে ইংগিত করেছেন, তা সহীহ হাদীছে মওজুদ রয়েছে। নবী (সঃ) জুমআর জন্যে তাড়াতাড়ি যাওয়ার ও ইমাম বেরিয়ে আসা পর্যন্ত ক্রমাগত নামায পড়ার জন্যে উৎসাহ দিয়েছেন। আমরা এ প্রেরণা পাই যে, হাদীছে অন্যান্য দিন দুপুরে নামায নিষেধ হওয়া সত্ত্বেও জুমআর দিনে নিষেধ করা হয়নি।

এ ধারায় আমরা আতা (রাঃ), হাসান (রাঃ) ও মাকহুল (রাঃ) এর বর্ণনায় এই অনুমতি দেখতে পাই। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই : দুপুরে নামায পড়া মাকরূহ হবার ব্যাপারে তিনটি মত সৃষ্টি হয়েছে।

(১) ইমাম মালিক (রঃ) বলেন, এ ওয়াক্তে নামায পড়া মাকরূহ নয়। তাঁর মাজহাব এটাই।

(২) জুমআ ও অন্যান্য দিনে সমানভাবেই এ সময়ে নামায মাকরূহ। ইমাম আব্ হানীফা (রঃ) এর ও এক মাশহুর বর্ণনা মোতাবেক ইমাম আহমদের (রঃ) মাজহাব এটাই।

(৩) জুমআ ছাড়া অন্যান্য দিন এ সময়ে নামায মাকরূহ। জুমআর দিনে নয়। ইমাম শাফেঈ (রঃ) এ মতের পরিপোষক।

দ্বাদশ, জুমআর নামাযে সূরা 'জুমআ' 'মুনাফিকুন,' 'সাব্বাহা' ও 'গাশিয়াহ' পড়া চাই। কারণ, নবী (সঃ) জুমআর নামাযে এগুলো পড়তেন (মুসলিম)। এও বর্ণিত আছে, তিনি জুমআর নামাযে 'হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ' পড়তেন। এগুলো তাঁর থেকে সঠিকভাবে প্রমাণিত। আর মুস্তাহাব এটা নয় যে, প্রত্যেক সূরা থেকে কিছু কিছু কিংবা দু'রাকআত মিলিয়ে এক সূরা পড়বে। বরং এটা সুন্নাতের পরিপন্থী। শুধু জাহিল ইমামরা এরূপ করে থাকে।

ত্রয়োদশ, প্রতি সপ্তাহের শেষে ঈদ আসে। আব্ আবদুল্লাহ ইবনে মাজাহ (রঃ) তাঁর 'সুনানে' হযরত আব্ মোহাবা ইবনে আব্দুল মাঞ্জারের বর্ণনা উধৃত করেছেন। তিনি বলেন, রসূল (সঃ) বলেছেন, শুক্রবার দিন হল সকল দিনের সর্দার। খোদার দরবারে এ দিন অশেষ মর্যাদা

পেয়েছে। ঈদ্‌ল ফিতর ও ঈদ্‌ল আযহার দিনগ্‌লো থেকে এর মর্যাদা ও গ্‌র্‌ত্ব বেশী। এর ভেতরে পাঁচটি বিশেষত্ব রয়েছে :

(১) আল্লাহ তা'আলা এই দিনে আদমকে (আঃ) স্‌ষ্টি করেছেন।

(২) এ দিনে আদমকে (আঃ) দ্‌নিয়ায় নামিয়ে দেয়া হয়।

(৩) এ দিনে আদমের (আঃ) ম্‌ত্যু ঘটে।

(৪) এ দিনে এমন একটি ম্‌হ্‌র্ত রয়েছে, তখন যদি কেউ খোদার কাছে কিছ্‌ প্রার্থনা করে, তিনি তা অবশ্যই কব্‌ল করেন—যদি তা কোন হারাম বস্তু না হয়।

(৫) এ দিনেই কিয়ামত ঘটবে। কোন ম্‌কাররব ফেরেশতা, আসমান, যমীন, হাওয়া পাহাড়, ব্‌ক্ষ এমন কিছ্‌ই নেই যা এ দিনটিকে ভয় না করে।

চতুর্দশ, এ দিনে যতখানি সাধ্যে কুলায় ভাল জামা কাপড় পড়া ম্‌স্তাহাব। কারণ, ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁর ম্‌সনাদে হযরত আব্‌ আইয়্‌ব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—আমি রস্‌লকে (সঃ) বলতে শ্‌নেছি, যে ব্যক্তি জ্‌মআর দিনে গোসল করল, তার কাছে স্‌গন্ধি থাকায় তা ব্যবহার করল ও উত্তম পোষাক পরে বের হল, মসজিদে না পৌঁছা পর্যন্ত স্বস্তি পেলনা, (যথা সময়ে) র্‌কু করল (নামায পড়ল), কাউকে কোন কষ্ট দিলনা ও ইমাম আসার পর থেকে নামায শেষ না করা পর্যন্ত চুপ থাকল, তার দ্‌ই জ্‌মআর মধ্যকার সব পাপের কাফফারা আদায় হয়ে গেল।

স্‌নান ও আব্‌ দাউদে হযরত আব্দ্‌ল্লাহ ইবনে সালাম বর্ণনা করেন : আমি রস্‌লকে (সঃ) জ্‌মআর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলতে শ্‌নেছি, তিনি বলেন—জ্‌মআর দিনের জন্যে অন্যান্য পোষাক ছেড়ে বিশেষ এক প্রস্ত পোষাক খরীদ করলে তোমাদের এমন কি ক্ষতি হয় ?'

ইবনে মাজার 'স্‌নানে' হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে : নবী (সঃ) জ্‌মআর দিন মান্‌ষের গায়ে পশমের মোটা কাপড় দেখে বললেন, যদি তোমাদের সামর্থ্য থেকে থাকে, তা হলে সাধারণ কার্যকলাপে ব্যবহৃত পোষাক ছাড়া জ্‌মআর জন্যে বিশেষ এক প্রস্ত পোষাক তৈরী করলে তোমাদের কি ক্ষতি হয় ?

পঞ্চদশ, জ্‌মআর ওয়াক্ত শ্‌র্‌ হলে জ্‌মআ যার ওপরে ওয়াজিব তার আর সেদিন সফরে বের হওয়া জায়েয নয়। এখন প্রশ্ন থাকে, ওয়াক্ত হবার আগে পারবে কিনা ? এ ব্যাপারে তিনটি মত দেখা যায়। ইমাম আহমদ এ তিনটি বর্ণনা করেছেন। একটি জায়েয, দ্বিতীয়টি না জায়েয, তৃতীয়টি হল, কেবল জিহাদের জন্যে জায়েয।

ইমাম শাফেঈর (রঃ) মতে সেদিন স্‌র্য হেলার পরে সফর শ্‌র্‌ করা হারাম। তবে ইবাদতের জন্যে সফরের ব্যাপারে দ্‌'টি মত রয়েছে। ইমাম নববীর (রঃ) মতে হারাম। ইমাম শাফেঈর (রঃ) মতে জায়েয। আর স্‌র্য হেলার আগে সফর সম্পর্কে ইমাম শাফেঈর (রঃ) দ্‌'টি মত রয়েছে। প্রথম দিকে জায়েয বলতেন। অবশেষে হারাম বলেছেন।

'আত্তাফরী' প্রণেতা বলেন, ইমাম মালিকের মত হচ্ছে এই, জুমআর দিনে সূর্য হেলার পরে জুমআ না পড়ে সফর করতে পারবে না। যদি হেলার আগেই সফরে যাত্রা করে, তা'হলে কোন দোষ নেই। উত্তম হল এই, জুমআর দিন সূর্যোদয় পর্যন্ত যদি কেউ বাড়ী থাকে তা'হলে জুমআর নামায আদায় না করে সফরে যাবে না।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) যে কোন অবস্থাতেই সেদিনে সফরে যাত্রা করা জায়েয বলেন। দারে কুতনী (রঃ) 'ইফরাদ' এ হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে এ বর্ণনা দেন যে, রসূল (সঃ) বলেছেন— জুমআর দিনে যে ব্যক্তি মুকীম হয়েও সফরের জন্যে যাত্রা করে, ফেরেশতা তার জন্যে এ বদ দো'আ করতে থাকেন যে, (খোদা করুন) সফরে তোমার যেন কোন বন্ধু না জুটে। ইবনে লাহিয়া এ বর্ণনাটি দান করেছেন।

ইমাম আহমদের (রঃ) মুসনাদে হাকাম থেকে বর্ণিত আছে (তিনি মুকসিম থেকে ও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে পেয়েছেন)ঃ নবী (সঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে ছোট এক অভিযানে পাঠালেন। সেদিন ছিল শুক্রবার। জুমআর সময় এসে গেল। সঙ্গীরা সকলেই রওয়ানা হয়ে গেছেন। তখন তিনি বলতে লাগলেন, আমি পরেই গিয়ে তাদের সাথে মিলব। এক্ষণে হযরতের (সঃ) সাথে জুমআ পড়ে নিই। নবী (সঃ) যখন তাকে দেখতে পেলেন, কেন এখনও যাননি তা জিজ্ঞেস করলেন। প্রশ্ন করলেন, কেন তুমি সাথীদের সাথে সকালে চলে গেলে না? তিনি জবাব দিলেন—আমার ইচ্ছে হল আপনার সাথে জুমআ আদায় করে তারপর গিয়ে তাদের সাথে মিলব। নবী (সঃ) তা শুনে বললেন তুমি যদি যথাসর্বস্বও খোদার জন্যে উৎসর্গ কর, তথাপি তাদের এ জিহাদের সফরের পুণ্য অর্জন করতে পারবে না।

বর্ণনাটি ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, মুকসিমের সাথে হাকামের কখনও দেখা হয়েছে বলে প্রমাণ মিলে না। তাই তার থেকে তিনি কিছু শুনতে পারেন না। তথাপি, এটা ঠিক যে, যদি সফরের বন্ধুদের নাগাল না পাবার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে সফর যে কোন সময়ে শুরু করা যায়। আর যদি পাবার সম্ভাবনা থাকে, তা হলে জায়েয নেই। প্রথম অবস্থাটি তো এরূপ জরুরী অবস্থা যে, তাতে জুমআ-ও জামআত বর্জন বৈধ করে। আওযাঈ (রঃ) থেকে যে বর্ণনায় দেখা যায় যে, সফরে যাত্রা করে জুমআর আজান শুনতে পেয়ে যাবে কি যাবে না তা জানতে চাওয়ায় তিনি অবশ্যই যাবে বলে মত দিয়েছেন, তাও এই কারণে।

এভাবে ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন—'জুমআ সফর স্থগিত রাখতে বলে না' তার অর্থ যদি নেয়া হয় যে, যে কোন অবস্থায়ই, সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ বটে।

এ ব্যাপারে আব্দুর রায্যাকের (রঃ) উদ্ধৃত দলীলটিই শেষ মীমাংসা বলে দেয়। তিনি তাঁর 'মুসান্নাফ' এ লিখেছেন—তিনি মুআম্মার থেকে, তিনি খালিদ আল হিজা থেকে, তিনি ইবনে সিরীন কিংবা অন্য কারুর থেকে এ বর্ণনা শুনেছেন যে, হযরত উমর (রাঃ) জুমআর নামায শেষ

করে এক ব্যক্তিকে সফরের পোষাকে দেখতে পেলেন। তখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কি ব্যাপার? সে জবাব দিল—আমি সফরে যাত্রা করেছিলাম। তারপর জুমআ না পড়ে যাওয়াটা ভাল মনে করলাম না। তা শুনে হযরত উমর (রাঃ) বললেন : যতক্ষণ জুমআর ওয়াক্ত হাজির না হয়, ততক্ষণ তা সফরের অন্তরায় হয় না। বলা বাহুল্য, সূর্য হেলার পরেই এ নিষেধ প্রযোজ্য, আগে নয়।

আব্দুর রায্যাক (রঃ) আরও একটি বর্ণনার উল্লেখ করেন। বর্ণনাটি তাঁকে ছাওরী (রঃ), তাঁকে ইবনে জুরায়েব, তাঁকে সালেহ ইবনে দীনার ও তাঁকে যুহরী (রঃ) শুনিয়েছেন। তিনি বলেন : রসূল (সঃ) জুমআর দিনে নামাযের আগেই চাশতের ওয়াক্তে সফরে রওয়ানা হয়ে যেতেন। ইবনে মুবারক হাসসান ইবনে আবু আতিয়া থেকে এরূপ বর্ণনা উধৃত করেন যে, তিনি বলেছেন—মানুষ যখন জুমআর দিনে সফরে বের হয়, তখন দিনটি তাকে এ বদ দো'আ করতে থাকে, খোদা করুন, তার প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য যেন সফল না হয় এবং সফরে যেন কোন বন্ধু না জুটে।

ইমাম আওযাঈ (রঃ) হযরত ইবনে হাসীবের (রাঃ) একটি বর্ণনা উধৃত করেন। তিনি বলেছেন—জুমআর দিনে নামাযের পরে সফরে রওয়ানা হওয়া চাই।

ইবনে জারীজ (রঃ) বলেন—আমি ইবনে আতাকে প্রশ্ন করলাম, জুমআর রাতে জুমআ পড়া হয় এমন কোন মহল্লায় থাকার সুযোগ পেলে সেখান থেকে জুমআ না পড়ে যাবে না বলে যে বলা হয়, আপনি কি সে খবর পেয়েছেন? তিনি বললেন—না। এ দিনটিতে কোন ক্ষতি নেই।

ষষ্ঠদশ : এ দিনে মসজিদের 'তাজমীর' মুস্তাহাব। সাঈদ ইবনে মানসুর নঈম ইবনে আব্দুল্লাহিল মুজমার থেকে উল্লেখ করেছেন যে, মদীনার মসজিদে হযরত উমর (রাঃ) দুপুর পর্যন্ত প্রত্যেক জুমআয় তাকে 'তাজমীর' এর নির্দেশ দেন। আমার মতে এ জন্যেই তার নাম হয়েছে নঈমুল মুজমার।

সপ্তদশ : জুমআর নামাযে গমনকারীর প্রতি পদক্ষেপে এক বছরের রোযা ও এক রাত জেগে ইবাদতের ছাওয়াব মিলে। আব্দুর রহমান বলেন—তিনি মুআম্মার, তিনি ইয়াহিয়া ইবনে আবু কাছীর, তিনি আবু কিলাবা, তিনি আবু আশআছ সুনআনীও তিনি আওস ইবনে আওস থেকে রসূলের (সঃ) এক বর্ণনা শুনেছেন। তাতে তিনি বলেন : যে ব্যক্তি জুমআর দিনে কাপড় চোপড় ধুইল ও গোসল করল এবং তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে দ্রুত নামাযের জন্যে চলল ও ইমামের কাছাকাছি চুপচাপ বসল, তা হলে সে যতটি পদক্ষেপ করল, প্রতি পদক্ষেপে তার জন্যে এক বছরের রোযা ও এক রাত্রির ইবাদত লেখা হবে। খোদার পক্ষে এ বিরাট ছাওয়াব দান সহজ কাজ।

ইমাম আহমদও তাঁর মুসনাদে এ বর্ণনাটি তুলেছেন।

অষ্টাদশ ঃ এ দিনটি পাপের কাফফারা (বিনিময়) হবার দিন। ইমাম আহমদের মুসনাদে হযরত আতা খুরাসানীর এক বর্ণনা রয়েছে। তিনি নবীশা হাজলীর মাধ্যমে রসুল (সঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেন—মুসলমান যখন জুমআর দিনে গোসল করল ও কাউকে কষ্ট না দিয়ে মসজিদে হাজির হল, ইমাম না আসা পর্যন্ত যথাসাধ্য নামায আদায় করল এবং ইমাম আসার পরে চুপচাপ বসে তাঁর খুৎবা শুনল, এমনকি ইমামের সাথে নামায শেষ করল, তার পাপ মাফ হয়ে যাবে। অন্তত, দুই জুমআর মধ্যবর্তী পাপ মাফ হবে।

সহীহ বুখারীতে হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রসুল (সঃ) বলেন—জুমআর দিনে যে ব্যক্তি গোসল করল, যতখানি সম্ভব পবিত্রতা অর্জন করল, কেউ সুগন্ধি তেল লাগাল ও কেউ আতর লাগাল, তারপর জুমআর নামাযের জন্যে বের হল এবং দু'জন মানুষের ভেতরে পার্থক্য সৃষ্টি করল না ও যথাযথভাবে নামায আদায় করতে লাগল। অবশেষে যখন ইমাম খুৎবা দিলেন, সে চুপচাপ বসে তা শুনল। তার এক জুমআ থেকে অন্য জুমআ পর্যন্ত যত পাপ রয়েছে, সব মাফ হয়ে যাবে।

ইমাম আহমদের মুসনাদে আবু দার্দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ রসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে গোসল করল, পোষাক পরিচ্ছদ পরল, খোশবু থাকলে তা লাগাল ও অস্থিরতার সাথে নামাযের জন্যে ছুটে গেল, কাউকে ঠেলে ঠুলে কষ্ট দিয়ে সামনে বসতে চেষ্টা করল না, এবং নির্দিষ্ট নামায আদায় করে ইমামের বিদায় না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তার দু'জুমআর ভেতরকার পাপ মাফ হয়ে গেল।

ঊনবিংশ ঃ জুমআর দিন ছাড়া প্রত্যেক দিনই জাহান্নাম উত্তপ্ত করা হয় (এ ব্যাপারে আবু কাতাদার (রাঃ) বর্ণনায় আগেই বলা হয়েছে)। কারণ, খোদার কাছে এটা সর্বোত্তম দিন। এই দিনে ইবাদত-বন্দেগী, দো'আ-কালাম ও খোদার কাছে আকুতি-মিনতি জানানো হয়। এসব কাজ জাহান্নাম উত্তপ্ত হবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই দিনে এ কারণে ঈমানদারদের পাপ অন্যান্য দিনের তুলনায় কম হয়ে থাকে। এমনকি পাপী মুসলমানও অন্যান্য দিনের চাইতে এ দিনে পাপ অনেক কমিয়ে দেয়।

এ হাদীছে জাহান্নাম উত্তপ্ত করার ব্যাপারটি দুনিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জুমআর দিন ভিন্ন প্রত্যেক দিনই তা করা হয়। এখন রইল কিয়ামতের প্রশ্ন। সেদিনে জাহান্নাম একদিনের জন্যেও পাপীদের রেহাই দেবে না। কোনদিনই তাদের আজাব হ্রাস পাবে না। তাই যখন তারা জাহান্নামের ফেরেশতাদের অনুরোধ জানাবে, কোন একদিন অন্তত খোদা যেন তাদের শাস্তি হ্রাস করে এ জন্যে সুপারিশ করতে, তখন তাঁরা তাদের এ কান্নাকাটির কোনই জবাব দিবেন না।

বিংশ ঃ এ দিনে দো'আ কবুলের একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে। সেই মুহূর্তে খোদার কাছে কেউ কোন প্রার্থনা জানালে তিনি তা কবুল করবেনই।

সহীহদ্বয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ নবী (সঃ) বলেছেন, জুমআর দিন এমন একটি মুহূর্ত আসে, যখন কোন মুসলমান নামাযে নিরত থেকে কোন প্রার্থনা জানালে আল্লাহ তা'আলা তাকে সেটাই দান করবেন। তারপর হাতের ইশারা দিয়ে সময়ের স্বল্পতা বুঝিয়ে দিলেন।

মুসনাদে হযরত (সঃ) থেকে হযরত আবু লুবানা মাঞ্জারীর এক বর্ণনা রয়েছে। রসূল (সঃ) বলেছেন—জুমআর দিনটি খোদার কাছে সকল দিনের সর্দাররূপে বিবেচিত এবং সবচাইতে মর্যাদার দিন। খোদার কাছে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার দিনের চাইতেও এ দিনটির মর্যাদা বেশী। এর ভেতরে পাঁচটি বিশেষত্ব রয়েছে ঃ (১) এই দিন আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছেন (২) এই দিন তাঁকে পৃথিবীতে নামানো হয়েছে। (৩) এই দিন তাঁর মৃত্যু হয় (৪) এই দিন এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন খোদার কাছে হারাম বস্তু ভিন্ন যা চাওয়া হবে, তাই পাওয়া যাবে (৫) এই দিনই কিয়ামত ঘটবে। এমন কোন মুকাররাব ফেরেশতা, হাওয়া, সমুদ্র, পাহাড় ও বৃক্ষ নেই যা এ দিনে অনুষ্ঠিত হবার ঘটনাটির ব্যাপারে কম্পমান নয়।

জুমআর দুর্লভ মুহূর্তটি

এ মুহূর্তটি সম্পর্কে এ মতভেদ দেখা দিয়েছে যে, আজও তা রয়েছে, না লোপ পেয়েছে ?

এ ব্যাপারে দু'টি মত ইবনে আব্দুল বার প্রমুখ উদ্ধৃত করেছেন। যারা তা আজও অবশিষ্ট থাকার কথা বলেন, তাদের ভেতরে আবার সময়ের নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে। যারা অনির্দিষ্ট হবার কথা বলেন, তাদের ভেতরেও দু'টি মত রয়েছে। তা এই, দিনের মুহূর্তগুলোর ভেতরে তা পরিবর্তিত হয়ে চলে অথবা চলে না। তা নিয়েও দু'টি মত সৃষ্টি হয়েছে।

পক্ষান্তরে যারা নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলেন, তাদের মতানৈক্য বেড়ে এগারটি মত সৃষ্টি হয়ে গেছে।

(১) ইবনে মানজার বলেন—আমি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এ বর্ণনা শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, এ সময়টি সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় ও আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত থাকে।

(২) ইবনে মানজারের হাসান বসরী (রঃ) ও আবু আলিয়া থেকে বর্ণিত মত অনুসারে সূর্য হেলার কাছাকাছি সময়ে সে মুহূর্তটি আসে।

(৩) ইবনে মানজারের হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত মত অনুসারে মুআজ্জিনের জুমআর আজান দেবার সময়টিই হল সেই মুহূর্তটি।

(৪) ইবনে মানজার হযরত হাসান বসরীর (রঃ) উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—ইমাম খুৎবা দানের জন্যে মিম্বরে বসার পর থেকে নেমে আসা পর্যন্ত সেই সময়টি থাকে।

(৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন—খোদা জুমআর নামাযের জন্যে যে সময়টি নির্দিষ্ট করেছেন, সেটাই সেই সময়।

(৬) আবু সাওয়ার আদভী বলেন—পূর্ববর্তীদের ধারণায় তা সূর্য হেলার পর থেকে নামাযের সময় পর্যন্ত।

(৭) আবু জার (রাঃ) বলেন—সূর্যোদয় থেকে সূর্য এক গজ উপরে উঠা পর্যন্ত।

(৮) আসর ও মাগরিবের মধ্যকার সময়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ), আতা (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ও তাউস (রাঃ) এ মত প্রকাশ করেছেন। এ সবই ইবনে মানজার উধৃত করেছেন।

(৯) আসরের পরে দিনের শেষ মুহূর্তটি। ইমাম আহমদ, অধিকাংশ সাহাবা ও তাবেঈন এ মতের অনুসারী।

(১০) ইমামের আগমন থেকে নিষ্ক্রমণ পর্যন্ত এ সময়টি থাকে। ইমাম নববী প্রমুখ এ মত প্রকাশ করেছেন।'

(১১) 'মা'না' প্রণেতা লিখেছেন—দিনের তৃতীয় প্রহরে এ সময়টি আসে। হযরত কা'ব (রাঃ) বলেছেন—মানুষ যদি দিনটিকে তিনভাগ করে নেয়, তা হলে এ সময়টি পাবে।

এ মতের ভেতরে দু'টি মতই সহীহ হাদীছ ভিত্তিক বলে প্রাধান্য পেতে পারে। তার ভেতরে আবার একটিকে প্রাধান্য দেয়া যায়। একটি হল, ইমামের মিম্বরে বসার পর থেকে জামাত শেষ হওয়া পর্যন্ত এ সময় থাকে। এ মতের দলীল হল সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আবু বুরদা (রাঃ) ইবনে আবু মুসার (রাঃ) হাদীছ। তাতে বলা হয়েছে ঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন, জুমআ সম্পর্কে আপনি আপনার পিতা থেকে রসূল (সঃ) এর কোন বাণী শুনেছেন ? তিনি বলেছেন—হাঁ ! আমি শুনেছি, তিনি বলতেন—'আমি রসূলকে (সঃ) বলতে শুনেছি, (জুমআর দুর্লভ মুহূর্তটি) ইমামের মিম্বরে বসা থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের ভেতরে রয়েছে।

ইবনে মাজা ও তিরমিজী হযরত আমর ইবনে আওফ মুযনী থেকে এবং তিনি রসূল (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন—নিশ্চয়ই জুমআর দিনে একটি মুহূর্ত রয়েছে যখন কোন বান্দা যদি আল্লাহর দরবারে কিছু প্রার্থনা জানায়, আল্লাহ তা'আলা তা দান করেন। আরয জানানো হল—হে খোদার রসূল ! সেটা কোন মুহূর্ত ? তিনি জবাব দিলেন ঃ নামায কায়েম হবার পর থেকে শেষ হওয়া পর্যন্ত।

দ্বিতীয় মতটি হল এই, এ সময়টি আসর নামাযের পরে আসে। মত দু'টির ভেতরে এটাই প্রাধান্য পেতে পারে। হযরত আবুল্লাহ ইবনে সালাম ও আবু হুরায়রা (রাঃ) এবং ইমাম আহমদ সহ বড় এক দলের মত এটাই। এ মতের সমর্থনে ইমাম আহমদের মুসনাদে বর্ণিত হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) হাদীছ রয়েছে। তাতে বলা হয়েছে,

Contents

নবী (সঃ) বলছেন, জুমআর দিন এমন একটি মুহূর্ত আসে, যখন বান্দা খোদার দরবারে প্রার্থনা জানালে তিনি তা মঞ্জুর করেন এবং এ সময়টি আসরের পরে আসে।

আবু দাউদ ও নাসায়ী হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ নবী (সঃ) বলেছেন, জুমআর দিনের বার ঘন্টার ভেতরে এমন একটি ঘন্টা রয়েছে, তখন কোন মুসলমান খোদার দরবারে যা কিছু প্রার্থনা জানায়, তিনি তা কবুল করেন। তাই সে ঘন্টাটি আসরের পরে শেষ ঘন্টায় সন্ধান কর।

সাঈদ ইবনে মানসুর তাঁর সুনানে হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান থেকে এরূপ বর্ণনা করেন ঃ হযরতের (সঃ) কয়েকজন সাহাবী একত্র হয়ে জুমআর দুর্লভ মুহূর্তটি সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। তাতে তাঁদের ভেতরে মতানৈক্য দেখা দেয়। তবে জুমআর শেষ ঘন্টায় হবার ব্যাপারে তারা একমত হয়েছেন।

ইবনে মাজার সুনানে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন ঃ হযরত (সঃ) তখন বসা ছিলেন। আমি আরয করলাম, আমরা খোদার কিতাব অর্থাৎ তাওরাতে জুমআর দিনে এমন একটি ঘন্টার কথা জানতে পাই, যখন কোন ঈমানদার বান্দা খোদার কাছে কিছু প্রার্থনা জানালে তিনি তা মঞ্জুর করেন। তিনি আমার দিকে ইংগিত করে বললেন—না, ঘন্টার কোন অংশ। আমি আরয করলাম—হে খোদার রসূল! আপনি ঠিকই বলেছেন। ঘন্টার কোন অংশই বটে। তা কখন? তিনি বললেন ঃ দিনের ঘন্টাগুলোর শেষ ঘন্টাটিতে। আমি আরয করলাম—সেটা তো নামাযের সময় নয়। তিনি বললেন—হাঁ, যখন কোন ঈমানদার বান্দা নামায পড়ে বসে বসে অন্য নামাযের অপেক্ষা করে, তখন যেন সে নামাযেই রত থাকে।

প্রথমোক্ত মতটির দলীল পূর্বে বলা হয়েছে।

ইমাম আহমদের মুসনাদে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ তিনি বলেন, নবীর (সঃ) কাছে আরয করা হল—জুমআ নাম রাখা হল কেন? তিনি জবাব দিলেন—যেহেতু তোমার পিতা আদমের (আঃ) দেহের সব উপাদান সেদিন মিলানো হয়েছে, সেদিন কিয়ামত ঘটবে, পুনরুত্থান ও শেষ বিচার হবে। আর সেদিনের শেষ ঘন্টাগুলোর একটিতে যদি কেউ প্রার্থনা জানায়, খোদা তা কবুল করেন।

আবু দাউদ, তিরমিজী ও নাসায়ীর সুনানে আবু সালমা ইবনে আবদুর রহমান হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রসূল (সঃ) বলেছেন, 'সূর্যোদয়ে সৃষ্ট দিন গুলোর ভেতরে শুক্রবারই উত্তম। কারণ, সেদিনে আদমের সৃষ্টি। সেদিনে তাঁর দুনিয়ায় অবতরণ। সেদিনে তাঁর তওবা কবুল হয়। সেদিনে তাঁর মরণ ঘটে। সেদিনে কিয়ামত হবে। কোন প্রাণী বা জিন-ইনসানের এমন কেউ নেই যে, এ দিনটিকে কিয়ামতের জন্যে ভয় না করে।

আর এ দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে যখন কোন মুসলমান বান্দা খোদার কাছে নামাযে নিরত অবস্থায় কোন প্রার্থনা জানালে তিনি তা পূরণ করেনই। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এ হাদীছ শুনে কা'ব বললেন—প্রতিবছর তা একদিন আসে। আমি বললাম—না, প্রত্যেক জুমআয়। তখন তিনি তাওরাত অধ্যয়ন করলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) সত্য বলেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) আরও বলেন—তারপর আমি আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে দেখা করলাম। কা'ব সহ এক মজলিসে তাকে এ হাদীছ শুনালাম। তিনি বললেন, আমি জানি, সেটা কোন ঘন্টা? আমি বললামঃ তা আমাকে বলে দিন। তিনি বললেন, জুমআর দিনের শেষ ঘন্টাটি। আমি বললামঃ শেষ ঘন্টায় কি করে হতে পারে? অথচ রসূল (সঃ) বলেছেন, নামাযে নিরত অবস্থায় কোন প্রার্থনা জানালে তা কবুল হবে। তিনি বললেনঃ রসূল (সঃ) কি এ কথা বলেননি যে, যে ব্যক্তি নামাযের পরে বসে বসে অন্য নামাযের জন্যে অপেক্ষা করে, সে যেন নামাযেই নিরত? আমি বললাম হাঁ। তিনি বললেন—এও তো তাই।

ইমাম তিরমিজী বলেন—হাদীছটি 'হাসান সহীহ।' সহীহদ্বয়ে এর কিছু অংশের উল্লেখ রয়েছে।

যারা নামাযের সময়কে সেই মুহূর্ত বলেন, তারাও আমর ইবনে আওফ মুযনীর হাদীছ থেকে প্রমাণ দেন। অথচ হাদীছটি যঈফ। আবু উমর ইবনে আব্দুল বার বলেন—এ হাদীছটি শুধু কাছীর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ইবনে আওফ তার পিতা ও সে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছে। এ ছাড়া আর কাউকে বর্ণনা করতে শুনিনি। অথচ তার হাদীছ প্রামাণ্য নয়।

রাওয়াহ ইবনে ইবাদ আওফ থেকে, তিনি মুআবিয়া ইবনে কুর্রা থেকে, তিনি আবু বুরদা থেকে, তিনি আবু মূসা থেকে ও তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে ইমামের আগমন থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের কথা বর্ণনা করেছেন। ইবনে উমর (রাঃ) আরও বলেন—আল্লাহ এতেই তোমাকে সঠিক পাবেন।

আব্দুর রহমান ইবনে হুজায়রা আবু জার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—তাঁর স্ত্রী তাঁকে জুমআর সেই মুহূর্তটি সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি জবাবে বলেন, সূর্য উদিত হবার সময় থেকে কিছুক্ষণ পর্যন্ত থাকে। এর পরেও যদি প্রশ্ন কর, তা হলে তুমি তালাক হয়ে যাবে।

এই মত অনুসারী দল হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) বর্ণনা থেকে এ প্রমাণ সংগ্রহ করেন যে, 'তিনি সেই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন'। অথচ আসরের পরে কোন নামায নেই। সুস্পষ্ট হাদীছ থেকে প্রমাণ দান উত্তম।

আবু উমর বলেন—এ মতের অনুসারীরা হযরত আলীর (রাঃ) বর্ণনা থেকেও প্রমাণ নিয়েছেন। তিনি বলেন—নবী (সঃ) বলেছেন, সূর্য যখন ঢলে পড়ে, ছায়া যখন লোপ পেয়ে চলে, প্রাণ যখন যেতে বসে, সেই মুহূর্তে খোদার কাছে নিজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে নাও। কারণ, এটা আওয়াবীনের সময়। তারপর তিনি এ আয়াত পড়েন: 'ইন্নাহু কানা লিল আউয়াবীনা গাফুরা' (নিশ্চয়ই তিনি আউয়াবীনদের জন্যে ক্ষমাশীল)।

সাঈদ ইবনে জুবায়ের হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন—জুম্‌আর দিনের যে মুহূর্তটির কথা বলা হয়, তা আসরের পর থেকে সূর্যাস্তের ভেতরে আসে। হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের যখন আসর পড়তেন, সূর্যাস্ত পর্যন্ত কারুর সাথে কথা বলতেন না। অধিকাংশ পূর্বসূরীদের এটাই মত। এ মতের সমর্থনেই অধিকাংশ হাদীছ এসেছে। তাতে এটাকে নামাযের সময় বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যান্য মতের কোন দলীল নেই।

আমার মতে নামাযের সময়েও দোআ কবুলের একটি মুহূর্ত আছে। তা হলে দোআ কবুলের দু'টি মুহূর্ত হয়। যদি সেই বিশেষ মুহূর্তটি আসরের পরের শেষ ঘন্টাটিতে হয়, তা'হলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়, যাতে আগ-পিছ হবার জো নেই। এখন রইল নামাযে দোআ কবুলের মুহূর্তটি। তা নামাযের অবস্থা অনুসারে আগ-পিছ হতে পারে। কারণ, মুসলমানদের জামাআত; নামায, বিনয় ও কান্না-কাটা ইত্যাদি দোআ কবুলের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাদের জামাআতের জন্যে এমন একটি মুহূর্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যখন দোআ কবুলের আশা করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সব হাদীছ একমত। তাই এ দু'টি সময়ে হযরত (সঃ) উম্মতদের দোআ ও কান্না-কাটা করার জন্যে উৎসাহ জুগিয়েছেন। তার উদাহরণ হযরত (সঃ) থেকে এ ঘটনায় পাই যে, একবার তাঁকে সৎ নিয়তে যে মসজিদ গড়া হয়েছে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন—'তোমাদের সেই মসজিদ হল এই।' একথা বলে তিনি মসজিদে নববীর দিকে ইশারা করলেন। অথচ তাঁর এ বক্তব্য কুববার মসজিদের পরিপন্থী নয়। কারণ, সেটা সম্পর্কেই 'তাকওয়ার ভিত্তিতে গড়া' বলে আয়াত নাযিল হয়েছে। আদপে এ দু'টোই সাধু উদ্দেশ্যে গড়া।

তেমনি জুমআর মুহূর্তটি সম্পর্কে তাঁর 'ইমাম মিম্বরে বসা থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত' ফরমানটিও অন্য সময়ে তা হওয়া নিষেধ করে না। তাই তা 'আসরের পরে তালাশ কর' এ ফরমানের পরিপন্হী নয়। 'আসমা' তেও অনুরূপ উদাহরণ মিলে। হযরতের (সঃ) ফরনান, 'মা তাউদ্দুনার রকূবো ফীকুম' (তোমাদের ভেতরে কাকে 'রকুব' মনে কর)? সাহাবারা আরয করলেন—যার কোন সন্তান নেই। রসূল (সঃ) বললেন, যার সন্তান থেকে কিছু না হয়, কিংবা তাকে দিয়ে কোন উপকার হয় না, সে-ই রকূব। হযরতের (সঃ) এ কথা দ্বারা নিঃসন্তানের রকূব হওয়া বাতিল হয় না।

তেমনি হযরতের (সঃ) বাণী—তোমাদের ভেতরে নিঃস্ব কে? সাহাবারা জবাব দেন—যার কাছে-ধন সম্পদ বলতে কিছুই নেই। তিনি বললেন—নিঃস্ব সেই ব্যক্তি, যে পাহাড় প্রমাণ পুণ্য নিয়ে কিয়ামতে উপস্থিত হয়েছে আর তার সাথে কাউকে থাপ্পর মেরে, কাউকে পিটিয়ে কিংবা কাউকে খুন করে এসেছে। তাই তার পুণ্য সবাই ভাগ করে নিবে...ইত্যাদি।

তদ্রূপ তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দুয়ারে দুয়ারে এক লোকমা খানা কিংবা দু'টো খেজুর পেতে ধর্ণা দিয়ে ফিরছে, সে মিসকীন নয়। মিসকীন সেই ব্যক্তি যে কারুর কাছে কিছু চায়না এবং কেউ বুঝতে পাবে না যে, তাকে সদকা দিতে হবে।

দোআ কবুলের মুহূর্তটি আসরের পরে দিনের শেষ ঘন্টায়ই রয়েছে। সব ধর্ম বেত্তারাই এ মুহূর্তটির গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। আহলে কিতাবরাও এটিকে দো'আ কবুলের সময় বলে মনে করে থাকে। এটা এমনি এক ব্যাপার ছিল, যা তাদের বদলাবার বা নতুনভাবে কিছু বলবার ছিলনা। তাদের ঈমানদারগণ এটাই মেনে নিয়েছে।

যাঁরা এ সময়টিকে পরিবর্তিত হতে থাকার কথা বলেন, তাঁরা লায়লাতুল কদর সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলো তাঁদের মতের সমর্থনে দলীল হিসেবে সমবেত করতে চেয়েছেন। সেটা মজবুত দলীল হয় না। লায়লাতুল কদর সম্পর্কে হযরত (সঃ) বলেছেন—তেইশ, পঁচিশ, সাতাশ কিংবা ঊনত্রিশ তারিখে খোঁজ কর।' পক্ষান্তরে জুমআ সম্পর্কে এ ধরনের কোন কথা বলেন নি। তা ছাড়া কদর রাতের হাদীছে কোন রাতকেই নির্দিষ্ট করে স্পষ্ট কিছু বলা হয় নি। পক্ষান্তরে জুমআর হাদীছে তা বলা হয়েছে। সুতরাং এ দুয়ের দলীলে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

এখন যাঁরা সে দুর্লভ মুহূর্তটি তুলে নেয়া হয়েছে বলে থাকেন, তাঁদের মতটি যাঁচাই সাপেক্ষ। এঁদের সমগোত্রের হলেন তাঁরা যাঁরা লাইলাতুল কদর তুলে নেয়া হয়েছে বলে ধারণা করেন। যদি তাঁদের ধারণা এটাই হয় যে, এ মুহূর্তটি আগে উম্মতদের জানা ছিল এবং পরে তাঁদের তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে, তা হলে বলতে হয় যে, সব উম্মতকে তো আর ভুলানো হয় নি। যদি তাঁরা বলেন যে, সেই মুহূর্তটির মূল দুআ কবুলের ব্যাপারটি আজ আর অবশিষ্ট নেই, তা হলে বলতে হয় যে, সব সহীহ হাদীছ এর বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে। তাই সে কথার ওপরে নির্ভর করা চলে না। খোদাই সর্বজ্ঞ।

একুশ ঃ জুমআর একুশতম বৈশিষ্ট্য হল এই, এই দিনে জুমআর নামায পড়া হয় এবং তা অন্য সব ফরয নামাযের ভেতরে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বিরাট জামাআত, বিশেষ সংখ্যক লোক হওয়া, ইকামাত শর্ত হওয়া, মুকীম হওয়া, জোরে কিরাআত পাঠ ইত্যাদি এ নামাযেই রয়েছে। আসর নামায ছাড়া সব চাইতে বেশী জোর দেয়া হয়েছে এর জন্যে। 'আস সুনানুল আরবা'এ

আবুল জুআদ আয-যুমরীর হাদীছে আছে—'হযরত (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি অবজ্ঞা করে তিন জুমআ ছেড়ে দিবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরের দ্বার রুদ্ধ করে দিবেন।'

ইমাম তিরমিজী বলেন, রিওয়ায়েতটি 'হাসান'। আমি মুহাম্মদ (রঃ) থেকে হযরত আবু জুআদ যুমরী সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন—তার নাম পরিচিত নয় এবং এ হাদীছটি ছাড়া আমি তার থেকে অন্য কোন রিওয়ায়েত শুনিনি।

সুনানে নবী (সঃ) থেকে জুমআ বর্জনকারী সম্পর্কে নির্দেশ রয়েছে, যে ব্যক্তি এক জুমআ ছেড়ে দিবে, সে এক দীনার সদকা দেবে ও অক্ষম হলে অর্ধ দীনার দিবে। আবু দাউদ ও নাসায়ী এটা কুদামা ইবনে ওয়াবিরা থেকে ও তিনি সুমরা ইবনে জুন্দুব থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন—কুদামা ইবনে ওয়াবিরা পরিচিত নয়। ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন অবশ্য তাঁকে 'ছিকা' বলেছেন। কিন্তু ইমাম বুখারী থেকে বর্ণিত আছে—সুমরা থেকে কুদামা শুনেছেন, তা ঠিক নয়।

জুমআ যে ফরযে আইন এ ব্যাপারে সব মুসলমান একমত। আর ইমাম শাফেঈ থেকে এর ফরযে কিফায়া হওয়া সম্পর্কে যে একটি বর্ণনা রয়েছে, তা ভুল বর্ণনা। কারণ, তাঁর বক্তব্যটি হল এই, যাদের ওপরে জুমআ ফরয, ঈদের নামাযও তাদের জন্যে ফরয। তাতে সে বুঝে নিয়েছে, যেহেতু ঈদের নামায ফরযে কিফায়া, তাই জুমআও ফরযে কিফায়া হবে। এ ধারণা সুস্পষ্টত অমূলক। বরং এ থেকে ঈদকেই ফরযে আইন ধরা চলে। এখানে দু'টি ব্যাপারই হতে পারে। এক, জুমআর মত ঈদও সকলের জন্য ফরয। দুই, ফরযে কিফায়াও হতে পারে। তবে এ ফরযে কিফায়া ফরযে আইনের মতই সকলের জন্যে ফরয। একদল আদায় করলেই যে অন্য সকলের আদায় হয়ে যাবে, তাতে মতভেদের অবকাশ রয়েছে।

বাইশ: জুমআর বাইশতম বৈশিষ্ট্য হল খুৎবা পাঠ। তাতে খোদার স্তুতি ও মর্যাদা এবং তাঁর একত্ব ও রসূলের রিসালাতের বর্ণনা ও সাক্ষ্য দান হয়ে থাকে। তাছাড়া তাতে বান্দাদের নিআমত কিংবা আজাব লাভের বর্ণনাও রয়েছে। তাতে জান্নাতের উপযোগী কার্যকলাপের নির্দেশ দান করা হয় ও জাহান্নামের উপযুক্ত কাজ থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দেয়া হয়। জামাআত ও খুৎবার উদ্দেশ এটাই।

তেইশ: জুমআর তেইশতম বৈশিষ্ট্য হল, এ দিনে ইবাদতের জন্যে অবসর গ্রহণ মুস্তাহাব। ওয়াজিব ও মুস্তাহাব ইবাদতের আধিক্যের জন্যেও এদিনটি অন্যান্য দিনের ওপরে প্রাধান্য লাভ করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা সব সম্প্রদায়ের জন্যে পার্থিব ব্যস্ততা ছেড়ে একটি দিন খোদার ইবাদতে মশগুল হবার জন্যে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। মুসলমানদের জন্যে সেই দিনটি হল শুক্রবার। মাসের ভেতরে যেমন রমযান মাস, দিনের ভেতরেও তেমনি শুক্র-

বার দিন এ বিশেষত্ব লাভ করেছে। রমযানে যেমন শবে কদর দোআ কবুলের জন্যে এসেছে, তেমনি শুক্রবারেও দোআ কবুলের সময় দেয়া হয়েছে। তাই জুমআর দিন যার ভাল গেল, পাপ মুক্ত ও শান্তিপূর্ণ হল, পুরা সপ্তাহই তার ভাল যাবে। তেমনি রমযান মাস যার ভাল যায়, সারা বছরও তার ভাল যায়। তেমনি যার হজ্জ ভালয় ভালয় পূর্ণ হয়, তার উমরাও শুভে লাভে পূর্ণ হয়।

তাই জুমআ হল সপ্তাহের মানদন্ড ও রমযান বর্ষের এবং হজ্জ উমরার মানদন্ড। খোদাই তওফিক দিবার মালিক।

চব্বিশ : জুমআর চব্বিশতম বৈশিষ্ট্য হল, জুমআর মর্যাদা সপ্তাহের ভেতরে ঠিক বছরের ভেতরে ঈদের দিনের মতই। ঈদে নামায ও কুরবানী দু'টি ইবাদত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা জুমআয় তাড়াতাড়ি যাওয়াকে কুরবানীর স্থলাভিষিক্ত করে দিয়েছেন। তাই যে ব্যক্তি দ্রুত মসজিদে জুমআর নামায পড়তে ছুটে যায়, সে যেন নামায ও কুরবানী দু'টি ইবাদতই সমাধা করে। সহীহদ্বয়ে নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে—যে ব্যক্তি পয়লা ঘন্টায় মসজিদে ঢুকল, সে যেন একটি উট কুরবানী করল। দ্বিতীয় ঘন্টায় যে ঢুকল, সে যেন একটি গাভী কুরবানী করল এবং তৃতীয় ঘন্টায় যে ঢুকল, সে যেন একটি ভেড়া কুরবানী করল।

এ ঘন্টা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। ফিকাহবিদদের এ ব্যাপারে দু'টি মত রয়েছে। একটি মতে দিন শুরু হবার সাথে সাথেই এ ঘন্টা শুরু হয়। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদের এ মতই পরিচিত। আরেকদলের মত হল, সূর্য হেলার পর থেকে ছ'ঘন্টা। এ মাজহাব হল ইমাম মালিকের। একদল শাফেঈও এ মত সমর্থন করেন। এ মতের সমর্থনে দু'টি দলীল পেশ করা হয়।

প্রথম, মসজিদে সূর্য হেলার পরেই যাওয়া হয়। কারণ, (হাদীছে ব্যবহৃত) 'রাওয়াহ' শব্দ 'গুদুও' শব্দের বিপরীত। প্রথমটি সূর্য হেলার পরের চলা ও দ্বিতীয়টি আগের চলা বুঝায়। যেমন, আল্লাহ বলেন, 'গুদুওহা শাহরুন ওয়া রাওয়াহুহা শাহরুন' অর্থাৎ তার সকালের চলা একমাস ও বিকালের চলা এক মাসের সমান হয়। ইমাম জাওহারী বলেন : রাওয়াহ সূর্য হেলার পরেই হতে পার।

দ্বিতীয় দলীল হল, প্রথম যুগের মুসলমানরা পুণ্য ও ভাল কাজের জন্যে নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন। অথচ তাদেরও দেখা যায়না যে, কেউ সকালের দিকে জুমআর নামায পড়তে গিয়েছেন। ইমাম মালিক তো দিনের শুরুতে জুমআর জন্যে আসতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন—মদীনাবাসীদের কেউ এরূপ করেছেন বলে আমি জানি না।

প্রথম মতের অনুসারীরা হযরত জাবিরের (রাঃ) হাদীছ থেকে প্রমাণ নেন। তাতে নবী (সঃ) বলেছেন, জুমআর দিন বার ঘন্টার সমষ্টি। তারা বলেন—নির্ধারিত ঘন্টাও দিনে বারটি। তবে

ঘন্টা দু'ধরনের হয়। সঠিক ঘন্টা ও সাময়িক প্রয়োজনে ধরে নেয়া ঘন্টা। তাঁরা বলেন, এ কথার তাৎপর্য এই, নবী (সঃ) দিনকে সেরূপ ছ'ঘন্টা ধরে নিয়েছেন। তবে সে ঘন্টা ঘড়ির কাঁটার সাথে মিলিয়ে ধরলে ছ'ঘন্টা চলে যাবার পরে সপ্তম ঘন্টা আসে, আর সপ্তম ঘন্টায় ইমাম এসে যান। তখন 'সহীফা' তুলে নেয়া হয় এবং তারপরে আর কুরবানী কবুল হয় না। সুনানে আবু দাউদে হযরত আলীর (কঃ) রসূল (সঃ) থেকে এ বর্ণনা রয়েছে ঃ জুমআর দিন এলেই শয়তান নিজ ঝান্ডা নিয়ে বাজারে আসে এবং মানুষকে বারংবার ধোকা দিতে থাকে ও তাদের জুমআ থেকে বিরত থাকতে বলে। আর ফেরেশতারা সকালেই এসে মসজিদের দরজায় বসে যান। তারপর কে প্রথম ঘন্টায় আর কে দ্বিতীয় ঘন্টায় এল, তা লিখতে থাকে। এভাবে ইমাম চলে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরা থাকেন।

উমর ইবনে আব্দুল বার বলেন, এ ঘন্টার হিসেব নিয়ে আলিমদের ভেতরেও মতভেদ দেখা দিয়েছে। একদলের মতে, এ ঘন্টা সূর্যোদয় ও তার পূর্ণ জ্যোতি প্রকাশ থেকে শুরু হয়। তাঁরা এ সময়ে জুমআর জন্যে যাওয়া উত্তম মনে করেন। ছাওরী (রঃ), আবু হানীফা (রঃ), শাফেঈ (রঃ) ও অধিকাংশ আলিম জুমআয় তাড়াতাড়ি উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব মনে করেন। ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন, যদি কেউ ফজরের পরে ও সূর্যোদয়ের আগে জুমআর জন্যে চলে যায়, তা উত্তম।

আছরাম বলেন—আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে ইমাম মালিক ইবনে আনাসের 'জুমআর দিন সকালের দিকেই মসজিদে গিয়ে বসে থাকা ঠিক নয়' এ মতটি ব্যক্ত করা হলে তিনি জবাব দেন—এটা হযরতের (সঃ) হাদীছের পরিপন্থী মত। সুবহানাল্লাহ ! এ ব্যাপারে তিনি কোন পথে চলে গেলেন ? অথচ নবী (সঃ) সেজন্যে কুরবানীর সমান ছওয়াবের কথা বলেছেন।

তিনি আরও বলেন—ইমাম মালিকের মত সম্পর্কে ইয়াহিয়া ইবনে উমর হার্মালা থেকে জানা যায় যে, সে ইবনে ওহাব থেকে এই ঘন্টা সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা জানতে চাইল, সেটা কি পূর্বাহ্নের প্রথম ঘন্টা, না অপরাহ্নের প্রথম ঘন্টা ? তিনি বলেন, আমি ইমাম মালিককে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি জবাব দেন—আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয়, তা থেকে জুমআর নামাযের জন্যে প্রয়োজনীয় অপরাহ্নের এক ঘন্টাকেই বুঝানো হয়েছে। আর সে ঘন্টারই প্রথম ভাগে, দ্বিতীয় ভাগে, তৃতীয় ভাগে, চতুর্থ ভাগে, পঞ্চম ভাগে কিংবা ষষ্ঠ ভাগে উপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। তা না হলে দিনের নবম ঘন্টায় আসরের কিংবা তার কাছাকাছি ওয়াক্তে জুমআ পড়া হত।

ইবনে হাবীব ইমাম মালিকের থেকে এরূপ বর্ণনার সত্যতা অস্বীকার করেছেন। তিনি তাঁর প্রথম মতেরই সমর্থক। তিনি বলেন, ইমাম মালিকের নামে বর্ণিত এ বর্ণনাটি হাদীছের ব্যাখ্যায় ওলট পালট সৃষ্টি করার শামিল। আর তা কয়েকটি কারণেই অসম্ভব। তিনি বলেন, একই

Contents

ঘণ্টার আংশিক ও কাল্পনিক ঘণ্টা স্থির করা বৈধ নয়। কারণ, দিনের ষষ্ঠ ঘণ্টায়ই বেলা হেলে যায়। তখন আজানের ও ইমাম আগমনের সময় হয়। তাই এ হাদীছে উল্লেখিত ঘণ্টা দ্বারা পূর্বাহ্নের ঘণ্টাগুলোই বুঝানো হয়েছে। আর দিনের পয়লা ঘণ্টা থেকেই 'তাহজীর' (তাড়াহুড়া) শুরু করার কথা বলা হয়েছে এবং তাতে উট কুরবানীর আর পঞ্চম ঘণ্টায় এ 'তাহজীর' এর আয়ু শেষ হয় বলে তাতে আন্ডা কুরবানীর কথা বলেছেন। তারপর আজানের সময় এসে যায়। এখান থেকেই হাদীছের ব্যাখ্যা যার যেদিকে খুশী করেছেন। কেউ পূর্বভাগে, কেউ পরবর্তী ভাগে এবং কেউ একই ঘণ্টার কয়েকভাগে এ ঘণ্টাগুলো ধরেছেন। অথচ হাদীছে দিনের প্রথম ভাগের ঘণ্টাগুলোর কথা বলা হয়েছে।

আমি 'কিতাবে ওয়াযিহে সুনান'এ এব্যাপার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ সব বহাছ ঘটেছে মালিক ইবনে মারোয়ানের (রঃ) বক্তব্য নিয়ে। আবু উমর (রঃ) তাই এটার প্রতিবাদ করে বলেছেন—ইমাম মালিকের (রঃ) ওপরে এ হচ্ছে মিথ্যা অপবাদ। তাঁকে বিকৃত ও অপসন্দনীয় কথা বলার দোষ চাপানো হয়েছে। ইমাম মালিকের অভিমত তো অন্যান্য ইমামদের ও হাদীছের মতের সমর্থন লাভ করেছে। মদীনাবাসির অনুসৃত পন্থাই তার সাক্ষ্য দেয়। এটা এমনি এক মাসআলা যাতে মদীনাবাসির কার্যধারা দলীল হবার যোগ্য। কারণ, জুমআ বারংবার এসেছে। তা সেখানকার আলিম বা জনসাধারণের কাছে গোপন থাকার ব্যাপার নয়।

যে সব 'আছার' (সাহাবাদের বাণী ও কার্যধারা) থেকে ইমাম মালিক তাঁর অভিমতের সমর্থনে দলীল পেশ করেছেন, তা হচ্ছে ইমাম যুহরীর (রঃ) সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে প্রাপ্ত বর্ণনাটি। তাতে নবী (সঃ) বলেন—'জুমআর দিন এলে প্রত্যেক মসজিদের প্রতিটি দ্বারে ফেরেশতারা দাঁড়িয়ে যান। তাঁরা মুসল্লীদের কে আগে আর কে পরে আসে, তা লিখতে থাকেন। সেক্ষেত্রে জুমআর জন্যে তাড়াহুড়া করে যে সকালেই চলে আসে, সে যেন একটা উট কুরবানী করে। যে ব্যক্তি তার পরে আসে, সে যেন একটি গাভী ও তারপরে যে আসে, সে যেন একটা ভেড়া কুরবানী করে। এমনকি তিনি মুরগী ও আন্ডা কুরবানীর কথাও বলেছেন। অবশেষে ইমাম যখন মিম্বরে উঠে বসেন, তখন (ফেরেশতাদের) কিতাব বন্ধ করা হয়। মানুষ তখন খুৎবা শুনতে থাকে।'

তিনি এ বর্ণনার পরে প্রশ্ন করেন—তোমরা কি বর্ণনাটির মর্ম বুঝেছ? তা হচ্ছে এই, ফেরেশতারা কে কার আগে আর কে কার পরে আসে তা লিখেন। এভাবে যে সবার আগে আসে, সে যেন উট এবং তার পরে যে আসে সে গাভী ....ইত্যাদি কুরবানী করে। এ ক্ষেত্রে সবার আগে যারা আসে, তাদেরই তিনি 'মুহাজ্জির' আখ্যা দিয়েছেন।

'মুহাজ্জির' শব্দ এসেছে 'হাজিরাহ' ও 'তাহজীর' থেকে। জুমআর জন্যে যাবার সময়কে বুঝানো হয়েছে। এটা সূর্যোদয়ের সময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ, সেটা জুমআয় যাবার

সময় নয়। হাদীছে বলা হয়েছে, তারপর যে আসবে ও তারপর যে আসবে...ইত্যাদি। এতে ঘন্টার কথাও বলা হয়নি। অবশ্য বিভিন্ন হাদীছে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। গোড়ার দিকে তা দেখানো হয়েছে। কোথাও 'মুতাআজ্জিল' বলা হয়েছে। সেখানে আবার 'বাদানাতান' ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও সেখানে 'জাযুরান' ব্যবহার করা হয়েছে। একদল শাফেঈ বলেছেন, হযরতের (সঃ) বাণী 'মুহাজ্জির ইলাল জুমআ' থেকে জুমআয় তাড়াতাড়ি বা আগে যাবার কথা বলা হয়নি; বরং জুমআ তরককারীদের জুমআয় আসার তাগাদা দেয়া হয়েছে। যেন তারা পার্থিব লালসা ছেড়ে জুমআ পড়ার জন্যে ছুটে যায়। সেক্ষেত্রে 'হিজরত' অর্থে ব্যবহৃত হবে। মানে কার্যের একটি ক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে হিজরত করা। এর থেকেই মুহাজির নামের সৃষ্টি হয়েছে। শাফেঈ (রঃ) বলেন—জুমআয় সকালের দিকেই চলে যাওয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়।

আমার বক্তব্য এই ঃ সকালের দিকে মসজিদে গিয়ে বসে থাকার বিরোধীতার ক্ষেত্রে তিনটি যুক্তি রয়েছে। এক, 'রাওয়াহ' কখনও সূর্য হেলার পরে ছাড়া ব্যবহৃত হয়না। দুই, তাহজীর শব্দ 'হাজিরাহ' থেকে হয়, যার অর্থ প্রখর উত্তাপের সময়। তৃতীয়, মদীনাবাসী কখনও দিনের প্রথমভাগে এসে মসজিদে বসে থাকেন না।

'রাওয়াহ' শব্দ যে অপরাহ্নে চলাচলের বেলায়ই প্রযোজ্য, তাতে সন্দেহের অবকাশই নেই। আর এ শব্দটি সাধারণত 'গুদুও' (সকালে গমন) শব্দের প্রতিশব্দ রূপে আসে। যেমন, খোদা বলেন ঃ

غدوها شهرا ورواحها شهرا -

কিংবা রসূলুল্লাহ্‌র (সঃ) বাণী ঃ

من غدا الى المسجد وراح اعد الله له نزلا فى الجنة كلما غدا او راح -

কিংবা কবি বলেন ঃ

نروح ونغدوا لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضى -

এ সব কটি উদাহরণেই 'রাওয়াহ' অপরাহ্নে গমনের কথা বুঝিয়েছে।

'রাওয়াহ' যদি 'গুদুও' শব্দের সাথে না আসে, তা হলে শুধু গমন বা নিষ্ক্রমন বুঝায়। আযহারী তাঁর 'তাহজীব'-এ বলেন—কোন কোন আরববাসীকে 'রাওয়াহ' সাধারণ সফরে গমনের অর্থেও ব্যবহার করতে শুনেছি। তেমনি হাদীছেও ব্যবহৃত হয়েছে। যার অর্থ দাঁড়ায়, জুমআর জন্যে যাওয়া বা সফর করা। তাই তা থেকে অপরাহ্নে যাওয়ার অর্থ নেয়া হয় নি। আর 'মুহাজ্জির' শব্দ 'তাহজির' ও 'হাজিরা' থেকে এসেছে। জাওহারী বলেছেন—এর অর্থ হচ্ছে দুপুর বেলার

Contents

প্রচন্ড উত্তাপের সময়। তাই বলা হয়, 'হাজারুন্নাহার' (দিনের তপ্ততম সময়)। যেমন, ইমরুল কায়েস বলেন :

فدعها وسل الهم عنها بجسرة ذمول اذا صام النهار وهجرا -

আরবে বলা হয় 'আতায়না আহলুনা মুহাজ্জিরীন' অর্থাৎ দুপুর বেলার উত্তপ্ত সময়ে। তাহজীর অর্থ দুপুরে পরিভ্রমণ। এ সব থেকে মদীনাবাসির মতেরই পরিপুষ্টি ঘটে। অন্যদল বলেন, 'তাহজীর'ও 'রাওয়াহ' এর মত সাধারণ চলার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এখানে তা থেকে 'তাবকীর' (সকালে গমন) বুঝানো হয়েছে।

আযহারী তাঁর প্রণীত 'তাহজীবে' বলেন—মালিক সুমার থেকে, তিনি আবু সালেহ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) ও তিনি রসূল (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন : 'যদি মানুষ 'তাহজীর' এ কি কল্যাণ রয়েছে, তা জানত, তা হলে সেদিকে ছুটে যেত। অন্য এক মারফু হাদীছে বলা হয়েছে, 'আল মুহাজ্জির ইলাল জুমুআ কাল মাহদী বাদনাতান'। অনেকেই এর অর্থ 'হাজিরাহ' থেকে নিয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে বেলা হেলার সময়। এটা ভুল। সঠিক মত প্রকাশ করেছেন আবু দাউদ আল মুসাহিফী ও নযর ইবনে শামীল। তাঁরা বলেছেন, 'তাহজীর' এখানে 'তাবকীর' অর্থ দেয়। খলীলকে এ হাদীছের এরূপ অর্থই করতে শুনেছি। সুতরাং এটাই সঠিক মত। আরবদের ভাষা ও অলংকারের এটাই কথা। লবীদ বলেছেন :

راح القطين بهجر بعد ما ابتكر -

এখানে 'হিজর' শব্দ 'ইবতিকার' এর সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দল 'রাওয়াহ' অর্থ সাধারণ চলা বলে থাকেন। তাদের মতে, পূর্বোক্ত হাদীছে 'মা ফীত তাহজীর' বলতে যে কোন নামাযেই 'তাবকীর' বুঝানো হয়েছে। মানে, সব নামাযেই ওয়াক্তের শুরুতেই যেতে হবে।

আযহারী বলেন—'হাজারার রাজুল' বলতে সব আরবরাই দুপুরে বের হওয়ার কথা বুঝে থাকে। আবু উবায়দা আবু যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন, 'হাজারার রাজুল' বলতে অর্ধ দিবসে বের হওয়ার কথা বুঝায়।

আযহারী আরও বলেন—আমাকে আল মাঞ্জারী একটি কবিতা লিখে দিয়েছেন। তা এই :

هل تذكرين قسمي ونذري ازمان انت بعروض الجفر
اذ انت مضرار جوادا لخضر على ان لم تنهضي بوقر
بسار بعين قدرت بقدري بالغالدى لا يضاع حجر
وتصبحي ايا نقا في سفري يهجرون بهجير الفجر
ثمت تسري ليلهم فتسري تطوي اثار الفجاج الغبر
طي اخي التجر برود التجر

আযহারী বলেন—এখানে 'য়্যাহজিরূনা বিহিজীরিল ফজর' বলতে 'য়্যাবাকিরূনা' অর্থ নেয়া হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, মদীনাবাসী যে সকালের দিকে মসজিদে আসতেন না, তা ইমাম মালিকের যুগে তাঁদের কার্যে শৈথিল্যের জন্যেও হতে পারে। তাইএটা দলীল হতে পারে না। যাঁরা মদীনাবাসির সর্বসম্মত মতকে দলীল বলে স্বীকার করেন, তাদের কাছেও এটা এ জন্যে দলীল হবেনা যে, এটা প্রয়োজনে বর্জন করা চলে বিধায় হয়ত তারা তা করতেন। অনেক সময় এমন হয় যে, সকাল সকাল জুমআর জন্যে গিয়ে বসে থাকার চাইতে কোন ধর্মীয় কিংবা সাংসারিক কাজ উত্তম ও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

এ ব্যাপারে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই যে, এক নামায পড়ে অন্য নামাযের অপেক্ষায় জায়-নামাযে বসে থাকা ঘরে ফিরে যাবার চাইতে উত্তম কাজ। যেমন নবী (সঃ) বলেন : "যে ব্যক্তি নামাযের জন্যে অপেক্ষায় বসে থেকে ইমাম এলে তাঁর সাথে নামায আদায় করে, সে ব্যক্তি নামায পড়ে যে ঘরে চলে যায় তার চেয়ে উত্তম। যতক্ষণ সে নামাযের স্থানে বসে থাকে, ফেরেতশতারা তার জন্যে রহমত কামনা করতে থাকে। তিনি আরও বলেন—নামায পড়ে অন্য নামাযের জন্যে বসে থাকা এমন এক কাজ, যা থেকে আল্লাহ তা'আলা পাপ মোচন করেন ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। একেই বলে 'রিবাত' (ইবাদতে লেগে থাকা)। আরও বলেন—আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার কাছে এরূপ বান্দা নিয়ে গৌরব প্রকাশ করেন যারা এক ফরয আদায় করে আরেক ফরয আদায়ের জন্যে অপেক্ষায় বসে থাকে। এটা প্রমাণ করে যে, ফরয নামায পড়ে যদি কেউ জুম-আর জন্যে অপেক্ষায় বসে থাকে, সে ব্যক্তি যে চলে যায় ও জুমআর ওয়াক্তে আসে তার থেকে উত্তম। সুতরাং মদীনাবাসী এরূপ করতেন না বলে তার অর্থ এটা হয়না যে, তা করা মাকরূহ। ঠিক এরূপ মাসআলাই হল জুমআর জন্যে সকালে তাড়াতাড়ি যাওয়া। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

পঁচিশ : জুমআর পঁচিশতম বৈশিষ্ট্য হল, এদিনে দান খয়রাত করা অন্যান্য দিনের চাইতে বেশী ছওয়াবের কাজ। অন্য সব মাসের চেয়ে রমযানের সদকায় যেরূপ পুণ্য বেশী, সব দিন থেকে এদিনের সদকায়ও তেমনি পুণ্য বেশী।

আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াকে দেখেছি, জুমআর জন্যে তিনি ঘর থেকে খাদ্য দ্রব্য নিয়ে এসে হাজির হতেন। রাস্তায় গোপনে তা দান করতেন। তিনি বলতেন, আল্লাহ তা'আলা রসূলকে (সঃ) যখন মুনাজাতের আগে সদকা দিতে বলেছেন, তখন মুনাজাতের আগে সদকা দেয়া উত্তম কাজ বটে। আহমদ ইবনে যুহায়ের ইবনে হারব তাঁর পিতা থেকে, তিনি জারীর থেকে, তিনি মানসূর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে ও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে শুনেছেন : আবূ হুরায়রা (রাঃ) ও কা'ব (রাঃ) একত্র হলে আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, জুমআর দিনে নিশ্চয়ই এমন একটি মুহূর্ত আসে, যখন কোন মুসলমান যা কিছু প্রার্থনা করে আল্লাহ তা'আলা তাই দেন। কা'ব (রাঃ) তা শুনে বললেন : আমি তোমাকে জুমআ

সম্পর্কে কিছু বলছি। যখন জুমআর দিন আসে, বণী আদম ও শয়তান ছাড়া আকাশ, পৃথিবী জল, স্থল, পাহাড় ও গাছ পালা ভয়ে কাঁপতে থাকে। ফেরেশতারা মসজিদের দরজাগুলো ঘিরে দাঁড়ান। যে আগে আসে, তারপর যে আসে, তারপর যে আসে এ সব লোকের নাম লিখেন। এমনকি যখন ইমাম বেরিয়ে আসেন, তখন তাঁরা লিখা বন্ধ করেন। ইমামের পরে যারা আসে খোদার কাছে তারা কিছুই পায় না। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের সেদিন ফরয গোসলের মতই গোসল করা উচিত। অন্যান্য দিনের সদকার তুলনায় এদিনের সদকা উত্তম। জুমআর দিনটির মত উত্তম সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত আর কোনদিন ঘটেনা।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই হল তাঁদের দু'জনের কথোপকথন। আমি বলছি, যদি মুসল্লির কাছে সুগন্ধি দ্রব্য থাকে, সে যেন সেদিন তা ব্যবহার করে নেয়।

ছাব্বিশ ঃ জুমআর ছাব্বিশতম বৈশিষ্ট্য হল, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় ঈমানদারদের নিজ নূরের দ্যুতি দেখাবেন। ইমামের যে বেশী কাছে ছিল, আল্লাহ তা'আলারও তখন সে বেশী কাছে থাকার সৌভাগ্য লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি জুমআর জন্যে সব চেয়ে তাড়াতাড়ি যেত, সে সবার আগে খোদাকে দেখবে।

ইয়াহিয়া ইবনে ইয়ামান শরীক (রঃ) থেকে, তিনি আবু য়্যাকজান (রঃ) থেকে, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে খোদার বাণী 'ওয়া লাদায়না মাযীদ' সম্পর্কে এ বর্ণনা শুনান ঃ আল্লাহ তা'আলা প্রতি জুমআয় নিজ নূর প্রদর্শন করবেন।

'মু'জিমে তিবরানী' গ্রন্থে আবু নঈম মাসউদী বলেন তিনি মিনহাল ইবনে আমর থেকেও তিনি আবু উবায়দা থেকে এরূপ বর্ণনা শুনেছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বলেছেন, জুমআর জন্যে জলদী যাও। কারণ, আল্লাহ তা'আলা প্রতি জুমআয় কর্পূরের এক টিলার ওপরে নিজ নূরের জ্যোতি প্রকাশ করেন।" সেদিন আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যলাভের পরিমাপ জুমআর নামায অনুসারে হবে। সেদিন মানুষকে তিনি অপূর্ব মর্যাদা দান করবেন। সেখান থেকে তারা নিজ নিজ পরিবারবর্গের কাছে ফিরে আসবে ও খোদা তাদের যা কিছু বলেছেন, তা বর্ণনা করবে।

তিনি আরও বলেন, এ কথা বলে আব্দুল্লাহ (রাঃ) মসজিদে চলে গেলেন। সেখানে আরও দু'জন লোক ছিল। তা দেখে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বললেন, আমি তৃতীয় হলাম। যদি খোদা চান তো তৃতীয় হয়েও বরকত পেতে পারি।

বায়হাকী তাঁর 'শো'ব' গ্রন্থে আলকামা ইবনে কায়েস থেকে এক বর্ণনা নিয়েছেন। তাতে তিনি বলেন ঃ আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের সাথে জুমআর জন্যে চললাম। তিনি সেখানে তিন-জনকে তাঁর আগে এসে বসে আছে দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন ঃ চারের জন্যে চতুর্থ স্থান। তাও খুব দূর নয়। তারপর বললেন—আমি রসূলকে (সঃ) বলতে শুনেছি, মানুষ

কিয়ামতের পরে খোদার ততটুকু কাছে বা দূরে থাকবে, যতটুকু দ্রুত বা ধীরে তারা জুমআর জন্যে গিয়েছিল। প্রথমের প্রথম, দ্বিতীয়ের দ্বিতীয়, তারপর তৃতীয়, তারপর চতুর্থ ও চতুর্থ স্থান লাভকারীর দূরত্বও কিছু নয়।

দারে কুতনী (রঃ) বলেন—আমাকে আহমদ ইবনে সুলায়মান ইবনে হাসান, তাঁকে মুহাম্মদ ইবনে উছমান ইবনে মুহাম্মদ, তাঁকে মারোয়ান ইবনে জা'ফর, তাঁকে নাফে' আবুল হাসান, তাঁকে আতা ইবনে আবু মায়মুন ও তাঁকে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এ বর্ণনা শুনান : রসূল (সঃ) বলেছেন, যখন কিয়ামত হয়ে যাবে, ইমানদাররা নিজ প্রতিপালকের দর্শন লাভ করবে। সেক্ষেত্রে জুমআর জন্যে যে ব্যক্তি সবার আগে গিয়েছিল সে সবার আগে দেখতে পাবে। নারীরা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন দেখতে পাবে।

আমাকে মুহাম্মদ ইবনে নূহ, তাঁকে মুহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে সুফিয়ান সুকরী, তাঁকে আব্দুল্লাহ ইবনে জুহম রাযী, তাকে আমর ইবনে কায়েস, তাঁকে আবু তাইয়েবা, তাঁকে আসিম, তাঁকে উছমান ইবনে উমায়ের আবুল য়্যাকজান ও তাঁকে আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) রসূল (সঃ) থেকে এ বর্ণনা শুনান : 'আমার কাছে জিব্রাঈল এল। তাঁর হাতে যেন একখানা আয়না ছিল। তাতে কালো একটা দাগ ছিল। আমি প্রশ্ন করলাম, হে জিব্রাঈল! ওটা কি? তিনি জবাব দিলেন—এটা হচ্ছে জুমআ। আল্লাহ তা'আলা এটা আপনাকে দিলেন। যেন আপনার জন্যে ও আপনার পরে উম্মতদের জন্যে এটা ঈদের দিন হয়।

আমি প্রশ্ন করলাম : এতে আমাদের জন্যে কি রয়েছে?

তিনি জবাব দিলেন, আপনার জন্যে তাতে কল্যাণ রয়েছে। আপনি (সাপ্তাহিক পর্বের দিক থেকে) ইয়াহুদী ও নাসারাদের থেকে অগ্রগামী হলেন এ দিনটিতে আপনার জন্যে এমন একটি ঘণ্টা রয়েছে, সে সময়ে যদি কোন বান্দা কিছু প্রার্থনা করে আর তা তার ভাগ্যলিপির বিরোধী না হয়, খোদা অবশ্যই দেন। আর যদি তা তার ভাগ্যলিপিতে না থাকে, তা হলে তার চাইতেও উত্তম বস্তু দান করেন। ভাগ্যলিপিতে তার জন্যে ক্ষতিকর কিছু থাকলে, সেই ক্ষতি থেকে তাকে নিরাপত্তা দান করা হয়। অথবা তার চাইতেও কোন বড় বিপদ থাকলে তা দূর করা হয়।

আমি প্রশ্ন করলাম : এ কালো দাগটি কিসের?

তিনি জবাব দিলেন—এ হচ্ছে কিয়ামত। জুমআর দিনে এটি ঘটবে। আমাদের কাছে এ দিনটি সকল দিনের সর্দার। আখিরাতে মানুষ এটিকে ইয়াওমে মযীদ বলবে। তিনি আরও বলেন—ইয়াওমে মযীদ এ ভাবে হয়, আপনার প্রতিপালক বেহেশতে একটি প্রান্তর মনোনীত করেছেন। তাতে সাদা মিশকের ঘ্রাণ ছড়িয়ে রেখেছেন। শুক্রবার এলে তিনি কুরসির ওপরে নেমে আসেন। কুরসির চারপাশে নূরের মিম্বর পেতে রাখা হয়। নবীরা (আঃ) হাজির হয়ে তাতে আসন নেন। তার পরের শ্রেণীতে সোনার আসন পাতা রয়েছে। তাতে শহীদ ও

সিদ্দীকরা এসে বসেন। তারপর বালাখানার লোকেরা এসে টিলার ওপরে আসন নেয়। এরপরে তাদের প্রতিপালক তাদের সামনে নিজ জ্যোতির প্রকাশ ঘটান। তখন তাঁরা তা দর্শন করেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা বলেন: আমি তোমাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করেছি। তোমাদের আমি পূর্ণ নিয়ামত দান করেছি। এটি আমার মর্যাদা প্রকাশের স্থান। তোমাদের যার যা প্রার্থনা আছে কর। তখন তাঁরা তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবে। তিনি বলবেন, আমি সন্তুষ্ট ছিলাম বলেই আমার ঘরে তোমাদের ঠাঁই দিলাম ও এতখানি মর্যাদা দান করলাম। সুতরাং এখন তোমরা আমার থেকে আরো (বেশী কিছু) প্রার্থনা কর। আবারও তাঁরা তাঁর সন্তুষ্টি প্রার্থনা করবেন। তখন আল্লাহ তা'আলা নিজ সন্তুষ্টির সাক্ষ্য দান করবেন। তার পর তাঁরা যার যার ইচ্ছা মাফিক প্রার্থনা জানাবে। এমনকি তাদের সব ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। এ জুমআর দিনে তাঁদের এমন সব নিয়ামত তিনি দান করবেন যা কেউ কখনো দেখেনি, শুনেওনি। এমনকি তা কেউ কল্পনাও করে নি।

তিনি বলে চললেন—তারপর আল্লাহ তা'আলা উঠে যাবেন। তাঁর সংগে সংগে নবী, শহীদ ও সিদ্দীকরাও চলে যাবেন। বালাখানার বাসিন্দারাও নিজ নিজ বালাখানায় চলে যাবেন। প্রতিটি বালাখানা মহামূল্যবান-মতি দিয়ে তৈরী, কোনরূপ জীর্ণতা বা ভগ্নতা নেই। লাল ইয়াকুতের তৈরীও রয়েছে। সবুজ যবরযদ পাথরের দরজা ও ছাদ রয়েছে তাতে। তার সাথে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত রয়েছে। ফল-মূল তাতে জুড়ে আছে। সেই বালাখানা বিবি, বাঁদী ও ভৃত্যে ভরপুর। তাই তাঁরা জুমআর দিনের চাইতে বেশী আর কোন বস্তুর আকাংখী হতেন না, যেন সেদিনে খোদার দীদার ও অভিনব নিয়ামত লাভ করে ধন্য হতে পারেন। এই হচ্ছে ইয়াওমুল মযীদ।

এ হাদীছটি কয়েক ধারায় এসেছে। আবু হাসানের দারে কুতনীতে 'কিতাবুর রুইয়া' এর ভেতরে সেগুলো উধৃত হয়েছে।

সাতাশ: জুমআর সাতাশতম বৈশিষ্ট্যটি দারে কুতনী 'ইয়াওমুল জুমআ' অধ্যায়ে শাহিদ(সাক্ষী) সম্পর্কিত তাফসীর প্রসংগে বর্ণনা করেছেন। হামীদ ইবনে যাঞ্জুবিয়া বলেন—আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে মূসা, তাঁকে মূসা ইবনে উবায়দা, তাঁকে আইয়ুব ইবনে খালিদ, তাঁকে আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে' ও তাঁকে আবু হুরায়রা (রাঃ) হযরত (সঃ) থেকে এ বর্ণনাটি শুনান: 'ইয়াওমে মাওউদ' কিয়ামতের দিনকে বলা হয় এবং 'ইয়াওমে মাশহুদ' আরাফাতের দিনকে বলা হয় এবং 'আশ-শাহিদ' হল জুমআর দিন। এ দিন থেকে উত্তম কোন দিনেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ঘটেনি। এ দিনে এমন একটি ঘন্টা রয়েছে যখন কোন বান্দা খোদার কাছে ভাল কিছু প্রার্থনা জানালে তা অবশ্যই পূর্ণ হয় কিংবা খারাপ কিছু থেকে পরিত্রাণ চাইলেও তা দেয়া হয়।

হারিস ইবনে আবু মুসলিমা তাঁর মুসনাদে রাওহ থেকে (তিনি মূসা থেকে) এরূপ বর্ণনা উধৃত করেছেন। তা ছাড়া মূসা ইবনে উবায়দা থেকে কয়েকভাবে এ বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে।

'মুজিমে তিবরাণী' কিতাবে গ্রন্থকার ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি যুহযাম ইবনে যিরআ থেকে, তিনি শরীহ ইবনে উবায়েদ থেকে, তিনি আবু মালিক আশআরী (রাঃ) থেকে ও তিনি রসূল (সঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা শুনেছেন ঃ

"ইয়াওমে মাওউদ" হল কিয়ামতের দিন। জুমআর দিন হল শাহিদ ও আরাফার দিন হল মাশহুদ। আল্লাহ তা'আলা আমাদের জমা করার জন্যে জুমআর দিনকে নির্দিষ্ট করেছেন। 'সালাতুল ওস্তা' হল আসরের নামায।

জাবীর ইবনে মুঈন থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। আমার মতে, প্রকাশ্য অর্থ এটাই। আসল মর্ম খোদাই ভাল জানেন। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এ হাদীছের এরূপ ব্যাখ্যাই দান করেছেন। ইমাম আহমদ বলেন—আমাকে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর, তাঁকে শু'বা, তাকে ইউনুস, তাঁকে আম্মার আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা শুনিয়েছেন যে, তিনি 'ওয়া শাহিদিউ' ওয়া মাশহুদ' আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেছেন, জুমআর দিন হল শাহিদ ও আরাফার দিন হল মাশহুদ। আর ইয়াওমুল মাওউদ হল কিয়ামতের দিন।

আটাশ : জুমআর আটাশতম বৈশিষ্ট হল, এ দিনটিকে আল্লাহ তা'আলা উম্মতের (সপ্তাহে এক বার) সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্যে নির্দিষ্ট করেছেন। এর আগেকার উম্মতদের এ দিনটিকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সহীহ হাদীছে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হযরত (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ জুমআ থেকে উত্তম এমন কোন দিন নেই যাতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ঘটে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে এ দিনটি চিনিয়েছেন এবং অন্য উম্মতরা এটি হারিয়েছে। এভাবে তারা আমাদের পরে চলে গেছে। কারণ, আমাদের জন্যে শুক্রবার, ইয়াহুদীদের জন্যে শনিবার ও খৃষ্টানদের জন্যে রবিবার।

অন্য এক রিওয়ায়েতে আছে, হযরত (সঃ) বলেছেন, জুমআর দিনটিতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের একত্র করে দেন।

ইমাম আহমদ বলেন—আমাকে আলী ইবনে আসিম, তাঁকে হিসীন ইবনে আব্দুর রহমান, তাঁকে আমর ইবনে কায়েস, তাঁকে মুহাম্মদ ইবনে আশআছ ও তাঁকে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরত (সঃ) আমার কাছে বসা ছিলেন। তখন এক ইয়াহুদী তাঁর কাছে আসার জন্যে অনুমতি চাইল। তিনি অনুমতি দিলে সে এসে বলল ঃ আসসামু আলাইকুম (তোমাদের ওপরে ধ্বংস নেমে আসুক)। নবী (সঃ) জবাব দিলেন ঃ ওয়াআলাইকা (তোমার ওপরেও)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন—আমি তখন কিছু বলতে চেয়েছিলাম। এমন সময় অন্য এক ইয়াহুদী ঢুকে আগের মতই বলল। হযরত (সঃ)ও আগের মতই জবাব দিলেন। আমি আবার কিছু বলতে উদ্যত হলাম। অমনি তৃতীয় ইয়াহুদী ঢুকে পূর্বানুরূপই বলল। আমি তখন

বললাম ঃ বরং তোমাদের ওপরে মরণ আসুক ও খোদার গযব নাযিল হোক। তোমরা বাঁদর ও শূকরের সমগোত্রীয়। তোমরা রসূলুল্লাহ্‌কে (সঃ) সে ভাবে সালাম করছ, যেভাবে খোদাও তাঁকে করেননি।

হযরত (সঃ) আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ থাম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা খারাপ বকাবকি পসন্দ করেন না। তারা এক কথা আমাকে বলেছে এবং আমি আবার সে কথা তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছি। তাই তাদের কথা আমার কোনই ক্ষতি করেনি। অথচ তাদের ওপরে তার জের কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। তারা কয়েকটি কারণে অন্যের চাইতে আমাকে বেশী হিংসা করে। যেমন, জুমআর ব্যাপারে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে ও আল্লাহ তা'আলা আমাদের পথ দেখিয়েছেন। কিবলার ক্ষেত্রেও তারা বিভ্রান্ত হয়েছে এবং আমাদের খোদা পথের নির্দেশ দিয়েছেন। আর ইমামের পেছনে আমরা 'আমীন' বলি বলেও তারা হিংসা করে।

সহীহ্‌দ্বয়ে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আমরা শেষ দল হয়েও কিয়ামতে অগ্রগামী দল হব। শুধু অন্যদলকে আমাদের আগে আমল নামা দেয়া হবে। আর আমাদের দেয়া হবে তা পরে। আমাদের এ দিনটি আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্যেও ফরয করেছিলেন। তারা তা ভুলে গেল। আমাদের খোদা তার সন্ধান দিলেন। তাই অন্যান্য দল আমাদের অনুগত হল। ইয়াহুদীরা পেল আমাদের পরের দিন ও খৃষ্টানরা তার পরের দিন।

এ হাদীছে ব্যবহৃত بيد শব্দটির ভাষাগত দু'টি রূপ রয়েছে। بيد স্থলে ميد এর ব্যবহারও দেখা যায়। আবু উবায়দার বর্ণনায় তা রয়েছে। এ শব্দটির দু'টি অর্থ। একটি غير ও অন্যটি على ان আবু উবায়দা এর সমর্থনে এ চরণটি উধৃত করেন ঃ

عمدا فعلت ذاك بيد انى   اخال لو هلكت لن ترنى

উনত্রিশ ঃ জুমআর উনত্রিশতম বৈশিষ্ট্য হল, এ দিনে আসমান যমীন, পাহাড়-সাগর, এক কথায় জিন্ন ও ইনসানের শয়তানেরা ছাড়া সকল সৃষ্টিই ভয়ে কাঁপে। আবুল জাওয়াব আম্মার ইবনে যরীক থেকে, তিনি মানসূর থেকে, তিনি মুজাহিদ থেকে ও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হযরত কা'ব ও হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) জুমআ সম্পর্কিত কথোপকথনটি বর্ণনা করেন। তাতে আবু হুরায়রাকে (রাঃ) কা'ব (রাঃ)বলেন—'জুমআর দিনে আসমান-যমীন, পাহাড়-সাগর এমনকি বণী আদম ও শয়তান ছাড়া সকল সৃষ্টি জগতই ভয়ে কাঁপে।'

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে আছে, নবী (সঃ) বলেছেন, জুমআর দিনের চাইতে কোন উত্তম দিনেই সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ঘটবে না। আর এমন কোন জীব নেই যা জুমআর দিনে ভয়ে কাঁপে না। শুধু জিন্ন ও মানুষই কাঁপে না। এ হাদীছটি সহীহ। আর কাঁপার কারণ এই, এ দিনেই কিয়ামত ঘটবে। নিখিল সৃষ্টি একাকার হবে। পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হবে। মানুষ জান্নাত বা জাহান্নামে যার যার স্থায়ী নিবাসে যাবে।

ত্রিশ ঃ জুমআর ত্রিশতম বৈশিষ্ট হল, এই সপ্তাহের সব দিনের ভেতরে এটিকেই খোদা মনোনীত করেছেন। যেমন, মাসের ভেতরে তিনি রমযানকে, রাতের ভেতরে কদরের রাতকে স্থানের ভেতরে মক্কা শরীফকে ও সৃষ্টির ভেতরে হযরত মুহাম্মদকে (সঃ) মনোনীত করেছেন।

আদম ইবনে আবু আইয়াস বলেন—আমাকে শায়বা আবু মুআবিয়া, তাঁকে আসিম, তাঁকে আবুন নজুদ, তাঁকে আবু সালেহ, তাঁকে কা'বুল আহবার এ বর্ণনা শুনান ঃ আল্লাহ তা'আলা মাসের ভেতরে রমযানকে, দিনের ভেতরে জুমআকে, রাতের ভেতরে কদর রাতকে, ঘন্টার ভেতরে নামাযের ঘন্টাকে বেছে মনোনীত করেছেন। আর জুমআর নামায দু'জুমআর মধ্যবর্তী পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ। পরন্তু তিন গুণ বেশী ছাওয়াব দেয়। এক রমযানের রোযা পরবর্তী রমযান পর্যন্ত পাপের কাফ্ফরা এবং এক হজ্জ্ব পরবর্তী হজ্জ্ব পর্যন্ত পাপের কাফ্ফারা হয়ে থাকে। এক উমরা পরবর্তী উমরা পর্যন্ত কৃত পাপের কাফ্ফারা হয়। মু'মিন দু'টি পুণ্যের মাঝখানে মারা যায় অর্থাৎ যে অবস্থায় সে একটি লাভ করে ও অন্যটির অপেক্ষায় থাকে। সে পুণ্যটি হল নামায। রমযানে শয়তানকে বন্দী করা হয়। দোযখের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। জান্নাতের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। তারপর আওয়াজ আসে ঃ

"হে কল্যান প্রত্যাশীবৃন্দ! রমযান এসে গেছে, কিছু কামাই করে জমিয়ে নাও।" বিশেষত শেষ দশ রাতের মত প্রিয় রাত আল্লাহর কাছে আর কোন রাতই নয়। তাতেই বেশী অমাল করা চাই।

একত্রিশ ঃ জুমআর একত্রিশতম বৈশিষ্ট্য হল এই, সেদিন আত্মাগুলো নিজ নিজ কবরের কাছে আসে এবং তাদের ছাওয়াব অর্জিত হয়। তারা তাদের যিয়ারতকারী ও সালাম প্রদান-কারীদের চিনতে পায়। অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিন তারা আপনজনের বেশী সান্নিধ্য পায়। তাই এ দিনটি হয়েছে জীবিত ও মৃতের পারস্পরিক মিলন দিবস। তেমনি এ দিনের সংঘটিত কিয়ামতের সময়ে পূর্বকালের ও পরবর্তীকালের মানুষ, পৃথিবী ও আকা-শের বাসিন্দা, প্রভু ও ভৃত্য, জালিম ও মজলুম, সূর্য ও চন্দ্র সবাই একত্রিত হবে। অথচ তার আগে কখনও তারা একাকার হবে না। এটা যেন মিলনেরই দিন, একাকার হওয়ারই দিন। এ কারণেই অন্যান্য দিনের চাইতে এ দিনে মানুষের পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাত বেশী হয়ে থাকে। এ দিনটি যে 'ইয়াওমুত তালাক' বা মুলাকাত দিবস।

আবু তিয়াহ লাহিক বিন হামীদ বলেন ঃ মাতরাফ বিন আবদুল্লাহ বদরে অবস্থান করছিলেন। তিনি প্রতি জুমআয় আসতেন। কোন এক জুমআর দিনে তিনি যখন কবর-স্তানের কাছে ছিলেন, তখন বলতে লাগলেন—আমি প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে তার কবরের ওপরে বসা দেখেছি। তারা বলছিল, এ তো সেই মাতরাফ যে প্রতি জুমআয় আসে।

মাতরাফ বলেন—আমি তখন তাদের প্রশ্ন করলাম, তোমরাও জুমআর দিন বুঝতে পাও ?

Contents

তারা জবাব দিল—হাঁ, পাই। সেদিন পাখ পাখালী কি বলে তাও আমরা বুঝতে পাই।

আমি প্রশ্ন করলাম—পাখ-পাখালী কি বলে ?

তারা জবাব দিল—পাখীরা কুজন করে বলতে থাকে, প্রভু হে, শান্তি হোক, শান্তি হোক, আজ বড় ভাল দিন।

ইবনে আবু দুনিয়া তাঁর 'কিতাবুল মানামাত' এ আসিম হাজদারী থেকে বর্ণনা করেন : আমি আসিম হাজদারীর মৃত্যুর দু'বছর পর তাকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি দুনিয়া থেকে চলে যান নি ? তিনি জবাব দিলেন—হাঁ, দুনিয়ায় তো এখন আমি নেই। আমি প্রশ্ন করলাম—তা হলে আপনি এখন কোথায় আছেন ? তিনি জবাব দিলেন—খোদার কসম ! জান্নাতের এক বাগিচায় আছি, আমি ও আমার বন্ধুবর্গ প্রতি জুমআয় একত্রিত হই। সকলে আমরা আবু বকর ইবনে আব্দুল্লাহ মুযনীর কাছে যাই। সেখানে তোমাদের খবরাখবর পাই।

আমি প্রশ্ন করলাম—এখন আপনারা কি সশরীরী, না আত্মা রূপে আছেন ?

তিনি বললেন—হায় হায়, শরীর তো প'চে গলে শেষ, এখন আমরা আত্মারা মিলিত হই।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম—আমরা গোরস্তানে এলে আপনারা জানতে পান ?

তিনি জবাব দিলেন—আমরা জুমআর রাত ও সারাটা দিন, এমন কি শনিবারের সূর্যোদয় পর্যন্ত তা জানতে পাই।

আমি প্রশ্ন করলাম—অন্যান্য দিন পাচ্ছেন না, অথচ সেদিন কি করে জানতে পান ?

তিনি জবাব দিলেন—জুমআর দিনের ফযীলত ও বরকতের বদৌলতে।

তা ছাড়া ইবনে আবু দুনিয়া মুহাম্মদ বিন ওয়াসি' থেকে বর্ণনা করেন—তিনি প্রতি শনিবার সকালে জিবানা পর্যন্ত পেঁাছে যেতেন এবং সেখানকার কবরস্তানে দাঁড়িয়ে সালাম করতেন ও দোআ করতেন। তারপর চলে আসতেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, এ কাজটি আপনি কেন মংগলবারে করেন না ? তিনি জবাব দিলেন—আমি জানতে পেয়েছি, জুমআর একদিন আগে ও একদিন পরে পর্যন্ত কবরের বাসিন্দারা যিয়ারত কারীদের সম্পর্কে জানতে পায়।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রঃ) বলেন—আমি যিহাক (রঃ) থেকে জানতে পেয়েছি, তিনি বলেছেন—যে ব্যক্তি শনিবার সকালে সূর্যোদয়ের আগে কবর যিয়ারত করে তার আসা সম্পর্কেও কবরবাসী জানতে পায়। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল—তা কি করে ? তিনি জবাব দিলেন—জুমআর মর্তবার বদৌলতে।

বত্রিশ : জুমআর বত্রিশতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শুধুমাত্র জুমআর দিন রোযা রাখা মাকরূহ। এ মতটি ইমাম আহমদের (রঃ)। আছরাম বলেন—আবু আব্দুল্লাহর কাছে জুমআর দিন

রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—শুধু জুমআর দিন রোযা রাখা মাকরূহ। তবে হাঁ, যদি ক্রমাগত রোযা রাখার মাঝে জুমআর দিন এসে যায় তো ক্ষতি নেই। আমি আবার প্রশ্ন করলাম—যদি কেউ একদিন অন্তর অন্তর রোযা রাখে এবং বৃহস্পতিবার ভেংগে শুক্রবার রেখে আবার শনিবার ভাংগে, তখন কি হবে? তিনি বললেন—সেটা জায়েয। আসল কথা হচ্ছে, যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে শুধু জুমআর দিন রোযা রাখে তা হলে মাকরূহ হবে।

ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আবু হানীফা (রঃ) অন্যান্য দিনের মতই জুমআর দিন রোযা রাখাকে মুবাহ বা বৈধ বলেন। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন—কোন আলিম ও ফকীহ জুমআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন বলে আমি জানিনা। মূলত সেদিন রোযা রাখা উত্তম। আমি কোন কোন আলিমকে দেখেছি, তাঁরা নিয়মিত শুক্রবারে রোযা রাখেন। এমনকি সেদিন রোযা রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন।

ইবনে আব্দুল্লাহ্ বলেন—শুক্রবারের রোযা সম্পর্কে রসূল (সঃ) থেকে বিভিন্নরূপ বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন ঃ রসূল (সঃ) প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন। আমি তাঁকে শুক্রবারে রোযা ছাড়া খুব কমই দেখেছি। হাদীছটি সহীহ। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) কে আমি কখনও কোন শুক্রবারে রোযা ছাড়া দেখিনি। হাদীছটি তাঁর কাছে যথাক্রমে উমায়ের ইবনে আবু উমায়ের, লায়েছ ইবনে আবু সালীম, হিফস ইবনে গিয়াস ও ইবনে আবি শায়বাহ বর্ণনা করেছেন।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—রসূল (সঃ) শুক্রবার রোযা রাখতেন এবং নিয়মিতই রাখতেন।

এখানে ইমাম মালিক (রঃ) যা বলেছেন, তার সমর্থনে তিনি সাফোয়ান বিন সালীম থেকে, তিনি বণু খায়ছামের এক ব্যক্তি থেকে ও তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন রোযা রাখল, তার জন্য আখিরাতের দশটি উজ্জ্বল দিনের সমান ছওয়াব লেখা হল। মানে, দুনিয়ার দিনের সাথে সে দিনের কোন তুলনাই হয় না। তাই এটা ঠিক যে, জুমআর দিনের রোযা নিঃসন্দেহে ভাল। কিন্তু তার বিপক্ষে এখন একটাই শক্ত দলীল রযেছে যা উড়িয়ে দেয়া যায়না। আমি বলি, দলীলটি বিশুদ্ধ এবং কেউ সেটার কোন ত্রুটির কথা বলেন নি। সহীহদ্বয়ে মুহাম্মদ ইবনে ইবাদ বলেন—আমি জাবির (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূল (সঃ) কি জুমআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি জবাবে বললেন—হাঁ, নিষেধ করেছেন।

সহীহ মুসলিমে মুহাম্মদ ইবনে ইবাদ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন যে, আমি কা'বা ঘর তাওয়াফ করার সময় জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূল (সঃ)

Contents

কি জুমআর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি জবাব দিলেনঃ হাঁ, এ ঘরের প্রতিপালকের কসম! তিনি নিষেধ করেছেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—রসূলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ শুধু জুমআর দিন রোযা রেখ না। হাঁ, যদি তার আগে-পরে রেখে থাক, তা হলে অন্য কথা। (মানে, তখন মাঝখানে রাখতে কোন দোষ নেই।) এটা বুখারী শরীফের ভাষ্য।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—রাতের ভেতরে জুমআর রাতকে ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করোনা। হাঁ, যদি তোমরা ক্রমাগত রোযা রেখে থাক এবং মাঝখানে এ রাত আসে তা হলে ঠিক আছে।

বুখারী শরীফে হযরত জুয়ায়রিয়া বিনতে হারিছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ নবী করীম (সঃ) জুমআর দিন তাঁর কাছে এলেন। তিনি রোযা রেখেছিলেন। রসূল (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি আগের দিন রোযা রেখেছিলে? তিনি জবাব দিলেন, জ্বী-না। রসূল (সঃ) প্রশ্ন করলেন—আগামী দিন কি তুমি রোযা থাকবে? তিনি জবাব দিলেন জ্বী-না। তখন রসূল (সঃ) বললেন—তা হলে রোযা ভেংগে ফেল।

মুসনাদে আহমদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—নবী করীম (সঃ) বলেছেন, শুধু জুমআর দিন রোযা রেখনা।

মুসনাদে হযরত জুনাদাহ ইযদী বলেন, আমি সাতজন ইযদীসহ জুমআর দিন নবী করীম (সঃ) এর খিদমতে হাযির হলাম। আমার দলে কিছু নারীও ছিল। তিনি সকালের খানা খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন—এস, খানা খেয়ে নাও।

আমরা বললাম—হে খোদার রসূল আমরা রোযাদার। তিনি প্রশ্ন করলেন—তোমরা কি গতকাল রোযা ছিলে?

আমরা বললাম—জ্বী না।

তিনি প্রশ্ন করলেন—আগামী দিন কি রোযা থাকবে?

আমরা জবাব দিলাম—জ্বী-না।

তিনি তখন বললেন—তা হলে রোযা ভেংগে ফেল।

তারপর আমরা রসূল (সঃ) এর সাথে খানা খেলাম। বর্ণনাকারী আরও বলেন—অতপর যখন তিনি বের হলেন, মিম্বরে বসে এক গ্লাস পানি চেয়ে নিয়ে বসে বসে পান করলেন। সবাই তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। তিনিও যেন সবাইকে এটা দেখাবার জন্যেই করছিলেন যে, জুমআর দিন তিনি রোযা রাখেন নি।

মুসনাদে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেনঃ

"রসূল (সঃ) বলেছেন, শুক্রবার হল ঈদের দিন। তাই ঈদের দিনকে কেউ রোযার দিন বানিও না। তবে তার আগে ও পরে রোযা রাখলে সেদিনও রাখতে পার।"

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে যথাক্রমে হাকীম ইবনে সাঈদ, ইমরান ইবনে জবিয়ান, সুফিয়ান ইবনে আয়নিয়া ও ইবনে আবু শায়বা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

"যদি তোমরা কেউ মাসিক রোযা রাখতে চাও, তা হলে বৃহস্পতিবার রোযা রাখ, শুক্রবারে রেখ না। কারণ, সেটা খানাপিনার দিন। তিনি আরও বলেন—তা হলে আল্লাহ তা'আলা তাকে দু'টো দিনই বরকতময় করে দেবেন। বৃহস্পতিবারে রোযার বরকত ও শুক্রবারে ঈদের বরকত তথা সাধারণ মুসলমানের সাথে মিলে খানাপিনার বরকত।

ইবরাহীম থেকে যথাক্রমে মুগীরা ও ইবনে জারীর বর্ণনা করেন যে, তিনি শুক্রবারে রোযা রাখা মাকরূহ মনে করতেন। কারণ, সে দিন খেয়ে দেয়ে ইবাদতের শক্তি অর্জন করতে হবে।

আমার মতে শুক্রবার রোযা রেখা মাকরূহ হওয়ার তিনটি কারণ রয়েছে। এক কারণ তো যা ওপরে বলা হল। তবে একদিন আগে ও পরে রোযা থেকে নিলে মাকরূহ হবার কারণ দূর হয়ে যায়। দ্বিতীয় কারণ হল, শুক্রবার মূলত ঈদের দিন। নবী করীম (সঃ) সেদিকেই ইংগিত করেছেন।

এ ক্ষেত্রে দুটো আপত্তি উঠতে পারে। এক, ঈদের দিন তো রোযা রাখা হারাম, কিন্তু শুক্রবার তো হারাম নয়। দুই, শুধু শুক্রবারে না রাখলে তা মাকরূহও হয় না।

তার জবাব এই যে, প্রথমত, বার্ষিক ঈদেই রোযা রাখা হারাম, সাপ্তাহিক ঈদে হারাম নয়। দ্বিতীয়ত, আগে পরে রোযা রেখে নিলে জুমআর ঈদে নির্দিষ্ট করে রোযা রাখা হল না। সুতরাং নির্দিষ্টকরণের ক্ষতিকর দিক দূর হয়ে গেল। ইমাম আহমদ (রঃ) মুসনাদে যা বলেছেন তার তাৎপর্য এটাই। পক্ষান্তরে সাকী ও তিরমিজী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা করেছেন, "রসূল (সঃ) কে শুক্রবারে আমি কমই রোযা ছাড়া দেখেছি" তা শুক্রবারে রোযার বৈধতা বুঝাবার জন্যে। অবশ্য বর্ণনাটি যদি বিশুদ্ধ হয়। কারণ, সহীহদ্বয়ে তা বর্ণিত হয়নি। ইমাম তিরমিজী (রঃ) হাদীছটিকে 'গরীব' আখ্যা দিয়েছেন। তাই তা সহীহ বর্ণনার কি করে অন্তরায় হতে বা তার ওপর প্রাধান্য পেতে পারে? তৃতীয় কারণ এই যে, এমন পথ বন্ধ করা যে পথে দ্বীনবহির্ভূত কোন কিছু দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সর্বদা দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থেকে নির্দিষ্ট কটা দিন দ্বীনের কাজের জন্য নির্ধারণ করা আহলে কিতাবদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তা বৈধ রাখার অর্থ দাঁড়াবে এই, অন্যান্য দিন বাদ দিয়ে শুধু সেদিন রোযা থাকার ফলে সেদিনটি একটা পর্বে পরিণত হবে। সেটা হবে দ্বীনের ভেতর নূতন এক সংযোজন যা আগে কখনো ছিল না। এ কারণেই রসূল (সঃ) রাতের ভেতর শুধু জুমআর রাতকে ইবাদতের রাত বানাতে নিষেধ করেছেন যেন এ ধারণা সৃষ্টি না হয় যে,

অন্যান্য রাত থেকে তা উত্তম। কেউ কেউ তো কদরের রাত থেকেও এটাকে উত্তম বলে বসেছেন। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেনঃ এটা আহলে কিতাবদের অনুকরণ বলে মনে হয়। তাই শরীআত প্রণেতা রসূল (সঃ) সে রাতকে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ নিষিদ্ধ করে সেরূপ পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।

জুমআ ও ঈদে রসূলের পঠিত সূরা

নবী করীম (সঃ) জুমআর দিন ফজরে সূরা 'আস সিজদা' ও 'হাল আতা আলাল ইনসান' পাঠ করতেন। কারণ, উভয় সূরায় মানুষের অতীত ও ভবিষ্যতের সব কথা বলা হয়েছে। মানব জীবনের শুরু ও শেষ, হাশর, নশর, বেহেশত, দোযখ সব কিছুই এতে বর্ণিত হয়েছে। এ নয় যে, তাতে তিলাওয়াতের সিজদা রয়েছে বলে অতিরিক্ত সিজদা লাভের কারণে তার মর্যাদা বেড়েছে। কোন কোন মূর্খ ও অর্ধশিক্ষিত লোক এ কারণে সিজদাওয়ালা অন্য কোন সূরা পড়াকেও ফযীলতের কাজ বলে ধারণা করে। এমন কি সিজদাওয়ালা সূরা না পড়লে তারা তাকে খারাপ জানে।

তেমনি রসূল (সঃ) বড় বড় জামাআতে যেমন ঈদ ইত্যাদিতে সে সব সূরা পড়তেন, যাতে তাওহীদ, ইহকাল, পরকাল, আম্বিয়ায়ে কিরাম ও তাঁদের উম্মত, নবীদের নাফরমানী ও অস্বীকৃতির কুফল এবং স্বীকৃতি ও আনুগত্যের সুফল বিবৃত হয়েছে। যেমন তিনি দুঈদে 'কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' 'ইকতারাবাতিস সাআতু ওয়ান শাক্কাল কামার' এবং কখনও 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা' ও 'হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়া' পড়তেন।

জুমআর দিন তিনি কখনো সূরা জুমআ পাঠ করতেন। কারণ, তাতে জুমআর জন্যে প্রচেষ্টা ও তার প্রতিবন্ধক দূর করার নির্দেশ রয়েছে। তাছাড়া তাতে অধিকতর আল্লাহর জিকির করার কথাও রয়েছে। আর তাতেই নিহিত রয়েছে উভলোকের সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য। কারণ, আল্লাহর জিকির ভুলে যাওয়ার মানেই উভলোকের ধ্বংস ডেকে আনা। দ্বিতীয় রাকআতে তিনি 'ইজা জাআকাল মুনাফিকুন' পড়তেন। উদ্দেশ্য হল, উম্মতকে নিফাকের মারাত্মক ব্যাধি সম্পর্কে সচেতন রাখা এবং সম্পদ ও সন্তানের মায়া যেন তাদের জুমআ থেকে গাফিল না করে সে ব্যাপারে সতর্ক করা। কারণ, তা হলে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

●

Contents

পরিচ্ছেদ

●

রাসূলের খুতবা

রসূলুল্লার (সঃ) খুৎবার বিষয়বস্তু

রসূল (সঃ) সকলকে আল্লাহর রাস্তায় খরচের জন্য উৎসাহিত করতেন। কারণ, সেটাই তাদের কল্যাণের বড় কারণ। তারপর মৃত্যুর বিভীষিকা বর্ণনা করে সতর্ক করতেন। কারণ, মানুষ দুনিয়ার মায়ায় ভুলে নিজকে দুনিয়ার স্থায়ী বাসিন্দা ভেবে বসে এবং মৃত্যুকে এড়িয়ে থাকতে চায়। তেমনি তিনি কোথা থেকে কোন প্রতিনিধিদল উপস্থিত থাকলে প্রচারমূলক আয়াত পাঠ করতেন। মনে হত যেন তাদের কুরআন তিলাওয়াত করে শুনানো হচ্ছে। সরব নামাযে তিনি দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করতেন। ফজর নামাযে তিনি একশ আয়াত পড়তেন। অবশ্য মাগরিবের নামাযে তিনি সূরা আরাফ, সূরা তূর ও সূরা কাফ পড়তেন।

এভাবে নবী করীম (সঃ) তাঁর খুতবায় মূলত আল্লাহ, রসূল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, মিরাজ, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাকার ব্যাপারে আলোচনা করতেন। বিশেষত আল্লাহ তা'আলা তাঁর বন্ধু ও অনুগতদের জন্য যে সব পুরস্কার এবং তার দুষমন ও অবাধ্যদের জন্য যে সব শাস্তি রেখেছেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করতেন।

এভাবে ঈমান, তাওহীদ, আল্লাহ ও তাঁর মহব্বতে শ্রোতাদের অন্তর ভরপুর হত। আজকাল মানুষের ইহকালের দুঃখ দুর্দশার মাতম আর মরণভীতি সৃষ্টি মূলক যেসব খুতবা চলছে, তাতে ঈমান বিল্লাহ, তাওহীদ ও মারিফাতের সেই প্রভাব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাতে না আল্লাহর গুণাবলী স্মরণে প্রাণ উদ্বেলিত হয়, না আল্লাহর দীদার লাভের জন্য কোন প্রাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। ফলে শ্রোতারা শুধুই শুনে যায়, কিছুই অর্জন করে না। তারপর সময় এলে মারা যায়। ধন-সম্পদ ভাগ বাটোয়ারা করা হয়। মাটি তার লাশটা ধ্বংশ করে দেয়। এরূপ খুতবাকে শত ধিক।

নবী করীম (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের খুতবা পড়লে অনুভব করবে যে, হিদায়েত তাওহীদ, দাওয়াত, ঈমান ও আল্লাহর ভীতি-প্রীতি তাতে কিরূপ সৃষ্টি হয়। কারণ, তাঁরা

আল্লাহর মহত্ত্ব ও গুণাবলীকে কেন্দ্র করেই খুতবা পেশ করতেন। তাতে আল্লাহর আনুগত্য, কৃতজ্ঞতা ও স্মরণকে জীবনের একমাত্র সম্বল করার জন্য নির্দেশ দেয়া হত। তাই শ্রোতারা তা শুনে আল্লাহর মহববত নিয়ে ফিরত এবং আল্লাহও তাদের মহববত করতেন।

যুগ যত পার হয়ে চলছে, নবুয়তের নূর ততই দৃষ্টি থেকে অন্তরাল হয়ে চলছে। শরী-আতের বিধি বিধানও দিন দিন আচার অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে চলছে। সে সবের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কোনই পরোয়া না করে শুধুই করার জন্য করে যাওয়া হচ্ছে। সবাই যার যার খেয়াল খুশী মত সেগুলো গড়ে নিয়ে পালন করছে, আর সেই অন্তঃসার শূন্য কাজগুলো রঙ চঙ লাগিয়ে বাইরের দিক জৌলুসময় করে নিয়েছে। এ সব প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানগুলো তারা সুন্নাত নামে চালাচ্ছে। অথচ মহান সুন্নাতের সাথে তা সম্পূর্ণই বেমানান। সবাই উদ্দেশ্য-হীন ও অর্থহীন কাজে লেগে আছে। তারা তাদের খুতবাকে সাড়ম্বর ও সালংকার করা শুরু করেছে। ফল দাঁড়াল এই, তা এখন আর মানুষের অন্তর জয় করে তাদের লক্ষ্য পথে পরিচালিত করে না। পরন্তু খুতবার প্রভাব আজ হাওয়া হয়ে গেছে।

রসূলুল্লাহ (সঃ) এর যে সব খুতবা সংরক্ষিত হয়েছে তা থেকে দেখা যায় যে, তিনি বেশীর ভাগ খুতবা কুরআন মজীদ এবং বিশেষত সূরা কাফ থেকে নিতেন। হযরত উম্মে হিশাম বিন্তে হারিছ বিন নু'মান বলেন—আমি হযরতের (সঃ) খুতবা শুনে শুনে সূরা কাফ মুখস্ত করেছি। হযরত আলী বিন যায়েদ বিন জুদআনের একটি দুর্বল বর্ণনায় রয়েছে, হযরতের সংরক্ষিত অন্যতম খুতবাটি এরূপ ঃ

"হে লোক সকল! মৃত্যু আসার আগেই তওবা করে আল্লাহর কাছে ফিরে আস। পুণ্য কাজে ক্ষিপ্রতা কর। অধিক নীরব জিকর ও প্রকাশ্য দান-সদকার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে মহববতের সম্পর্ক কায়েম কর। তার পুরস্কার তোমরা পাবে আর প্রশংসিতও হবে। তোমাদের রিযিকও মিলবে। জেনে রাখ, অবশ্যই আল্লাহ পাক তোমাদের ওপর জুমআ ফরয করেছেন। এখানে এ বছরে এ মাসে যা ফরয হল তা কিয়ামত পর্যন্ত সামর্থ ব্যক্তির জন্য ফরয থাকবে। আমার জীবদ্দশায় কিংবা আমার মৃত্যুর পর যদি কেউ তা অস্বীকার করে কিংবা সাধারণ ব্যাপার ভেবে বর্জন করে, তার জীবন আল্লাহ তা'আলা ব্যর্থ করে দিবেন। এমন কি সে যদি কোন ইনসাফগার কিংবা আলিম রাষ্ট্রনায়কও হয়। তার কাজে কখনই কোন বরকত পাবে না। সাবধান! এ নামাযের কোন কাযা নেই। খবরদার! এ নামাযের বিকল্প ওযু নেই। সাবধান! এ নামাযের কাফফারা হিসেবে কোন রোযা নেই। সাবধান! এর কাফফারায় কোন যাকাত নেই। সাবধান! এর বিনিময়ে কোন হজ্জ নেই। সাবধান!

এর বরকতেরও কোন বদলা নেই। যদি সে তওবা করে তা হলেই কেবল ক্ষমা পেতে পারে। রসূলে খোদার (সঃ) আরেকটি সংরক্ষিত খুতবা নীচে দেয়া গেল ঃ

الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدى الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا - (ابو داؤد)

“সব প্রশংসাই আল্লাহ তা'আলার জন্য। তার কাছেই মদদ চাই। তাঁর কাছেই ক্ষমা চাই। আমি নিজ প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে পথ দেখান তাকে কেউ বিপথে নিতে পারে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই। তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল ও তাঁর বান্দা। আল্লাহ তাঁকে কিয়ামতের আগে সত্য সহ সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করল সে অবশ্যই পথ পেল। আর যে ব্যক্তি তাঁদের অবাধ্য হল সে নিজেরই ক্ষতি সাধন করল। আল্লাহর সে কোনই ক্ষতি করে নি। (আবু দাউদ)

খুতবা দেয়ার সময়ে রসূলুল্লাহর (সঃ) দু চোখ লাল হয়ে যেত। আওয়াজ উঁচু হয়ে যেত। তিনি উত্তেজিত হয়ে যেতেন। মনে হত যেন তিনি কোন আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে নিজের বাহিনীকে সতর্ক করছেন।

তিনি বলতেন—তোমাদের সকাল ও সন্ধ্যা! তারপর বলতেন—আমাকে কিয়ামতের সাথে এরূপ মিলিয়ে পাঠানো হয়েছে যে, কিয়ামত ও আমার সান্নিধ্য দু'আংগুলের মত। এই বলে তিনি শাহাদত ও তর্জনী আংগুল মিলিয়ে দেখাতেন। তারপর বলতেন ঃ

অতপর শোন, নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম বাক্য হচ্ছে আল্লাহর কালাম। সর্বোত্তম তরীকা হচ্ছে সুন্নাতে মুহাম্মদী। নিকৃষ্টতম কাজ হচ্ছে বিদআত। আর বিদআতই বিভ্রান্তি।

অতপর বলতেন ঃ

“আমি প্রত্যেক মু'মিনের তার নিজের চাইতেও বেশী কল্যাণকামী। যদি কেউ সম্পদ রেখে যায় তা তার পরিবারবর্গের জন্য। কিন্তু যদি কেউ ঋণ রেখে যায় তাহলে তা আমার জন্য। তাই তা আদায় করা আমার দায়িত্ব। (মুসলিম)

রসূল (সঃ) এর খুতবা ছিল সংক্ষিপ্ত। নামায ছিল লম্বা। আল্লাহর জিকর বেশী করতেন আর বক্তব্য হত সংক্ষিপ্ত ও তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলতেন—মানুষের দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য তার বিচক্ষণতার নিদর্শন। তিনি তাঁর খুতবায় সাহাবায়ে কিরামকে ইসলামের রীতি-

নীতি ও শরীআত শিক্ষা দিতেন। কোন কাজের নির্দেশ দেবার অথবা কোন কাজ নিষেধ করার প্রয়োজন দেখা দিলে তা তিনি খুতবার মাধ্যমেই করতেন। একবার তাঁর খুতবার সময়ে এক সাহাবী মসজিদে এলে তিনি খুতবার অবস্থায়ই বললেন—দু'রাকআত নামায পড়ে নাও।

তেমনি এক সময় গর্দান উঁচু করে একজন যখন দেখছিল, তখন তিনি তা নিষেধ করে তাকে বসে যেতে বললেন। কখনও কখনও তিনি কোন সাহাবীর প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে খুতবা বন্ধ করে প্রয়োজন সেরে নিয়ে তারপর খুতবা পূর্ণ করতেন।

অনেক সময় তিনি প্রয়োজনে মিম্বর থেকে নেমে যেতেন। তারপর এসে অসমাপ্ত খুতবা সম্পন্ন করতেন। যেমন, একবার হাসান ও হুসাইন (রাঃ) এলে তাদের কোলে নেবার জন্য মিম্বর থেকে নামলেন। তারপর তাদের কোলে রেখেই মিম্বরে গিয়ে অবশিষ্ট খুতবা সম্পন্ন করেন।

কখনও খুতবার অবস্থায় কাউকে তিনি ডেকে বলতেন—হে অমুক! বসে পড়। হে অমুক! নামায পড় ইত্যাদি।

খুতবায় তিনি সময়ের চাহিদা মোতাবেক বক্তব্য রাখতেন। কাউকে ভুকা দেখতে পেলে তিনি সদকা ও দান খয়রাতের প্রেরণামূলক বক্তব্য রাখতেন। দোআ বা খুতবায় আল্লাহর নাম এলে তিনি শাহাদত অংগুলি দ্বারা ইংগিত করতেন। বৃষ্টির অভাব দেখা দিলে খুতবায় তিনি বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা জানাতেন।

জুমআর খুতবা তিনি বিলম্বে পড়তেন। সবলোক এসে জমা হলে তখন খুতবা দিতেন। খুতবার জন্য যখন তিনি কক্ষ থেকে আসতেন, একাই আসতেন, আসতেন অনাড়ম্বর ভাবে। আগে পিছে কোন ঘোষক থাকতনা, দেহেও থাকতনা কোন বিশেষ পোষাক। মসজিদে ঢুকে নিজেই আগে সাহাবাদের সালাম দিতেন। মিম্বরে চড়ার সময়ে সবার দিকে দৃষ্টি ফেরাতেন এবং তাদের সালাম দিতেন। তারপর তিনি বসা মাত্র হযরত বিলাল (রাঃ) আজান দিতেন। হযরত বিলাল (রাঃ) যখন আজান শেষ করতেন, তখন নবী করীম (সঃ) দাঁড়াতেন। আজান ও খুতবার মাঝখানে অপেক্ষা করতেন না, অন্য কোন কাজও করতেন না। আজান শেষ হওয়া মাত্র খুতবা শুরু করতেন।

তিনি তলোয়ার কিংবা অন্যকিছু হাতে নিয়ে দাঁড়াতেন না। বরং মিম্বর তৈরীর আগে তিনি তীর ও তীরের ধনুকে ঠেস দিয়ে দাঁড়াতেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি তীরের ধনুকে ভর করে দাঁড়াতেন। জুমআর খুতবায় তিনি লাঠি ভর করে দাঁড়াতেন। তিনি তলোয়ারে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছেন এরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কোন কোন মূর্খ যে ভেবে থাকেন, তিনি সর্বদা তলোয়ারে ভর করে দাঁড়াতেন এবং তা ইংগিত দেয় যে, দ্বীন তলোয়ার দ্বারা কায়েম হয়েছে, তা নেহাৎ মূর্খতা প্রসূত ভাবনা। মিম্বর তৈরী হবার পর তিনি কখনও তীর বা তলোয়ারে ভর করে দাঁড়িয়েছেন এমন কোন রিওয়ায়েত মেলে না। এমনকি মিম্বর তৈরীর

আগেও তিনি কোন দিন তরবারিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছেন তেমন কোন প্রমাণ নেই। তখন সাধারণত তিনি তীর বা তুনে ভর করে দাঁড়াতেন।

তাঁর মিম্বরে তিনটি ধাপ ছিল। মিম্বর তৈরীর আগে তিনি একটি খেজুরের ডালে ভর করে দাঁড়াতেন। যখন তিনি মিম্বরে চলে গেলেন, তখন সেই ডালটি কান্না জুড়ে দিল। মসজিদে সমবেত সবাই তা শুনতে পেলেন। তখন নবী করীম (সঃ) মিম্বর থেকে নেমে সেটাকে বুকে লাগালেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন—খেজুর শাখাটি যখন দেখল, সে যে ওহী শুনে আসছিল তা থেকে সে বঞ্চিত হয়ে গেল, আর নবী করীম (সঃ) এর সান্নিধ্যও হারাল, তখন তার ভেতর এ কান্নার উদ্রেক হল।

মিম্বরটি মসজিদের মাঝখানে নয়, বরং পশ্চিম দিকের দেয়াল ঘেঁষে বসানো হল। মিম্বর ও দেয়ালের মাঝে একটি বকরী যাতায়াতের মত ফাঁক ছিল। তিনি যখন জুমআর খুতবা দিতেন কিংবা জুমআ ছাড়া কখনও মিম্বরে বসতেন, তখন সাহাবায়ে কিরামের দিকে মুখ করে বসতেন।

খুতবা দিতে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। কিছুক্ষণ খুতবা দেয়ার পর তিনি বসতেন। তারপর আবার দাঁড়াতেন ও দ্বিতীয়বার খুতবা দিতেন। যখন তিনি খুতবা শেষ করতেন, তখন হযরত বিলাল (রাঃ) ইকামাত দিতেন। হযরত (সঃ) মিম্বর থেকে নেমে সাহাবাদের কাছে আসতেন এবং প্রথমে তাদের চুপ থাকতে বলে, তারপর তিনি বলতেন, যদি কেউ তোমাদের (নামাযরত অবস্থায়) কাউকে চুপ থাকতে বলে, তা হলে সে বাহুল্য কথা বলল এবং তার জুমআ বরবাদ হল। এ বর্ণনাটি ইমাম আহমদের (রঃ)।

উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন—রসূল (সঃ) এক জুমআর দিন 'তাবারাকাল্লাজী' সূরা পড়লেন এবং আমাদিগকে আল্লাহর গুণাবলী স্মরণ করিয়ে দিলেন। আবু দারদা (রাঃ) কিংবা আবু বকর (রাঃ) ফিসফিসিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—এ সূরা কবে নাযিল হল ? আমি তো এটা আর কখনও শুনিনি। তখন আমি ইশারা করে চুপ থাকতে বললাম। নামায শেষ হলে তিনি বললেন—আমি তোমার কাছে জানতে চাইলাম সূরাটি কবে নাযিল হল। অথচ তুমি তা আমাকে জানালে না।

আমি বললাম—আজ তোমাদের নামাযই হয়নি। তোমরা নিছক বাহুল্য কথায় লিপ্ত হয়েছ।

তারা রসূল (সঃ) এর কাছে গেলেন এবং সব ঘটনা খুলে বললেন। আমি যা তাদের বলেছি তাও তারা তাঁকে শোনালেন। তখন রসূল (সঃ) বললেন—উবাই সঠিক কথা বলেছে।

ইবনে মাজাহ ও সাঈদ ইবনে মানসূর এ বর্ণনাটি উধৃত করেন। মূল বর্ণনাটি মুসনাদে আহমদে রয়েছে।

রসূল (সঃ) বলেছেন, জুমআয় তিন ধরনের লোক উপস্থিত হয়। এক, বাজে কথা বলার লোক। তার কথাও বাজে হবে। দুই, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার লোক। আল্লাহ তা কবুল করতে পারেন, নাও করতে পারেন। তিন, নীরবে এসে চুপচাপ বসে থাকে। কাউকে ডিংগায় না, কাউকে কোনরূপ বিরক্ত করেনা, কষ্টও দেয়না। সে নিজ ইবাদতে কায়মনে মশগুল থাকে। তার জুমআর নামায পরবর্তী জুমআর মধ্যবর্তী সকল পাপের কাফফারা হয়ে থাকে। তা ছাড়াও সে তিন দিনের অতিরিক্ত ছাওয়াব পায়। তা এ জন্য যে, আল্লাহ বলেন ঃ

من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ○

"যে ব্যক্তি একটি পুণ্য করল, তাকে দশগুণ ছওয়াব দেয়া হবে। (মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদ)

●

Contents

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

●

জুমআর সুন্নাত নামায

হযরত বিলাল (রাঃ) দ্বিতীয় আজান দেবার পর নবী করীম (সঃ) খুৎবা শুরু করতেন এবং কেউ তখন কোন নামায পড়তেন না। শুধু একবারই আজান হত। এতে জানা গেল যে, ঈদের নামাযের মতই জুমআর কোন সুন্নাত নেই। উলামায়ে কিরামের মতামতের ভেতর এটাই বেশী বিশুদ্ধ মনে হয়। সুন্নাতে নববী এ মতেরই সমর্থন জোগায়। কারণ রসূল (সঃ) ঘর থেকে এসে সোজা মিম্বরে গিয়ে বসতেন। বিলাল (রাঃ) আজান দিতেন। আজান শেষ হওয়া মাত্র রসূল (সঃ) খুতবায় দাঁড়াতেন। এ সব ঘটনা তো চোখে দেখা ঘটনা। তাই সুন্নাত পড়ার সময় পেত কোথায় ?

যাদের এ ধারণা যে, বিলাল (রাঃ) আজান শেষ করলে সবাই দু'রাকআত সুন্নাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন, তাদের তা নেহাৎ অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা। সুন্নাতে নববী সম্পর্কে তার জ্ঞানই নেই। এ কারণেই আমি বলছি, জুমআর আগে কোন সুন্নাত নেই। ইমাম মালিকের মাজহাবও তাই। ইমাম আহমদেরও মাশহুর বক্তব্য মতে এটাই মাজহাব।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) ও অন্যান্য আইম্মায়ে কিরামের অভিমত হল, জুমআয় সুন্নাত নামায রয়েছে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, যেহেতু জুমআ জুহরেরই সংক্ষিপ্ত রূপ, তাই তার ওপর জুহরের বিধান বর্তাবে। এটা খুবই দুর্বল যুক্তি। কারণ জুমআ একটি স্বতন্ত্র নামায। এর স্বাতন্ত্র্য রয়েছে সরব কিরাআতে, নামাযের রাকআতে, খুতবায়, ওয়াক্তে ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য শর্তাবলীতে।

কেউ কেউ সহীহ বুখারীর রিওয়ায়েত থেকে দলীল পেশ করেন। তিনি 'বাবুস সালাতে কাবলাল জুমআ ওয়া বা'দাহা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন, আমাকে আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ, তাঁকে মালিক, তাঁকে নাফে' ও তাঁকে ইবনে উমর (রাঃ) এ বর্ণনা শুনান যে, 'নবী করীম (সঃ) ঘরে বসে জুহরের আগে ও পরে দু'রাকআত করে, মাগরিবের পরে দু'রাকআত, ইশার আগে দু'-রাকআত এবং জুমআর পরে দু'রাকআত নামায পড়তেন।' মূলত এটা দলীল হতে পারে না। কারণ, এতে তিনি জুমআর আগে কোন সুন্নাত নামাযের উল্লেখ করেন নাই। তাঁর এ অধ্যায় দাঁড় করার উদ্দেশ্যই ছিল নবী করীম (সঃ) জুমআর আগে ও পরে কোন নামায পড়েছেন কি না ? তাতে তিনি শুধু জুমআর পরে নামাযের উল্লেখ করেছেন, আগে নয়।

জুমা'আ কি জুহরের বদল ঃ

কিছু লোক মনে করেন, জুহরের বদলেই জুমআ পড়া হয়। তবে যেহেতু জুহরের আগে ও পরে কোন নামায হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নেই, তাই জুমআয়ও সেটাই করা চাই। হাদীছে যে বলা হয়েছে, রসূল (সঃ) ঘরে গিয়ে দু'রাকআত সুন্নাত পড়তেন সেটার উদ্দেশ্য হচ্ছে জুমআর পর সুন্নাত নামাযের ওয়াক্ত নির্দেশ করা। মূলত এ ধারণাটি ভুল। কারণ ইমাম বুখারী (রঃ) 'বাবুত তাতাব্বু বা'দাল মাকতুবা' অধ্যায়ে হযরত ইবনে উমরের (রাঃ) এ বর্ণনাটি উধৃত করেছেন ঃ

ইবনে উমর (রাঃ) বলেন—আমি রসূলুল্লাহর সাথে নামায পড়েছি। তিনি জুহরের আগে ও পরে দু'রাকআত, মাগরিবের পরে দু'রাকআত, ইশার পরে দু'রাকআত এবং জুমআর পরে দু'রাকআত নামায পড়েছেন।

এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, সাহাবায়ে কিরাম জুমআর নামাযকে স্বতন্ত্র নামায মনে করতেন। তা না হলে জুমআকে জুহরের সাথে উল্লেখ করতেন, সবশেষে উল্লেখ করতেন না। দ্বিতীয় কথা, যেহেতু হাদীছে সুন্নাতের কথা বলা হয়েছে জুমআর পরে, তাই জুমআর আগে কোন সুন্নাত নামায নেই।

কেউ কেউ আবু দাউদের একটি হাদীছ দলীল হিসেবে পেশ করেন। তিনি বলেন, আমাকে মুসাদ্দাদ, তাঁকে ইসমাঈল, তাকে আইয়ুব কিংবা নাফে'এ বর্ণনা শুনিয়েছেন যে, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) জুমআর আগে লম্বা নামায পড়তেন। তারপর ঘরে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়তেন। বর্ণিত আছে যে, রসূল (সঃ)ও তাই করতেন।

অবশ্য এ হাদীছ জুমআর আগে সুন্নাত নামায প্রমাণ করে না। কারণ রসূল (সঃ)ও তাই করতেন, কথাটি জুমআর পরে ঘরে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়া সম্পর্কে বলা হয়েছে। সুন্নাত নামায মসজিদে না পড়ে ঘরে পড়াই উত্তম। সহীহ সংকলনদ্বয়ে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে রসূলুল্লাহর (সঃ) ঘরে গিয়ে দু'রাকআত জুমআর সুন্নাত পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

সুনানে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন মক্কায় ছিলেন, তখন জুমআ পড়ে ঘরে এসে তিনি দু'রাকআত সুন্নাত পড়েছেন, মসজিদে পড়েন নি। তাঁকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, রসূল (সঃ) এটাই করতেন।

এখন রইল হযরত ইবনে উমরের (রাঃ) জুমআর আগের লম্বা নামাযের প্রশ্নটি। সে নামায ছিল সাধারণ নামায। যে ব্যক্তিই জুমআর আগে হাযির হয়, তার জন্য ইমাম আসার আগ পর্যন্ত নফল নামায পড়তে থাকা উত্তম। তেমনি আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হযরত নাবীশা হাজলীর নবী করীম (সঃ) থেকে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেন ঃ

Contents

"যে ব্যক্তি জুমআর দিন গোসল করে মসজিদে হাজির হয়ে যতটুকু পারে নামায পড়ে, চুপচাপ বসে থাকে এবং ইমাম খুতবা শেষ করলে তাকে ইক্তেদা করে নামায পড়ে, তার পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত যত পাপ হবে তা মাফ হয়ে যাবে এবং তার ওপরে আরও তিনদিনের অতিরিক্ত ছাওয়াব পাবে।"

নাবীশা হাজলী বলেন ঃ যখন কোন মুসলমান জুমআর দিন গোছল করে পথে কাউকে কষ্ট না দিয়ে মসজিদে হাযির হয়ে ইমাম না আসা পর্যন্ত সাধ্যমত নামায পড়তে থাকে আর ইমাম এলে চুপচাপ বসে খুতবা শোনে এবং তেমনিভাবে ইমামের পেছনে নামায আদায় করে, তা হলে যদি সেই জুমআ তার অতীত পাপ মোচন নাও করে, তথাপি পরবর্তী জুমআ পর্যন্ত পাপের কাফফারা তাতে অবশ্যই হবে। সাহাবায়ে কিরামের জুমআর এটাই রীতি ছিল।

ইবনে মাজ্জার বলেন ঃ আমার কাছে ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে এ বর্ণনা পেঁাছেছে যে, জুমআর আগে তিনি বার রাকআত ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) আট রাকআত নামায পড়তেন।

এ সব বর্ণনা এটাই প্রমাণ করে যে, সে সব ছিল নফল নামায। এ কারণেই বর্ণিত নামায গুলোয় রাকআতের তারতম্য দেখা যায়।

তিরমিজী (রঃ) তাঁর 'জামে' গ্রন্থে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—ইবনে মাসউদ (রাঃ) জুমআর নামাযের পূর্বে ও পরে চার রাকআত করে নামায পড়তেন। ইবনে মুবারক ও ছাওরীর মাজহাবও তাই।

ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবনে হানী হুশিয়ারপুরী বলেন—আমি আবু আবদুল্লাহ্কে দেখেছি, জুমআর দিন এলে তিনি প্রায় সূর্য হেলা পর্যন্ত নামায পড়তে থাকতেন। তারপর সূর্য হেলার সাথে সাথে মুয়াজ্জিন আজান দিলে তিনি তখন উঠে দুই কি চার রাকআত নামায পড়তেন। চার রাকআত হলে তিনি দু'দু রাকআতে সালাম ফিরাতেন। যখন ফরয নামায শেষ হত, কিছুক্ষণ মসজিদে বসে থেকে পরে বের হয়ে পাশের কোন ছোট মসজিদে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়তেন। এভাবে ছ'রাকআত নামায হত। তার পরেও তিনি কম বেশী কিছু নামায পড়তেন।

একদল তো এ নামায সুন্নাত হবার সপক্ষে দলীল হিসেবে হাদীছ পেশ করেন। ইবনে মাজার মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া থেকে, তিনি ইয়াযীদ ইবনে আবদুল্লাহ থেকে, তিনি বাকীয়াহ থেকে, তিনি মুবাশশির ইবনে উবায়েদ থেকে, তিনি হাজ্জাজ ইবনে আরতাত থেকে, তিনি আতিয়া আওফী থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—রসূলুল্লাহ (সঃ) জুমআর আগে এক সালামে চার রাকআত নামায পড়তেন।

ইবনে মাজাহ্ উক্ত হাদীছটি 'বাবুস সালাত কাবলাল জুমআ' অধ্যায়ে বর্ণনা করেন। মূলত এ বর্ণনাটিতে কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে।

এক, বাকীয়াহ ইবনে ওলীদ মুদাল্লিসদের ইমাম। তার বর্ণনা শোনার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট নয়। তা ছাড়া সে অবাঞ্ছিত বর্ণনাকারী।

দুই, মুবাশশির ইবনে উবায়েদ মুনকার রাবী।

তিন, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত যঈফ ও মুদাল্লিস রাবী

চার, আতিয়া আওফী সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রঃ) বলেছেন, হুশায়েম (রঃ) তার ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। ইমাম আহমদ (রঃ) তাকে যঈফ রাবী বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ বলেন—আমি হযরত উবাইকে বলতে শুনেছি, হিমসে অবস্থানকারী মুবাশশির ইবনে উবায়েদ নামক শায়েখ আমার ধারণামতে কুফার লোক। তার কাছ থেকে বাকিয়াহ ও আবু মুগীরা রিওয়ায়েত করেছেন। তাদের বর্ণিত সব হাদীছই মওযূ ও মিথ্যা। ইমাম দারে কুতনী বলেন—মুবাশশির ইবনে উবায়েদ মাতরূক রাবী। তার রিওয়ায়েত অনুসরণ করা হয় না। ইমাম বায়হাকী বলেন—আতিয়া আওফীর রিওয়ায়েত দলীল হবার যোগ্যতা রাখেনা আর মুবাশশির বিন উবায়েদ মওযূ হাদীছ বর্ণনার জন্য খ্যাত। তেমনি হাজ্জাজ ইবনে আরতাতের বর্ণনাও দলীল যোগ্য নয়। মূলত নবী (সঃ) জুমআর ফরয পড়েই ঘরে চলে যেতেন এবং দু'রাকআত সুন্নাত নামায পড়তেন। তা ছাড়া আদেশ করতেন, যার পড়তে হয় সে যেন এরপর চার রাকআত পড়ে নেয়।

আমাদের শায়েখ আবু আব্বাস ইবনে তায়মিয়া (রঃ) বলেন—যদি মসজিদে পড়া হয় তো চার রাকআত এবং ঘরে পড়লে দু'রাকআত। আমি বলি, হাদীছসমূহের তাৎপর্যও তাই বলে। আবু দাউদ (রঃ) হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে এ বর্ণনা উধৃত করেন যে, তিনি মসজিদে পড়লে চার রাকআত পড়তেন আর ঘরে গিয়ে পড়লে দু'রাকআত পড়তেন।

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন—রসূল (সঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুমআ আদায় করবে, তখন ফরযের পর চার রাকআত নামায পড়বে।

Contents

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

●

ঈদের নামায

হযরত (সঃ) ঈদের নামাযের জন্য এক রাস্তায় যেতেন ও অন্য পথে ফিরতেন। তিনি ঈদের নামায ঈদগায় গিয়ে পড়তেন। এ ঈদগাহ মদীনার পূর্ব দরজার কাছে ছিল। এ ঈদগাতেই এখন হাজীদের যানবাহন রাখা হয়।

বৃষ্টির কারণে মাত্র একবার তিনি মসজিদে নববীতে নামায পড়েছেন। তা ছাড়া তিনি সবাইকে নিয়ে ঈদগাতেই নামায পড়েছেন। ঈদগার জন্য সুনানে আবু দাউদ ও ইবনে মাজায় শর্তাবলী বর্ণিত হয়েছে।

ঈদের নামাযে হযরতের (সঃ) রীতি ছিল এই, তিনি প্রতি বছর দু'ঈদের নামায পড়তেন। ঈদের নামাযের জন্য উত্তম পোশাক পরতেন। তার কাছে ঈদ ও জুমআয় পরিধানের জন্য এক প্রস্থ উত্তম কাপড় ছিল। একবার তিনি দু'টো সবুজ চাদর এবং একবার লাল চাদর ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কিছু লোকের যে ধারণা তা নির্ভেজাল লাল ছিল তা ঠিক নয়। কারণ, তা হলে 'বুদ' শব্দ ব্যবহৃত হতনা। ঘটনা ছিল এই, সে চাদরের পাড় শুধু লাল ছিল। ইয়ামানী চাদরে সাধারণত তাই হয়। তাই তাকে লাল চাদর বলা হয়েছে। এটা সর্বসম্মতভাবে প্রমাণিত যে, তিনি লাল ও সবুজ চাদর ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তাই আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর দেহে যখন তিনি দু'টো লাল চাদর দেখলেন, তখন তাকে তিনি তা জ্বালিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি নিজে লাল চাদর পড়েছেন তা হতেই পারে না। বরং তাঁর তা জ্বালাবার নির্দেশ থেকে বুঝা যায়, লাল পোশাক হারাম কিংবা মাকরূহ তাহরীমী।

হযরত (সঃ) ঈদুল ফিতরের নামাযে যাবার আগে ক'টি খেজুর খেয়ে নিতেন। তিনি তা বেজোড় সংখ্যায় খেতেন। অবশ্য ঈদুল আযহায় তিনি নামায থেকে না ফিরে কিছু খেতেন না। ফিরে এসে তিনি নিজ কুরবানীর গোশত থেকে কিছু খেয়ে নিতেন।

উভয় ঈদের নামাযের আগে তিনি গোসল করতেন। (সহীহ হাদীছ) পায়ে হেঁটে ঈদগায় যেতেন। তাঁর আগে আগে নেযা নিয়ে যাওয়া হত। ময়দানে পেঁছে সেটাকে সামনে গেড়ে দেয়া হত যেন সেটাকে আড় করে নামায আদায় করা যায়। কারণ, ঈদগাহ হত একটা খোলা ময়দান। তাতে কোন দেয়াল বা সৌধ থাকত না। তাই তাঁর নেযাই নামাযের সামনে আড় দেয়ার কাজ সম্পন্ন করত।

ইদুল ফিতরের নামায তিনি বিলম্বে পড়তেন। তবে ঈদুল আযহার নামায তিনি তাড়াতাড়ি পড়তেন। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) সুন্নতের কড়াকড়ি অনুসরণের গরজে সূর্যোদয়ের আগেই

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন এবং ঘর থেকে নেমে ঈদগাহ পর্যন্ত যেতে 'তাকবীর' বলতে থাকতেন।

হযরত (সঃ) ঈদগায় পেঁছেই নামায শুরু করতেন। তার জন্যে আজান, ইকামাত বা 'আস্সালাতু জামিআ' বলার কোন প্রয়োজন হত না। এটাই সুন্নাত।

হযরত (সঃ) ও তাঁর সাহাবারা ঈদগায় পেঁছে ঈদের নামাযের আগে কি পরে কোন নামায পড়তেন না এবং খুতবার আগে নামায সম্পন্ন করতেন। নামায তাঁরা দু'রাকআত পড়তেন। পয়লা রাকআতে তাকবীরে উলাসহ পর পর সাতবার তাকবীর বলতেন। প্রতি দু'তাকবীরের মাঝে সামান্য থামতেন। তাকবীরের মাঝে অন্য কোন দোআ কালাম পড়ার প্রমাণ নেই। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) সুন্নাতের কড়াকড়ি অনুসরণের লক্ষ্যে প্রতি তাকবীরে দু'হাত তুলতেন। নবী করীম (সঃ) তাকবীর শেষ করে কিরাআত শুরু করতেন। মানে, পয়লা রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে 'কাফ ওয়াল কুরআনিল মাজীদ' এবং দ্বিতীয় রাকআতে 'ইকতারাবাতিস সাআতু ওয়ান শাক্কাল কামার' পড়তেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি দু'রাকআতে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা' ও 'হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ' সূরা পড়তেন। এগুলোই সহীহ সনদে পাওয়া যায়। এ ছাড়া অন্য কিছু সহীহ সনদে বর্ণিত হয়নি। কিরাআত শেষ হতেই তিনি তাকবীর বলে রুকুতে চলে যেতেন। এভাবে সিজদা সম্পন্ন করে এক রাকআত শেষ করতেন। দ্বিতীয় রাকআতে পরপর পাঁচবার তাকবীর বলে কিরাআত শুরু করতেন। এভাবে প্রতি রাকআতে আগে তাকবীর বলতেন ও পরে কিরাআত পড়তেন।

ইমাম তিরমিজী (রঃ) কাছীর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আওফের এক বর্ণনা উধৃত করেছেন। কাছীর তাঁর পিতা থেকে ও তিনি তার দাদা থেকে এ বর্ণনা শুনেছেন যে, রসূল (সঃ) দু'ঈদের নামাযে পয়লা রাকআতে কিরাআতের আগে সাতবার ও দ্বিতীয় রাকআতে কিরাআতের আগে পাঁচবার তাকবীর বলেছেন তিরমিজী (রঃ) বলেন, আমি এ রিওয়ায়েত সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রঃ) কে জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন—এ ব্যাপারে এর চাইতে বিশুদ্ধ হাদীছ আর নেই বলে আমি এর ওপরেই ফতোয়া দেই।

নবী করীম (সঃ) নামায শেষ করে মুসল্লীদের সামনে দাঁড়াতেন। সবাই সারীবদ্ধ অবস্থায় বসা থাকত। তাদের সামনে তিনি ভাষণ দিতেন, উপদেশ দিতেন ও বিধিনিষেধ শোনাতেন। যদি কোথাও সৈন্য পাঠাতে হত তো তখনই পাঠাতেন। কোন বিশেষ নির্দেশ দেবার থাকলে তাও সেখানে দিতেন। ঈদগায় কোন মিম্বর ছিল না যার ওপর চড়ে তিনি ভাষণ দিতেন। তাঁর ভাষণ দানের জন্য মসজিদে নববীর মিম্বরও নিয়ে আসা হত না। তিনি মাটিতে দাঁড়িয়েই ভাষণ দিতেন।

হযরত জাবির (রাঃ) বলেন—আমি রসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে ঈদের নামাযে হাজির হলে তিনি আজান ও ইকামত ছাড়াই নামায শুরু করলেন। নামায শেষে তিনি হযরত বিলালের কাঁধে ভর

করে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তাতে তিনি আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ দিলেন, আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিআমত ও অবদান সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারপর তিনি মহিলাদের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দিলেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সহীহদ্বয়ে বলেন—নবী করীম (সঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা নামাযের সময় ঈদগায় গিয়ে সর্বাগ্রে নামায পড়তেন, নামায শেষে সবার সামনে দাঁড়াতেন। তখন সবাই যার যার লাইনে বসে থাকত। (মুসলিম)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন—নবী করীম (সঃ) ঈদের দিন বেরিয়ে এসে সবাইকে নিয়ে দু'রাকআত নামায পড়তেন। নামাযের সালাম ফিরিয়ে বাহনে চড়ে সবার সামনে আসতেন। তখন সবাই বসে থাকত। তাদের তিনি সদকা দেবার নির্দেশ দিতেন। তা শুনে অধিকাংশ মহিলা নিজ নিজ আংটি ও অন্যান্য জিনিসপত্তর সদকা দিতে থাকতেন। তারপর যদি অন্য কোন দরকারী কাজ থাকত, কাউকে যদি কোথাও পাঠাতে হত, তা হলে সেখানে বসেই তার ব্যবস্থা করতেন। তেমন কিছু না থাকলে তিনি চলে যেতেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, নবী করীম (সঃ) দাঁড়ালেন এবং সর্বাগ্রে নামায পড়লেন। তারপর সবার সামনে খুতবা দিলেন। খুতবা শেষ করে তিনি নেমে গেলেন। অতপর মহিলারা উপস্থিত হলে তিনি তাদের উপদেশ দিলেন। (আলহাদীছ)

এতে জানা যায়, তিনি কখনও মিম্বরে ও কখনও মাটিতে দাঁড়িয়ে খুতবা দিতেন। হতে পারে তাঁর জন্য কাঁচা ইঁট কিংবা মাটি দিয়ে কোন মিম্বর গড়ে নেয়া হয়েছিল। এ উভয় বর্ণনার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এতেও সন্দেহ নেই যে, মসজিদে নববী থেকে কোন মিম্বর নেয়া হত না।

মারওয়ান বিন হাকামই প্রথম মসজিদে নববী থেকে মিম্বর বাইরে এনেছেন। তার এ কাজের বিরোধিতা করা হয়েছিল। এখন রইল কাঁচা ইঁট কিংবা মাটির গড়া মিম্বরের কথা। তাও মারওয়ানের শাসনকালে কাছীর বিন সিলত মদীনায় পয়লা তৈরী করেন। সহীহদ্বয়ে এ বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং খুব সম্ভব রসুল (সঃ) ঈদের ময়দানে কোন উঁচু জাগায় দাঁড়িয়ে খুতবা দিয়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে নেমে মহিলাদের দিকে যান এবং তাদের উপদেশ দেন।

হযরত (সঃ) সব খুতবাই আলহামদুলিল্লাহ দিয়ে শুরু করতেন। কোন বর্ণনায় মেলে না যে, তিনি ঈদের নামাযের খুতবা 'তাকবীর' দিয়ে শুরু করেছেন।

সুনানে ইবনে মাজায় রসুলের (সঃ) অন্যতম মুআজ্জিন হযরত সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুল (সঃ) খুতবায় বেশী বেশী তাকবীর বলতেন এবং ঈদের খুতবায় তো সব

চেয়ে বেশী তাকবীর বলতেন। এ থেকে অবশ্য এটা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি 'তাকবীর' দিয়ে খুতবা শুরু করতেন।

আদপে দু'ঈদ ও ইস্তিসকা নামাযের খুতবা হযরত (সঃ) কিভাবে শুরু করতেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। একদল বলেন, তাকবীর দিয়ে শুরু করতে হবে। কিছু লোক বলেন—ইস্তিসকার নামায 'ইস্তিগফার' দিয়ে শুরু করতে হবে। আবার কিছু লোক বলেন, 'আলহামদু' দিয়ে শুরু করতে হবে। আমাদের শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ) বলেন, শেষোক্ত মতটিই উত্তম। কারণ, নবী করীম (সঃ) বলেছেন, যে কাজ আল্লাহর হামদ ছাড়া শুরু করা হবে না তা ব্যর্থ ও বরবাদ হবে। তাই হযরত তাঁর সব খুতবাই 'হামদ' দিয়ে শুরু করতেন। তিনি সাধারণ ভাবে অনুমতি দিয়ে রাখতেন যার ইচ্ছা থাকবে, যার ইচ্ছা চলে যাবে। যদি জুমআর দিন ঈদ হত তা হলে জুমআর জন্যে তিনি ঈদের নামায সংক্ষেপে শেষ করতেন।

রসূল (সঃ) ঈদের ময়দানে ভিন্ন ভিন্ন পথে আসা-যাওয়া করতেন। এক পথে তিনি যেতেন ও অন্য পথে আসতেন। একদল তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন যে, এর ফলে উভয় পথের পার্শ্বস্থ লোকদের সালাম দেয়া যাবে। অপর দল বলেন, এর ফলে উভয় এলাকার লোকদের বরকত লাভ হবে। তৃতীয় ব্যাখ্যা হল এই, উভয় পথের অভাবীদের অভাব মোচনের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। চতুর্থ ব্যাখ্যা হল এই, উভয় রাস্তায় ইসলামের শান-শওকত প্রকাশ পাবে। পঞ্চম ব্যাখ্যা হল, উভয় পথের মুনাফিকরা মুসলমানদের এ শান-শওকত দেখে জ্বলে পুরে মরবে। ষষ্ঠ ব্যাখ্যা হল এই যে, বেশী ভূখণ্ডের অণু পরামণু এর সাক্ষী হয়ে থাকবে। কারণ, মসজিদ ও ঈদগায় যেতে প্রতি কদমে গমনকারীর একটি দরজা বলন্দ হয় ও একটি পাপ মাফ হয়। ঘরে ফিরার পথেও তাই হয়। শেষোক্ত এ মতটিই অধিকতর শুদ্ধ।

এও বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) আরাফার দিন ফজর নামায থেকে আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিনের আসর নামায পর্যন্ত নিম্নরূপ পড়তেনঃ

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ

●

কসূফ নামায

সূর্য গ্রহণের সময়ে হযরতের আদর্শ :

সূর্যগ্রহণ হলে নবী করীম (সঃ) খুব দ্রুত চলতেন। পিঠে চাদর জড়িয়ে তিনি বের হতেন। একবার এরূপ হল যে, সূর্য সকাল বেলা দু' তিন নেযা পরিমাণ ওপরে ওঠার পরই গ্রহণ দেখা দিল। সংগে সংগে তিনি মসজিদে চলে এলেন এবং দু'রাকআত নামায পড়লেন। পয়লা রাকআতে সূরা ফাতিহার পর এক লম্বা সূরা পড়লেন। কিরাআত সরব ছিল। তারপর রুকুতে গিয়ে অনেকক্ষণ থাকলেন। রুকু থেকে দাঁড়িয়েও বেশ সময় কাটালেন। তবে তা নামাযের কিয়ামের চেয়ে কম সময় ছিল। রুকু থেকে মাথা তুলে তিনি বললেন :

سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد

তারপর আবার কিরাআত শুরু করলেন। আবার রুকুতে গিয়ে দীর্ঘ সময় কাটালেন। তবে পয়লা রুকুর চেয়ে তা ছিল কম সময়। তারপর এক লম্বা সিজদায় নিরত হলেন। তা বেশ দীর্ঘ ছিল। দ্বিতীয় রাকআতও পয়লা রাকআতের মতই পড়লেন। এভাবে প্রতি রাকআতে তিনি চার রুকু ও চার সিজদা দিলেন।

রসূলুল্লাহর জান্নাত জাহান্নাম অবলোকন :

এ নামাযে তিনি স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেন। তিনি ইচ্ছা করেছিলেন, জান্নাত থেকে একটি আংগুরের ছড়া ছিড়ে নিয়ে সাহাবাদের দেখাবেন। তখন তিনি দোযখীদেও দোযখের আগুনে জ্বলতে দেখেছেন। একটি নারীকে তিনি দোযখে দেখলেন। তাকে একটি বিড়াল আঁচড়াচ্ছিল। কারণ, সেটাকে সে নির্মমভাবে বেধে রেখে না খাইয়ে মেরেছিল। আমর ইবনে মালিককে তিনি দেখতে পেলেন, আগুনের ভেতরে পা হেঁচড়ে চলছিল। এই ব্যক্তিই প্রথম ইব্রাহিমী দ্বীনকে পাল্টে দিয়েছিল। সেখানে তিনি হাজীদের মধ্যকার এক চোরকে শাস্তি ভুগতে দেখেছেন।

নামায শেষ করে তিনি অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ এক দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। তাতে তিনি বললেন :

"নিঃসন্দেহে চাঁদ-সূরুজ আল্লাহর নিদর্শন। কারো জন্ম-মৃত্যুতে এর গ্রহণ দেখা যায় না। তাই যখন তাতে গ্রহণ দেখতে পাও, আল্লাহকে ডাক, তাকবীর বল, নামায পড় ও সদকা দাও।

হে মুহাম্মদের (সঃ) উম্মত! খোদার কসম! তাঁর কাছে তাঁর কোন বান্দা বা বান্দীর ব্যভিচারের চাইতে ক্ষোভ সৃষ্টিকারী ব্যাপার আর কিছুই নেই। হে মুহাম্মদের (সঃ) উম্মত! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে পেতে, তা'হলে হাসতে খুবই কম, কাঁদতে অনেক বেশী।"

তিনি আরও বলেন :

"আমি এখানে সে সব জিনিস দেখেছি যার প্রতিশ্রুতি আমি তোমাদেরকে দিয়েছি। এমন কি আমি ইচ্ছা করেছিলাম, জান্নাতের আংগুরের একটি ছড়া ছিঁড়ে নেব। ঠিক তক্ষুণি তোমরা আমাকে একটু এগিয়ে যেতে দেখেছ। তখনই আমি জাহান্নাম দেখতে পেলাম। তার এক একটি অংশ অন্য অংশ থেকে ভয়ংকর। ঠিক তক্ষুণি তোমরা আমাকে কিছুটা পিছিয়ে আসতে দেখেছ। এক বর্ণনায় আছে, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি। সেরূপ ভয়াবহ দৃশ্য আমি কখনও দেখি নি।"

তিনি আরও বলেন :

"আমার কাছে ওহী এসেছে, কবরে তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। সেখানে কেউ এসে তোমাদের কারো কাছে প্রশ্ন করবে—সেই লোক (মুহাম্মদ) সম্পর্কে তুমি কি জান? তখন মজবুত ইমানদার বলবে—মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রসূল। তিনি আমাদের কাছে হিদায়েত ও দালাএল নিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁকে মেনে নিয়েছি, ঈমান এনেছি ও তার আনুগত্য করেছি। তখন তাকে বলা হবে, 'ঘুমিয়ে থাক, তুমি পুণ্যবান। জানতে পেলাম তুমি মু'মিন ছিলে।' পক্ষান্তরে মুনাফিক বা সংশয়ী বলবে—'আমি জানি না। আমি অন্যদের কিছু বলতে শুনেছি বলে আমিও তাদের সাথে তাই বলেছি।'

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) অন্য একটি বর্ণনা উধৃত করেছেন। তাতে বলা হয়েছে—নবী করীম (সঃ) সালাম ফিরিয়ে আল্লাহ পাকের হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন—আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু, ওয়া রাসূলুহু।

তারপর বললেন :

"হে লোক সকল! আমি তোমাদের আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি—আমি কি আমার প্রতিপালকের পয়গাম তোমাদের কাছে পেঁাছাবার ব্যাপারে কোনরূপ ত্রুটি করেছি? সমবেত লোকদের তরফ থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল—আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আপনার প্রতিপালকের পয়গাম যথাযথ ভাবে পেঁাছে দিয়েছেন। আপনি আপনার উম্মতদের জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করেছেন। আপনার ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা আপনি সুষ্ঠভাবে সম্পাদন করেছেন।

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের সাথে কারো জন্ম-মৃত্যুর সম্পর্ক নেই :

অবশেষে তিনি বলেন—"কিছু লোক মনে করে যে, চাঁদ সূর্যের গ্রহণ কিংবা নক্ষত্রের কক্ষচ্যুতি পৃথিবীর কোন বড় ধরণের ব্যক্তিত্বের মৃত্যুর কারণে ঘটে থাকে। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। এ তো হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ এক নিদর্শন। তাঁর বান্দারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। তিনি দেখেন যে, এ সব দেখে কে তওবা করে ঠিক হয়ে যায়।

"খোদার কসম! আমি যখন নামাযে দাঁড়িয়েছি, তখন দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের কি হবে না হবে সব দেখতে পেয়েছি। খোদা ভালভাবেই জানেন, ত্রিশজন দাজ্জাল আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত হবে না। শেষ দাজ্জাল হল কানা দাজ্জাল। তার বাম চোখ বিলুপ্ত থাকবে। তা যেন আবু তাহিয়ার চোখ। যখন সে আত্মপ্রকাশ করবে, অচিরেই সে নিজকে খোদা বলে দাবী করবে। যে ব্যক্তি তার ওপর ঈমান আনবে, তাকে সত্য বলে জানবে ও তার আনুগত্য মেনে নেবে, তার অতীতের কোন পুণ্যই কোন কল্যাণে আসবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাকে অস্বীকার করবে ও তাকে মিথ্যা বলে জানবে, অতীতের কোন পাপের জন্য তাকে জবাবদিহী করতে হবে না। কানা দাজ্জাল খুবই ক্ষিপ্রতার সাথে কা'বা শরীফ ও বায়তুল মুকাদ্দাস ছাড়া সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। মুসলমানদের সে বায়তুল মুকাদ্দাসে অবরুদ্ধ করবে। ফলে তারা অত্যন্ত ভীত ও অবসন্ন হয়ে পড়বে। তারপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সসৈন্যে ধ্বংস করে দেবেন। এমন কি দেয়ালের ভিতর ও গাছের শিকড় থেকে আওয়াজ উত্থিত হবে "হে মুসলিম, হে মু'মিন! এ লোক ইয়াহুদী (কিংবা কাফির)। এস, তাকে হত্যা কর।"

বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) অন্যভাবেও সূর্য গ্রহণের নামায পড়েছেন। যেমন, কখনও প্রতি রাকআতে তিন রুকু আবার কখনও প্রতি রাকআতে চার রুকু এবং কখনও স্বাভাবিক নামাযের মত প্রতি রাকআতে এক রুকু দিয়ে নামায সম্পন্ন করেছেন। অবশ্য প্রধান ইমামগণ এ সব বর্ণনা সমর্থন করেন না। যেমন, ইমাম আহমদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম শাফেঈ (রঃ) সে সব বর্ণনাকে ভুল বর্ণনা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন—আমাকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, একদল লোক বর্ণনা করেন যে, নবী (সঃ) প্রতি রাকআতে তিন রুকু প্রদান করেছেন। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, তোমারও কি ধারণা তাই? সে জবাব দিল—না, তা নয়। তবে আপনার দু'রুকুর বর্ণনা সত্ত্বেও তারা তিন রুকুর বর্ণনা শোনাচ্ছে, অথচ আপনি কেন তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন না? ইমাম শাফেঈ (রঃ) তার জবাবে বললেন—উক্ত বর্ণনা বিচ্ছিন্ন সূত্রের। আমি একক সূত্রের বর্ণনার ওপরে বিচ্ছিন্ন সূত্রের বর্ণনাকে প্রাধান্য দেই না। তাই আমরা উক্ত বর্ণনাকে ভুল মনে করি।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেন—ইমাম শাফেঈ (রঃ) বিচ্ছিন্ন সূত্র বলতে বুঝিয়েছেন যে, তা

হচ্ছে উবায়েদ ইবনে উমায়রের বক্তব্য। একদল মুহাদ্দিছ রুকুর সংখ্যা সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোকে বিশুদ্ধ মনে করেন।

তেমনি নবী করীম (সঃ) কয়েকবার সূর্য গ্রহণের নামায পড়েছেন। তাই একেকবার হয়ত এক এক ধরনের পড়েছেন। এভাবে সবগুলোকে জায়েয করা যায়। ইসহাক ইবনে রাহবিয়া, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযায়মা, আবু বকর ইবনে ইসহাক যয়ঈ ও আবু সুলায়মান খাত্তাবী এ মতের ধারক। ইবনে মাঞ্জারও এ মতটিকে ভাল বলেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম বুখারী ও ইমাম শাফেঈ (রঃ) যে মতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন সেটাই সর্বোত্তম। আমিও হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনাকেই উত্তম মনে করি। অধিকাংশ বর্ণনাই সেটার ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে। এ মাজহাবই হযরত আবু বকর (রাঃ) ও অন্যান্য পূর্বসুরীদের। আমার উস্তাদ আবুল আব্বাস ইবনে তায়মিয়া (রঃ) এ মাজহাবই পসন্দ করেছেন। অন্যান্য বর্ণনাগুলোকে তিনি যঈফ বলেছেন। তিনি বলেন- রসূল (সঃ) মাত্র একবারই সূর্য গ্রহণের নামায পড়েছেন। যখন তাঁর সাহেবজাদা ইব্রাহীম (আঃ) এর মৃত্যু হয়, সে দিনই সূর্যগ্রহণ হয়। হযরত (সঃ) সে উপলক্ষে সূর্য গ্রহণের নামায পড়ান এবং সবাইকে এরূপ অবস্থায় আল্লাহর জিক্‌র, নামায, দোআ, ইস্তিগফার, সদকা ও গোলাম আযাদের নির্দেশ দেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

ইস্তিসকার নামায

নবী করীম (সঃ) বৃষ্টির জন্যে কয়েকভাবে দোআ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। একবার তিনি জুমআর দিন মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্যে এভাবে দোআ করেন ঃ

اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا .

"হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষন কর। হে আল্লাহ! আমাদের পানীয় দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে পান করাও।"

দ্বিতীয়ত, নবী করীম (সঃ) একদিন সবাইকে কথা দিলেন, ময়দানে গিয়ে নামায আদায়ের জন্য তিনি বেরোবেন। সেমতে যখন সূর্যোদয় ঘটল, তখন তিনি অত্যন্ত বিনয়াবনত অবস্থায় বের হলেন। মনে হচ্ছিল যেন তিনি মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিলেন। বড়ই দীনহীন অবস্থায় এলেন। নামাযের ময়দানে এসে তিনি মিম্বরে উঠে দাঁড়ালেন (যদি এ বর্ণনা বিশুদ্ধ হয়ে থাকে)। পয়লা আল্লাহ তা'আলার হামদ ও ছানা বর্ণনা করলেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করলেন। তারপর নিম্নরূপ খুতবা প্রদান করলেন ঃ

"সব প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্যে নিবেদিত। তিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। তিনি অত্যন্ত দাতা ও দয়ালু। তিনিই প্রতিদান দিবসের মালিক। আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। (প্রভু হে!) তুমি অমুখাপেক্ষী ও আমরা মুখাপেক্ষী। আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষন কর। আর যতটুকুই আমাদের ওপর বর্ষণ কর, সেটাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে আমাদের জীবিকার উপকরণ করে দাও।"

তারপর তিনি উভয় হাত তুললেন এবং দোআ ও কান্নাকাটায় নিমগ্ন হলেন। হাত অত্যন্ত বেশী তুললেন। এমন কি তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখা গেল। তারপর তিনি সবাইকে পেছনে রেখে কিবলামুখী হলেন। সেই অবস্থায় তিনি নিজের চাদরের অবস্থান বদলে নিলেন। মানে, ডান দিকের অংশ বাম দিকে ও বাম দিকের অংশ ডান দিকে নিলেন। তেমনি পিঠের অংশকে বুকে ও বুকের অংশকে পিঠে নিলেন। তখন তাঁর অংগে কালো চাদর ছিল। কিবলামুখী অবস্থায় তিনি দোআ শুরু করলেন। অন্যান্যরাও তখন কিবলামুখী ছিল। দোআ শেষ করে তিনি নামলেন।

তারপর তিনি ঈদের নামাযের মত আজান ইকামত ছাড়াই দু'রাকআত নামায পড়লেন। নামাযে তিনি সরবে কিরাআত পড়লেন। পয়লা রাকআতে সূরা ফাতিহার সাথে 'সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আলা' ও দ্বিতীয় রাকআতে 'হাল আতাকা হাদীছুল গাশিয়াহ' পড়লেন।

তৃতীয় ধরনটি এভাবে বর্ণিত আছে যে, হযরত (সঃ) জুমআর দিন ছাড়া কয়েকদিন মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির জন্য দোআ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি কোন ইস্তিসকার নামায পড়েছেন বলে জানা যায় না।

চতুর্থত, তিনি মসজিদে বসে বৃষ্টির জন্যে দোআ করেছেন। উভয় হাত তুলে তিনি নিম্ন দোআ পড়েছেন ঃ

اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريعا طبقا عاجلا غير رائث نافعا غير ضار -

"আয় আল্লাহ ! আমাদের তৃষ্ণা এমন বৃষ্টি দিয়ে দূর কর যা তৃপ্তিদায়ক, পর্যাপ্ত, মন্হর নয়-ক্ষিপ্র ও ক্ষতিকর নয়-কল্যাণপ্রদ।"

পঞ্চম পদ্ধতি এই, হযরত (সঃ) যাওরাবের কাছে গিয়ে দোআ করেছেন। তা মসজিদের দরজার বাইরে অবস্থিত। আজকাল সেটাকেই 'বাবুস সালাম' বলা হয়। তিনি তখন মসজিদ থেকে এতখানি দূরে ছিলেন যতদূরে একখানা পাথর ছুড়ে নেয়া যায়।

ষষ্ঠবার তিনি কোন এক রণাংগনে যুদ্ধের সময়ে দোআ করেছিলেন। মুশরিকরা যখন এগিয়ে এসে পানির ফোয়ারা দখল করে নিল এবং মুসলমানরা পিপাসায় অস্থির হয়ে পড়ল, তখন তারা নবী করীম (সঃ) এর কাছে ফরিয়াদ করায় তিনি তা করেছিলেন। মুনাফিকরা বলেছিল, মুসা (আঃ) যেভাবে তাঁর জাতির পানির অভাব মিটানোর জন্য দোআ করেছিলেন, তিনি যদি নবী হয়ে থাকেন তো আমাদের পানির অভাব মোচনের জন্য দোআ করবেন।

রসুল (সঃ) এ খবর শুনে বললেন—তারা কি সত্যিই এ কথা বলেছে ? তা হলে হয়ত তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পিপাসা মিটিয়ে দেবেন।

এ বলে তিনি দু'হাত তুলে দোআ করলেন। তাঁর হাত না নামাতেই মেঘ ছেয়ে ফেলল ও বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। এমন কি মাঠে ময়দানে পানির স্রোত বয়ে চলল। সবাই অত্যন্ত তৃপ্তি সহকারে পানি পান করল। তিনি নিম্নরূপ দোআ পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে ঃ

اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت
اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل -

"হে আল্লাহ ! আমাদের পরিতৃপ্ত কর। আমাদের প্রয়োজন মিটানোর বৃষ্টি দান কর। তা পর্যাপ্ত ভাবে দাও। তা কল্যাণপ্রদ কর যেন ক্ষতিকর না হয়। তা অনতিবিলম্বে আসুক যেন বিলম্ব না হয়।"

হযরত (সঃ) যখনই বৃষ্টির জন্য দোআ করেছেন, সংগে সংগে বৃষ্টি এসে গেছে। বৃষ্টি যখন অতিমাত্রায় শুরু হয়ে গেছে, তখন সবাই আবার গিয়ে তাঁকে থামাবার আবেদন জানিয়েছে। তিনি তখন আবার বৃষ্টি সরিয়ে দেবার জন্য নিম্নরূপ দোআ করেন ঃ

اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام و الجبال و الظراب وبطون الاودية ومنابت الشجر ۔

"হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে কিংবা আমাদের ওপর আর না হোক। হে আল্লাহ! পাহাড়ের টিলায়, পাহাড়ে, উপত্যকায় ও গাছ-পালার শিকড়ে তা হোক।"

রসূল (সঃ) মেঘ দেখা দিলে এ দো'আ করতেন :

اللهم صيبا نافعا

"হে আল্লাহ! এ বৃষ্টি যেন পূর্ণ মাত্রায় হয় ও কল্যাণবহ হয়।"

তখন তিনি পবিত্র অংগ থেকে কাপড় সরিয়ে দিতেন যেন তার দেহে বৃষ্টি পড়ে। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন : কারণ, এ হচ্ছে নিজ প্রতিপালকের তরফ থেকে নতুন প্রতিশ্রুতি।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন—আমি এ খবর তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি যাঁকে আমি কখনও অপবাদ দেই না।

আমার ধারণা, তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হবেন। হযরত যারীদ ইবনে হাদ থেকে বর্ণিত আছে, যখন বর্ষণের স্রোত বেয়ে যেত, তখন তিনি বলতেন, এস, এদিকে এস, আমার কাছে এস। আল্লাহ তা'আলা যাকে পবিত্র করে সৃষ্টি করেছেন আর যা দিয়ে আমরা পবিত্রতা অর্জন করি তা আমার কাছে এস। অতপর তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন করতেন।

রসূল (সঃ) যখন মেঘ ও হাওয়া দেখতেন, তখন তার চেহারায় তার প্রতিফলন ঘটত। তিনি উদ্বেগের সাথে এদিক ওদিক তাকাতেন। যখন বর্ষণ শুরু হত, তখন খুশী হতেন। তাঁর উদ্বেগ কেটে যেত। তিনি উদ্বিগ্ন হতেন এই ভেবে যে, মেঘ ও হাওয়া গযব আকারে ঝড়-বন্যা হয়ে দেখা না দেয়।

সালিম ইবনে আবদুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে এক মারফু রিওয়ায়েত বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে, হযরত (সঃ) বৃষ্টির জন্য নিম্নরূপ দোআ করেছেন :

اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريعا غدقا مجللا عاما طبقا سحا دائما ۔ اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم ان بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه الا اليك اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع واسقنا من بركات السماء وانبت لنا من بركات الارض اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء مدرارا ۔

Contents

"হে খোদা। আমাদের পরিতৃপ্ত কর এমন বৃষ্টি দিয়ে যা প্রয়োজন পূরণে পর্যাপ্ত ও যথেষ্ট হয়। তা প্রচুর হোক, পরিপূর্ণ হোক, ঘন হোক, স্থায়ী হোক। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দিয়ে তৃষ্ণা মিটাও, নিরাশ করোনা। বান্দারা সহ শহরগুলো, জীব-জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্টি দুঃখ, বিপদ ও অভাব অনটনে রয়েছে। তাই তার জন্য কেবলমাত্র তোমার কাছেই ফরিয়াদ করছি। হে খোদা! আমাদের জন্য ফসল উৎপন্ন কর। আমাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা কর। আসমান ও যমীন থেকে আমাদের জন্য বরকত দান কর। হে আল্লাহ! আমাদের দুঃখ, ক্ষুধা, নগ্নতার অবসান ঘটাও ও আমাদের কষ্ট দূর কর। একমাত্র তুমিই তা দূর করতে পার। হে খোদা! আমরা তোমার কাছেই ক্ষমা চাই। নিঃসন্দেহে তুমিই ক্ষমাশীল। আমাদের ওপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটাও।"

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন—ইস্তিসকার নামাযে ইমাম এ দোআটি পাঠ করুক এটাই আমি কামনা করি।

তিনি আরও বলেন—রসূল (সঃ) বৃষ্টির দোআর জন্যে হাত তোলার পর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলে তার পয়লা বর্ষণের পানি নিজ পবিত্র দেহে মেখে নিতেন।

তিনি আরও বলেন—আমি যাকে নির্দোষ মনে করি তিনি আমাকে আব্দুল আযীয ইবনে উমর থেকে, তিনি মাকহুল থেকে ও তিনি নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ

"জিহাদের ময়দানে, নামাযের সময়ে ও বৃষ্টির মুহূর্তে দোআ কবুলের আবেদন জানাও।"

ইমাম শাফেঈ (রঃ) এও বলেন আমি একাধিক সূত্রে জানতে পেয়েছি, বারিপাতের সময়ে ও নামাযের ওয়াক্তে অবশ্যই দোআ কবুল হয়।

বায়হাকী (রঃ) বলেন—আমাকে মাওসুল সহল বিন সা'দ থেকে নবী করীম (সঃ) এর দোআ সম্পর্কিত একটি বর্ণনা শুনান। তাতে বলা হয়েছে, জিহাদে নিরত অবস্থায় ও বৃষ্টিপাতের সময়ের দোআ ব্যর্থ হয় না।

হযরত আবু ইমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তাঁর কাছে নবী করীম (সঃ) থেকে এ বর্ণনাটি পেঁাচেছে যে, তিনি বলেছেন—চার সময়ে আকাশের দুয়ার খোলা হয় ও দোআ কবুল হয়।

১। জিহাদের জন্য কাতার বেঁধে দাঁড়ানো অবস্থায়।
২। বৃষ্টি বর্ষণের সময়।
৩। নামাযে নিরত অবস্থায়।
৪। পবিত্র কাবাঘর যিয়ারতের সময়।

অষ্টদশ পরিচ্ছেদ

●

সফরে হুযরাতের (সঃ) কার্যধারা

রাসূলে পাক (সঃ) চার ধরনের সফর করেছেন।

এক, হিজরতের সফর।

দুই, জিহাদের সফর।

তিন, উমরার সফর।

চার, হজ্জের সফর।

যখন তিনি সফরে বেরোতেন, উম্মুল মু'মিনীনদের সফর সংগিনী হবার ব্যাপারে লটারীর আশ্রয় নিতেন। যার নাম উঠত তিনি সাথে যেতেন। অবশ্য হজ্জের সফরে তিনি সবাইকে সাথে নিয়েছেন।

দিনের শুরুতে তিনি সফর শুরু করতেন। তিনি বৃহস্পতিবারে সফরে যাওয়া পসন্দ করতেন। তিনি দোআ করতেন যেন আল্লাহ তা'আলা তাঁর উম্মতদের সকাল ভ্রমণে বরকত দান করেন।

তিনি যদি কখনও কোথাও সেনাদল কিংবা প্রতিনিধিদল পাঠাতেন তো দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। যদি কোথাও তিনজন পাঠাতেন তা'হলে একজনকে আমীর করে নেয়ার নির্দেশ দিতেন। তিনি একা সফর করতে নিষেধ করতেন। তিনি বলতেন, বাহনে এক কি দু'জন সফরে বের হওয়া শয়তানের কাজ। তিন জনের সওয়ারীই সঠিক সওয়ারী।

যখন তিনি সফরের জন্য দাঁড়াতেন তখন এ দোআ পড়তেন ঃ

اللهم اليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ما اهمني وما لا اهتم به اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير اينما توجهت

"আয় আল্লাহ ! আমি তোমার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছি এবং তোমারই আঁচল শক্তহাতে ধরেছি। হে আল্লাহ ! যা নিয়ে আমার দুর্ভাবনা রয়েছে আর যা নিয়ে নেই সে সব ব্যাপারে আমার জন্য যথেষ্ট হও। হে আল্লাহ ! আমাকে 'তাকওয়া' দাও, আমার গোনাহ মাফ কর এবং আমার দৃষ্টি যে দিকেই থাকনা কেন, কল্যাণের দিকে তা ফিরিয়ে দাও।"

যখন তার সামনে সফরের বাহন উপস্থিত করা হত, তখন তার রিকাবে পা রাখতে গিয়ে বিসমিল্লাহ বলতেন। তারপর যখন বাহনের পিঠে সওয়ার হতেন তখন নিম্নরূপ দোআ পড়তেন ঃ

الحمد لله الذى سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين - و انا الى ربنا لمنقلبون

তারপর পড়তেন ঃ

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله اكبر الله اكبر الله اكبر

অতপর পড়তেন ঃ

سبحانك انى ظلمت نفسى فاغفرلى انه لا يغفر الذنوب الا انت

অবশেষে পড়তেন ঃ

اللهم انا نسئلك فى سفرنا هذا البر و التقوى و من العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا و اطو عنا بعده اللهم انت الصاحب فى السفر الخليفة فى الاهل اللهم انى اعوذ بك من وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر فى الاهل والمال ٥

"সকল প্রশংসাই আল্লাহর জন্য। তিনিই আমাদের জন্য এই বাহন অনুগত করিয়াছেন। আমরা তার সংগ্রাহক ছিলাম না। অবশ্যই আমরা আমাদের প্রতিপালকের দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।"

"সকল প্রশংসাই আল্লাহর জন্য। সকল প্রশংসাই আল্লাহর জন্য। সকল প্রশংসাই আল্লাহর জন্য আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।"

"পবিত্রতা শুধু তোমারই। নিশ্চয় আমি নিজের ওপর জুলুম করেছি। তাই আমাকে ক্ষমা কর। তুমি ছাড়া নিশ্চয় আর কেউ ক্ষমা করারনেই।"

"হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে তোমার কাছে পুণ্য, পরহিযগারী ও তোমার সন্তোষমূলক কাজ চাই। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ সফর সহজ করে দাও, আর আমাদের জন্য এ সফরের দূরত্ব অনুপলব্ধ করে দাও। হে আল্লাহ! তুমিই সফরের প্রভু ও তুমিই ঘর-বাড়ির রক্ষক। হে আল্লাহ! আমরা সফরের দুঃখ, প্রত্যাবর্তনের বিপদ-আপদ ও ঘর-বাড়ি সহায়-সম্পদের দুর্গত দৃশ্যের থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

ঘরে ফিরে এসেও তিনি উক্ত দোআ পড়তেন। তবে তার সাথে এ অংশটুকু যোগ করতেন ঃ

ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون

"প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, নিজ প্রভুর ইবাদতগার ও প্রশংসাকারী।"

হযরত (সঃ) ও তাঁর সাহাবাবৃন্দ যখন কোন উঁচু জায়গায় উঠতেন তো তাকবীর বলতেন ও যখন নীচে উপত্যকায় নেমে আসতেন তখন তাসবীহ পাঠ করতেন। তারপর যখন কোন বস্তীতে প্রবেশ করতে উদ্যত হতেন তখন এ দোআ পড়তেন ঃ

اللهم رب السماوات السبع وما اظللن ورب الارضين السبع وما اقللن ورب الشياطين وما اضللن ورب الرياح وما ذرين - اسئلك من خير هذه القرية وخير ما جمعت فيها واعوذ بك من شرها ومن شر ما جمعت فيها اللهم ارزقنا جناها واعذنا من وباها وحببنا الى اهلها وحبب صالحي اهلها الينا -

"হে সপ্ত আকাশ ও তার ছায়ায় অবস্থিত বস্তুর প্রতিপালক! হে সপ্ত পৃথিবী ও তার মধ্যস্থিত বস্তুর প্রতিপালক! হে শয়তান ও তার দ্বারা বিভ্রান্তদের প্রতিপালক! হে বায়ু-মন্ডল ও তদ্দ্বারা উড্ডীয়মান বস্তুর প্রতিপালক! আমি তোমার কাছে এ বস্তী ও তাতে তোমার জমানো কল্যাণের প্রার্থনা জানাই। তেমনি এ বস্তী ও তাতে তোমার জমানো অকল্যাণ থেকে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! এর ফলমূল থেকে আমাদের রিযিক দান কর এবং তার বিপদাপদ থেকে রক্ষা কর। তার বাসিন্দাদের ভেতর থেকে আমাদের বন্ধু বানিয়ে দাও এবং তাদের পুণ্যবানদের জন্যে আমাদের অন্তরে ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও।"

কসরের নামায

সফরে হযরত (সঃ) চার রাকআত বিশিষ্ট নামায কসর করতেন। তিনি সফরে বেরিয়ে মদীনা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত চার রাকআত ফরযের স্থলে দু'রাকআত পড়তেন। সফরে তিনি চার রাকআত পুরোপুরি পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। অবশ্য হযরত আয়েশার (রাঃ) এক বর্ণনায় আছে, 'তিনি সফরে কখনও কসর পড়তেন, কখনও পুরোপুরি পড়তেন। কখনও রোযা রাখতেন, কখনও ভংগ করতেন।' এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াকে বলতে শুনেছি, এ বর্ণনাটি রসূলুল্লাহর নামে মনগড়া চালানো হচ্ছে। রসূল (সঃ) ও সমগ্র সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) কথা ও কাজের বিপরীত কি উম্মুল মু'মিনীন কোন বর্ণনা প্রদান করতে পারেন?

সঠিক কথা এই, আল্লাহ তা'আলা মূলত দু'দু রাকআত নামাযই ফরয করেছিলেন। তারপর যখন হযরত (সঃ) মদীনায় হিজরত করলেন, তখন আবাসে চার রাকআত করা হল ও প্রবাসে যা ছিল তাই রাখা হল। তাই এটা কি করে আশা করা যায় যে, নবী করীম (সঃ) রীতিবহির্ভূত কাজ করবেন?

এও বলা হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) এর ধারণা ছিল যে, কসর নামাযের জন্য সফর ও খাওফ দুটোই শর্ত। তাই যে সফরে ভয়ের কারণ থাকেনা সেখানে কসর পড়ারও কারণ থাকেনা। এ ব্যাখ্যা মূলত ঠিক নয়। কারণ, হযরত (সঃ) নিরাপদ সফরেও সর্বদা কসর নামায পড়তেন।

হযরত উমর (রাঃ) যখন কসরের আয়াতের মর্ম উদ্ধার করতে পারছিলেন না, তখন হযরত (সঃ) এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন—এটা হল আল্লাহর দান। আমার উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এটাই বৈধ করেছেন। এ থেকে জানা গেল, ইবাদতের নির্দেশের তাৎপর্য বুঝা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য নির্দেশ পালন। তাই নিরাপদ কি বিপদসংকুল উভয় অবস্থায়ই কসর বৈধ। এটা আল্লাহ পাকের এক বিশেষ কনসেশন।

কারো কারো ধারণা, কসরের আয়াতের মর্মানুসারে নামাযের রাকআত ও আরকান উভয়ই সংক্ষিপ্ত হবে। আর তার জন্য শর্ত হচ্ছে দু'টো—সফর ও খাওফ। যখন উভয় শর্তের সমন্বয় ঘটবে তখনই কসর বৈধ হবে। যদি উভয় শর্তের অনুপস্থিতি ঘটে, তা হলে বৈধতাও বিলুপ্ত হয়। আর নামাযের রাকআত ও আরকান দুটোতেই সংক্ষেপণ হবে। যখন এক শর্ত দূর হবে, তখন এক ব্যাপারে কসর হবে। অর্থাৎ যদি আবাসে ফিরে বিপদাশংকা মুক্ত না হয়, তা হলে নামাযের রাকআত পুরোপুরি হবে, আরকানে কসর হবে। এটা কসরের একটা ধরন মাত্র, পূর্ণ কসর নয়। তেমনি যদি নিরাপদ সফর হয়, তা হলে নামাযের রাকআতে কসর হবে, আরকানে নয়। সেটা হল 'নিরাপদ নামায।' এটাও কসরের একটা ধরন। সাধারণত কসর নামাযকে 'সংক্ষিপ্ত নামায' বলা হয়। অবশ্য আরকানপূর্ণ কসর নামাযকে পূর্ণ নামাযও বলা হয়। এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি কসরের আয়াতের নির্দেশিত নামাযের আওতায় আসেনা। মোট কথা, কসরের পয়লা ব্যাখ্যাই অধিকাংশ ফকীহ গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, নামায দু'দু'রাকআত ফরয ছিল। রসূল (সঃ) যখন মদীনায় হিজরত করলেন, তখন সফরে পূর্ণ নামায ঠিক থাকল ও আবাসের নামাযে সংযোজন হল। এতে জানা যায়, তাঁর মতে সফর নামায কমেনি। আবাসে ও প্রবাসে ফরয তো দু'রাকআতই ছিল। আবাসে বেড়েছে, প্রবাসে যা ছিল তাই আছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর মাধ্যমে তোমাদের জন্য আবাসে চার রাকআত, প্রবাসে দু'রাকআত ও আপদে এক রাকআত নামায ফরয করেছেন। এ হাদীছও হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) হাদীছের সহায়ক। অবশ্য ইমাম মুসলিম ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর এ হাদীছটি একাই উধৃত করেছেন।

সফরের নামাযই দু'দু' রাকআত ঃ

হযরত উমর (রাঃ) বলেন—'নামায সফরে দু'রাকআত, জুমআয় দু'রাকআত ও ঈদে দু'রাকআত। আমাদের নবীর (সঃ) ফরমান দৃষ্টে এগুলোই পূর্ণ নামায, কসর নয়। এক্ষেত্রে যে মিথ্যার আশ্রয় নিল সে ব্যর্থ হল।' এটা বিশুদ্ধ হাদীছ। অন্য এক হাদীছে আছে, তিনি নবী

করীম (সঃ) কে প্রশ্ন করলেন—নিরাপদ প্রবাসেও কি কসর পড়তে হবে? নবী (সঃ) জবাব দিলেন—এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর দান। তাঁর এ দান কবুল কর। মূলত এ দু'হাদীছে কোন বিরোধ নেই। কারণ, নবী করীম (সঃ) এর জবাব থেকে তিনি জেনে গেলেন যে, সফরে চার রাকআতকে দু'রাকআত করা হয়নি; বরং তার নামাযই আল্লাহ দু'রাকআত নির্ধারণ করেছেন। তাই তিনি বললেন, নামায আবাসে চার রাকআত, প্রবাসে দু'রাকআত ও ঈদে দু'রাকআত, আর এগুলো সবই পূর্ণ নামায, কোনটিই কসর নয়।

তাই যারা তাঁর বরাত দিয়ে বলেন, সফরে কসর পড়া মুবাহ, যার ইচ্ছে পড়বে, যার ইচ্ছে পুরো পড়বে, এ দলীল ঠিক নয়। কারণ রসূল (সঃ) হামেশা সফরে দু'রাকআত পড়েছেন। আপদকালীন নামায শুধু তিনি একবার চার রাকআত পড়েছিলেন। পরে তা সবিস্তারে বলব।

হযরত উছমানের কার্যধারার ব্যাখ্যা ঃ

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন—আমরা রসূল (সঃ) এর সাথে মক্কা থেকে মদীনার পথে চললাম। তিনি মদীনায় পেঁছা পর্যন্ত দু'দু'রাকআত নামায পড়েছেন (সহীহদ্বয়)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ জানতে পেলেন, হযরত উছমান (রাঃ) মিনায় চার রাকআত নামায পড়েছেন, তখন 'ইন্নালিল্লাহ' পড়ে বললেন, আমি নবী করীম (সঃ) এর সাথে মিনায় দু'রাকআত নামায পড়েছি। আমি হযরত আবু বকরের (রাঃ) সাথে মিনায় দু'রাকআত নামায পড়েছি। তেমনি আমি হযরত উমরের (রাঃ) সাথে মিনায় দু'রাকআত নামায পড়েছি। হায়, এ চার রাকআতের দু'রাকআতই মকবুল নামায হত।

ওপরের বর্ণনাটি যদি বিশুদ্ধ হয়, তা হলে তার এক ব্যাখ্যা হল এই যে, হযরত উছমান (রাঃ) মিনায় সেবারে বিয়ে করেছিলেন। মাসআলা হল এই, সফরে কেউ যদি কোথাও অবস্থান নিয়ে বিয়ে করে, তা হলে সে সেখানে মুকীম হয়ে যায় এবং তাকে পূর্ণ নামায পড়তে হয়। নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণিত এক মারফু হাদীছ থেকে এ মাসআলা নেয়া হয়েছে।

ইকরামা ইবনে ইবরাহীম ইযদী আবু জিআব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন—হযরত উছমান (রাঃ) মিনায় চার রাকআত নামায পড়ে ঘোষণা করলেন—হে জনতা! আমি এখানে বিয়ে করেছি। আমি রসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি, যখন কেউ সফরে কোন শহরে বিয়ে করে, তখন সে সেখানে মুকীমের নামায পড়বে। ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে হাদীছটি বর্ণনা করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের হুমায়দীও তাঁর মুসনাদে হাদীছটি উধৃত করেন। ইমাম বায়হাকী হাদীছটিকে ছিন্নসূত্র ও দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বুখারী তাঁর ইতিহাসে হাদীছটি উধৃত করে তার ওপর কোন বিরূপ মন্তব্য করেন নি। অথচ হাদীছের ত্রুটি-বিচ্যুটি ও বর্ণনাকারীদের চুল চেড়া বিশ্লেষনই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইমাম আহমদ (রঃ) এর মাজহাব হল, মুসাফির যেখানে বিয়ে করবে, সেখানে সে মুকীমের নামায পড়বে। ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) ও তাঁদের অনুসারীদের মতও এটাই। সুতরাং হযরত উছমান (রাঃ) এর জন্য তো এ ওজর গ্রহণ-যোগ্য। তবে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) জন্য 'তিনি উম্মুল মু'মিনীন ছিলেন বলে যেখানে যেতেন সেটাই তাঁর ঘরবাড়ী ছিল' এ ব্যাখ্যাটি দুর্বল। কারণ নবী করীম (সঃ) উম্মতের বাপ ছিলেন। তাঁরই বদৌলতে উম্মুল মু'মিনীনরা উম্মতের মা হয়েছেন। তিনি তা বলে তো কখনও সফরে পুরো নামায পড়েন নি।

হিশাম ইবনে উরুয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—হযরত আয়েশা (রাঃ) সফরে চার রাকআত নামায পড়েছেন। আমি আরয করলাম—আহা, আপনি যদি দু'রাকআত পড়তেন। তিনি জবাবে বললেন—ভাতিজা! আমার জন্য তো এটা কষ্টকর হয় নি।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন—মুসাফিরের নামায দু'রাকআতই যদি হত, তা হলে হযরত উছমান (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) চার রাকআত পড়তেন কেন? তা ছাড়া মুকীমের সাথে কেন মুসাফিরের জন্য চার রাকআত বৈধ করা হল? পরন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন—রসূল (সঃ) পুরো নামাযও পড়েছেন, কসরও পড়েছেন। তা ছাড়া ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ তালহা ইবনে উমর থেকে, তিনি আতা ইবনে রিবাহ থেকে ও তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—নবী করীম (সঃ) সফরে পুরো নামাযও পড়েছেন, কসরও পড়ছেন।

ইমাম বায়হাকী বলেন—আতা থেকে মুগীরা ইবনে যিয়াদ অনুরূপ বর্ণনা করেন। আমার কাছে সব চাইতে বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেছেন আবু বকর হারিছী। তিনি দারে কুতনী থেকে, তিনি মুহাইল থেকে, তিনি সাঈদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আইয়ুব থেকে, তিনি আবু আসিম থেকে, তিনি উমর ইবনে সাঈদ থেকে, তিনি আতা থেকে ও তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল (সঃ) সফরে কসরও পড়তেন, পুরো নামাযও পড়তেন, আর রোযা রাখতেনও, রোযা ভাঙতেনও।

দারে কুতনী বলেন, সনদটি বিশুদ্ধ। তারপর তিনি আবু বকর নিশাপুরীর একটি বর্ণনা উধৃত করেন। নিশাপুরী আব্বাস দাওরী থেকে, তিনি আবু নঈম থেকে, তিনি আলা ইবনে যুহায়ের থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ থেকে ও তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করীম (সঃ) এর সংগে মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত উমরার সফর করেন। তখন তিনি আরয করেন—হে আল্লাহর রসূল! আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আমি এ সফরে কসরও করেছি, পুরোও পড়েছি। তেমনি রোযাও রেখেছি, রোযা ভংগও করেছি। রসূল (সঃ) বললেন, হে আয়েশা! তুমি ভাল কাজ করেছ।

আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ) কে বলতে শুনেছি, ঐ হাদীছটি হযরত আয়েশার (রাঃ) নামে মিথ্যা চালু করা হয়েছে। সঠিক কথা এই, হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের খেলাফ কোন কাজ করতে পারেন না। যখন তাঁদের তিনি কসর পড়তে দেখছেন, তখন বিনা কারণে কি করে তিনি পুরো নামায পড়তে পারেন? অথচ তিনিই বর্ণনা করেছেন যে, দু'রাকআত করেই নামায ফরয করা হয়েছিল। তারপর আবাসের নামাযে রাকআত বাড়ানো হয়েছে আর প্রবাসের নামায পূর্বানুরূপ রয়ে গেছে। তাই এটা কি করে ধারণা করা যায় যে, তিনি আল্লাহর নির্ধারিত ফরয উপেক্ষা করবেন এবং রসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরামের খেলাফ কাজ করবেন?

উমাইয়া ইবনে খালিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে বললেন—আমরা মুকীমের নামায ও আপদকালীন নামাযের কথা তো কুরআনে দেখতে পাই। কিন্তু মুসাফিরের নামায তো দেখি না। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বললেন—ভাই আমার! নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা রসূল (সঃ) কে প্রেরণ করেছেন। আমরা তো তখন কিছুই জানতাম না। তাই আমরা যেভাবে তাঁকে যা করতে দেখেছি, আমরাও তাই করি।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন—আমরা রসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে মক্কা শরীফ গেলাম। তিনি মদীনায় না ফেরা পর্যন্ত দু'রাকআত নামায পড়ছিলেন।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন—আমি রসূলুল্লাহর (সঃ) সফর সঙ্গী ছিলাম। তিনি, এবং আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), উছমান (রাঃ) তাদের কেউই দু'দু'রাকআতের বেশী নামায পড়েন নি। এ সব বর্ণনাই বিশুদ্ধ।

সফরে সুন্নাত জরুরী নয়ঃ

রসূল (সঃ) থেকে বিতর ও ফজরের সুন্নাত ছাড়া সফরে অন্য কোন সুন্নাত নামায পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন—আমি রসূলুল্লাহর সফর সঙ্গী ছিলাম। সফরে তিনি কখনও তাসবীহ (সুন্নাত) পড়তেন না। আর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহর ভিতর উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

রসূল (সঃ) সওয়ারীর ওপরে বসে নফল পড়তেন। যখন যেদিকে সওয়ারী ফিরত, তিনি সেদিকে ফিরেই নামায পড়তেন। সহীহদ্বয়ে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন—রসূল (সঃ) সফরে উটে বসে নফল নামায পড়তেন, তা উট যেদিকেই চলুক না কেন। এখানে নামায বলতে তিনি রাতের তাহাজ্জুদ ইত্যাদি বুঝিয়েছেন। কিন্তু ফরয নামায তিনি নেমে পড়তেন। তবে বিতর সওয়ারীতে বসে পড়তেন।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন—নবী করীম (সঃ) সফরে রাতে নফল পড়তেন। তবে ফরযে কসর করতেন।

সহীহদ্বয়ে আমের ইবনে রবীআ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি নবী করীম (সঃ) কে রাতের বেলায় উটের পিঠে বসে নফল পড়তে দেখেছেন। তা ছিল রাত জাগা নামায। মানে, তাহাজ্জুদ।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে রসূলুল্লাহর (সঃ) সফরে নফল পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন—সফরে নফল নামায পড়ায় কোন বাধা নেই।

হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহর (সঃ) সাহাবারা সফরে ফরযের আগে ও পরে নফল পড়তেন। এ রীতি হযরত উমর (রাঃ), আলী (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ), জাবির (রাঃ), আনাস (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবু জার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য হযরত ইবনে উমর (রাঃ) ফরযের আগে-পরে কোন নফল নামায পড়তেন না। হাঁ, মাঝ রাতে বিতরের সাথে নফল (তাহাজ্জুদ) পড়তেন।

মোট কথা নবী করীম (সঃ) এর অনুসৃত রীতি থেকে এটা স্পষ্ট জানা যায় যে, তিনি সফরে কসরের আগে-পরে কোন নফল নামায পড়তেন না। তবে তা পড়তে নিষেধও করতেন না। তা ছিল স্বেচ্ছাকৃত কাজ। কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

এখন প্রশ্ন দেখা দেয় হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীছ নিয়ে। তিনি বলেছেন, রসূল (সঃ) জুহরের আগে চার রাকআত ও পরে দু'রাকআত নামায কখনও বাদ দেন নি। সহীহ বুখারীতে বর্ণনাটি উদ্ধৃত হয়েছে। তার জবাব এই, উক্ত হাদীছ সফরেও তিনি বাদ দেন নি এরূপ কথা সুস্পষ্ট করে বলা হয়নি। মনে করা যেতে পারে, বুখারীর হাদীছে রসূল (সঃ) এর সাধারণ রীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এটা হল তাঁর মুকীম অবস্থায় নামাযের কথা। সফরের অবস্থা সম্পর্কে নারীর চাইতে নরের বেশী খবর রাখার কথা। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন, সফরে হযরত (সঃ) দু'রাকআতের বেশী নামায পড়তেন না। তাই ইবনে উমর (রাঃ) নিজেও ফরযের আগে-পরে কোন নামায পড়তেন না।

বাহনে নফল পড়ার বৈধতা ঃ

হযরত (সঃ) এর রীতি ছিল, তিনি সওয়ারীতে নফল নামায পড়তেন তার গতি যে দিকেই হোক না কেন। রুকু ও সিজদা ইশারায় করতেন, সিজদায় রুকুর চাইতে কিছুটা বেশী আনত হতেন।

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ হযরত আনাস (রাঃ) এর হাদীছ উদ্ধৃত করেন। হযরত (সঃ) তাকবীরে তাহরীমায় উটটি কিবলামুখী করে নিতেন। অবশিষ্ট নামায তিনি উট যেদিকে যেত সেদিকে ফিরেই আদায় করতেন। অবশ্য এ হাদীছে সংশয় রয়েছে। কারণ, যারাই সওয়ারীর ওপরের নামাযের অবস্থা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের সব বর্ণনাকারীই সাধারণভাবে বলে গেছেন যে, তিনি সওয়ারীর ওপর নামায পড়তেন তা যেদিকেই চলুক না কেন। তাতে তাকবীরে তাহরীমায় উটকে কিবলামুখী করে নেয়ার কথা নেই। আমের ইবনে রবীআ, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, জাবির

ইবনে আব্দুল্লাহ প্রমুখের বর্ণনা তার প্রমাণ। তাঁদের হাদীছ হযরত আনাস (রাঃ) এর হাদীছের চাইতে অধিকতর বিশুদ্ধ। আল্লাহই ভাল জানেন। হযরত (সঃ) উট ছাড়া অন্যান্য বাহনেও চড়েছেন। অবশ্য যদি এ সম্পর্কিত বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হয়। এ বর্ণনাটি হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এর সনদে ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ সংকলনে উদ্ধৃত করেছেন।

বৃষ্টি ও কাদার জন্য হযরত (সঃ) সাহাবাদের নিয়ে ফরয নামাযও সওয়ারীতে পড়েছেন বলে বর্ণিত আছে। বর্ণনার শুদ্ধাশুদ্ধি অবশ্য বিচার সাপেক্ষ।

ইমাম আহমদ, তিরমিজী ও নাসায়ী বর্ণনা করেন—নবী করীম (সঃ) সাহাবাদের নিয়ে এক সংকীর্ণ জাগায় উপনীত হন। উপরে বৃষ্টি ও নীচে কাদা ছিল। সে অবস্থায় নামাযের ওয়াক্ত হল। তিনি মুআজ্জিনকে আযান দিতে বললেন। মুআজ্জিন আযান ও ইকামত দিলে নবী করীম (সঃ) সওয়ারী নিয়ে আগে গেলেন এবং ইশারায় নামায পড়ালেন। রুকুর চেয়ে সিজদায় তিনি বেশী আনত হলেন।

ইমাম তিরমিজী বলেন—হাদীছটি 'গরীব' ও অন্যতম রাবী উমর ইবনে রুবাহ 'মুনফারাদ'। অবশ্য হযরত আনাস (রাঃ) এরূপ করেছেন।

দু'ওয়াক্তের সমাহার বৈধ ঃ

নবী করীম (সঃ) এর পবিত্র রীতি এটাই ছিল যে, তিনি সূর্য হেলার আগে সফরে বেরোলে জুহরকে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করে দু'ওয়াক্ত এক সংগে পড়তেন। যদি সূর্য হেলার পর সফর করতেন তা হলে জুহর পড়ে সফর শুরু করতেন। সফরে তাড়াহুড়া দেখা দিলে মাগরিবকে ইশার ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্বিত করে মাগরিব ও ইশা এক সংগে পড়ে নিতেন।

হাকাম বলেন—আমাকে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে বালুবিয়া, তাকে মুসা ইবনে হারুণ, তাকে কুতায়বা ইবনে সাঈদ, তাকে লায়েছ ইবনে সাঈদ—ইয়াযীদ ইবনে হাবীব থেকে, তিনি আবু তুফায়েল থেকে ও তিনি হযরত মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—নবী করীম (সঃ) তবুকের যুদ্ধে যখন লিপ্ত ছিলেন, তখন তিনি সূর্য হেলার আগে সফরে বের হলে জুহর বিলম্বিত করে আসরের সাথে পড়ে নিতেন। তবে যদি সূর্য হেলার পর সফর শুরু করতেন, তাহলে জুহর ও আসর এক সংগে পড়ে নিয়ে সফর শুরু করতেন। তেমনি যদি মাগরিবের আগে সফর শুরু করতেন, তা হলে মাগরিবকে বিলম্বিত করে ইশার ওয়াক্তে একত্রে পড়ে নিতেন। আর যদি মাগরিবের পর সফর শুরু করতেন তা হলে ইশাও মাগরিবের সাথে পড়ে নিতেন।

হাকাম বলেন, হাদীছটি বিশুদ্ধ এবং এর প্রত্যেক বর্ণনাকারী নির্ভর যোগ্য।

ইসাহাক ইবনে রাহবিয়া শাবাবা থেকে, তিনি লায়েছ থেকে, তিনি আকীল থেকে, তিনি ইবনে শিহাব থেকে ও তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এ বর্ণনা শুনেছেন যে, হযরত (সঃ) সফরে সূর্য হেলার পর জুহর ও আসর এক সংগে পড়ে নিতেন।

এ বর্ণনার সনদটিও সুস্পষ্ট। শাবাবা হলেন শাবাবা ইবনে সাওয়ার। তিনি নির্ভর-যোগ্য রাবী। তার বর্ণনা দলীল হবার ব্যাপারে মতৈক্য রয়েছে। ইমাম মুসলিমও তার বর্ণনা লায়েছ ইবনে সা'দের সূত্রে সহীহদ্বয়ের শর্ত মোতাবেক স্বীয় সংকলনে উধৃত করেছেন। সেটার ন্যূনতম মর্যাদা এই যে, তা থেকে হযরত মাআজের বর্ণনাটি শক্তি পায়।

আবু দাউদ (রঃ) বলেন—আমাকে শামস উরুয়া থেকে, তিনি হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ থেকে, তিনি কুরায়েব থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ও তিনি নবী করীম (সঃ) থেকে 'হাদীছে মুফাযযাল' অর্থাৎ 'জামউ তাকদীম' সম্পর্কিত হযরত মাআজের বর্ণনার মত বর্ণনা শুনিয়েছেন। তার ভাষ্যরূপ এই ঃ

হুসাইন ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্বাস কুরায়েব থেকে ও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—'আমি কি তোমাদের কাছে নবী করীম (সঃ) এর সফরকালীন নামাযের কথা বলব না? সফর শুরুতে যখন সূর্য ঢলে পড়ত, ঘর থেকে তিনি জুহর ও আসর এক সংগে পড়ে নিতেন। আর যখন সূর্য হেলার আগে বেরোতেন, তখন জুহর বিলম্বিত করে আসরের সাথে পড়তেন। বর্ণনা-কারী বলেন—আমার খেয়াল, তিনি মাগরিব ও ইশার ব্যাপারেও অনুরূপ বলেছেন।

ইসমাঈল ইবনে ইসহাক বলেন—আমাকে ইসমাঈল ইবনে আবু উয়ায়েস, তাকে তার ভাই, তিনি সুলায়মান ইবনে মালিক থেকে, তিনি হিশাম ইবনে উরুয়া থেকে, তিনি কুরায়েব থেকে ও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—রসূল (সঃ) যখন সফরে তাড়াহুড়ায় পড়ে যেতেন, তখন সূর্য হেলার আগেই সফরে বেরোতেন। সওয়ারীতে উঠে রওয়ানা হয়ে যেতেন। তারপর জুহরের ওয়াক্তে জুহর ও আসর এক সংগে পড়ে নিয়ে আবার বাহনে উঠতেন। যদি সূর্য হেলার পর রওয়ানা হতেন, তা'হলে জুহরের সাথে আসর পড়ে নিয়ে রওয়ানা হতেন। রওয়ানা হবার সময়ে যদি কখনও মাগরিবের ওয়াক্ত হত, তা হলে মাগরিব ও ইশা এক সংগে পড়ে সফরে বেরোতেন।

আবুল আব্বাস শুরায়েহ বলেন—আমাকে ইয়াহিয়া ইবনে আব্দুল হামীদ আবু খালিদ আহমার থেকে, তিনি হাজ্জাজ থেকে, তিনি হাকাম থেকে, তিনি মাকসাম থেকে ও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—নবী করীম (সঃ) যখন সূর্য হেলার পর সফরে বেরোতেন, তখন জুহর ও আসর এক সংগে পড়ে নিতেন। যদি সূর্য হেলার আগে

বেরোতেন তা'হলে জুহর বিলম্বিত করে আসরের ওয়াক্তে জুহর ও আসর একসংগে পড়ে নিতেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ) বলেন—এ ধরনের দু'ওয়াক্তের সমাহার আরাফায় তিনি যে জুহর ও আসর একত্রে পড়তেন তারই ইংগিত বহন করে। দোআর জন্য অবকাশ নেয়াই তার উদ্দেশ্য। তা ছাড়া সীমিত সময়ে আবার আলাদা আসর নামায আদায় কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় বলেই তা করা হয়। সুতরাং যে কোন অসুবিধাকর অবস্থায় প্রয়োজনে দু'ওয়াক্তের সমাহার উত্তম।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন—আরাফার দিনে আসর এগিয়ে আনা উত্তম। তা'হলে দোআর সাথে তার সন্নিবেশ ঘটে। তেমনি মুযদালিফায় মাগরিব বিলম্বিত করে ইশার সাথে পড়া উত্তম। অন্যথায় মাগরিব বিচ্ছিন্ন করে পড়া তখন খুবই কষ্টকর ব্যাপার।

সফরে বাহনে থাকা অবস্থায় হযরত (সঃ) দু'নামায একত্র করতেন বলে যারা মনে করে তাদের ধারণা ঠিক নয়। এও ঠিক নয় যে, তিনি অবতরণ কালে তা করতেন। এটা তো সেই সফরে করতেন যখন সফরে কোন তাড়াহুড়ার ব্যাপার থাকত।

আরাফা ছাড়া কেবলমাত্র সফরেই তিনি 'জামউ বাইনা সালাতাইন' করেছেন। আরাফায় করেছেন 'ওকুফ' এর সাথে উভয় নামাযের সংযোগ সাধনের জন্যে। ইমাম শাফেঈ (রঃ) ও ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ) তাই বলেছেন। এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা (রঃ) দু'ওয়াক্তের সম্মিলন শুধু আরাফাতের জন্যেই নির্দিষ্ট করেছেন এবং সেটাকে কুরবানীর পরিসমাপ্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর মতে 'জামউ বাইনা সালাতাইন' এর সাথে সফরের কোন সম্পর্ক নেই।

অবশ্য ইমাম আহমদ, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেঈ (রঃ) আরাফায় দু'নামায একত্রীকরণের কারণ হিসেবে সফরের কথাই বলেছেন। ফলে এ প্রশ্নে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম শাফেঈ (রঃ) ও ইমাম আহমদ (রঃ) দীর্ঘ সফরকে উহার কারণ নির্ণয় করেছেন। তাই মক্কাবাসির জন্য তারা তা বৈধ করেন নি। অপর এক বর্ণনা মতে, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (রঃ) মক্কাবাসির জন্য আরাফায় কসর ও দু'নামাযের সমন্বয় বৈধ বলেছেন। আমাদের শায়খুল ইসলাম এ মতই গ্রহণ করেছেন। আবু খাত্তাব ইবাদতে তা গ্রহণ করেছেন। শায়খুল ইসলাম সে মত প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি ছোট বড় সকল সফরেই কসর ও দু'নামাযের সমন্বয় জায়েয বলেছেন। পূর্বসূরী অধিকাংশের মাজহাব সেটাই। ইমাম মালিক ও আবু খাত্তাব তা মক্কাবাসির জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। অথচ নবী করীম (সঃ) গোটা উম্মতের জন্য সফরে কসর ও ইফতার (রোযা না রাখা) বৈধ করেছেন এবং তিনি সফরের কোন সীমারেখাও বলেন নি। তিনি সাধারণ সফর বলেই ছেড়ে দিয়েছেন। তেমনি সকল সফরেই তিনি তায়াম্মুমের সাধারণ অনুমতি দিয়েছেন, এ ধরনের কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা তাঁর থেকে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া সফর এক দিনের, দু'দিনের কি তিন দিনের বলে নির্দিষ্ট করার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা বিশুদ্ধ নয়।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

কুরআন তিলাওয়াত

হযরতের (সঃ) রীতি ছিল কুরআন তারতীলের সাথে পড়া। তিনি দ্রুত তিলাওয়াত করতেন না। প্রতিটি অক্ষর যথাযথ উচ্চারণের সাথে সুস্পষ্ট করে পড়তেন। তিলাওয়াতে প্রতি আয়াত শেষ করে থেমে যেতেন। মদযুক্ত অক্ষর টেনে পড়তেন। যেমন رحمن কি رحيم শব্দের তিনি যথাস্থানে টেনে পড়তেন। তিনি তিলাওয়াতের শুরুতে—اعوذ بالله من الشيطان الر جيم পড়তেন। কখনও বা ঃ

اللهم انى اعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه و نفخه و نفثه পড়তেন।

তিলাওয়াতের পূর্বে সর্বদা তিনি তাউজ, পড়তেন। অপরের কুরআন তিলাওয়াত শোনাও তিনি বেশ পসন্দ করতেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন কুরআন তিলাওয়াত করতে। তিনি তিলাওয়াত করছিলেন ও হযরত (সঃ) তা শুনছিলেন। তিলাওয়াত শুনতে শুনতে তাঁর দু'চোখ বাষ্পাকুল হল।

হযরত (সঃ) বসে, দাঁড়িয়ে, শুয়ে, ওযু করে, ওযু ছাড়া, এক কথায় ফরয গোসলের অবস্থা ছাড়া সব অবস্থায়ই তিলাওয়াত করতেন। অন্যকেও সে সব অবস্থায় তিলাওয়াত করতে নিষেধ করতেন না। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করতেন। কখনও কখনও তিনি তিলাওয়াতে 'তারজী' করতেন। মানে, আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হত। যেমন انا فتحنا لك فتحا পড়ার সময় তাঁর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হত। আব্দুল্লাহ ইবনে মুফাযযাল বলেন—হযরতের তারজী তিন আলিফ পরিমান ছিল (বুখারী)। এ সম্পর্কিত নিম্ন হাদীছগুলো প্রণিধান যোগ্য।

১। কুরআন পাককে নিজ আওয়াজ দিয়ে সুললিত কর।

২। যে ব্যক্তি সুর করে কুরআন পড়বেনা সে আমাদের দলের নয়।

৩। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে কুরআন তিলাওয়াতে সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যতখানি উদার অনুমতি দিয়েছেন তা আর কিছুতে দেন নি। তিনি কুরআনকে সুললিত সুরে তিলাওয়াতের অনুমতি দিয়েছেন।

এতে জানা গেল যে, নবী করীম (সঃ) এর তিলাওয়াতে তারজী উট চালাবার ক্ষেত্রে সৃষ্ট অস্থির আওয়াজ নয়; বরং তা ইচ্ছাকৃত সুস্থির আওয়াজ। কারণ তা যদি উট হাঁকাবার আওয়াজ হত, তা'হলে তা ইচ্ছাকৃত হতে পারত না। আর আব্দুল্লাহ ইবনে মুফাযযাল তার কাহিনী

বর্ণনা করতেন না। তা এই ঃ 'তারজী তিনি নিজ তৃপ্তির জন্য নিজে স্বেচ্ছায় করতেন। তাতে তিনি দেখতে পেতেন, তাঁর উটনীর গতি ক্ষিপ্র হয়ে গেছে। ফলে তিনি থেমে যেতেন।' তারপর তিনি বলেন—হযরত (সঃ) কিরাআতে তারজী করতেন। এ কারণেই এ কাজটি তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। উট চালাবার জন্য সেরূপ আওয়াজ করলে তা স্বেচ্ছাকৃত আওয়াজ হত না।

এক রাতে তিনি আবূ মূসা আশআরীর তিলাওয়াত শুনেন। আবূ মূসা (রাঃ) যখন তা জানতে পেলেন তখন বললেন—যদি জানতাম আপনি আমার তিলাওয়াত শুনছেন, তা হলে আপনার জন্যে যথাসাধ্য সুললিত ও সুন্দর আওয়াজে তিলাওয়াত করতাম এবং নিজ আওয়াজকে যতখানি সম্ভব আকর্ষণীয় করতাম।

আবূ দাউদ তাঁর সুনানে আব্দুল জব্বার ওয়ার্দ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন—আমি ইবনে আবূ মুলায়কাকে বলতে শুনেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ বলেছেন, আবূ লুবাবা (রাঃ) আমাদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তার পিছু ধরলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি তার ঘরে ঢুকে গেলেন। সহসা একটা বৃদ্ধ লোককে বলতে শুনলাম—আমি রসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি সুর দিয়ে তিলাওয়াত করবেনা, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

বর্ণনাকারী বলেন—তখন আমি ইবনে আবূ মুলায়কাকে বললাম, হে আবূ মুহাম্মদ! যদি কারো আওয়াজ সুন্দর না হয়, তা হলে সে কি করবে? তিনি জবাব দিলেন—যতখানি সম্ভব সে তা সুন্দর করতে চেষ্টা করবে।

আমার মতে ব্যাপারটির খোলামেলা আলোচনা দরকার। এ ব্যাপারে উম্মতের সব মতভেদ ও প্রত্যেক দলের মত ও যুক্তি এবং তার ভেতর সঠিক মত সম্পর্কে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। প্রসংগত আল্লাহ তা'আলার মদদ ও মেহেরবাণীতে এক্ষেত্রে সঠিক মাজহাব নির্ণীত হবে।

একদলের ধারণা, সুর করে কিরাআত পড়া মাকরূহ। এ মাজহাব ইমাম আহমদ (রঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ) প্রমুখের।

আলী ইবনে সাঈদের বর্ণনায় জানা যায়, ইমাম আহমদ (রঃ) সুর করে কিরাআত পাঠ সম্পর্কে বলেন—আমার এটা ভাল লাগে না; বরং এটা বিদআত। মারূযীর বর্ণনাতে তিনি বলেন—সুর করে কিরাআত পড়া বিদআত এবং তা শোনা উচিত নয়। আব্দুর রহমানের বর্ণনায়ও দেখা যায়, তিনি সুর দিয়ে কিরাআত পড়াকে বিদআত বলেছেন। তাঁর ছেলে আব্দুল্লাহ সহ ইউসুফ ইবনে মূসা, ইয়াকুব ইবনে হাব্বান, আছরাম ও ইব্রাহীম ইবনে হারিছের বর্ণনায় জানা যায়, ইলহানের কিরাআত সম্পর্কে তিনি বলেন—আমার কাছে তা ভাল লাগেনা। তবে হাঁ, যদি তা প্রাণ গলানো হয়, তা হলে ক্ষতি নেই। যেমন, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) পড়তেন।

সালেহর বর্ণনায় পাই, হযরত (সঃ) বলেছেন যে, কুরআনকে নিজ আওয়াজ দ্বারা আকর্ষণীয় কর। মানে, সুললিত কন্ঠে তিলাওয়াত কর। মারুযীর বর্ণনা মতে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা কোন নবীকে আওয়াজ সুন্দর করার ব্যাপারে যতখানি ব্যাপক অনুমোদন দিয়েছেন, তা আর কোন ব্যাপারে দেন নি। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সুর করে সুললিত কন্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করা। অপর এক বর্ণনা মতে তিনি বলেন—যে ব্যক্তি সুললিত কন্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করেনা, সে আমাদের দলের নয়।

তাই ইবনে আয়নিয়া বলেন—কুরআন সুর দিয়ে সুললিত কন্ঠে পড়া উচিত।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন—সুউচ্চ কন্ঠে তিলাওয়াত কর। তার সামনে সূরা ফাতিহা সম্পর্কিত ঘটনা ও তারজী সম্পর্কে মুআবিয়া ইবনে কুররার বর্ণনা তুলে ধরা হলে তিনি সেটাকে সুর দিয়ে পড়ার অর্থে গ্রহণ করতে রাযী হন নি। যে বর্ণনা দ্বারা সুরের অনুমোদন সম্পর্কে দলীল দেয়া হয়, সেটা তিনি মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

ইমাম মালিক (রঃ) থেকে ইবনে কাসিম বর্ণনা করেন—তাঁর কাছে নামাযে সুর দিয়ে কিরাআত পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন—আমার কাছে তা ভাল লাগে না। এ তো পাপ। মানুষ এভাবে গেয়ে পয়সা রোযগার করে।

সুর দেয়াকে যাঁরা মাকরূহ বলেছেন তাঁরা হলেন ঃ

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ), সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রাঃ), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ), কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ), হাসান (রাঃ), ইবনে সিরীন (রঃ) ও ইব্রাহীম নাখঈ (রঃ)।

আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ ইকবারী বলেন যে, এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে ঃ আমি ইমাম আহমদের কাছে সুর দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়ায় তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন—তোমার নাম কি? আমি বললাম—মুহাম্মদ। তিনি তখন বললেন—কেউ যদি তোমাকে মু-উ-হাম্মদ বলে ডাকে তো তুমি পসন্দ করবে?

কাযী আবু ইয়ালী (রঃ) বলেন—সুর দেয়াকে মাকরূহ বলাটা একটু বেশী মনে হয়।

হাসান ইবনে আব্দুল আযীয হারুলী বলেন—এক ব্যক্তি অসিয়ত করে গেল এবং মীরাছ হিসেবে সুললিত কন্ঠে তিলাওয়াতকারিনী এক দাসী রেখে গেল। আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, হারছ ইবনে মিসকীন ও আবু উবায়েদের কাছে জিজ্ঞেস করলাম—উক্ত দাসীটি আমি কিভাবে বিক্রী করব? তাঁরা জবাব দিলেন—সাধারণ দাসীর মতই সস্তা দামে তাকে বিক্রী কর। আমি তার ফলে সৃষ্ট ক্ষতির দিকগুলো তাদের খুলে বললাম। তারা তবুও বললেন—সাধারণ মূল্যে তাকে বেচে দাও। কাযী বলেন—তারা তা এজন্য বলেছেন যে, সেই দাসীটির তিলাওয়াত শোনা মাকরূহ ছিল। তাই তাকে গায়িকার দামে বিক্রী করা জায়েয মনে করেন নি।

ইবনে বাত্তাল বলেন—একদলের মত হল এই, গানের সুরে কুরআন পড়ার মানে হচ্ছে আকর্ষণীয় আওয়াজে তিলাওয়াত করা আর সুললিত কণ্ঠে তারজী করে তিলাওয়াত করা। তিনি এও বলেন—এটা হচ্ছে ইবনে মুবারক ও নযর ইবনে শুমায়েলের অভিমত।

সুর দিয়ে কুরআন পড়াকে যারা বৈধ বলেন, তাদের সম্পর্কে তাবারী (রঃ) হযরত উমর (রাঃ) থেকে এ দলীল পেশ করেন যে, তিনি আবু মুসা আশআরীকে বলতেন ঃ আমরা শুধু পরোয়ারদিগারের জিকির করি আর আবু মুসা তাঁকে সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করে। তারপর তিনি বলেন—কেউ যদি আবু মুসার মত সুর দিতে পারে তো তা ভাল।

সবচাইতে সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াত করতেন হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ)। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে বললেন—আমার সামনে অমুক সুরাটি পড়। তিনি তখন সেই সুরাটি পড়লেন। উমর (রা) তা শুনতে শুনতে কেঁদে ফেললেন ও বললেন ঃ আমার মনে হচ্ছিল, সুরাটি এইমাত্র নাযিল হল।

বর্ণনাকারী বলেন—হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) তার অনুমতি দিয়েছেন। আতা ইবনে আবু রিবাহ বলেন—আব্দুর রহমান ইবনে আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ রমযান মাসে মসজিদে সুললিত কণ্ঠের তিলাওয়াতকারী খুঁজতেন।

তাহাভী (রঃ) হযরত আবু হানীফা (রঃ) ও তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে বলেন যে, তাঁরা সুর দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুনতেন। মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল হাকীম বলেন—আমি আমার পিতা, ইমাম শাফেঈ (রঃ) ও ইউসুফ ইবনে আমর (রঃ) কে সুর দিয়ে পড়া কুরআন তিলাওয়াত শুনতে দেখেছি। ইবনে জারীর তাবারী (রঃ) এ মতই গ্রহণ করেছেন।

সুর বৈধকারীগণ বলেন—ইবনে জারীরের বক্তব্য এটাই প্রমাণ করে যে, হাদীছের তাৎপর্য হচ্ছে সুললিত কণ্ঠ ও রুচী সম্পন্ন সুর যেন তিলাওয়াতকারী ও শ্রোতাদের ভাবাকুল করে তোলে।

আবুল হাসান বাত্তাল বলেন—এ প্রশ্নে ইবনে আবু শায়বার বর্ণনাটিও সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তিনি যায়েদ ইবনে হাব্বাব থেকে, তিনি মুসা ইবনে আবি রিবাহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে ও তিনি উকবা ইবনে আমের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—"রসূল (সঃ) বলেছেন, কুরআন শিখ ও তা সুর দিয়ে পড় এবং তা লিখে রাখ। আমার জীবন যাঁর মুঠোয় তাঁর কসম করে বলছি, এ বস্তু খুব তাড়াতাড়ি স্মৃতি থেকে হারিয়ে যায়।

বর্ণনাকারী বলেন যে, উমর ইবনে আবি শায়বা বলেন—আবু আসিম নাবীলের কাছে সুর দিয়ে তিলাওয়াত সম্পর্কে ইবনে আয়নিয়ার এ ব্যাখ্যা তুলে ধরা হল যে, "তা থেকে استغنا। (বেপরোয়াই) চায়"। তিনি তার জবাবে বললেন—ইবনে আয়নিয়া মূলত কিছুই বলেন নি।

আমাকে ইবনে জারীজ, তাঁকে আতা ইবনে উবায়েদ ইবনে উমায়ের বর্ণনা করেন যে, হযরত

দাউদ (আঃ) এর কাছে 'মাগরাফা' (বাদ্যযন্ত্র) ছিল। তিনি তা নিয়ে সুর করে যবুর তিলাওয়াত করতেন। তিনি নিজেও কাঁদতেন আর অন্যান্যকেও কাঁদাতেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—হযরত দাউদ (আঃ) সত্তরটি সুরে যবুর তিলাওয়াত করতেন। তা তিনি এমনভাবে পড়তেন যে, শ্রোতারা অস্থির হয়ে যেত।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) এর কাছে ইবনে আয়নিয়ার ব্যাখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন—আমি তাকে বেশী জানি। তাঁর উদ্দেশ্য যদি استغنا হত, তা হলে বলতেন, من لم يستغن بالقران কিন্তু তিনি যখন يتغنى بالقران বলেছেন, তখন আমরা বুঝতে পেলাম যে, তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে تغنى বা সুর। তিনি বলেন, সুললিত আওয়াজ ও আকর্ষণীয় তিলাওয়াত অন্তরে প্রভাব সৃষ্টিকারী, শ্রুতিমধুর, ও আগ্রহ উদ্দীপক হয়ে থাকে। মূলত এ পদ্ধতির মাধ্যমে শব্দাবলী ও তার তাৎপর্য শ্রোতাদের অন্তরে গেঁথে যায়। ফলে উদ্দেশ্য অর্জনে তা সহায়ক হয়। এ যেন মিষ্টির ভেতরে মেখে তিক্ত দাওয়াই সেবন। রোগীরা সাগ্রহে তা সেবন করে সহজে রোগমুক্ত হয়। একটি নারী যেভাবে সুগন্ধী, অলংকার ও সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ দিয়ে নরের চিত্ত জয় করে বিয়ের লক্ষ্য অর্জন করে, এও তেমনি।

তিনি আরও বলেন—যেহেতু কথার দিকে আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে মানুষের জন্য সুর একটি অপরিহার্য মাধ্যম, তাই সুরকে গানের বাহন না করে কুরআনের বাহন করা হল। হারাম ও মাকরূহ বস্তুকে সেরূপ ভাল বস্তু দ্বারা বদল করা হয়েছে। যেমন, তীরের মাধ্যমে বন্টনকে ইস্তিখারার মাধ্যমে বন্টন দ্বারা বদল করা হয়েছে, ব্যভিচারের স্থলে বিবাহ চালু করা হয়েছে, জুয়ার বদলে নিযা নিক্ষেপ প্রতিযোগীতা ও শয়তানী গানের বদলে রহমানী তিলাওয়াত চালু করা হয়েছে। এ ধরনের উদাহরণ প্রচুর রয়েছে। হারাম বস্তুর অধিকাংশ কিংবা সম্পূর্ণই ক্ষতিকর হয়। কিন্তু সুর দিয়ে কুরআন তিলাওয়াতে ক্ষতির বদলে কুরআনের প্রতি লোকের আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তা ছাড়া যেহেতু সুরেলা কথাও কথাই, তাই শ্রোতার তা বুঝতেও অসুবিধে হয় না; বরং সহজেই তা হৃদয়ংগম হয়ে থাকে।

একদল লোক বলেন—সুর ও স্পন্দন শব্দাবলীর রূপ বদলে ফেলে। ফলে শ্রোতার বুঝতে বাধা সৃষ্টি হয়। আমি বুঝিনা এর অর্থ কি? বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সুর ও স্পন্দন এমন এক ব্যাপার যা কখনও অবস্থা, কখনও রীতি ও কখনও প্রভাব প্রকাশ করে। কখনও ভাবভংগী ও কৃত্রিম পন্থায় তা ব্যক্ত করে। তা বলে মূল বাক্য ও শব্দাবলীর রূপ বদলায় না। কারণ, সুর ও স্পন্দনের সম্পর্ক তো আওয়াজের সাথে। আওয়াজ মোটা কি চিকন করা আর দীর্ঘ কি হ্রস্ব করা তার কাজ। কিন্তু ইমালা বা মদ্দে তবীল ও মদ্দে মুতাও-য়াসসাত ইত্যাদি তো শব্দাবলীর সাথে সংশ্লিষ্ট। সুর ও স্পন্দনের সৃষ্ট অবস্থার প্রভাব তো ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে শব্দাবলীর দীর্ঘ-হ্রস্ব ইত্যাদি অবস্থার তো কিছুটা বর্ণনা দেয়া যায়। আমরা তা ব্যক্ত করার জন্য অক্ষরও ঠিক করে থাকি। অবশ্য তা উদ্দেশ্য পূর্ণভাবে প্রকাশে সমর্থ নয়। তথাপি যথাসাধ্য মোটামুটি প্রকাশ পায়। যেমন সুরা ফাত্হএ হযরত (সঃ) এর তারজীকে তিন হামযাহ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

তিলাওয়াতে সুর ও স্পন্দন দু'ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ঃ 'মদ ও তারজী'। নবীয়ে পাক (সঃ) থেকে প্রকাশিত আছে যে, তিনি 'রাহমা-ন ও রাহী-ম' পড়ার সময়ে 'মদ' করে টেনে পড়েছেন। তাঁর তারজীর কথা আগেই বলা হয়েছে।

সুর অবৈধকারীরা কয়েকটি দলীল পেশ করেন। এক, হযরত হুজায়ফা ইয়ামানীর (রাঃ) বর্ণনা। তিনি নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ 'কুরআন আরবী স্বর ও সুরে তিলাওয়াত কর এবং আহলে কিতাব ও ফাসিকদের সুর থেকে দূরে থাক। কারণ, আমার পরে অচিরে এমন জাতি আসবে যারা কুরআনকে গান ও বিলাপের সুরে তিলাওয়াত করবে। কুরআন তাদের হলকের বাইরে আসবে না। তাদের অন্তর ফিতনায় ভরপুর থাকবে। যারা তা শুনবে তাদের অন্তরও তদ্রূপ হবে।

হাদীছটি আবুল হাসান ও যররীন 'তাজরীদুস সিহাহ' গ্রন্থে ও আবু আব্দুল্লাহ হাকীম তিরমিজী 'নুরুল অসুল' গ্রন্থে উধৃত করেছেন।

কাযী আবু ইয়ালী (রঃ) তাঁর 'জামে' গ্রন্থেও তা উধৃত করেন। তিনি তার সাথে আরও একটি হাদীছ উধৃত করে দলীল পেশ করেছেন। তাতে নবী করীম (সঃ) কিয়ামতের শর্তাবলী উল্লেখ প্রসংগে বলেছেন—'কুরআনকে তখন গান হিসাবে ব্যবহার করা হবে। যে ব্যক্তির না আছে তেমন ইলম আর না আছে আমল, সেও কুরআনকে গান বানিয়ে (কারী সেজে) গেয়ে বেড়াবে।' তাঁর উধৃত অপর এক বর্ণনায় আছে, 'যিয়াদ নাহদী হযরত আনাস (রাঃ) এর নিকট এক কারীকে নিয়ে এলেন। তাকে বলা হল—তুমি পড়। সে উ'চু গলায় কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পড়ল। আনাস (রাঃ) এর চেহারা কালো ও বিবর্ণ হয়ে গেল এবং বললেন—হে ব্যক্তি! তিনি তো এভাবে পড়তেন না।'

কোন ভুল কাজ দেখলে হযরত আনাস (রাঃ) এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। বর্ণিত আছে, নবী করীম (সঃ) কাঁপা গলায় আজান দেয়ার মুআজ্জিনকে আজান দিতে নিষেধ করেছেন। যেমন ইবনে জারীজ আতা থেকে ও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—নবী করীম (সঃ) এর কাছে কাঁপা গলায় আজান দেয়ার এক মুআজ্জিন ছিল। তিনি তাকে বললেন—আজান তো সহজ সরল কথা। তোমার আজান যদি সহজ সরল হয় তা হলে দাও, তা না হলে দিও না (দারে কুতনী)।

হাফিয আব্দুল গণী ইবনে সাঈদ কাতাদাহ থেকে, তিনি আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) থেকে ও তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন—রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কিরাআত টানা হত, কিন্তু তারজী হত না।

বর্ণিত আছে, তারজী ও তাতরীবে হামযাহ ও মদ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে থাকে। এক আলিফের তারজীতে কয়েক আলিফ ও এক 'ইয়া'র তারজীতে কয়েক 'ইয়া' এসে যায়। এটা কুরআনের ওপর বাড়াবাড়ি বিধায় অবৈধ।

পূর্বসূরীদের খবর যারা রাখেন তারা অবশ্যই জানেন যে, গানের সুরে বিকৃতভাবে কুরআন তিলাওয়াত তাঁরা পসন্দ করতেন না। সীমিত যে কটি শব্দ টেনে বা ইমালা করে পড়তে হত, তারা তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পড়তেন।

এটাও জানা কথা যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) সুললিত কণ্ঠে কাঁপা সুরে কুরআন পড়তেন। কখনও তাঁরা ভাবগম্ভীর কণ্ঠে তিলাওয়াত করতেন, কখনও অত্যন্ত মহব্বতের সংগে কাঁপা সুরে পড়তেন। এটা এমন এক ব্যাপার যা মন মেজাজের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে ঘটে থাকে। মানুষের প্রকৃতির সহজাত আবেগের সাথে এর গভীর সম্পর্ক বিধায় বিধায়ক (সঃ) এ ব্যাপারে তাঁদের নিষেধ করেননি; বরং এ ব্যাপারে ইরশাদ করেন—যে ব্যক্তি যেভাবে তিলাওয়াত করে, স্বয়ং আল্লাহ্ পাক তাঁর তিলাওয়াত শোনেন। তিনি আরও বলেন—কুরআন যে ব্যক্তি সুর দিয়ে পড়েনা, সে আমার দলের নয়।

এ বর্ণনাটির দু'টো দিক রয়েছে। একটা হল যা বাস্তবে ঘটছে, আমরা সবাই যা করছি। দুই, তা যেন কোনমতেই রসূলে পাক (সঃ) এর সুন্নতের পরিপন্থী না হয়।

বিংশ পরিচ্ছেদ

●

রুগ্নের সেবা

অমুসলিম ভৃত্যের সেবা ঃ

সাহাবায়ে কিরামের কেউ রুগ্ন হলে রসূলুল্লাহ (সঃ) তার সেবা-সুশ্রূষার জন্য হাযির হতেন।

হযরতের (সঃ) একজন ভৃত্য ছিলেন পূর্ব গ্রন্থানুসারী। তিনি তারও সেবা করেছেন। তিনি তাঁর মুশরিক চাচার সেবা করেছেন। তিনি উভয়ের কাছেই ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছেন। ইয়াহুদী ভৃত্যটি মুসলমান হয়েছিল।

তিনি রোগীর কাছে পেঁছে তার শিয়রের কাছে বসতেন। রোগীর অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। রোগীকেও প্রশ্ন করতেন—তুমি এখন কেমন আছ ?

বর্ণিত আছে, তিনি রোগীকে জিজ্ঞেস করতেন—তোমার কি প্রয়োজন ? তোমার কি-কোন কিছু খেতে ইচ্ছা করে ? যদি রোগী কিছু খেতে চাইত, আর যদি বুঝতেন তাতে রোগীর ক্ষতি হবে না, তা হলে তিনি তা খাওয়াবার ব্যবস্থা করতেন। তিনি রোগীর ওপর ডান হাত বুলাতেন এবং নিম্ন দোআ পড়তেন ঃ

ا للهم رب ا لناس ا ذ هب ا لبـاس و ا شف ا نت ا لشا فی لا شفاء ا لا شفا ء ک لا یغا د ر سقما .

"হে আল্লাহ! হে মানুষের প্রতিপালক! দুঃখ দূর কর। সুস্থতা দান কর। তুমিই সুস্থতা দানকারী। তুমি ছাড়া কোথাও রোগমুক্তি মিলবে না। এমন সুস্থতা দাও যেন কোন-রূপ রোগ না থাকে।"

তিনি নিম্ন দোআও পড়তেন ঃ

ا مسح ا لبـا س رب ا لنا س بيد ک ا لشفا ء لا کا شف له ا لا ا نت

"হে মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর কর। তোমারই হাতে নিরাময়তা। তুমি ছাড়া এ রোগবন্ধন কেউ খুলতে পারবে না।"

রোগীর জন্য তিনি তিনবার দোআ করতেন। যেমন হযরত সা'দ (রাঃ) এর জন্য দোআ করেছেন—হে আল্লাহ! তুমি সা'দকে রোগমুক্ত কর। হে আল্লাহ! তুমি সা'দকে রোগমুক্ত কর। হে আল্লাহ! তুমি সা'দকে রোগমুক্ত কর।

রোগীর কাছে গিয়ে তিনি বলতেন—কোন ভাবনা নেই। ইনশাআল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে। কখনও তিনি বলতেন—এ অসুখ পাপের কাফ্ফারা হয়ে যাবে, পাপ থেকে পবিত্র করে দেবে।

কারো যদি জখম বা ফোড়া হত, তিনি তাতে ফুঁ দিতেন। তখন শাহাদত আংগুল মাটিতে রেখে পরে তুলতেন ও পড়তেন ঃ

بسم الله تربة ارضنا بريقة بعضنا يشفى سقيما باذن ربنا

"আল্লাহর নামে আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো থুথুর বদৌলতে আমাদের প্রতিপালকের ইচ্ছায় আমাদের নিরাময় করবে।

সহীহদ্বয়ে এটা বর্ণিত রয়েছে। এ বর্ণনাটি অপর একটি বর্ণনার বিরোধী প্রতিভাত হয়। তাতে আছে, সত্তর হাজার এমন লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবেন যারা ফুঁ দেয়নি এবং নেয়ওনি। ঘটনা এই যে, বর্ণনাটিতে لا يرقون (ফুঁ দিবেনা) কথাটি মূলত বর্ণনাকারীর ভ্রমাত্মক সংযোজন। আমি শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াকে বলতে শুনেছি, হাদীছটি ও ভাবে নয়, বরং এ ভাবে হবে'। মানে তারা 'ঝাড়ফুঁক করাবেনা।' আমি (ইবনে কাইয়েম) বলছি, তারা এ জন্য জান্নাতে যাবে যে, তারা পরিপূর্ণ তাওহিদী হবে, নিজ প্রতিপালকের ওপর তারা পূর্ণ ভরসা করবে, তাঁরই স্মরণে শান্তি পাবে, তাঁর যে কোন ব্যবস্থায়ই সন্তুষ্ট থাকবে এবং তাদের যা কিছু প্রয়োজন সব তারই কাছে চাইবে। শুধু মানুষের ঝাড়-ফুঁক নয়, কোন কিছুরই তারা মানুষের কাছে প্রত্যাশী হবেনা। কোন কুসংস্কারই তাদের অন্তরে ঠাঁই পাবেনা। কারণ, কুসংস্কার তাওহীদকে পংগু ও দুর্বল করে দেয়।

শায়খুল ইসলাম বলেন—ফুঁ দাতা উপকারী ও ফুঁ গ্রহিতা উপকার প্রার্থী। নবী করীম (সঃ) উপকারী হয়েছিলেন, উপকারপ্রার্থী হন নি। তিনি আরও বলেন—তোমরা যদি কারো উপকার করতে পার তো অবশ্যই তা করা উচিত।

যদি প্রশ্ন করা হয়, সহীহদ্বয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছের কি জবাব হবে? তিনি বলেছেন—রসূল (সঃ) বিছানায় শুতে গিয়ে দু'হাত একত্র করে তিন কুল (কুলহুয়াল্লাহ, কুল আউজু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউজু বিরাব্বিন্নাস) পড়ে ফুঁ দিয়ে মাথা ও চেহারা হতে শুরু করে দেহের সম্মুখভাগ দু'হাতে মুছে দিতেন এবং এভাবে তিনি তিনবার করতেন। যখন তিনি রুগ্ন হতেন তখন আমাকে সেভাবে করে দেবার জন্য নির্দেশ দিতেন।

এক জবাব এই যে, বর্ণনাটি আরও তিনভাবে বর্ণিত হয়েছে। এক, যেভাবে ওপরে বর্ণিত হল। দুই, তিনি তাঁর দেহে ফুঁ নিতেন। তিন, হযরত আয়েশা (রাঃ) ফুঁ দিতেন ও হযরত (সঃ) নিজে দেহের ওপর পবিত্র হাত বুলিয়ে নিতেন। চার, অসুস্থ অবস্থায় তিনি নিজেই আউজুদ্বয় পড়তেন ও ফুঁ দিতেন। মূলত বর্ণনাগুলো একে অপরের পরিপূরক ও ব্যাখ্যাতা। নবী করীম (সঃ) নিজেই নিজের ওপর ফুঁ দিতেন। তবে অসুস্থতাজনিত দুর্বলতার কারণে

নিজেই নিজ পবিত্র দেহের ওপর হাত ফিরাতে পারতেন না বলে উম্মুল মু'মিনীনের সাহায্য নিতেন হাত ফিরিয়ে দেবার ব্যাপারে। তা হলে এটা ফুঁ নেয়ার ব্যাপার হলনা। কারণ, আয়েশা (রাঃ) তা হলে বলতেন যে, 'আমাকে তিনি ফুঁ দিতে নির্দেশ দেন।' বরং হযরত (সঃ) নিজেই নিজ দেহে ফুঁ দিতেন ও আয়েশা (রাঃ) কে বলতেন তার দুর্বল হাত দু'টো দেহের ওপরে ফিরিয়ে দিতে। তাই তিনি বললেন—আমাকে তিনি নির্দেশ দিলেন, তিনি যেভাবে করতেন সেভাবে করিয়ে দিতে।

রুগ্নের সেবার জন্য হযরত (সঃ) কোন দিন বা সময় নির্দিষ্ট করতেন না। বরং তিনি দিন রাতের যে কোন সময়ে রোগীর সেবা করতেন।

মুসনাদে বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) বলেছেন, যখন কোন লোক তার এক মুসলিম ভাইয়ের রোগে সেবা সুশ্রূষা করে, তখন সে যেন জান্নাতের বাগিচায় চলাফেরা করে। তারপর যখন সে বসে, তখন আল্লাহর রহমত তাকে আচ্ছাদিত করে। যদি সকালে সেবা করে, তা হলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দোআ করে। আর যদি রাতে সেবা করে, তা হলে সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য সকাল পর্যন্ত রহমতের দোআ করতে থাকে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানের রোগ সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা রহমতের দোআ করতে সত্তর হাজার ফেরেশতা পাঠান। যদি দিনে সেবা করে তো সন্ধ্যা পর্যন্ত ও রাতে সেবা করলে সকাল পর্যন্ত দোআ করতে থাকে।

হযরত (সঃ) চক্ষুরোগীরও সেবা করতেন। কখনও তিনি যে কোন রোগীর কপালে হাত রাখতেন। তারপর তার বুকে ও পেটে হাত বুলাতেন এবং দোআ করতেন—হে আল্লাহ! তাকে নিরাময় কর।

তিনি রোগীর মুখমণ্ডলেও হাত বুলাতেন। যখন তিনি রোগীর ব্যাপারে হতাশ হতেন তো পড়তেন:

انا لله وانا اليه راجعون

"নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী।"

একাবিংশ পরিচ্ছেদ

জানাযার নামায

জানাযার ব্যাপারে হযরত (সঃ) এর পবিত্র রীতি অন্য যে কোন নবীর উম্মতের তুলনায় পরিপূর্ণ ও উত্তম এবং তাতে মৃতের সাথে সর্বাধিক ইহসান করা হয়।

জানাযায় তিনি এমন পদ্ধতি অনুসরণ করতেন যাতে মৃতের কবরে ও হাশরে কল্যাণ দেখা দেয়। তেমনি তার পরিবার ও আত্মীয় স্বজনেরও যেন শোক প্রশমিত হয়। পরন্তু যারা জীবিত রয়েছে তাদেরও যাতে কোন কষ্ট না হয় সে ব্যবস্থাই তাতে রয়েছে।

জানাযায়ও হযরত (সঃ) আল্লাহ পাকের ইবাদত পূর্ণরূপে বহাল করেছেন। সাথে সাথে মৃতের প্রতি ইহসান পূর্ণত্বে পৌঁছিয়েছেন এবং তাকে আল্লাহ পাকের দরবারে উত্তমভাবে পেশ করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) শ্রেণীবদ্ধ হয়ে জানাযা নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, আল্লাহ তা'আলার গুণ-কীর্তন করতেন, মৃতের জন্য দোআ করতেন, তার জন্য মাগফিরাত ও রহমত কামনা করতেন। তারপর লাশের সাথে কবর পর্যন্ত যেতেন এবং কবরে রেখে বিদায় নিতেন। বিদায়ের প্রাক্কালে হযরত (সঃ) সাহাবায়ে কিরাম সহ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মৃতের জন্য সেই দোআ করতেন যা তার জন্য তখন প্রয়োজন। তারপরও মাঝে মাঝে তিনি কবরস্তানে গিয়ে মৃতকে সালাম ও দোআ করে আসতেন। এ যেন কোন এক জীবিত ব্যক্তির সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য মাঝে মধ্যে দেখা শোনা ও কুশল কামনা করা।

মূলত মৃত্যুপথগামী রুগ্নের সাথে হযরতের (সঃ) আচরণ ছিল এই যে, তিনি তাকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন এবং ওসিয়ত ও তওবা করার জন্য নির্দেশ দিতেন। শেষ মুহূর্তে তাকে কালিমায়ে তাইয়েবা তালকীন দিতেন যেন দুনিয়ায় তার শেষ কথা হয়—'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

মৃতের ব্যাপারে তিনি পরকালে অবিশ্বাসীদের আচার অনুষ্ঠান অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, মুখ ও বুক চাপড়ানো, কাপড় ছিন্ন বিছিন্ন করা, মাথা কামানো, সুউচ্চ কণ্ঠে বিলাপ করা ইত্যাদি।

মৃতের জন্য সুন্নত তরীকা হল নীরবে ক্রন্দন ও অশ্রু বর্ষণ এবং দুঃখভারাক্রান্ত ও বিনয়াবনত হওয়া। হযরত (সঃ) নিজেও তাই করতেন। তিনি বলতেন, চোখে পানি ঝরছে, অন্তর বিষন্ন হচ্ছে আর মুখে তাই বলছি যাতে পরোয়ারদিগার খুশী হন।

এ ক্ষেত্রে তিনি উম্মতের জন্য শোকাহত না হয়ে আল্লাহর গুণ-কীর্তন ও ইস্তিরজা (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন) সুন্নত করেছেন। আল্লাহ যা করেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকার সাথে বিষন্ন অন্তরে নীরবে অশ্রুপাতের কোন বিরোধ নেই। এ কারণেই তিনি গোটা মানব জাতির ভেতরে সর্বাধিক আল্লাহর প্রশংসাকারী ও আল্লাহর সর্ব ব্যবস্থায় হৃষ্টচিত্ত ছিলেন। তাঁর সাহেবযাদা ইব্রাহীম (আঃ) এর মৃত্যুতে অত্যধিক মহব্বতের বশে তিনি কেঁদে ফেললেন। তথাপি অন্তর তাঁর আল্লাহর ব্যবস্থায় প্রশান্ত ও সকৃতজ্ঞ ছিল এবং ছিল আল্লাহর জিকর ও হামদে মুখর।

কিছু লোক সমস্যায় পড়ে যায় যে, এক দরবেশের ছেলে মারা যাওয়ায় তিনি হাসছিলেন। প্রশ্ন করা হল, এ অবস্থায় আপনি হাসছেন? তিনি জবাব দিলেন—আল্লাহ পাক আমার ব্যাপারে যা ফয়সালা করেছেন আমি তাতে খুশী থাকতে চাচ্ছি।

এখানে সমস্যা এই যে, রসূল (সঃ) যেখানে তাঁর সন্তানের ইন্তেকালে কাঁদলেন, সেখানে দরবেশ হাসলেন। তা হলে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তোষ প্রকাশের কোন পদ্ধতিটি ঠিক? অথচ রসূল (সঃ) আল্লাহর ফয়সালায় সন্তোষ প্রকাশের ক্ষেত্রে নিখিল সৃষ্টির চেয়েও অগ্রগামী ছিলেন।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াকে (রঃ) বলতে শুনেছি যে, উক্ত দরবেশের সন্তোষ প্রকাশের চেয়ে রসূলে পাক (সঃ) এর সন্তোষ প্রকাশ পূর্ণাংগ ছিল। কারণ, রসূল (সঃ) সেক্ষেত্রে হাক্কুল্লাহ ও হাক্কুল ইবাদ দুটোই সমানে পূর্ণ করেছেন। অথচ দরবেশ হাক্কুল্লাহ আদায় করতে গিয়ে হাক্কুল ইবাদ ভুলে গেছেন। কারণ, হযরতের (সঃ) অন্তর এতই প্রশস্ত ছিল যে, সন্তানের পিতৃস্নেহের দাবী ও আল্লাহর প্রতি সন্তোষ প্রকাশের দাবী তাতে একই সংগে পূর্ণ হবার সুযোগ ছিল। পক্ষান্তরে দরবেশের অন্তরে সেই প্রশস্ততা ছিল না। ফলে তার পক্ষে একটি দাবীই পূরণ করা সম্ভব হয়েছে, অন্যটি হয় নি। তার সন্তোষের বন্দেগী রহমতের বন্দেগীর পথে বাধ সেধেছে।

মৃতের গোসল ও কাফন ঃ

নবী করীম (সঃ) এর পবিত্র সুন্নাত এটাই ছিল যে, মৃতের গোসল, কাফন ও খোশবু লাগানোর কাজ তিনি দ্রুত সম্পন্ন করতে বলতেন এবং সাদা কাপড়ে কাফনের ব্যবস্থা করতেন। মৃতকে সাজিয়ে নিয়ে আসার পর তাঁকে খবর দেয়া হত। তিনি তাশরীফ এনে মৃতের পাশে দাঁড়াতেন। মৃতের তাজহীয সম্পন্ন হলেই তিনি জানাযার নামায শুরু করতেন এবং মৃতকে কবর পর্যন্ত পেঁৗছে দিতেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) অনুভব করলেন যে, এতখানি করা হযরত (সঃ) এর জন্য কষ্টকর হয়। তাই তারা মৃতের তাজহীয ও তাকফীন সম্পন্ন করে মরণখাটে তুলে জানাযার জন্য প্রস্তুত করে নবী করীম (সঃ) কে খবর দিতেন। তিনি তখন এসে জানাযা পড়াতেন।

Contents

মসজিদে জানাযা ঃ

হযরত (সঃ) সাধারণত মসজিদে জানাযা পড়তেন না। মসজিদের বাইরে জানাযা পড়তেন। কখনও তিনি মসজিদে জানাযা পড়েছেন। যেমন সহল ইবনে বায়যা ও তার ভাইয়ের জানাযা তিনি মসজিদে পড়েছেন। এটা ব্যতিক্রম ঘটনা। তাঁর সুন্নাত ও রীতি ছিল মসজিদের বাইরে জানাযা পড়া।

সুনানে আবু দাউদে তাওয়ামার মুক্তদাস সালেহ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন—রসুল (সঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযা পড়বে, সে কিছুই পাবেনা।

অবশ্য বর্ণনার ভাষায় বেশ কম রয়েছে। খতীব তাঁর গ্রন্থে যা উধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে, তার ওপর কিছুই নেই। অন্য বর্ণনায় আছে, তার জন্যে কিছুই নেই। ইবনে মাজার বর্ণনায় আছে فليس له شئ অর্থাৎ তার জন্য কিছুই নেই। ইমাম আহমদ (রঃ) প্রমুখ হাদীছটিকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমদ বলেন—তাওয়ামার মুক্তদাস সালেহ নিঃসংগ বর্ণনাকারী (মুনফারাদ)। ইমাম বায়হাকী বলেন—বর্ণনাটি সালেহ একা করে থাকলেও সে নির্ভরযোগ্য রাবী। তবে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনাটি অধিকতর বিশুদ্ধ। সালেহর বক্তব্যে তারতম্যও রয়েছে। তাই মালিক (রঃ)ও সেটার সমালোচনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনা মতে হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) মসজিদে জানাযা নামায পড়েছেন।

আমি বলছি, সালেহ ব্যক্তিগতভাবে নির্ভরযোগ্য রাবী। ইবনে মুঈন থেকে আব্বাসও এ কথা বলেছেন। ইবনে আবু মরিয়াম ও ইয়াহিয়া বলেন—নির্ভরযোগ্য রাবীর বর্ণনা দলীল হতে পারে। আমি বলেছি যে, মালিক (রঃ) তাকে বর্জন করেছেন। ইবনে আবু মরিয়াম বলেন—মালিক (রঃ) তাকে অতি বার্ধক্যাবস্থায় পেয়েছে বিধায় তখন তার হুঁশজ্ঞান কিছুটা লোপ পেতে দেখেছেন। ছাওরী (রঃ)ও তাকে তখনই পেয়েছেন। কিন্তু ইবনে আবু জুওয়ায়ের (রঃ) তাকে আরও আগে পেয়েছেন ও তখন তার থেকে হাদীছ শুনেছেন। আলী ইবনে মাদিনী বলেন—সালেহ ছিকাহ রাবী। তবে হাঁ, শেষ বয়সে তিনি বেখেয়াল হয়ে গিয়েছিলেন। ছাওরী (রঃ) তার থেকে তখন হাদীছ শুনেছেন। তবে ইবনে আবু জুওয়ায়ের শুনেছেন তারও আগে। ইবনে হাব্বান বলেন—তিনি বেখেয়াল হয়েছেন একশ পঁচিশ বছর বয়সে। ফলে তিনি ছিকাহ রাবী হয়েও এমন সব বর্ণনা শুরু করলেন যা মওযু হাদীছের সাথে মিলে যায়। এর ফলে তার আগের ও পরের হাদীছেও তাল-গোল পাকিয়ে যায়। সেগুলোর ভেতর পার্থক্য সৃষ্টি কঠিন হয়ে দাড়ায় বলেই তাকে বর্জন করা উত্তম।

খাত্তাবী (রঃ) বলেন—এটা সুপ্রমাণিত সত্য যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) মসজিদে জানাযা পড়েছেন। এটাও জানা কথা, আনসার ও মুহাজির সাহাবাগণ

সাধারণত তাতে শরীক হয়েছেন। যেহেতু কেউ তাতে আপত্তি তোলেন নি, এটাই মসজিদে জানাযা নামায বৈধ হবার দলীল। তিনি আরও বলেন—আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সালেহর বর্ণিত হাদীছ মেনে নিলেও এ ব্যাখ্যা হতে পারে যে, তাতে ছওয়াব কম হবে। তা এ ভাবে যে, মসজিদে জানাযা হলে অংশ গ্রহণকারীদের অনেকে হয়ত কবরস্তান পর্যন্ত যাবে না। ফলে দাফনের ছাওয়াব ও মৃতের সহযাত্রী হয়ে কদমে কদমে ছওয়াব থেকে তারা বঞ্চিত হবে। পক্ষান্তরে কবরস্তানের কাছাকাছি বাইরে জানাযা হলে হয়ত তারা সবটাতেই শরীক হয়ে সব ছাওয়াব পেয়ে যেত।

এখন থাকে হাদীছের فلا شئ له (তাহার জন্য কিছুই নেই) কথাটি। একদল তার অর্থ নিয়েছে فلا شئ عليه অর্থাৎ তাতে তার কোনই ক্ষতি নেই। এক্ষেত্রে আর কোন বিরোধ থাকে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ وان اساتم فلها এখানেও فلها অর্থ فعليها অর্থাৎ যদি তোমরা পাপ কর তাহা তোমাদের ওপর বর্তাবে। উভয় হাদীছ সম্পর্কে সবার কথা বলা হল। সঠিক মত আমি শুরুতে বলে এসেছি। তা হচ্ছে ওজর ছাড়া মসজিদে জানাযা পড়া ঠিক নয়। কারণ, সুন্নাত হল সাধারণত বাইরে জানাযা পড়া। যদিও দু'ভাবেই বৈধ, তথাপি উত্তম হল মসজিদের বাইরে পড়া।

মৃতকে চুমু খাওয়াঃ

নবী করীম (সঃ) এর পবিত্র সুন্নাত হল মৃত্যুর সাথে সাথে লাশ ঢেকে দেয়া, তার চোখ বন্ধ করে দেয়া ও তার মুখমন্ডল বস্ত্রাচ্ছাদিত করা।

অনেক সময় তিনি মৃতকে চুমু খেতেন। তিনি উছমান ইবনে মাজউন (রাঃ) এর মৃতদেহে চুমু খেয়েছেন ও কেঁদেছেন। তেমনি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) নবীয়ে পাক (সঃ) এর ইন্তিকালের পর তাঁর কপালে চুমু খেয়েছেন। তিনি মৃতকে গোসল-কারীর পসন্দমতে প্রয়োজনানুসারে তিন, পাঁচ বা ততোধিকবার গোসল দেয়াবার নির্দেশ দিয়েছেন। শেষ গোসলে কপূরের পানি ব্যবহার করতে বলেছেন।

শহীদের গোসল নেই। তিনি শহীদের গোসল দেয়াতেন না। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন—হযরত (সঃ) শহীদের গোসল দিতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য তিনি তাদের লোহার হাতিয়ার ও চামড়ার পোষাক খুলে নিতেন। তাছাড়া তার যে পোষাক থাকত তা সহই তাকে দাফন করতেন। তার জানাযা নামায পড়তেন না। যখন কেউ ইহরামের অবস্থায় মারা যেতেন, তিনি তাকে পানি ও বড়ই পাতার সিদ্ধ পানি দিয়ে গোসল করাতেন। তাকে দু'কাপড়ের কাফন দিতেন। তা ছাড়া থাকত মুহরিমের নিজস্ব লুংগী ও চাদর। তাকে খোশবু লাগিয়ে ঢেকে দেয়া হত।

তিনি মৃতের অভিভাবককে ভালভাবে কাফন দেয়ার নির্দেশ দিতেন। আর সাদা কাপড়ের কাফন দিতে বলতেন। খুব দামী কাপড় দিতে নিষেধ করতেন। যদি কাফনে পুরো শরীর না ঢাকত, তখন তার মাথা ঢেকে পায়ের দিক ঘাস দিয়ে ঢেকে দিতেন।

জানাযার আগে ঋণ আদায়ঃ

হযরতের (সঃ) সামনে যখন মৃতের খাট নিয়ে আসা হত, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, এর কি কোন ঋণ আছে? যদি তার কোন ঋণ না থাকত তা হলে তিনি নামায পড়াতেন। কিন্তু যদি ঋণ থাকত, তাহলে তিনি জানাযা পড়াতেন না। তখন সাহাবায়ে কিরামকে বলতেন—তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা পড়ে নাও। কারণ, রসূল (সঃ) এর জানাযা তো শাফাআত ছিল। তার শাফাআত অবশ্যই কবুল হত। অথচ ঋণী ব্যক্তির ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত সে জান্নাতে যাবেনা। তারপর যখন হযরত (সঃ) এর আর্থিক দৈন্য দূর হয়ে স্বচ্ছলতা এল, তখন তিনি নিজ দায়িত্বে ঋণী মৃতের ঋণ আদায় করে জানাযা পড়তেন ও তার পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিছদের দিয়ে দিতেন।

জানাযা নামাযের পদ্ধতিঃ

জানাযা নামাযের শুরুতে তিনি তাকবীর বলে হামদ ও ছানা পড়তেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) জানাযা পড়াতে গিয়ে তাকবীরের পর জোরে জোরে সূরা ফাতিহা পড়ে নামায আদায় করতেন। অবশেষে বলতেন—এটা যে সুন্নাত তা জানাবার জন্য আমি জোরে জোরে পড়লাম।

তেমনি আবু উমামা ইবনে সহল বলেন—পয়লা তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত। আর নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়তে বলেছেন। এ বর্ণনার সূত্র সঠিক নয়।

আমাদের শায়েখ ইবনে তায়মিয়া (রঃ) বলেন—জানাযায় সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয়, সুন্নাত।

আবু উমামা ইবনে সহল এক দল সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) থেকে জানাযায় দরূদ শরীফ পড়ার কথা বর্ণনা করেছেন। ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আনসারী হযরত সাঈদ মাক-বারী থেকে, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি জানাযায় দরূদ পাঠ সম্পর্কে হযরত ইবাদা বিন সামিত (রাঃ) কে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন—আমি তোমাকে খোদার কসম দিয়ে বলছি, জানাযার শুরুতে আমি তাকবীর বলব এবং তারপর নবী করীম (সঃ) এর ওপর দরূদ পাঠ করব ও মৃতের জন্য দোআ করবঃ

اللهم ان عبدك فلانا كان لا يشرك بك وانت اعلم به
ان كان محسنا فزد فى احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم
لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده۔

আয় আল্লাহ! নিঃসন্দেহে তোমার অমুক বান্দা তোমার সাথে কাউকে শরীক করেনি। তুমিই তাকে ভাল ভাবে জান। যদি সে পুণ্যবান হয়ে থাকে তাহলে তার পুণ্য আরও বাড়িয়ে দাও। যদি সে পাপী হয়ে থাকে তাহলে তার পাপ মাফ করে দাও। হে আল্লাহ! তার ছাওয়াব থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না। আর তার পরে যারা আমরা বেঁচে আছি তাদের পথহারা করোনা।

দোআর ব্যাপারে হযরত (সঃ) থেকে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়ঃ

اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار-

"আয় আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর। তার ওপর দয়া কর। তাকে রেহাই দাও। তাকে মর্যাদাকর নিবাস দাও। তার সেই নিবাস প্রশস্ত কর। তাকে শীতল পানি ও বরফ দিয়ে ধুয়ে নাও। সাদা কাপড়ের ময়লা ধুয়ে যেভাবে ধবধবে করা হয়, তার পাপ ধুয়ে তাকে সেরূপ পরিষ্কার কর। যে ঘরে সে ছিল তার চেয়ে উত্তম ঘর তাকে দাও। যে স্বজন তার ছিল তার চাইতে ভাল স্বজন তাকে দাও। যে স্ত্রী তার ছিল তার চাইতে ভাল স্ত্রী তাকে দাও। তাকে জান্নাতে ঠাঁই দাও। তাকে কবর ও জাহান্নামের আজাব থেকে বাঁচাও। তাঁর থেকে নিম্ন দোআও বর্ণিত হয়েছেঃ

اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا - اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان - اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده -

"আয় আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, ছোট, বড়, নর-নারী, উপস্থিত, অনুপস্থিত সবাইকে ক্ষমা কর। আয় আল্লাহ! আমাদের ভেতর যাদের তুমি জীবিত রাখ, তাদের ইসলামের ওপর রাখ আর যাদের মৃত্যু দাও, তাদের ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও। আয় আল্লাহ! তার ছাওয়াব থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না আর তার পরে আমাদের জীবিতদের কোন পরীক্ষায় ফেলোনা।"

নবী করীম (সঃ) মৃতের জন্যে সরল অন্তকরণে নিঃস্বার্থ দোআ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

জানাযায় কয় তাকবীর?

হযরত (সঃ) জানাযার নামায চার তাকবীরে আদায় করতেন। অপর বর্ণনামতে তিনি পাঁচ তাকবীরে নামায পড়েছেন। পরবর্তীকালে সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) চার, পাঁচ, এমন কি ছয়

তাকবীরেও জানাযা পড়েছেন। যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) পাঁচ তাকবীর বলেছেন এবং বলেছেন যে, নবী করীম (সঃ) পাঁচ তাকবীর বলতেন (মুসলিম)। হযরত আলী (রাঃ) হযরত সহল বিন হানীফের জানাযায় ছয় তাকবীর বলেছেন। আহলে বদরের জানাযায়ও তিনি ছয় তাকবীর বলেছেন। এভাবে কোন সাহাবার বেলায় পাঁচ তাকবীর ও কোন সাহাবার বেলায় চার তাকবীর বলার প্রমাণ রয়েছে। (দারে কুতনী।)

সাঈদ ইবনে মানসুর হাকাম থেকে ও তিনি ইবনে আয়নিয়া থেকে বর্ননা করেন যে, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) আহলে বদরের জানাযায় পাঁচ, ছয়, এমনকি সাত তাকবীর পর্যন্ত বলেছেন। এটা বিশুদ্ধ 'আছার'। তাই তা নিষেধ করার কোন অবকাশ নেই। তা ছাড়া নবী করীম (সঃ)ও চারের বেশী তাকবীর বলতে নিষেধ করেন নি। বরং তিনি নিজে এবং সাহাবায়ে কিরামও কখনও চারের অধিক তাকবীর বলেছেন।

জানাযায় কয় সালাম ?

বর্ণিত আছে, রসূলে (সঃ) এক সালামে জানাযা পড়তেন। এক হাদীছে অবশ্য তাঁর দু'-সালামের কথা আছে। বায়হাকী প্রমুখ হযরত মাকবারীর সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) চার তাকবীর ও এক সালামে জানাযা পড়েছেন। ইমাম আহমদ (রঃ) থেকে আছরাম বর্ণনা করেন—হাদীছটি মওযু। খল্লাল তাঁর 'মালুমাত' গ্রন্থে এ বর্ণনা করেন। ইবরাহীম হিজরী বলেন—আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওযী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর মেয়ের জানাযা চার তাকবীরে পড়েছেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। সবাই ভাবল, তিনি পাঁচ তাকবীর বলবেন। কিন্তু তিনি ডানে ও বামে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করলেন। তাকে প্রশ্ন করা হল—এটা কি হল ? তিনি জবাবে বললেন—এর বেশী কিছু আমি করতে পারি না। রসূল (সঃ) কে আমি যতটুকু করতে দেখছি, তা এটাই।

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন—নবী করীম (সঃ) এর তিনটি কাজ মানুষ ছেড়ে দিয়েছে। তার মধ্যে একটি হল, জানাযায় অন্যান্য নামাযের মত সালাম ফিরানো। বর্ণনা দু'টি বায়হাকী (রঃ) উধৃত করেছেন। তবে ইবরাহীম ইবনে মুসলিম হিজরীকে ইবনে মুঈন, নাসায়ী ও আবু হাতিম যঈফ রাবী বলেছেন। আমি বলছি, ইবনে আওযী থেকে বরং এর বিপরীত বর্ণনা পাওয়া যায়। ইমাম আহমদ (রঃ) তাঁর ও আহমদ ইবনে কাসিম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক সালামে জানাযা পড়তেন। আবু আব্দুল্লাহকে প্রশ্ন করা হল—দু'সালামে জানাযা পড়ার কোন সাহাবাকে আপনি জানেন কি ? তিনি বললেন—না। তবে এরূপ ছ'জন সাহাবার নাম জানি, যাঁরা হাল্কাভাবে শুধু ডান দিকে সালাম ফিরাতেন। তাঁরা হলেন ঃ

"হযরত ইবনে উমর (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ) ওয়াএলা ইবনে আসকাফ (রাঃ), ইবনে আবু আওযী (রাঃ) ও যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ)।"

ইমাম বায়হাকী (রঃ) আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ), জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ), আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) ও আবু উমামা ইবনে সহল (রাঃ) এর নামও সংযুক্ত করেছেন। ফলে সাহাবার সংখ্যা দশে দাঁড়াল।

আবু উমামা (রাঃ) হযরতের (সঃ) সময়ই জন্ম নেন। হযরত (সঃ) তার মায়ের দাদা আবু উমামা আসআদ ইবনে যিরারার নামে তার নাম রাখেন। তিনি একাধারে সাহাবা ও শীর্ষস্থানীয় তাবেঈ ছিলেন।

এখন প্রশ্ন থাকে জানাযায় রাফএ য়্যাদায়েন নিয়ে। ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন—সাহাবাদের কথা ও অন্য নামাযের রীতির ওপর কিয়াস করে রাফএ য়্যাদায়েন ধরে নিতে হবে। কারণ, নবী করীম (সঃ) কিয়ামের অবস্থায় প্রতি তাকবীরে রাফএ য়্যাদায়েন করতেন।

আমি বলছি, ইমাম শাফেঈর 'আছার' কথাটির তাৎপর্য হল হযরত ইবনে উমর ও আনাস ইবনে মালিকের বর্ণনা। তাঁরা বলেন—হযরত (সঃ) পয়লা তাকবীরে হাত তুলে বাম হাতের ওপর ডান হাত রাখতেন (বায়হাকী)।

তিরমিজী শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সঃ) যখন কবরের মৃতের জানাযার নামায পড়তেন, তাতে তিনি ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখেছেন। কিন্তু বর্ণনাটি ইয়াযীদ ইবনে সিনান রিহাবীর কারণে যঈফ।

নবী করীম (সঃ) এর রীতি ছিল এই যে, কোন জানাযা যদি বাদ পড়ত তা হলে তিনি তা কবর সামনে নিয়ে আদায় করতেন। একবার তিনি এক রাত পরে জানাযা পড়েন। একবার তিন রাত পর ও আরেক বার এক মাস পর জানাযা পড়েন। এ ব্যাপারে কোন সময়সীমা ছিলনা।

আহমদ (রঃ) বলেন—কবরে জানাযা পড়ার ব্যাপারে কার সন্দেহ আছে? কারণ, নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, কারো জানাযা বাদ পড়লে তিনি তার কবরে জানাযা পড়তেন। ছ'টি সূত্রে এ বর্ণনা মিলে এবং সব কটি সূত্রেই 'হাসান' (ভাল)।

ইমাম আহমদ কবরে জানাযার ব্যাপারে এক মাস সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন। কারণ, নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণিত সর্বোচ্চ সময়সীমা এটাই। ইমাম শাফেঈ (রঃ) তার সময়সীমা নির্ধারণ করেছেন লাশ বিকৃত না হওয়া পর্যন্ত। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ) অনুপস্থিত অভিভাবক ছাড়া অন্য কারো জন্য কবরে জানাযা পড়া জায়েয বলেন নি। অভিভাবক যখনই উপস্থিত হবে তখনই কবরের পাশে গিয়ে জানাযা পড়ে নিবে।

নবী করীম (সঃ) পুরুষের মাথা বরাবর ও নারীদের মাঝ বরাবর জানাযায় দাঁড়াতেন।

শিশুর জানাযা ঃ

বিশুদ্ধ বর্ণনায় প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (সঃ) শিশুর জানাযা পড়েছেন।

সুনানে ইবনে মাজায় মারফু বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'নিজ শিশুদের জানাযা পড়। কারণ, তা তোমাদের এমন এক নেক আমল যা তোমরা আগাম পাঠালে।'

আহমদ ইবনে আবু উবায়দা বলেন—আমি ইমাম আহমদের (রঃ) কাছে প্রশ্ন করলাম—মৃত প্রসবের শিশুর জানাযা কখন জরুরী? তিনি বললেন—চার মাসের হলে। কারণ, তখন তার ভেতরে প্রাণ আসে। আমি আরয করলাম—হযরত মুগীরা ইবনে শু'বার বর্ণনায় আছে, শিশুর জানাযা পড়তে হবে। তিনি বললেন—হাদীছটি সহীহ ও মারফু। আমি বললাম—তাতে তো চার মাসের কথা নেই। তিনি বললেন—হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের হাদীছে রয়েছে।

এখন যদি বলা হয়, নবী করীম (সঃ) তাঁর ছেলে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর জানাযা পড়েছেন। এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সুনানে আবু দাউদে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মৃত্যু কালে ইবরাহীম (আঃ) এর বয়স ছিল আঠার মাস। তাই নবী করীম (সঃ) তাঁর জানাযা পড়েন নি।

ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন—আমাকে ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম তার পিতা থেকে, তিনি ইবনে ইসহাক থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম থেকে, তিনি উমরা থেকে ও তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এ বর্ণনা শুনান। অবশ্য তিনি 'রিওয়ায়েতে হাম্বল' গ্রন্থে হাদীছটিকে সুস্পষ্ট 'মুনকার' বলেছেন।

খুল্লাল বলেন—হযরত আবদুল্লাহকে বলা হল, আমাকে আমার পিতা, তাকে আসওয়াদ ইবনে আমের, তাকে ইসরাঈল, তাঁকে জাবির, তাঁকে আমের ও তাকে হযরত বারাআ ইবনে আযিব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) তাঁর ছেলে ইবরাহীমের (আঃ) জানাযা পড়িয়েছেন, তখন তার বয়স ছিল ষোল মাস।

আবু দাউদ জুহনী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) এর ছেলে ইবরাহীম (আঃ) মারা গেলে তিনি তার জানাযা পড়ান। বর্ণনাটি মুরসাল। জুহনীর আসল নাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার কুফী।

হযরত আত্তার ইবনে আবু রিবাহ থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সঃ) তাঁর ছেলের জানাযা পড়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল সতের দিন। এ বর্ণনাও 'মুরসাল'। তা ছাড়া অন্যতম রাবী আতা অতি বৃদ্ধ ছিল বলে তার বর্ণনার নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আহমদ (রঃ) সহ যাঁরা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা অস্বীকার করেন, তাঁরা বলেন, হযরত বারাআ ইবনে আযিব (রাঃ) এর হাদীছটি বিভিন্ন 'মুরছাল' বর্ণনার সমর্থনপুষ্ট হয়ে অধিকতর জোরদার হয়েছে। কিছু লোক আবার জাবির জাআফীর বর্ণনার দ্বারা হযরত বারাআর হাদীছ ও তার

সমর্থক আছারগুলোকে যঈফ বলেন। তাদের মতে ইবনে ইসহাকের রিওয়ায়েত সেগুলোর ভেতর বিশুদ্ধতর।

ইবরাহীম (আঃ) এর জানাযা পড়া হয়নি বলে যারা মনে করেন, তারা তার কারণের ব্যাপারে আবার বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এক দলের খেয়াল যে, নবী করীম (সঃ) এর নবুওতের কারণে তার নামাযে জানাযার প্রয়োজন ছিলনা। কারণ, জানাযার নামায আজাব-মুক্তির শাফাআতের জন্য হয়। যেমন শহীদের জানাযা নিষ্প্রয়োজন।

অপর দলের ধারণা, যেদিন তার মৃত্যু হয়, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। তাই নবী করীম (সঃ) জানাযার নামাযের বদলে সূর্যগ্রহণের নামাযে মনোযোগ দেন। তৃতীয় দলের ধারণা এই যে, হযরত (সঃ) অপর লোকদের জানাযা পড়তে বলে নিজে সূর্যগ্রহণের নামাযে মনোনিবেশ করেন। ফলে জানাযা হয়েছে বটে, তিনি নিজে শরীক হতে পারেন নি। এ ব্যাখ্যা দ্বারা হাদীছ ও আছারের ভেতরকার বিরোধ দূর হয়ে যায়। এক দল বলেন— জানাযা পড়ার বর্ণনাটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ, জানাযা পড়া আর না পড়ার বর্ণনার ভেতরে পয়লা মতে ইলম ও দ্বিতীয়মতে জহুল রয়েছে। এ দুয়ের মোকাবেলায় ইলম প্রাধান্য পায়।

মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্ত ও আত্মহত্যাকারীর জানাযাঃ

মৃত্যু দন্ডপ্রাপ্তের জানাযার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। সঠিক বর্ণনা এই যে, নবী করীম (সঃ) জুহায়নাকে প্রস্তারাঘাতে মৃত্যুদন্ড দানের পর তার জানাযা পড়েছেন। উমর (রাঃ) আরয করলেন—হে আল্লাহর রসূল! আপনি তার জানাযা পড়ছেন। অথচ ব্যাভিচারের কারণেই তার মৃত্যুদন্ড হল। তিনি জবাব দিলেন—সে এমন তওবা করেছে যা মদীনার সত্তর জনের ভেতরে বণ্টন করে দিলে সবারই তওবা হয়ে যায়। এর চেয়ে উত্তম তওবা আর কি হতে পারে যে, আল্লাহকে খুশী করার জন্য সে নিজেকে কুরবান করে দিল? (মুসলিম)

সহীহ বুখারীতে মাএজ ইবনে মালিকের অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তার জন্যও হযরত (সঃ) প্রশংসামূলক কথা বলেছেন এবং তার জানাযাও পড়েছেন। বুরাইদা ইবনে হাসীব বলেন—'হযরত (সঃ) বলেছেন, মাএজ ইবনে মালিকের পরিত্রাণের জন্য দোআ কর। সবাই মিলে দোআ করল—হে আল্লাহ! মাএজ ইবনে মালিককে ক্ষমা কর।' এ উভয় ঘটনাই ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ সংকলনে উধৃত করেন। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন—হযরত (সঃ) তার জানাযা পড়েছেন (বুখারী)। অবশ্য এ হাদীছ আব্দুর রাযযাকের যা ত্রুটিপূর্ণ। হযরত আবু বুরদা আসলামী বলেন—নবী করীম (সঃ) মাএজের জানাযা পড়েছেন এবং তার জানাযা পড়তে নিষেধ করেন নি (আবু দাউদ)।

আমি বলছি, গায়েদিয়া সম্পর্কিত হাদীছে কোন মতভেদ নেই। এটা সুপ্রমাণিত যে, তার জানাযা তিনি পড়েছেন। রইল মাএজ সম্পর্কিত হাদীছ। সে সম্পর্কেও বলা যায় যে, তাতে শব্দগত বিরোধ নেই। কারণ, 'সালাত' দোআ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। তাই তিনি তার জন্য দোআ করেছেন যেন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তার জানাযা যদি না পড়ে থাকেন তো তা অন্যান্য উম্মতকে শিক্ষাদানের জন্য হতে পারে। কেউ যেন সে ধরনের পাপ না করে। যদি বলা হয় যে, শব্দেও বিরোধ রয়েছে, তা হলে আমরা গায়েদিয়ার হাদীছ গ্রহণ করতে পারি। কারণ, তা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন।

মৃতের সহগামী হওয়া :

জানাযা পড়ার পর হযরত (সঃ) মৃতের সহগামী হতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর খুলাফায়ে রাশেদীনও তাই করতেন। যদি তাঁরা বাহনে যেতেন তো পিছনে থাকতেন। পায়ে হেঁটে গেলে কখনও পেছনে, কখনও আগে, কখনও ডানে ও কখনও বামে চলতেন।

মৃতকে নিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চলতে বলেছেন। তাই সাহাবায়ে কিরাম মৃতকে নিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে চলতেন। আজকাল যেভাবে আস্তে আস্তে চলা হয় তা সুন্নাতের খেলাফ, মাকরূহ ও বিদআত। আহলে কিতাবদের ইয়াহুদীরা এরূপ করে থাকে। হযরত আবু বকর (রাঃ) যদি কখনও আস্তে চলতে দেখতেন, তা হলে কোড়া তুলে ধমকে বলতেন—তোমরা কি দেখনি রসূল করীম (সঃ) এর মুর্দারের সাথে চলতে গিয়ে আমরা কিভাবে দৌড়োতে থাকতাম।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন—আমি নবী করীম (সঃ) এর কাছে লাশ বয়ে চলার প্রকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন—ক্ষিপ্র বেগে দৌড়ানোর চেয়ে কিছুটা কম গতিতে চলবে। আহলে সুনান এটা বর্ণনা করেছেন।

হযরত (সঃ) জানাযায় ও মৃতের সাথে পদব্রজে চলতেন। তিনি বলতেন—ফেরেশতারা যেখানে পায়ে হেঁটে চলছেন সেখানে আমি বাহনে যেতে পারি না। যখন সৎকার থেকে অবসর হতেন, তখন পায়ে হেঁটেও চলতেন, বাহনেও চলতেন। মৃতের সাথে গিয়ে কবরে লাশ না রাখা পর্যন্ত তিনি বসতেন না। তিনি বলতেন—মৃতের সাথে গিয়ে তাকে গোরে না রেখে তোমরা বসো না।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া বলেন—লাশ রাখার মানে কবরস্তানের মাটিতে রাখা।

গায়েবানা জানাযা :

কতিপয় মুসলমান বিদেশ বিভুঁয়ে ইন্তিকাল করায় হযরত (সঃ) তাদের গায়েবানা জানাযা পড়েছেন। সহীহ বর্ণনামতে হযরত (সঃ) উপস্থিত মৃতের জানাযার মতই নাজ্জাশী সম্রাটের জানাযা পড়েছেন। এ থেকে তিনটি মাজহাব সৃষ্টি হয়েছে।

একদল বলেন—গায়েবানা জানাযা শরীআত সম্মত এবং উম্মতের জন্য তা সুন্নাত। হযরত (সঃ) থেকে প্রাপ্ত এক বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম শাফেঈ (রঃ) ও ইমাম আহমদ (রঃ) এর অভিমত

এটাই। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম মালিক (রঃ) বলেন—নাজ্জাশী সম্রাটের গায়েবানা জানাযা পড়ার ব্যাপারটি হুযুর (সঃ) এর সাথেই সংশ্লিষ্ট, অন্যের জন্যে নয়। তাঁদের অনুসারীরা বলেন—হতে পারে হযরত (সঃ) এর সামনে তার লাশবাহী খাট হাজির করা হয়েছে। হযরত (সঃ) মৃত নাজ্জাশীকে সামনে দেখতে পেয়েই জানাযা পড়েছেন। সাহাবাগণ তা দেখতে পান নি। তথাপি তারা রসূল (সঃ) এর অনুকরণে জানাযায় শরীক হয়েছেন। তিনি নাজ্জাশী সম্রাটের গায়েবানা জানাযা ছাড়া আর কারো গায়েবানা জানাযা পড়েছেন বলে প্রমাণ নেই। সুতরাং তাঁর থেকে জানাযা পড়ার প্রমাণ মাত্র একটি এবং না পড়ার প্রমাণ অনেক। তাই তা পড়া যদি সুন্নাত হয় তো বর্জন করাও সুন্নাত। তাঁর অন্তর্ধানের পর আর কারো পক্ষে এত দূরের কারো মৃতখাট দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। এও অসম্ভব যে হুযুর (সঃ) ছাড়া কারো জন্য মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধক হটিয়ে তা দৃষ্টিগোচর করানো হবে আর সে জানাযা পড়বে। সুতরাং সে ব্যাপারটি ছিল হুযুর (সঃ) এর জন্য খাস, অন্যের জন্য নয়।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ) বলেন—এ ব্যাপারে উত্তম নীতি হল এই, যদি দূরবর্তী এমন কোন জাগায় কেউ মারা যায় যেখানে তার জানাযা পড়া হয়নি, তা হলে তার গায়েবানা জানাযা পড়া যায়। যেমন নবী করীম (সঃ) নাজ্জাশীর জানাযা পড়েছেন। কারণ, তিনি কাফিরের দেশে মারা গেছেন এবং তার জানাযা পড়া হয়নি। পক্ষান্তরে যদি এমন জাগায় কারো মৃত্যু হয় যেখানে তার জানাযা পড়া হয়, তা হলে আর গায়েবানা জানাযার প্রয়োজন নেই। কারণ, তা ছিল ফরযে কিফায়া এবং তা আদায় হয়ে গেছে। তাই তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। নবী করীম (সঃ) গায়েবানা জানাযা পড়েছেন, আবার বর্জনও করেছেন। তাই তা পড়া ও না পড়া দুটোই সুন্নাত। পড়ার ক্ষেত্র এক, না পড়ার ক্ষেত্র আরেক।

আহমদ (রঃ) এর মাজহাবে তিনটি অভিমত রয়েছে। তার ভেতরে বিশুদ্ধ মত হল এই, গায়েবানা জানাযা বিনা শর্তেই পড়া উচিত। কারণ, তা সাধারণ ভাবেই বৈধ।

হযরত (সঃ) থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তার সামনে জানাযা উপস্থিত হলে তিনি দাঁড়াতেন এবং সবাইকে দাঁড়াতে বলতেন। অবশ্য তাঁর বসে থাকারও প্রমাণ মিলে। এ কারণে এ ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন, দাঁড়ানোর নির্দেশ পরবর্তী কালে তাঁর বসার কার্যক্রম দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে। অপর দল বলেন—দাঁড়ানো ও বসা দুটোই বৈধ। তাঁর দাঁড়ানোটা ছিল মুস্তাহাবের ও বসাটা ছিল জায়েযের দলীল। বাতিলওয়ালাদের ব্যাখ্যার চেয়ে এ ব্যাখ্যাটি অধিকতর সঠিক বলে মনে হয়।

কবর কিরূপ হবে?

নবী করীম (সঃ) এর রীতি ছিল, তিনি সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক দুপুরে দাফন কার্য সমাপ্ত করতেন না। তিনি কবরের মাঝখানে উঁচু (লহদ) রাখতে বলতেন। তা ছাড়া কবর গভীর করাতেন এবং লাশের মাথা ও পায়ের দিক প্রশস্ত করতে বলতেন।

হযরত (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে, মৃতকে যখন কবরে রাখা হত তখন তিনি এ দোআ পড়তেন:

بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله

"আল্লাহর নামে আল্লাহর হাতে রসূলুল্লাহর মিল্লাতে ওপর।"

অপর এক বর্ণনায় আছে:

بسم الله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله -

"আল্লাহর নামে আল্লাহর রাস্তায় রসূলুল্লাহর মিল্লাতের ওপর।"

হযরত (সঃ) থেকে এও বর্ণিত রয়েছে যে, মৃতকে কবরে রাখার পর তিনি তিন মুষ্ঠি মাটি তুলে কবরে দিতেন। যখন দাফন শেষ হয়ে যেত তখন তিনি ও সাহাবারা কবরের ওপর দাঁড়িয়ে তাছবীতের দোআ পড়তেন এবং সাহাবায়ে কিরামকে বলতেন—এই মৃতের জন্য দৃঢ় থাকার দোআ পড়। আজকাল যেভাবে মানুষ কবরের পাশে বসে দোআ দরুদ পড়ে থাকে, তিনি তা পড়তেন না এবং মৃতকেও তালকীন দিতেন না।

সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ:

কবর খুব উঁচু করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। তেমনি পাকা কি কাঁচা ইট দিয়ে কবর বাঁধানো কিংবা কবরের ওপর গম্বুজ বানানো সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ।

এ ধরনের সব কাজই মাকরূহ ও বিদআত এবং সর্বস্তরে হযরত (সঃ) এর রীতির বহির্ভূত কাজ। একবার রসূল (সঃ) হযরত আলীকে এই বলে পাঠালেন যে, যত ছবি দেখবে তা নিশ্চিহ্ন করবে আর যত উঁচু কবর দেখবে সব সমান করে ফেলবে। তাই তাঁর রীতি এটাই যে, কবর উঁচু করা যাবে না। যদি কেউ করে থাকে, তাও সমান করে ফেলতে হবে। তিনি কবরে সমাধিসৌধ নির্মাণ ও চুনকাম করা নিষিদ্ধ করেছেন। তাতে কিছু লিখে দেওয়াও নিষিদ্ধ করেছেন। সাহাবায়ে কিরামের কবর না খুব উঁচু, না একেবারে সমান। স্বয়ং রসূল (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের কবরও তাই।

কবরকে সিজদাস্থল বানানো চলবেনা:

নবী করীম (সঃ) কবরকে সিজদাস্থল বানাতে নিষেধ করেছেন এবং তাতে বাতি দিতেও নিষেধ করেছেন। তিনি কঠোরভাবে তা নিষিদ্ধ করেছেন এবং যারা তা করবে তাদের

তিনি লা'নত প্রদান করেছেন। তিনি কবর সামনে নিয়ে নামায পড়াও নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি তাঁর কবরকেও মেলা উরসের আখড়া বানাতে নিষেধ করেছেন। এবং কবর যিয়ারতকারীদের ওপর লা'নত বর্ষন করেছেন।

তাঁর সুন্নাত এটাই ছিল যে, কবরের কোনরূপ অবমাননা যেন না হয়। কবর মাড়িয়ে চলা যাবেনা, তার ওপরে আসন পেতে বসা যাবেনা। পক্ষান্তরে কবরকে এমন সম্মানও দেখানো যাবেনা, যা কবর পূজা হয়ে দাঁড়ায়। সেটাকে নামাযের জায়গা বানানো যাবেনা। তার কাছে বা তাকে সামনে নিয়ে নামায পড়া যাবেনা। সেখানে মেলা বসানো যাবেনা। সেটাকে পূজা করা যাবেনা।

কবর যিয়ারতের সুন্নাত তরীকা :

হযরত (সঃ) যখন কোন সাহাবার কবরের কাছে যেতেন, তখন তার জন্য দোআ করতেন। তিনি মৃত সাহাবাদের মহব্বতের আকর্ষণে তাদের কবরের পাশে গিয়ে দোআ করতেন। সেটাই তাঁর কবর যিয়ারতের তরীকা। উম্মতের জন্য তিনি এটাই সুন্নাত হিসেবে প্রবর্তন করে গেছেন। কবর যিয়ারতে গিয়ে নিম্ন দোআ পড়তে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন :

السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين و المسلمين و انا انشاء الله بكم لاحقون - نسأل الله لنا و لكم العافية -

"হে মু'মিন ও মুসলিম দেশবাসী! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। নিঃসন্দেহে ইনশাআল্লাহ আমরা তোমাদের সাথে মিলব। আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।"

তাঁর এও রীতি ছিল যে, নামাযের সময়ে ক্ষমা ও অনুগ্রহের জন্য যে সব দোআ পড়তেন তা তিনি কবর যিয়ারতেও পড়তেন। মুশরিকরা এ রীতি অপসন্দ করল ও মৃতকে সম্বোধন করে তাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানাল এবং তার কাছে নিজ প্রয়োজন পেশ করে তা পূরণের জন্য তার মদদ কামনা করল। তারা সেই পথ অনুসরন করল যা রসূল (সঃ) এর রীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

নবী করীম (সঃ) এর সুন্নাত হল. তাওহীদের হিফাযত ও মৃতের কল্যাণ প্রয়াস। পক্ষান্তরে মুশরিকদের কাজ হল, শির্ক করা এবং নিজের ও মৃত ব্যক্তির অকল্যাণ সাধন। তার তিন শ্রেনী :

এক—মৃতের জন্যে দোআ করবে।

দুই—মৃতের ওসীলা দিয়ে দোআ করবে।

তিন—মৃতের কাছে গিয়ে দোআ করবে।

তারা মনে করে, মৃতের কাছে গিয়ে তার জন্য দোআ করা মসজিদে বসে তার মাগফিরাত কামনার চেয়ে উত্তম ও মাকবুল। কিন্তু হযরত (সঃ) ও তাঁর সাহাবাদের রীতির ওপর চিন্তা-ভাবনা করলে এ দু'রীতির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। কল্যাণের তাওফীক দানের মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

মৃতের জন্য শোক প্রকাশের পদ্ধতি ঃ

মৃতের পরিবার বর্গের শোক প্রকাশও নবী করীম (সঃ) এর রীতির অন্তর্ভুক্ত। তবে তাঁর এ রীতি ছিলনা যে, শোক প্রকাশের জন্য কোথাও সমবেত হতে হবে কিংবা কবরের পাশে বা অন্য কোথাও বসে কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। এ সবই মাকরূহ ও বিদআত। শোক প্রকাশের সুন্নাত তরীকা হল এই, আল্লাহর ফায়সালার ওপর শান্ত থাকার ভেতর দিয়ে সন্তোষের প্রমাণ দেয়া, তাঁর গুন-কীর্তন করা ও 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়া। পক্ষান্তরে শোকাচ্ছন্ন হয়ে জামা-কাপড় ছেড়া, উচ্চস্বরে বিলাপ করা, মাথা কামিয়ে ফেলা ইত্যাদি কাজে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তাঁর অন্যতম রীতি ছিল এই, শোকার্ত পরিবার শোকার্ত আত্মীয় স্বজনের জন্য রান্না-বান্না করবে না। অন্যদের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন তাদের জন্যে খানা পাকিয়ে পাঠাবার জন্য। এটা মানবীয় চারিত্রিক সৌন্দর্যের এক উত্তম নিদর্শন। কারণ, তখন আত্মীয়-স্বজন নিয়ে রান্না-বান্না করে খানা-পিনায় মশগুল হওয়া সদ্যমৃতকে বিস্মৃত হওয়ারই নামান্তর। শোকার্ত পরিবার স্বভাবতই রান্না-বান্না করে খাওয়ানোর অবস্থায় থাকে না।

হযরত (সঃ) মৃতের শোকের জন্য আহবান জানানো নিষিদ্ধ করেছেন। কারণ, সেটা হল জাহিলী যুগের রীতি। হযরত হুজায়ফা (রাঃ) তাই কেউ মারা গেলে তা ঘোষণা করে ফেরাটাও পসন্দ করতেন না। তাঁর খেয়ালে সেটাও হয়ত জাহিলী রীতির অনুসরণ হয়ে দাঁড়াবে।

●

Contents

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

●

আপদকালীন নামায

যুদ্ধাবস্থায় নামাযের বিভিন্ন পদ্ধতি:

আল্লাহ তা'আলা সফর ও ভীতির অবস্থায় নামাযের আরকান ও রাকআতের সংখ্যার ব্যাপারটি সহজতর করে দিয়েছেন। সফর যদি নিরাপদ হয়, তা হলে রাকআতের সংখ্যা হ্রাস পায়। যদি আপদ দেখা দেয় ও সফর না হয়, তা হলে আহকাম-আরকানের সংখ্যা হ্রাস পায়। নবী করীম (সঃ) তা অনুসরণ করে গেছেন। সফর ও আপদকালীন অবস্থায় নামাযের রাকআত ও আরকান হ্রাসের রহস্য তাতে প্রকাশ পায়।

হযরত (সঃ) এর আপদকালীন নামাযের রীতি ছিল এই: শত্রু যদি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে অবস্থান করত, তা হলে সব মুসলমান তাঁর পেছনে নামাযের জন্য দাঁড় হত। তিনি তাকবীর বলে নামায শুরু করতেন। তিনি যখন রুকু করতেন, সবাই তাঁর সাথে রুকু করত। তিনি রুকু থেকে মাথা উঠালে সবাই মাথা উঠাত। তার পর তিনি যখন সিজদায় যেতেন, তখন তাঁর সংলগ্ন কাতারটি তাঁর সাথে সিজদায় যেত এবং অপর কাতারটি দুষমনের মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকত। যখন পয়লা রাকআত শেষ করে তিনি দ্বিতীয় রাকআতের জন্য দাঁড়াতেন, তখন সিজদা বিরত কাতারটি সিজদা সম্পন্ন করে পয়লা কাতারের জায়গায় চলে যেত ও পয়লা কাতারটি দ্বিতীয় কাতারের জাগায় চলে আসত। উদ্দেশ্য ছিল, উভয় কাতারকে পয়লা কাতারে নামায আদায়ের মর্তবা হাসিলের সুযোগ দান ও দ্বিতীয় কাতারও যেন ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকআতে দু'সিজদা দানের সুযোগ পায়। এ ভাবে উভয় কাতারকে নামাযের ছাওয়াব ও বরকত সমান ভাবে বন্টন করে দেয়ার ব্যবস্থা ইনসাফেরই অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

এ ভাবে হযরত (সঃ) যখন দ্বিতীয় রাকআতের রুকু করতেন, তখন উভয় কাতার রুকুতে যেত। তারপর যখন তিনি সিজদায় যেতেন, তখন পয়লা কাতার তাঁর সাথে সিজদায় যেত ও দ্বিতীয় কাতার শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে থাকত। তিনি যখন তাশাহহুদের জন্য বসতেন, তখন দ্বিতীয় কাতার সিজদা সম্পন্ন করে তাঁর সাথে তাশাহহুদে যোগ দিত। অতপর সবাইকে নিয়ে তিনি এক সংগে সালাম ফিরাতেন।

শত্রু যদি কিবলার দিকে না থেকে অন্য কোন দিকে থাকত, তা হলে কখনও তিনি দু'জামাআত করে নিতেন। একদল দুশমনের মুকাবিলার জন্য দাঁড়িয়ে থাকত। অপর

দলটি নিয়ে এভাবে তিনি নামায আদায় করতেন যে, একদল তাঁর সাথে এক রাকআত নামায পড়ে দ্বিতীয় দলের জায়গায় গিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে থাকত ও দ্বিতীয় দল এসে তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাকআতে শরীক হত। তারপর হযরত (সঃ) যখন সালাম ফিরাতেন, তখন উভয় দল পালানুসারে অবশিষ্ট রাকআত আদায় করত।

তা ছাড়া কখনও তিনি একদল নিয়ে এক রাকআত নামায পড়তেন। তারপর দ্বিতীয় দলের সাথে দ্বিতীয় রাকআত পড়তে যেতেন। এ ফাঁকে প্রথম দল তাদের দ্বিতীয় রাক-আত পড়ে নিত। তিনি যখন দ্বিতীয় রাকআত শেষ করে তাশাহহুদে যেতেন, তখন দ্বিতীয় দল তাদের বাকী রাকআত পুরা করত। তিনি তাশাহহুদ পড়ে তাদের অপেক্ষায় থাকতেন। যখন তাদেরও তাশাহহুদ পড়া হত, তখন একত্রে সালাম ফিরাতেন।

কখনও তিনি একদলের সাথে দু'রাকআত পড়ে তাশাহহুদে বসে অপর দলের অপেক্ষা করতেন। যারা দু'রাকআত পড়ল, তারা নিজেরা সালাম ফিরিয়ে উঠে গেলে দ্বিতীয় দল আসত। তাদেরও তিনি দু'রাকআত পড়িয়ে সালাম ফিরাতেন। ফলে তাঁর হত চার রাকআত ও সাহাবারা পড়তেন দু'রাকআত।

কখনও তিনি একদল নিয়ে দু'রাকআত পড়ে সালাম ফিরাতেন। তারপর অপরদল এলে তাদের নিয়েও দু'রাকআত পড়ে সালাম ফিরাতেন। এ অবস্থায় তাঁর নামায দু'দলের সাথে দু'বার হত।

কখনও তিনি একদলের সাথে এক রাকআত পড়তেন। তারা এক রাকআত পড়েই চলে যেত। তখন দ্বিতীয় দল এসে তাঁর সাথে দ্বিতীয় রাকআত পড়ত। এ অবস্থায় হযরত (সঃ) দু'রাকআত পড়তেন এবং সাহাবারা পড়তেন এক এক রাকআত।

আপদকালে উক্ত সব ধরনের নামাযই বৈধ। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন—সালাতে খাওফের উক্ত পদ্ধতিগুলোর প্রত্যেকটিই জায়েয। তিনি বলেন, তার ছয় কি সাতটি নিয়ম জানা যায়। এ সবগুলোই বৈধ।

Contents

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

●

যাকাত

যাকাত আদায়ের ন্যায়নীতি :

যাকাতের ব্যাপারে হযরত (সঃ) এর রীতি ও পদ্ধতি সর্ব বিবেচনায় পরিপূর্ণ ও ত্রুটি মুক্ত। সময়, পরিমাণ ও যাকাতের পূর্বশর্ত সব দিক দিয়ে বিচার করলে এ ব্যবস্থার পূর্ণাংগতা উপলব্ধি করা যায়। মালদার ও মিসকীনের সুবিধা ও প্রয়োজন উভয় দিকে সমানে নজর রাখা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা যাকাতের মাল ও মালদারের পবিত্রতা অর্জনের উপায় হিসেবে যাকাতকে নির্ধারণ করেছেন। শুধুমাত্র ধনীর ওপরই যাকাত ফরয করা হয়েছে। তাই যে ব্যক্তি যাকাত আদায় করে, সে সম্পদ হারানোর ভয় থেকে নিরাপদ থাকে। এমন কি সে সম্পদে বরকত ও প্রবৃদ্ধি দেখা দেয়। তার ওপর থেকে বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায়। এভাবে যাকাত দেয়া যাকাত আদায়কারীর জন্য নিরাপত্তাদায়ক এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও সুরক্ষিত দুর্গ হয়ে দাঁড়ায়।

চার ধরনের সম্পদের ওপর যাকাত হয়। সেগুলো প্রায় সব ধরনের লোকের ভিতর ব্যবহার্য বস্তু। সে সবের গুরুত্ব সবার কাছেই সমান। তা হল :

১। ফসল ও ফলমূল।

২। গৃহপালিত পশু।

৩। আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন দুই বস্তু—সোনা ও রূপা।

৪। নানাবিধ বাণিজ্যিক সম্পদ।

সারা বছরে মাত্র একবার যাকাত ফরয। ফল ও ফসলের যাকাত আদায়ের শর্ত হল তারা পূর্ণতা ও পরিপক্কতা লাভ। এটাই সর্বাধিক ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা। কারণ, প্রতি মাস বা সপ্তাহে যাকাত ফরয করা হলে মালদারের জন্য তা কাণ্টকর হত। পক্ষান্তরে জীবনে একবার ফরয হলে তা মিসকীনের জন্য ক্ষতিকর হত। বছরে একবার ফরয হওয়াটাই সর্ববিচারে ন্যায় ভিত্তিক হয়েছে।

তা ছাড়া মালদারের সম্পদের প্রয়াস ও পরিমাণে পার্থক্য অনুসারে যাকাতের পরিমাণে পার্থক্য রাখা হয়েছে। যেমন, অনায়াসে হঠাৎ করে পাওয়া গুপ্তধনের এক পঞ্চমাংশ যাকাত

ধার্য করা হয়েছে। তার জন্য পূর্ণ বছর অতিক্রান্ত হওয়াও শর্ত নয়। বরং যখনই তা পাওয়া যাবে সংগে সংগে তার খুমুস (পঞ্চমাংশ) আদায় করা ফরয হয়ে যাবে।

তার পরে আসে ফল ও ফসল। তার জন্যেও মানুষকে খুব বেশী কষ্ট ও চেষ্টা করতে হয় না। তাই তার ওপর গুপ্তধন বা খণিজ দ্রব্যের অর্ধেক অর্থাৎ এক দশমাংশ যাকাত ধার্য করা হয়েছে। কারণ, জমির চাষাবাদে উর্বরতা ও পানি সরবরাহের জন্য মানুষকে চেষ্টা ও কষ্ট করতে হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পানি কিনতে হয় না, পাইপেও পানি সরবরাহ করতে হয় না। তাই এক দশমাংশ ফল-ফসল যাকাত হয়। যদি জমিতে পানি সিঞ্চনের জন্য মজুর খাটানো হয় কিংবা পাইপ লাগানো হয় কিংবা কূয়া বা নালা তৈরী করতে হয়, তা হলে যাকাত অর্ধেক অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ হয়ে যায়। সম্পদের বর্ধন যদি মালদারের দেশভ্রমণ ও ব্যক্তিগত আপ্রাণ প্রয়াসের ওপর নির্ভশীল হয় এবং তাও বেশ সময় সাপেক্ষ হয়, তা হলে তার যাকাত হবে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

এটা সুস্পষ্ট কথা যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের খাটুনী ও কষ্ট চাষাবাদের খাটুনী ও কষ্টের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। ফল-ফসল বৃদ্ধির তুলনায় বাণিজ্যিক সম্পদ বৃদ্ধির কাজটি বেশী কষ্টকর। তাই তার যাকাতের পরিমাণ স্বভাবতই বেশী হয়। তেমনি বৃষ্টি ও প্রাকৃতিক নদী-নালা থেকে পানির প্রয়োজন মেটা ও মজুর খাটিয়ে ও পাইপ লাগিয়ে পানির প্রয়োজন মেটানোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তাই যাকাতেও পার্থক্য হয়েছে। সব চাইতে অনায়াসলব্ধ সম্পদ হল গুপ্তধন। তাই তার ওপর যাকাতও সর্বাধিক ধার্য হয়েছে। সম্পদ কম-বেশী যাই হোক, মান যেহেতু এক নয়, তাই সম্পদের ভিন্ন ভিন্ন নেসাব ধার্য করা হয়েছে। ফলে মালদার ক্ষতি-গ্রস্ত হয়না। যেমন, রূপার জন্য দু'শ দিরহাম, সোনার জন্য বিশ মিছকাল, ফল-ফসলের জন্য পাঁচ ওসাক (পাঁচ উটের বোঝা), বকরীর জন্য চল্লিশ বকরী, গরুর জন্য ত্রিশ গরু ও উটের জন্য পাঁচ উট নেসাব ধার্য করা হয়েছে।

যদি কোন বস্তুর যাকাত তা দিয়ে আদায় সম্ভব না হয়, তা হলে বকরীর হিসেবে নিয়ে তা আদায় করা যাবে। তেমনি উটের কম-বেশী হিসেবের বেলায় বয়স সমস্যা হতে পারে বলে বয়সের বিভিন্ন স্তরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নেসাব ধার্য করা হয়েছে। যেমন, ইবনে মাখায, বিন্তে মাখায, ইবনে লবুন, বিন্তে লবুন, হাক্কাহ ও জুযআ ইত্যাকার বিভিন্ন বয়সের উটের বয়স যতই বাড়তে থাকবে যাকাতের পরিমাণও ততই বাড়তে থাকবে। এমনকি উটের বয়স পূর্ণত্বে পেঁছলে সংখ্যার হিসেবে যাকাত হবে।

আল্লাহ তা'আলার হিকমত এটাই যে, যাকাত একদিকে যেন ধনী ও মধ্যবিত্তের জন্য দুর্বহ বোঝা না হয় ও অন্য দিকে দরিদ্রের যেন অভাব মোচন হয়।

এ সত্ত্বেও উভয় দিক থেকেই জুলুম চলতে লাগল। ধনীরা যাকাতের ফরয বন্ধ করল। পক্ষান্তরে প্রাপক না হয়েও যাকাত নেয়া শুরু হল। এ দু'দলের বাড়াবাড়ির ফলে নিরীহ

দরিদ্র সমাজ যেই তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল। মাসআলায়ও বিভিন্নরূপ বাহানা সৃষ্টি শুরু হল। স্বয়ং মহান প্রতিপালক যাকাত দেয়ার খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং তা হচ্ছে আটটি। দু'ধরনের প্রয়োজনের ভিত্তিতে এ খাত নির্ধারিত হয়েছে। এক, মৌলিক অভাবী ও অক্ষম এবং তাদের চাহিদা হল ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ। অভাবের তারতম্যের ভিত্তিতে তাদের চাহিদা হয়ে থাকে। এ দলে রয়েছে ফকীর, মিসকিন, ঋণগ্রস্ত ও মুসাফির। দ্বিতীয় দল হল যাকাতের কর্মচারী, নও মুসলিম, মুজাহিদ ও দ্বীনের সার্বক্ষণিক মুবাল্লিগ। তারা মিল্লাতের কল্যাণ ও প্রসারে নিয়োজিত বলে তা পাবে। তাই যার কোন অভাব নেই এবং মিল্লাতের কল্যাণ ও প্রসারেও কোন অবদান নেই তার যাকাতে কোনই অংশ নেই।

প্রাপকরাই যাকাত পাবে ঃ

হযরত (সঃ) যদি জানতে পেতেন যে, যাকাত প্রার্থীটি যথার্থ প্রাপক, তা হলেই তিনি তাকে যাকাত দিতেন। তারপরও তিনি যাকাত দিতে গিয়ে এ কথা বলে নিতেন ঃ মনে রেখ, এতে অভাবহীন ও সক্ষমদের কোন অংশ নেই।

তিনি ধনী থেকে যাকাত আদায় করে দরিদ্রের ভেতর বিতরণ করতেন। তাঁর পবিত্র রীতি এটাই ছিল যে, যেই এলাকার যাকাত আদায় করতেন সেই এলাকায়ই তা বন্টন করতেন। বন্টনের পর যদি কিছু বেঁচে যেত সেটাই শুধু তাঁর কাছে পাঠানো হত। তিনি সেগুলো ঘাটতি এলাকায় বন্টন করতেন। যাকাতের কর্মচারীদের তিনি বস্তীতে না পাঠিয়ে দুর্গম পল্লীতে পাঠাতেন। হযরত মাআজ (রাঃ) কে ইয়ামান পাঠিয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন, সেখানকার ধনীদের থেকে যাকাত নিয়ে সেখানকার দরিদ্রদের ভেতরে বিতরণ করতে। এটা বলেন নি যে, যাকাত আদায় করে আমার কাছে এনে জমা করবে।

তাঁর রীতি এটাও ছিল যে, তিনি যাকাতের কর্মচারীদের চতুষ্পদ জীব, ফল ও ফসলের মত প্রকাশ্য সম্পদের মালিকের কাছে পাঠাতেন না। বরং তাদের পাঠাতেন খেজুর বাগানের মালিকের কাছে, যার ফসলের পরিমাণ অস্পষ্ট। তারা খেজুর বাগানে ঘুরে খেজুরের পরিমাণ ঠিক করত এবং তার ওপর যাকাতের হিসসা নির্ধারণ করত। তিনি পরিমাণ নির্ধারকদের বলে দিতেন এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ বাদ দিয়ে ধরতে। কারণ, খেজুরে সাধারণত নানারূপ ঘাটতি দেখা দেয়। এটা তিনি এ জন্য করতেন যে, মালিক যেন যাকাত আদায়ের নির্ধারিত সময়ের প্রাক্কালে তাতে তসরুফ ঘটাতে না পারে। তা হলে যাকাতের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব হবে না। এ কারণেই তিনি খায়বারের চাষীদের কাছে কর্মচারীদের পাঠিয়ে তাদের ফল-ফসলের আনুমানিক পরিমাণ ঠিক করে তার ওপর যাকাত নির্ধারণ করতেন। তারপর তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে তা উসুল করার জন্য পাঠাতেন। চাষীরা যখন তাকে ঘুষ দিতে চাইত তখন তিনি বলতেন ঃ

"তোমরা কি আমাকে হারাম খাওয়াতে চাও? খোদার কসম! আমি তোমাদের কাছে সেই মহান ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি যিনি আমার কাছে সর্বাধিক প্রিয়। তোমরা এ কাজ দ্বারা আমার চোখে বানর ও শূকরের পর্যায়ে নেমে গেছ। আমি তোমাদের তাই ঘৃণা করি। তবে রসূল (সঃ) এর প্রতি মহব্বত ও তোমাদের প্রতি ঘৃণার কারণে আমি কখনও ইনসাফ থেকে বিচ্যুত হবনা।" তখন ইয়াহূদী চাষীরা বলত—এ ইনসাফের কারণেই আকাশ ও পৃথিবী আজও টিকে আছে।

হযরত (সঃ) ঘোড়া, খচ্চর, গাধা, শাক-সবজী এবং এমন সব ফল-মূল থেকেও যাকাত নিতেন না, যা না মাপা যায়, না গোলাজাত করা যায়। তবে আংগুর ও খেজুরের যাকাত তিনি নিতেন এবং সেক্ষেত্রে তাজা ও শুকনো কোনটাই বাদ দিতেন না।

মধুর ওপর যাকাতের প্রশ্ন ঃ

মধুর যাকাতের প্রশ্নে হযরতের (সঃ) রীতির ব্যাপারে মতান্তর রয়েছে। ইমাম আবু দাউদ (রঃ) আমর ইবনে শুআয়েব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, বণী মুতআন গোত্রের হিলাল নামক এক ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর কাছে মধুর ওশর নিয়ে হাজির হল এবং তাঁর কাছে সেই মধুবনের ইজারা প্রার্থনা করল। হযরত (সঃ) তা মঞ্জুর করলেন। তারপর হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) খলীফা হলে সুফিয়ান ইবনে ওহাব তাঁর কাছে মধুর ওশর সম্পর্কে জানার জন্য লিখল। তিনি জবাবে লিখলেন—নবী করীম (সঃ) যেভাবে মধুর ওশর আদায় করছিলেন তুমিও যদি সেভাবে আদায় করতে পার, তা হলে সেই মধু উৎপন্নের এলাকাটি ওশর দাতার দায়িত্বে ছেড়ে দেবে। যদি তা না পার তা'হলে সে এলাকা খোদার দান হিসেবে উন্মুক্ত থাকবে এবং সকলের তা থেকে মধু আহরণের অধিকার থাকবে। উক্ত হাদীছের এক বর্ণনায় আছে, প্রতি দশ কুরবে এক কুরব ওশর।

সুনানে ইবনে মাজায় হযরত আমর ইবনে শুআয়েবের বর্ণনা উধৃত হয়েছে। তিনি তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে এ বর্ণনা শুনেছেন যে, হযরত (সঃ) মধুর ওশর নিতেন।

মুসনাদে ইমাম আহমদে আবু ইয়াসারাহ ছাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন ঃ আমি আরয করলাম—হে আল্লাহর রসূল। আমার কাছে মধু (মৌচাক) রয়েছে। তিনি বললেন, ওশর আদায় কর। তখন আমি আরয করলাম—হে আল্লাহর রসূল! মৌচাকের এলাকাটি আমার তত্ত্বাবধানে দিন। তিনি মঞ্জুর করলেন।

আব্দুর রাযযাক উবায়দুল্লাহ ইবনে মুহাররির থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আবু সালমা থেকে ও তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—নবী করীম (সঃ) ইয়ামানবাসির ব্যাপারে লিখেছিলেন, তাদের থেকে যেন মধুর ওশর আদায় করা হয়।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন—আমাকে আনাস ইবনে আয়ায, তাকে হারিছ ইবনে আব্দুর রহমান, তাকে আবু জিআব, তাকে তার পিতা, তাকে সা'দ বিন আবু জিআব এ বর্ণনা শুনান যে, আমি রসূল (সঃ) এর কাছে হাজির হলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর আমি আরয করলাম—হে আল্লাহর রসূল! আমার এলাকাবাসির সম্পদের ওপর যাকাত ধার্য করে দিন। যেহেতু তারাও ইসলাম গ্রহণ করে তা অনুসরণ করে চলবে। নবী করীম (সঃ) তার আবেদন মঞ্জুর করলেন। তিনি তাদের ওপর আমাকে গভর্ণর নিযুক্ত করলেন। তাঁর অন্তর্ধানের পর হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) ও আমাকে তাদের গভর্ণর হিসেবে বহাল রাখলেন।

বর্ণনাকারী বলেন—তিনি এও বললেন যে, আমি মধুর ব্যাপারেও আমার সম্প্রদায়কে বলেছি যে, তাতেও তাদের যাকাত দিতে হবে। কারণ, যে বস্তুর যাকাত আদায় করা হয় না তাতে কোন কল্যাণ থাকে না। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করল, আপনার ধারণামতে তাতে কি পরিমাণ যাকাত হবে? আমি বললাম—দশ ভাগের এক ভাগ। তারপর আমি দশ ভাগের একভাগ নিয়ে নিলাম এবং হযরত উমর (রাঃ) এর কাছে হাজির হয়ে সব ঘটনা বললাম। উমর (রাঃ) তা গ্রহণ করে মুসলমানদের যাকাতের মালের সাথে রেখে দিলেন। ইমাম আহমদ (রঃ)ও বর্ণনাটি উধৃত করেছেন।

মধু সম্পর্কিত হাদীছসমূহ ও তার যাকাত নিয়ে উলামায়ে কিরামের ভেতরে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন—সঠিক মাসআলা হল এই যে, মধুর যাকাত নেই। তিরমিজী (রঃ) বলেন—মধুর যাকাতের ব্যাপারে হযরত (সঃ) এর কোন নির্দেশের প্রমাণ নেই। ইবনে মাঞ্জার বলেন—মধুর ওশরের ব্যাপারে না রসূল (সঃ) থেকে কোন বর্ণনা রয়েছে, না উম্মতের ইজমা হয়েছে। তাই তার ওপর যাকাত ফরয নয়। ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন, মধুর যাকাত সম্পর্কিত হাদীছ মূলত যঈফ হাদীছ। পক্ষান্তরে মধুর যাকাত নেই বলে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার ভেতরেও একমাত্র উমর ইবনে আব্দুল আযীযের (রঃ) বর্ণনাটি ছাড়া সবই যঈফ। সা'দ ইবনে আবু জিআব যে বর্ণনা প্রদান করেন, তাতেও জানা যায় যে, হযরত (সঃ) মধুর যাকাত দেয়ার জন্য নির্দেশ দেননি, বরং স্বেচ্ছায় কেউ দিলে তিনি তা নফল সদকা হিসেবে মঞ্জুর করেছেন। শাফেঈ (রঃ) অবশেষে বলেন—আমার ধারণামতে মধুর যাকাত নেয়া উচিত নয়। কারণ, তা না নেয়ার সঠিক প্রমাণ মেলে, কিন্তু নেয়ার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই তা এড়িয়ে যাওয়া উচিত।

ইয়াহিয়া ইবনে আদম বলেন—আমাকে হুসায়েন ইবনে যায়েদ, তাকে জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ, তাকে তার পিতা ও তাকে হযরত আলী (রাঃ) এ বর্ণনা প্রদান করেন যে, মধুর যাকাত নেই।

ইয়াহিয়া বলেন—হাসান ইবনে সালেহর কাছে মধু সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন—মধুর যাকাত নেই।

হযরত মাআজ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মধুর যাকাত নিতেন না। হুমায়দী (রঃ) বলেন—আমি সুফিয়ান থেকে শুনতে পেয়েছি যে, তিনি ইবরাহীম ইবনে মায়সারা থেকে, তিনি তাউস থেকে ও তিনি মাআজ ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে এ বর্ণনা শুনতে পান যে, তাঁর কাছে গরুর মাথা ও মধু নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন—এ দু'টো থেকে যাকাত নিতে নবী করীম (সঃ) আমাকে কখনও বলেন নি।

শাফেঈ (রঃ) বলেন—আমাকে মালিক (রঃ) ও তাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু বকর এ কথা জানান যে, আমার আব্বার কাছে উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রঃ) চিঠি লিখেন। আব্বা তখন মিনায় ছিলেন। তাতে তিনি জানান যে, ঘোড়া ও মধুর যাকাত নিবে না। এ সব 'আছার' পরস্পরকে জোরদার করে। মুসনাদ বর্ণনা ও মুরসাল বর্ণনার সমন্বয়ে মতভেদের ক্ষেত্রে প্রমাণকে জোরদার করা যায়।

ইমাম আবু হানীফার (রঃ) মাজহাব :

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, মধু যদি ওশর ধার্যযোগ্য ভুখন্ডে উৎপন্ন হয়, তা হলে তার ওপর ওশর ফরয হবে। যদি তা শুধু করযোগ্য ভুখন্ডে উৎপন্ন হয়, তা হলে ওশর দিতে হবে না। খাজনার জমীর জন্য মালিক থেকে খাজনা নেয়াই হয় তার ফল-ফসলের জন্য। তাই তার ওপর আর কোন কর চাপানো যায় না। ওশরী জমির মালিক থেকে যেহেতু খাজনা নেয়া হয় না, তাই তা থেকে উৎপন্ন যে কোন খাদ্য বস্তুর জন্য ওশর দিতে হবে।

ইমাম আহমদ (রঃ) দু'ধরনের জমিকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। তিনি খিরাযী ও ওশরী উভয় প্রকার জমিতেই ওশর ফরয বলেছেন। তবে এ ফরযিয়াতের সমর্থকদের ভেতরে এ নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে যে, তার কোন নেসাব নির্ধারিত রয়েছে কিনা ?

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন—কম-বেশী যাই হোক তার ওপরে ওশর ধার্য হবে। দ্বিতীয় দল বলেন—তার ওশর ফরয হবার নেসাব রয়েছে। এ নেসাবের পরিমাণ নিয়েও মতভেদ দেখা দিয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বলেন—তার নেসাব হল দশ রোতল। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন—পাঁচ ফরক। ছত্রিশ ইরাকী রোতলে এক ফরক। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন—তার নিসাব হল দশ ফরক। ইমাম আহমদের অনুসারীদের ভেতরে ফরকের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক অভিমত অনুসারে ষাট রোতলে এক ফরক। অন্য অভিমতে বলা হয়, ছত্রিশ রোতলে এক ফরক। তৃতীয় মত অনুসারে ষোল রোতলে এক ফরক। এটাই ইমাম আহমদের প্রকাশিত অভিমতের তাৎপর্য।

যাকাত দাতার জন্য দোআ :

নবী করীম (সঃ) এর কাছে যখন কেউ যাকাত নিয়ে আসত, তখন তিনি তাকে দোআ করতেন। কখনও তিনি এ দোআ করেছেন :

اللهم بارك فيه في ابله ـ

"হে আল্লাহ ! তাকে ও তার উটে বরকত দাও।"

কখনও তিনি বলেছেন :

اللهم صل عليه ـ

"হে আল্লাহ ! তার ওপর রহম কর।"

যাকাতের জন্য ভাল ভাল মাল বেছে নেয়ার পদ্ধতি ছিল না, বরং মধ্যম শ্রেণীর মাল নেয়ার রীতি চালু ছিল। তাই রসূল (সঃ) হযরত মাআজ (রাঃ) কে যাকাতের জন্য ভাল মাল বেছে নিতে নিষেধ করেছেন।

একের যা সদকা অপরের তা হাদিয়া :

নবী করীম (সঃ) যাকাত দাতাকে যাকাতের মাল খরীদ করতে নিষেধ করতেন। যদি কোন গরীব ধনীকে যাকাতের মাল হাদিয়া দিতেন, তবে তা নিতে তিনি অনুমতি দিতেন। যেমন হযরত বারীরা (রাঃ) কে যে যাকাত প্রদান করা হয়, হযরত (সঃ) তা খেয়েছেন এবং বলেছেন, এ মাল তার বেলায় যাকাত ও আমার বেলায় হাদিয়া।

কখনও তিনি যাকাতের সম্পদ থেকে সাধারণ মুসলমানের কল্যাণকর কাজের জন্য কর্জ নিতেন। যেমন, তিনি একদল সৈন্য প্রস্তুত করছিলেন। তাতে উটের অভাব দেখা দিল। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন—যাকাতের উট থেকে জওয়ান দেখে একটি উট নিয়ে আস। উট আনা হলে তিনি নিজ হাতে সেটাকে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ সেটার কানে তিনি চিহ্ন লাগালেন।

তেমনি তিনি প্রয়োজন দেখা দিলে যাকাত দাতা থেকে আগাম যাকাত নিতেন কর্জ হিসেবে। যেমন, আকাল দেখা দেয়ায় তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে দু'বছরের যাকাতের মাল ধার নিয়েছিলেন।

●

Contents

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

ফিতরা

ফিতরার গুরুত্ব :

নবী করীম (সঃ) প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী, আযাদ-গোলাম, ছোট-বড়, স্বনির্ভর-পরনির্ভর এক কথায় সকল মুসলানদের জন্য সাদকাতুল ফিতর ফরয করেছেন। তার পরিমাণ খেজুর, যব, পনির, কিসমিস ইত্যাদির এক সাআ। তিনি গম ও আটার পরিমাণও এক সাআ বলেছেন। সর্বজনবিদিত মাসআলা হল এই যে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) উক্ত দ্রব্য সমূহের স্থলে সকলের জন্য আধ সাআ গম নির্ধারণ করেছেন (আবু দাউদ)। সহীহদ্বয়ে আছে, হযরত মুআবিয়া (রাঃ) উক্ত পরিমাণই বহাল রেখেছেন। এ ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) থেকে যে সব মুরসাল ও মুসনাদ বর্ণনা (আছার) পাওয়া যায় তা পরস্পরের সম্পূরক ও সহায়ক। তার ভেতরে একটি বর্ণনা হল হযরত ছা'লাবা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবু সাগীরের। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল (সঃ) বলেছেন : এক সাআ গম দু'ব্যক্তির ওপর (মুসনাদে আহমদ)।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন—হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রমযানের শেষভাগে বসরার মিম্বরে বসে ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন—নিজ নিজ রোযার সদকা দাও। সেখানকার লোক তার পরিমাণ জানত না। তাই তিনি প্রবাসী মদীনার লোকদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন- ওঠ, তোমাদের ভাইদের বুঝিয়ে দাও। কারণ, তারা জানেনা যে, রসূল (সঃ) প্রত্যেক আযাদ ও গোলাম নর ও নারীর ওপর খেজুর ও যবের এক সা'আ এবং গমের আধ সা'আ ফিতরা ফরয করেছেন। কিন্তু, পরে যখন হযরত আলী (কঃ) এলেন, তখন তিনি বললেন—আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্বচ্ছলতা ও প্রশস্ততা দান করেছেন। তাই গম সহ সব দ্রব্যের ক্ষেত্রেই এক সাআ ফিতরা দাও। আমাদের শায়েখ ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ) এ মাজহাবকেই শক্তিশালী মনে করেন এবং বলেন—কাফফারার ব্যাপারে ইমাম আহমদ এ কথার ওপরেই কিয়াস করে বলেছেন, অন্যান্য দ্রব্যের মোকাবেলায় গম আধ সাআ ওয়াজিব।

হযরত (সঃ) এর রীতি ছিল এই যে, ঈদের নামাযের আগেই তিনি সদকায়ে ফিতর আদায় করতেন। সুনানে তাঁর থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : যে ব্যক্তি নামাযের আগে সদকা আদায় করে, তার সদকা মকবুল যাকাত হয়। আর যে ব্যক্তি নামাযের পর আদায় করে, তার তা সাধারণ সদকা হয়।

সহীহদ্বয়ে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল (সঃ) নির্দেশ দিয়েছেন ঈদগায় যাবার আগেই সবাইকে সদকায়ে ফিতর আদায় করতে। এ দু'টো হাদীছেরই বক্তব্য হল ঈদের নামাযের আগেই ফিতরা দিতে হবে। সেক্ষেত্রে ঈদের নামাযের পর আর ফিতরা আদায়ের ওয়াক্ত থাকে না। এটাই সঠিক মাসআলা। কারণ, এ সম্পর্কিত হাদীছ গুলোর ভেতরে কোন বিরোধ নেই এবং একটি অপরটিকে বাতিলও করেনি। এর বিরুদ্ধে কোন ইজমাও হয়নি। আমাদের শায়েখ ইবনে তায়মিয়া (রঃ) এটাকেই জোরদার মাজহাব বলে মনে করেন। এর উদাহরণ হল এই যে, কুরবানী কখনও ওয়াক্তের ওপর নির্ভর করেনা, নির্ভর করে ইমামের নামায শেষ করার ওপর। তাই ইমামের নামায শেষ করার আগে কেহ কুরবানী করলে তা কুরবানী হবেনা, হবে গরু-বকরীর গোশত খাওয়া। তেমনি ফিতরাও নামাযের পরে দিলে ফিতরা আদায় হবেনা, হবে সাধারণ দান। এরূপ আরও মাসআলা রয়েছে। দু'টি ব্যাপারে হযরত (সঃ) থেকেও তা বর্ণিত হয়েছে।

ফিতরার প্রাপক ঃ

নবী করীম (সঃ) এর পবিত্র সুন্নাত এই ছিল যে, সদকায়ে ফিতর তিনি মিসকীনের জন্য নির্দিষ্ট করতেন। সারি বাঁধা ভিক্ষুকদের এক মুঠি এক মুঠি করে দেয়ার রীতি তিনি প্রবর্তন করেন নি। তিনি সেরূপ কোন নির্দেশও দেননি। সাহাবা ও তাবেঈনদের ভেতরেও তা পরিদৃষ্ট হয়নি। বরং আমাদের কাছে যে সব বর্ণনা পৌচেছে তার ভেতর একটি তো এই যে, ফিতরা নির্দিষ্টভাবে মিসকীনদের জন্য ব্যয় করা হবে। এ মতটি অন্য মত থেকে জোরদার ও প্রাধান্য পাবার যোগ্য। অন্য মতটি হল এই যে, তা ভিক্ষুকদের ভেতর বিতরণ করে দেয়া।

নফল সদকার রীতি ঃ

নফল সদকার ব্যাপারে হযরত (সঃ)-এর পবিত্র সুন্নাত ছিল এই যে, তাঁর কাছে যা কিছু থাকত তা তিনি সদকা করে দিতেন। সব চাইতে বেশী সদকা তিনিই করতেন। যখনই আল্লাহ পাক তাঁকে কিছু দিতেন, তা কম কি বেশী সে দিকে তিনি খেয়াল করতেন না, যে-ই এসে প্রার্থনা করত, তাকেই তিনি কম বেশী যা হোক দিয়ে দিতেন। তিনি এমন ভাবে সদকা করতেন যেন দারিদ্র্যের তিনি কোন পরোয়াই করতেন না। সদকা করাই যেন তার সব চাইতে প্রিয় কাজ ছিল। তাঁর দান পেয়ে প্রাপকরা যা খুশি হ'ত তার চেয়ে অনেক বেশী খুশী হতেন তিনি দিয়ে। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম দাতা। তাঁর হাত শুধু খোলাই ছিলনা, দানের বেলায় ছিল অন্ধ ও বেপরোয়া। কোন অভাবী এলে তিনি নিজের অভাব ভুলে যেতেন এবং খাওরা পরার ব্যাপারে তাকে নিজের ওপর প্রাধান্য দিতেন।

হযরতের (সঃ) দান বখশিশ কয়েক ধরনের হত। কখনও হেবা করতেন কখনও সদকা দিতেন, কখনও হাদিয়া দিতেন, কখনও কিছু খরীদ করে দাম দিয়ে সে বস্তুও দিয়ে দিতেন। হযরত জাবির (রাঃ) এর সাথে তা করেছেন। কখনও কিছু ধার নিয়ে তা থেকে উত্তম কিছু পরিশোধ করতেন। কখনও কিছু খরীদ করে তার দাম অনেক বেশী দিতেন। হাদিয়া গ্রহণ করতেন বটে, তবে তার চাইতে অনেক গুণ বেশী আবার হাদিয়া দাতাকে বখশিশ দিতেন। তাঁর হাতে যা কিছু থাকত তা তিনি এভাবেই খরচ করে ফেলতেন। দান খয়রাতের জন্য তিনি অন্যকেও নির্দেশ দিতেন, তার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তিনি অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুসারে এ জন্য সবাইকে আহবান জানাতেন। কোন কৃপণকে দেখলে তিনি তাকে দানের জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। যে কেউ তাঁর সাহচর্যে এসে তাঁর কাজ দেখে দান না করে পারত না। তাঁর এটা রীতিই ছিল যে, সচরাচর তিনি পরোপকার, দান ও পুণ্য কাজের জন্য বলতে থাকতেন।

হযরতের অন্তরের পূর্ণত্ব ও প্রশস্ততার কারণ :

হযরতের (সঃ) অন্তরের এ প্রশস্ততার সব চেয়ে বড় কারণ ছিল তাঁর তাওহীদে পরিপূর্ণ ও অবিচল বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই তাঁর অন্তরকে জ্যোতির্ময় ও উদার করে দিয়েছিল। আল্লাহ পাক বলেন :

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ -

"তাঁর কথা কি, আল্লাহ পাক যাঁর অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দিয়েছেন। অনন্তর সে তার প্রভুর তরফ থেকে আলোকময় রয়েছে।"

তিনি অন্যত্র বলেন :

فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ -

"অনন্তর যাকে আল্লাহ চান পথ দেখাতে, তার অন্তর ইসলামের জন্য খুলে দেন। যাকে আল্লাহ বিভ্রান্তি মঞ্জুর করেন, তার অন্তর তিনি সংকীর্ণ ও অস্থির রাখেন যেন তারা আকাশে চড়ছে আর কি!"

এতে জানা যায়, অন্তরের ঔদার্যের মূল ভিত্তি হল তাওহীদ ও হিদায়েত। পক্ষান্তরে অন্তরের সংকীর্ণতার ভিত্তি হল শিরক ও গোমরাহী। তেমনি হল নূর বা আলো। ঈমানের আলো যে

অন্তর উদ্ভাসিত করে তা প্রশস্ত ও সদানন্দময় থাকে। আর যখন ঈমানের আলো নিষ্প্রভ হয় তখন তা সংকীর্ণ হয়ে যায়, পরিশ্রান্ত ও পেরেশান হয়। তা যেন সংকীর্ণ এক কঠিন প্রাচীরের কুঠুরীতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

জামে তিরমিজীতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন—অন্তরে যখন নূর প্রবেশ করে, তখন অন্তর খুলে যায় ও তাতে প্রশস্ততা সৃষ্টি হয়। আরয করা হল—হে খোদার রসূল! তার আলামত কি? তিনি জবাব দিলেন—স্থায়ী নিবাসের (পরকালের) প্রতি আকর্ষণ ও প্রতারণার জগতের প্রতি বিতৃষ্ণা এবং মরণ আসার আগেই তার প্রস্তুতি সম্পন্ন করা। বান্দার অন্তরে যতখানি নূর প্রবিষ্ট হয়, ততখানি তার অন্তর প্রশস্ত হয়।

বাহ্যিক আলো-আঁধারের প্রভাব সেরূপ। মানুষের সাহস বেড়ে যায় আলোতে আর অন্ধকারে মানুষের মন হয় সংকুচিত। তেমনি বিদ্যা মানুষের অন্তরে প্রশস্ততা আনে আর মূর্খতা দেয় সংকীর্ণতা। মানুষের বিদ্যা যত বাড়ে, মনের প্রশস্ততাও তত বাড়ে। অবশ্য সে বিদ্যা হতে হবে নবী করীম (সঃ) এর নির্দেশিত বিদ্যা। সে বিদ্যাই কল্যাণপ্রদ এবং সে বিদ্যা বাস্তবায়নকারীরা অন্য সব মানুষের চেয়ে বেশী প্রশস্ত অন্তরের হয়ে থাকে। তারাই হয় উত্তম চরিত্রের অধিকারী ও উত্তম জীবনযাপনকারী। সে বিদ্যাই আল্লাহর নৈকট্য দান করে এবং আল্লাহর মহব্বতে অন্তর নিমগ্ন করে। তখন তাঁর ইবাদতকে নিআমত মনে হয় এবং তার চাইতে কোন কিছুই তার কাছে ভাল লাগে না। তখনি সে এভাবে বলতে থাকে—হায়! আমি যদি জান্নাতেও আল্লাহর মহব্বতে ডুবে থাকতে পারতাম, তা হলে কতইনা উত্তম হত।

প্রশস্ত ও সদানন্দ অন্তরেই কেবল ভালবাসা ঠাঁই পায়। ভালবাসার স্বাদ যে পেয়েছে সেই কেবল ভালবাসার দৃঢ় রহস্য উপলব্ধি করেছে। ভালবাসা যত গভীর হবে অন্তর ততই উদার ও প্রশস্ত হবে। সংকীর্ণ চিত্তে কখনও ভালবাসা ঠাঁই পায় না। তাই ভালবাসাহীন মন-ই শুধু সংকীর্ণ হয়ে থাকে। ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্য বিহীন লোকদের দেখে কিছু লোকের ভেতর খটকা সৃষ্টি হয় এবং তাদের সাথে মেলামেশা করে আত্মিক পীড়ায় আক্রান্ত হয়।

আল্লাহ তা'আলা থেকে ফিরে থাকা, গায়রুল্লাহর দিকে মনো সংযোগ, আল্লাহর জিকর থেকে গাফলাত ও গায়রুল্লাহ্‌র সাথে মহব্বত অন্তরের সংকীর্ণতার জন্য সব চেয়ে বড় উপকরণ। কারণ, আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাথে যে মহব্বত করে তাকে আল্লাহ এ শাস্তি দেন যে, গায়রুল্লাহর মহব্বতের কয়েদখানা থেকে তার অন্তর আর মুক্তি পায় না। তখন দুনিয়ার বুকে তার চেয়ে হতভাগা ও সংকীর্ণমনা আর কে হতে পারে? সর্বাবস্থায় সর্বত্র জিকরুল্লাহর হালাতে স্থির থাকাই অন্তরের প্রশস্ততা ও উন্মুক্ততার সেরা উপকরণ। এ কারণেই জিকরের ভেতর অন্তরের মুক্তি ও প্রশান্তির এক অদ্ভুত প্রভাব রাখা হয়েছে। তেমনি আল্লাহর জিকর থেকে ঔদাসিন্যের ভেতরে অন্তরের সংকীর্ণতা ও অস্থিরতার অদ্ভুত প্রভাব বিদ্যমান।

সৃষ্টির সাথে কল্যাণময় সম্পর্ক :

তেমনি সুপ্রভাব রয়েছে সৃষ্টির সাথে সুসম্পর্কের। সৃষ্টির কল্যাণে নিয়োজিত ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টিকারী উপকারী ও দাতা ব্যক্তির অন্তর অত্যন্ত প্রশস্ত হয়। তার আত্মা নির্মল ও পবিত্র হয়। সে প্রশস্ত অন্তরের তৃপ্তিকর অবদানে ধন্য হয়। পক্ষান্তরে পরোপকার বিমুখ কৃপণ ব্যক্তির অন্তর সর্বাধিক সংকীর্ণ, দুর্গত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে থাকে।

নবী করীম (সঃ) দাতা ও কৃপণের উদাহরণ তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন—তারা যেন লৌহ পরিচ্ছদাবৃত দু'ব্যক্তি। তাদের দাতা ব্যক্তি যখন দানের ইচ্ছা করে তখন তার লোহার পোষাক খুলে যায়, ঢিলা ঢালা হয়ে যায়। ফলে সে যেরূপ ইচ্ছা করতে পারে এবং পোষাক তার বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। পক্ষান্তরে কৃপণ ব্যক্তি দানের ইচ্ছা করা মাত্র তার পোষাক টাইট হয়ে যায়, সে হাত খুলতে পারে না, দানও করতে পারে না। এ দাতাই হচ্ছে মু'মিনের প্রশস্ত হৃদয়ের উদাহরণ আর কৃপণ হচ্ছে সংকুচিত ও সংকীর্ণ অন্তরের উদাহরণ।

বীরত্ব অন্তরের প্রশস্তির নমুনা :

তেমনি বীরত্বও অন্তরের প্রশস্তিরই বহিঃপ্রকাশ। বীরগণ উদার ও প্রশস্ত অন্তরের অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে কাপুরুষ সব চাইতে সংকুচিত ও সংকীর্ণ অন্তরের হয়ে থাকে। তার কোন আনন্দ ও প্রশান্তি থাকে না। তার ভাগ্যে না কোন নিআমত থাকে, না সে কোথাও তৃপ্তি পায়। তবে হাঁ, চতুষ্পদ জীবের মত তার জৈবিক আনন্দ ও তৃপ্তি থাকে যা তার বিবেক ও দূরদর্শীতার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

এভাবে অন্তরকে সংকীর্ণতা ও দুঃখদায়ক সব নিন্দনীয় বিশেষণগুলো থেকে মুক্ত রাখাই হল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ অন্তরের প্রশস্ততা সৃষ্টিকারী কাজ গুলোর দিকে মনোনিবেশ না করবে এবং সংকীর্ণতা সৃষ্টিকারী স্বভাবগুলো পরিহার না করবে, ততক্ষণ সে নিজের কোনই কল্যাণ সাধন করতে পারবে না।

অন্তরের সংকীর্ণতার অন্যান্য কারণ :

এভাবে দৃষ্টি ও কথা, শ্রুতি ও মেলা-মেশা, আহার ও নিদ্রার ক্ষেত্রেও অপ্রয়োজনীয় ও অন্যায় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কারণ, সে সবও অন্তরে দুঃখ ও দুর্ভাবনা সৃষ্টি করে সেটাকে সংকীর্ণ ও সংকুচিত করে ফেলে। পার্থিব ও অপার্থিব অধিকাংশ আজাব ও কষ্টের মূলে উপরোক্ত কাজগুলোই সক্রিয়। মূলত উক্ত বিপজ্জনক দিকগুলোর সাথে জড়িয়ে মানুষ বড়ই সংকীর্ণতা ও দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার শিকার হয়।

পক্ষান্তরে পূর্ববর্ণিত সদগুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মানুষ কতই সুখময় জীবন যাপন করে থাকে। দুনিয়া ও আখিরাতের অজস্র নিআমত তাকে ঘিরে রাখে। আল্লাহ পাক তাদের সম্পর্কে বলেন :

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ -

"নিশ্চয় নেককারগণ নিআমতে নিমজ্জিত।"

অপরপক্ষে অসদগুণাবলীর ধারকদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

إِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ -

"অবশ্যই অপরাধীরা অনলে অর্পিত।"

এ দু'দলের ভেতরে বিভিন্ন পার্থক্য বিদ্যমান। তার খবর কেবল আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনই রাখেন।

মোট কথা, নবী করীম (সঃ) উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণ নমুনা ছিলেন। তাঁর থেকেই আমরা অন্তরের প্রশস্ততা ও ঔদার্য, দৃষ্টির প্রসন্নতা ও আত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ সফলতা অর্জন করতে পারি। তিনি যেন হৃদয়ের প্রশস্ততা ও চারিত্রিক পরিপূর্ণতার শারীরিক নমুনা। তাঁর অনুসরণ করেই বান্দা হৃদয়ের বিশালতা ও আত্মিক জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ অর্জন করতে পারে। তাঁর অনুসারীদের আল্লাহ তা'আলা অনুসরণের পর্যায়ানুসারে নিরাপত্তা ও মর্যাদা দান করেন। মানে কাউকে বেশী ও কাউকে কম করেন। যে ব্যক্তির সে কল্যাণ লাভের সৌভাগ্য হয়, তার উচিত আল্লাহর হামদ ও শোকর করা। আর যার সে সৌভাগ্যের বদলে দুর্ভোগ অর্জিত হয়, তার উচিত নিজকে সর্বতোভাবে দায়ী করে সৌভাগ্যের পথ অনুসরণ করা।

●

Contents

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

রমযানের রোযা

প্রভু-ভৃত্যের গোপন সম্পর্ক ঃ

রোযার উদ্দেশ্য হচ্ছে কুপ্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ, প্রিয় ও কাম্য বস্তু থেকে বিরতি এবং যৌনপ্রবণতায় ভারসাম্য সৃষ্টি। তার ফলে অশেষ কল্যাণ ও অফুরন্ত নিআমত লাভের দ্বার উন্মোচিত হয়। আল্লাহর দরবারে বান্দার মকবুলিয়াত অর্জিত হয়। কারণ, রোযা আত্মিক পরিশুদ্ধির সহায়ক হয় এবং আত্মশুদ্ধি মূলত স্থায়ী জীবনের চাবিকাঠি।

রোযার মাধ্যমে মানুষ মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা অনুভব করতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে পরস্পরের দৈন্য সৃষ্ট দুঃখ-কষ্ট ও ব্যাথা-বেদনা। তা ছাড়া খানা-পিনার নিয়ন্ত্রণের কারণে শয়তানের দৌরাত্ম্যও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। জীবিকা সৃষ্ট ক্ষতিকর দিকগুলোও হ্রাস পায়। শরীরের প্রতিটি অংশ স্থির ও শান্ত থাকার সুযোগ পায়। ফলে তা বিপথে চালিত হওয়ার আশংকা মুক্ত থাকে। এ যেন পরহেযগারী সৃষ্টির এক লাগাম ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য একটি ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। নেককার ও খোদা-প্রেমিকদের আত্মিক সাধনার এ যেন এক হাতিয়ার। সব নেক কাজের ভেতর একমাত্র রোযাই রাব্বুল আ'লামীনের জন্য পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত হয়। কারণ, রোযাদার সব কিছু থেকে বিরত থাকে। সে আল্লাহকে খুশী করার জন্য খানা-পিনা ও কামনা-বাসনার সব কিছুই বর্জন করে। সে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজ আবেগ, লালসা, প্রিয় বস্তু, স্বাদ, আহ্লাদ এক কথায় পার্থিব আকর্ষণের ব্যাপারগুলো পরিত্যাগ করে থাকে।

রোযা প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যকার এমন এক গোপন রহস্যপূর্ণ ব্যাপার যা কেবল প্রভুই জানতে পায়।

এ ব্যাপারেও নবী করীম (সঃ) এর পদ্ধতি হল সর্বাংগীন সুন্দর ও উদ্দেশ্য অর্জনে সর্বাধিক সহায়ক। সাধারণ মুসলমানের জন্যেও তা সহজপালা। আকর্ষণীয় বস্তু ও যৌন আবেগ থেকে বেঁচে থাকা যেহেতু কঠিন ব্যাপার, তাই রোযা হিজরতের বেশ কিছু পরে ফরয করা হয়েছে। পয়লা সবার অন্তরকে তাওহীদ ও যাকাত দ্বারা মজবুত করে নেয়া হয়েছে এবং কুরআন নির্দেশিত অন্যান্য বিধানগুলোর ওপর তাদের অভ্যস্ত করে নেয়া হয়েছে। তারপর ধীরে সুস্থে তা প্রবর্তন করা হয়েছে। হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে তা ফরয করা হয়েছে। নবী করীম (সঃ) ইন্তিকালের প্রাক্কালেও ন'টি রোযা রেখে ইন্তিকাল করেন।

রোযার তিনটি পর্যায় ছিল। এক, স্বেচ্ছাধীন রোযা অর্থাৎ যে কেউ ইচ্ছে করলে প্রতিদিন ভিক্ষুক খাইয়ে রোযা না রেখে পারত। তারপর এ ব্যবস্থা সংকুচিত হয়ে শুধু বৃদ্ধ ও নারীদের জন্য সীমিত হল। তারপর তা আরও সংকুচিত হয়ে শুধু রুগ্ন ও মুসাফিরের জন্য নির্দিষ্ট হল। শেষ পর্যায়ে গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রী নারীর জন্য ভিক্ষুক খাওয়ানোর বদলে কাযা আদায়ের শর্তে রোযা না রাখার সাময়িক সুযোগ দান করা হল।

দুই, অপরিহার্য রোযা অর্থাৎ রোযাদার কিছু না খেয়ে রাতে ঘুমিয়ে পড়লেও পরবর্তী রাত পর্যন্ত তার খানা-পিনা নিষিদ্ধ ছিল।

তিন, যথানিয়মে রোযা অর্থাৎ যেভাবে রোযা আজ দুনিয়ায় চালু রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, এ রোযা এসে দ্বিতীয় ধাপের রোযা বাতিল করে দিয়েছে।

সওমে বিসাল প্রসংগ ঃ

হযরত (সঃ) রমযানে কয়েক ধরনের ইবাদত বেশী করতেন। তিনি রমযানে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এর সাথে কুরআন শরীফের বিভিন্ন মনযিল নিয়ে তাকরার করতেন। সে সময়ে তিনি দান-খয়রাতও অত্যধিক করতেন। দান-খয়রাতের বেলায় স্বভাবতই তিনি সর্বাগ্রে থাকতেন। রমযানে দান-সদকা, কুরআন-তিলাওয়াত, নামায, জিকির, ই'তিকাফ ইত্যাদি তিনি অনেক বাড়িয়ে দিতেন। অন্যান্য মাসের তুলনায় রমযান মাসটিকে তিনি বেশী ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন।

অবশ্য তিনি নিজ প্রভুর বন্দেগীতে সার্বক্ষণিকভাবে মগ্ন থাকার জন্য মাঝে মাঝে সওমে বিসাল (ক্রমাগত রোযা) অনুসরণ করতেন। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামকে তিনি ক্রমাগত রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম আরয করতেন—হে আল্লাহর রসূল। আপনি কেন তা রাখছেন ? রসূল (সঃ) জবাব দিলেন—আমার প্রশ্ন আলাদা। আমাকে তো রাত্রি জাগরণও করতে হয়।

অন্য বর্ণনায় আছে, আমি তো আমার প্রভুর দরবারে থাকি এবং তিনি আমাকে খানা-পিনা প্রদান করেন। এ খানা-পিনা সম্পর্কে আবার মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে।

একদল বলেন—তা বস্তুগত ও মুখে খাওয়া হত। তারা বলেন—এটাই সঠিক শাব্দিক অর্থ। তাই তা থেকে সরে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় দল বলেন—তা আত্মিক এবং আল্লাহর সান্নিধ্য, তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন ও তাঁর ভালবাসার স্বাদ ও আনন্দই এ পানাহারের তাৎপর্য। এ আত্মিক খোরাক মানুষের আত্মাকে এরূপ সবল ও সতেজ করে দেয় যে, তার আর বস্তুগত খাদ্যের প্রয়োজন থাকেনা। এ খাদ্য আত্মাকে পরিতৃপ্ত ও দেহকে প্রশান্ত রাখে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে, এ আত্মিক খোরাক মানব

দেহকে জৈবিক খাদ্যের প্রয়োজন থেকে মুক্ত করে দেয়। বিশেষত যে খোদা প্রেমিক তার অভিষ্ট অর্জন করেছেন, নিজ প্রিয়তম প্রভুর বিচিত্র প্রকাশ দেখে দেখে চোখ শীতল করছেন এবং তাঁর প্রীতি ও অবদানে প্রতিমুহূর্তে নিজেকে ধন্য করছেন, পরন্তু নিজ প্রিয়তমের দেয়া সম্পদ ও মর্যাদায় অহরহ ভূষিত হয়ে চলছেন, তার কাছে বস্তুগত খাদ্যের কি মূল্য রয়েছে? পার্থিব প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমলীলারই যখন এরূপ আত্মভোলা করার শক্তি রয়েছে, তখন ঐশী প্রেম-লীলার শক্তি যে কত বেশী তার ইয়াত্তা কি? যাঁর মত মর্যাদা, ক্ষমতা, সৌন্দর্য, পূর্ণত্ব ও প্রেম-প্রীতি আর করো নেই, তাঁর সাথে যখন কোন প্রাণের প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তখন তার অংগের প্রতিটি তন্ত্রী ও ধমনী তো এরূপ সজীব ও চঞ্চল হয়ে যায় যা জৈবিক খাদ্য থেকে কখনও হতে পারেনা। সেক্ষেত্রে স্বভাবতই বলা যায় যে, প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের ঘরে খেয়ে-দেয়ে এরূপ সুস্থ সবল থাকছে। এ কারণেই রসূল (সঃ) বলেছেন, আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে থাকি ও তাঁর কাছ থেকেই খাওয়া দাওয়া পেয়ে থাকি। মূলত সে খাদ্য যদি বস্তুগত হত তো ক্রমাগত রোযা দূরের কথা, একটি রোযাও তো হত না। যদি তা রাতের খাদ্যও হত, তা হলেও তো আর ক্রমাগত রোযা হত না।

ক্রমাগত রোযার তিনটি মত :

হযরত (সঃ) সাহাবায়ে কিরামের 'আপনি তো ক্রমাগত রোযা থাকেন'—এ কথার জবাবে 'আমি তো তোমাদের মত নই'—এ বক্তব্য দ্বারা তাঁর ক্রমাগত রোযা থাকার কথা স্বীকার করেছেন। পরন্তু এও জানিয়ে দিলেন যে, সাহাবাদের ও তাঁর ভেতরে তারতম্য রয়েছে। তাই তাঁকে এমন কিছু বেশী আমল করতে হয় যা সাহাবাদের জন্য প্রয়োজন নয়।

সহীহ মুসলিমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে : রসূল (সঃ) রমযানুল মুবারকে 'সওমে বিসাল' শুরু করলেন। তা দেখে সাহাবারাও শুরু করলেন। তখন তিনি তাদের নিষেধ করলেন। সাহাবারা আরয করলেন—'আপনিতো রাখছেন।' হযরত (সঃ) জবাবে বললেন—'আমি তোমাদের মত নই। আমাকে পানাহার দেয়া হয়।' এ বলে তিনি উম্মতদের ক্রমাগত রোযা থেকে রেহাই দিলেন ও সেহরী পর্যন্ত পানাহারের অনুমতি দিলেন।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত (সঃ) বলেছেন : বিসাল করোনা। যদি তা কারো করতে ইচ্ছে হয় তো সেহরী পর্যন্ত কর।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতে মাসআলা কি দাঁড়াল? সওমে বিসাল কি জায়েয, না হারাম, না মাকরূহ? এ প্রশ্নে উলামায়ে কিরামের ভেতর মতভেদ দেখা দিয়েছে। ফলে তিনটি মত সৃষ্টি হয়েছে।

এক—যদি কারো ক্রমাগত রোযা থাকার ক্ষমতা থাকে, তার জন্য জায়েয। হযরত আব-দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) প্রমুখ থেকে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি ক্রমাগত কয়েক দিন

বিনা ইফতারীতে রোযা রাখতেন। এ দলের যুক্তি হল এই, রসূল (সঃ) ও সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ক্রমাগত রোযা রেখেছেন। অবশ্য রসূল (সঃ) সাহাবাদের কষ্টের কথা ভেবে নিষেধ করেছেন। সহীহদ্বয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ হযরত (সঃ) সাহাবায়ে কিরামকে ক্রমাগত রোযা রাখতে নিষেধ করে বলেছেন, আমি তোমাদের মত নই। সাহাবায়ে কিরাম তখনি বিরত না হয়ে তাঁর সাথে একদিন, দু'দিন, তিন দিন পর্যন্ত ক্রমাগত রোযা রেখেছেন। ফলে নিষেধের পরেও সাহাবাদের ক্রমাগত রোযা রাখার প্রমাণ মিলে। যদি সে নিষেধ হারাম অর্থে হত তা হলে তারা তা অমান্য করতেন না। আর তিনিও তা করতে দিতেন না। এতে বুঝা যায়, তিনি উম্মতের কষ্টের কথা ভেবেই নিষেধ করেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেনঃ রসূল (সঃ) দয়াপরবশ হয়ে ক্রমাগত রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন।

দুই—দ্বিতীয় দল বলেনঃ ক্রমাগত রোযা জায়েয নেই। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফেঈ (রঃ) ও ছাওরী (রঃ) এর মাজহাব এটাই। ইবনে আবদুল বার (রঃ) তাঁদের থেকে বর্ণনা করেন—তাঁরা সবল, দুর্বল কারও জন্যেই ক্রমাগত রোযা জায়েয বলেন নি।

আমি বলছি, ক্রমাগত রোযা মাকরূহ হবার ব্যাপারে ইমাম শাফেঈর (রঃ) অভিমত পাওয়া গেছে। তবে তাঁর সহচরদের ভেতর মতভেদ বিদ্যমান। কেউ মাকরূহ তাহরীমী বলেন। কেউ মাকরূহ তানযীহী বলেন। যারা হারাম বলেন, তারা রসূল (সঃ) এর নিষেধ করাকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। নিষেধাজ্ঞা হারাম হওয়া দাবী করে। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) যে বলেছেন, 'দয়া করে নিষেধ করেছেন', সে বর্ণনাও হারাম হওয়ার অন্তরায় নয়, বরং তার সহায়ক। কারণ, দয়ারও দাবী হল হারাম হওয়া। সব হারাম ব্যাপারই উম্মতের জন্য করুণা এবং উম্মতের হিফাজতের জন্যই তা হারাম হয়েছে।

এখন রইল নিষেধাজ্ঞার পরে ক্রমাগত রোযা রাখার প্রশ্নটি। তার জবাব এই যে, রসূল (সঃ) তাতে এ জন্য বাধা দেন নি যে, তারা নিষেধাজ্ঞার কারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিক। তার ফলও দেখা দিয়েছে। যখন তারা দেখতে পেলেন যে, ক্রমাগত রোযা তাদের এতই দুর্বল করছে যে, অন্যান্য জরুরী ইবাদতের পথেই তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আপনা থেকেই তারা নিষিদ্ধকরণের পক্ষপাতী হয়ে গেছেন। সহীহ্দ্বয়ে হযরত উমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেন—যখন দিন এতখানি চলে যায় যে, রাতের কিছু অংশ পেয়ে যায়, তখন রোযাদার যেন ইফতার করে নেয়।

সহীহদ্বয়ে এভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আওফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইফতারের সময় আসামাত্র রোযাদারকে 'মুফতার' ঘোষণা করেছেন, তা সে ইফতার করুক

আর নাই করুক। এ ঘোষণা ক্রমাগত রোযার পথে শরয়ী বাধা বৈ নয়। তিনি আরও বলেন, নবী করীম (সঃ) বলেছেন—আমার উম্মত স্বাভাবিকতার অনুসারী হবে। যতদিন আমার উম্মত যথা মুহূর্তে ইফতারের জন্য উদ্বিগ্ন ও তৎপর থাকবে, ততদিন তাদের কল্যাণ অব্যাহত থাকবে। সুনানে হযরত (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যতদিন মুসলমানরা ইফতারে ক্ষিপ্রতা অক্ষুন্ন রাখবে, ততদিন দ্বীন বিজয়ী থাকবে। (পক্ষান্তরে) ইয়াহুদী ও নাসারারা ইফতারে (শৈথিল্য সহকারে) বিলম্ব ঘটায়।

সুনানে আরও বর্ণিত আছে, রসূল (সঃ) বলেছেন—'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার সর্বাধিক প্রিয় বান্দা সে, যে সর্বাগ্রে ইফতার করে।' এ সব বর্ণনা এমন কি ইফতারে বিলম্ব করা মাকরূহ বলে প্রমাণ করে। তাই যারা ইফতার বর্জন করে, তাদের অবস্থা কি হতে পারে? তা ছাড়া যা মাকরূহ হয় তা আর ইবাদতের মর্যাদা পায় না। ইবাদতকে অন্তত মুস্তাহাবের স্তর লাভ করতে হয়।

তিন—তৃতীয় মতটিই সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত মনে হয়। তা হল এই যে, এক সেহরী থেকে অন্য সেহরী পর্যন্ত 'বিসাল' জায়েয। ইমাম আহমদ (রঃ) ও ইসহাক (রঃ) থেকে এটাই বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) রসূলে পাক (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন: "ক্রমাগত রোযা থেক না। একান্তপক্ষে যে থাকতে চাও, সে এক সেহরী থেকে অন্য সেহরী পর্যন্ত থেক।"—বুখারী।

ক্রমাগত রোযার প্রশ্নে এটা মাঝামাঝি ও সহজ পন্থা। এটা রাতের খাওয়ারও স্থলাভিষিক্ত হয়। তাতে কিছুটা বিলম্ব হয় এই যা। তখন রোযাদার দিন-রাতে একবার মাত্র খাবে।

চাঁদ দেখার মাসআলা:

হযরতের (সঃ) রীতি এটাই ছিল যে, যতক্ষণ চাঁদ দেখার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত না হতেন কিংবা চাক্ষুস সাক্ষী না পেতেন, ততক্ষণ রোযা শুরু করতেন না। যেমন হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এর সাক্ষ্য অনুসারে রোযা রেখেছেন। আরেকবার এক আরববাসির সাক্ষ্য অনুসারে রোযা রেখেছেন। তিনি তাদের দু'জনের কথাই বিশ্বাস করেছেন। তিনি সাক্ষ্যদানের শরয়ী শর্তের সাথে এটাকে যুক্ত করেন নি। যদি তিনি নিজে চাঁদ না দেখতেন আর কোন দেখা সাক্ষীও না পেতেন, তা হলে শাবানের ত্রিশদিন পুরিয়ে রোযা শুরু করতেন। যদি মেঘ-বৃষ্টির কারণে ত্রিশে শাবানের রাতে চাঁদ দেখা না যেত, তা হলেও তিনি ত্রিশে শাবান পূর্ণ করে পরদিন থেকে রোযা রাখতেন।

মেঘঢাকা দিনে তিনি রোযা শুরু করতেন না আর কাউকে তা করতে নির্দেশও দেননি। বরং মেঘলা দিন হলে শাবানের ত্রিশ দিন পুরিয়ে রোযা শুরু করতে বলেছেন। এ রীতিই তাঁর

অনুসৃত রীতি। তিনি যে বলেছেন, মেঘলা দিন হলে অনুমানে ঠিক করে নিও, তা এ রীতির পরিপন্থী নয়। এখানে অনুমান অর্থ মাসের হিসেব ঠিক করা। মানে, মাস পূর্ণ করা। যেমন তিনি বলেছেন—'আকমিলুল ইদ্দাতা' অর্থাৎ নির্ধারিত সময় পূর্ণ করে নাও। এখানে পূর্ণ করা মানে মাস পূর্ণ করা। যে মাসের শেষ তারিখে আকাশ মেঘঢাকা হয়, তা পূর্ণ করতে হবে।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, 'শা'বানের মুদ্দাত পূর্ণ কর।' হযরত (সঃ) বলেন—'যতক্ষণ চাঁদ না দেখ, রোযা রেখনা। তেমনি চাঁদ না দেখে ঈদ করোনা। যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তা হলে মুদ্দাত পুরা কর।" এখানে রোযা রাখা ও শেষকরার দিন মেঘলা হলে যে মুদ্দাত পুরা করার নির্দেশ দিয়েছেন তার অর্থ মাস পুরা করা।

এর চেয়েও সুস্পষ্ট বর্ণনায় তিনি বলেন—'ঊনত্রিশ দিনে মাস। তাই যতক্ষণ চাঁদ না দেখ রোযা রেখনা। যদি আকাশ মেঘলা হয়, তাহলে মুদ্দাত পুরা কর।' বর্ণনার শাব্দিক অর্থ দ্বারা রোযা রাখার ও তাৎপর্য দ্বারা রোযা শেষ করার কথা বুঝা যায়। সেক্ষেত্রে তাৎপর্যগত অর্থ দ্বারা শাব্দিক অর্থ অস্বীকার করা ঠিক নয়।

তিনি এও বলেন—'ত্রিশ দিনে মাস। আবার ঊনত্রিশ দিনেও হয়। যদি মেঘ থাকে তো ত্রিশদিন পুরা কর।' তিনি আরও বলেন—'রমযানের আগে রোযা রেখনা। বরং চাঁদ দেখে রোযা রাখ ও চাঁদ দেখে রোযা ভাংগ। কিন্তু যদি মেঘের কারণে তা দেখতে না পাও, তা হলে ত্রিশদিন পূর্ণ কর।'

অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন—'রমযানকে এগিয়ে এনোনা।' এক বর্ণনামতে, 'রমযান শুরু হবার দু'একদিন আগেই রোযা রেখনা। হাঁ, যদি কেউ আগে থেকেই রোযা রেখে থাক, তা হলে রাখতে পার।' এ নিষেধাজ্ঞায়ও মেঘলা দিন অন্তর্ভুক্ত। হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) এক মারফু হাদীছে বর্ণিত আছে, 'রমযানের আগে রোযা রেখনা। চাঁদ দেখে রোযা রাখ ও চাঁদ দেখে রোযা ভাংগ। যদি মেঘ তাতে বাধ সাধে তো ত্রিশদিন পুরা কর।' (সহীহ ইবনে হাব্বান)।

সন্দেহের দিনে রোযা ঃ

হযরত সিমাক হযরত ইকরামা থেকে ও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রমযানের চাঁদ দেখা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। একদল বলল—আজ রোযা হবে। অপর দল বলল—কাল রোযা হবে। এক বদ্দু এসে রসূলে (সঃ) কে বলল—আমি চাঁদ দেখেছি। রসূলে (সঃ) প্রশ্ন করলেন—তুমি কি কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' পড়েছ? সে বলল—নিশ্চয় আমি কালিমা পাঠকারী। তখন রসূলে (সঃ) হযরত বিলাল (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন সবাইকে রোযা রাখার ঘোষণা প্রদান করতে। অতপর তিনি বললেন ঃ 'চাঁদ দেখে রোযা রেখ ও চাঁদ দেখে রোযা ছেড়। যদি মেঘ থাকে তা হলে ত্রিশ দিনের আন্দাজ করে নাও, তারপর রোযা রাখ। একদিন আগে রোযা রেখ না।'

এ সব হাদীছই সহীহ। এ সবের কিছু সহীহদ্বয়ে ও অন্যান্যগুলো সহীহ ইবনে হিব্বান, হাকাম ইত্যাদিতে রয়েছে। যদিও কিছু হাদীছ ত্রুটিপূর্ণ বলে আখ্যায়িত হয়েছে, তথাপি সামগ্রিকভাবে দলীল হতে পারে। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, হযরত (সঃ) এর রীতি যদি এটাই হয়, তা হলে হযরত উমর (রাঃ), আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ), আনাস ইবনে মালিক (রাঃ), আবু হুরায়রা (রাঃ), মুআবিয়া (রাঃ), আমর ইবনুল আস (রাঃ), হাকাম ইবনে আইয়ুব গিফারী (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) ও আসমা বিন্তে আবু বকর (রাঃ) কি করে তাঁর রীতির খেলাফ কাজ করলেন? তেমনি সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ), তাউস (রাঃ), মুজাহিদ (রাঃ), আবু উছমান নাহদী, মাতরাফ ইবনে যুবায়ের, মায়মুন ইবনে মাহরান ও বকর ইবনে আব্দুল্লাহ মুযনী কেন তাঁর বিরোধিতা করলেন? তদুপরি আহলে হাদীছ ও সুন্নাহর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) কেন সে রীতির বিরোধিতা করলেন?

এখন আমি উক্ত বুযুর্গ ইমামদের সহীহ সূত্রের বর্ণনা ও বক্তব্য তুলে ধরছি। ওলীদ ইবনে মুসলিম বলেন—তিনি ছাওবান থেকে, তিনি তার পিতা থেকে ও তিনি মাকহুল থেকে এ বর্ণনা শুনেছেন যে, চাঁদ দেখার রাতে মেঘ থাকলে উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) রোযা রাখতেন এবং তিনি বলতেন—'এটা রোযা এগিয়ে আনা নয়, বরং অনুমানে ঠিক করে রোযা রাখা।'

হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন: আমাকে আবদুল আযীয ইবনে মুহাম্মদ দুরাওয়ার্দী, তাকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আমর ইবনে উছমান, তাকে তার জননী ফাতিমা বিন্তে হুজাইফা (রাঃ) এ বর্ণনা শুনান যে, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন—'আমি শা'বান মাসে রোযা রাখাকে রমযান মাসে রোযা ভাংগার চেয়ে উত্তম মনে করি।'

আবদুর রাযযাকের সংকলনে ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে। তাতে আবদুর রাযযাক বলেন- ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে মুআম্মার থেকে আইয়ুবের সূত্রে আমি এ বর্ণনা পেয়েছি যে, মেঘলা দিন হলে তিনি রোযা রাখতেন আর তা না হলে ছাড়তেন। সহীহদ্বয়ে তাঁর এ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন—চাঁদ দেখে রোযা রাখ ও চাঁদ দেখে রোযা ছাড়। যদি আকাশে মেঘ থাকে তো মাস পুরা কর। নাফে'র বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম আহমদ (রঃ) আরও বলেন—শা'বানের উনত্রিশ তারিখ হলেই ইবনে উমর (রাঃ) কাউকে চাঁদ দেখতে পাঠাতেন। যদি সে চাঁদ দেখত তো রোযা রাখতেন, তা না হলে রাখতেন না। তবে মেঘ থাকলে রোযা রাখতেন।

কয়েকটি বিভিন্ন মত:

এখন রইল আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) সম্পর্কিত বর্ণনা। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন—আমাকে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহীম, তাকে ইয়াহিয়া ইবনে আবু ইসহাক এ বর্ণনা শুনিয়েছেন যে, তিনি বলেন: আমি জুহর কিংবা তার কাছাকাছি সময়ে চাঁদ দেখলাম। ফলে সবাই রোযা ভাঙল।

Contents

আমি তখন আনাস (রাঃ) এর কাছে গিয়ে তা বললাম। তিনি বললেন—আমি তা হলে রোযা একত্রিশ দিন পূরা করব। তার কারণ, হাকাম ইবনে আইয়ূব আমার কাছে খবর পাঠিয়েছেন যে, কেউ রোযা না রাখলেও সে রোযা শুরু করবে। আমিও তার বিরোধিতা ভাল মনে করলাম না বলে রোযা রাখলাম। আজও আমি রোযা পূরা করব।

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) সম্পর্কিত বর্ণনাটি এই ঃ ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন—আমাকে মুগীরা, তাকে সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয, তাকে মাকহুল ও ইবনে হাল্লাস বলেন যে, হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলতেন—'আমি রমযানের কোন রোযা ভংগের চেয়ে শাবানেও রোযা রাখা পসন্দ করি।'

হযরত আমর ইবনুল আস সম্পর্কিত বর্ণনা ঃ ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন—আমাকে যায়েদ ইবনে হাব্বান, তাকে ইবনে লুহায়ফা ও তাকে আব্দুল্লাহ ইবনে হুবায়রা আমর ইবনে আস সম্পর্কে এ বর্ণনা শুনান যে, তিনি সন্দেহের দিনে রোযা রাখতেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সম্পর্কিত বর্ণনা ঃ ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন, আমি তাঁর এ বর্ণনা শুনতে পেয়েছি যে, তিনি বলেছেন—রমযানের রোযা একদিন পরে রাখার চেয়ে একদিন আগে রাখাই আমি পসন্দ করি। কারণ, তাতে একটি রোযাও হাতছাড়া হবায় আশংকা থাকে না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কিত বর্ণনা ঃ সাঈদ ইবনে মানসুর বলেন—আমাকে আবু আওয়ানা, তাকে ইয়াযীদ ইবনে জুবায়ের ও তাকে এক খবর দাতা এ খবর শুনান যে, তিনি এক সন্দেহের দিনে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) কাছে গেলে তিনি তাকে বলেন—রমযানের কোন রোযা ভাংগার চেয়ে শাবানে রোযা রাখা আমার কাছে পসন্দনীয়।

হযরত আসমা বিন্তে আবু বকর (রাঃ) সম্পর্কিত বর্ণনা ঃ সাঈদ ইবনে মানসুর বলেন—আমাকে ইয়াকুব ইবনে আব্দুর রহমান, তাকে হিশাম ইবনে উরুয়া ও তাকে ফাতিমা বিন্তে মানজার এ খবর শুনান যে, কখনও যদি রমযানের শুরুতে মেঘ দেখা দিত, তা হলে হযরত আসমা (রাঃ) একদিন আগে রোযা শুরু করে দিতেন এবং অন্যকেও তা করতে বলতেন। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন—আমাকে রাওহ ইবনে ইবাদা, তাকে হাম্মাদ ইবনে সালমা, তাকে হিশাম ইবনে উরুয়া ও তাকে ফাতিমা এ বর্ণনা শুনান যে, আসমা (রাঃ) সন্দেহের দিনে রোযা থাকতেন।

আমি আহমদ (রঃ) থেকে যতটুকু বর্ণনা উধৃত করলাম, তা ফযল ইবনে যিয়াদ থেকে নেয়া হয়েছে। আছরাম তাঁর থেকে বর্ণনা করেন—যখন আকাশে মেঘ বা অন্য কিছু হত, তখন তিনি রোযা রাখতেন এবং আকাশ পরিস্কার থাকলে রোযা রাখতেন না। সালেহ ও আব্দুল্লাহ মারুযীও ফযল ইবনে যিয়াদ থেকে এ দু'ধরনের বর্ণনাই উধৃত করেন।

এগুলোর জবাব কয়েকভাবেই দেয়া যায়। একে তো এ সব অভিমত ও আছারের একটিও এরূপ সুস্পষ্ট নয় যে, তা অনুসরণ অপরিহার্য হতে পারে। এমন কি সেগুলোকে নবী করীম (সঃ) এর রীতির খেলাফও বলা চলে না। বড় জোর বলা চলে যে, তাঁরা তা সতর্কতা-মূলকভাবে রেখেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) তো সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, শাসকের বিরোধিতা করা তিনি ভালো মনে করেন নি বলে রোযা রেখেছেন। তাই ইমাম আহমদ (রঃ) বলেছেন— এরূপ ক্ষেত্রে রোযা রাখা না রাখার ব্যাপারে শাসকের অনুসারী হতে হয়।

নবী করীম (সঃ) এর কার্যধারা আমি বর্ণনা করে এসেছি। তাঁর বক্তব্য থেকেও প্রমাণিত হয় যে, বাদলা দিনের রোযা ফরযও নয়, হারামও নয়। বরং যে রোযা রাখলনা; সে জায়েয কাজই করল। তেমনি যে রাখল, সেও সতর্কতার খাতিরে জায়েয কাজই করল।

দ্বিতীয় কথা, সেদিন একদল সাহাবা রোযা রেখেছেন, অন্যদল রাখেন নি। ওপরের আলো-চনায়ই তা জানা গেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের (রাঃ) সে মাসের রোযার ব্যাপারটি সুস্পষ্ট। ইবনে আব্দুল বার তা উধৃত করেছেন। গাউস ইয়ামানী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রঃ) মতও তাই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত আসমা (রাঃ) ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ) এর কন্যা। সুতরাং তাঁর মতও তাই ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের (রাঃ) মাজহাবে এ'দের ছাড়া আর কারো কথা জানা যায় না।

পক্ষান্তরে হযরত উমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত হুজায়ফা (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ও হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) সন্দেহের দিনে রোযা রাখা অপসন্দ করেছেন।

শা'বানের শেষ দিনের নফল রোযা :

আমি বলছি, হযরত আলী (রাঃ), উমর (রাঃ), আম্মার (রাঃ), হুজায়ফা (রাঃ) ও ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, শা'বানের শেষ দিনের নফল রোযা নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে আম্মার (রাঃ) এর বক্তব্য হল; যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোযা থাকল; সে আবুল কাসিম (সঃ) এর নাফরমানী করল। এখন রইল বাদলা দিনের রোযার ব্যাপারটি। তা রাখা হত রমযানের ফরযের নিয়তে সতর্ক পদক্ষেপ হিসেবে। যদি রমযান ঠিক হল তো ফরয আদায় হল, অন্য-থায় নফল হল। সাহাবাদের বর্ণনা থেকে এটা বৈধ প্রমাণিত হয়। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) তাই করতেন। তবে নবী করীম (সঃ) থেকে হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণনা রয়েছে যে, যদি শা'বানের শেষ দিন মেঘাচ্ছন্ন থাকত, তাহলে সে মাস পূর্ণ করে পরে তিনি রোযা রাখতেন। কিন্তু তাঁর এ বর্ণনা তাঁর কার্যধারা দ্বারা বাতিল হয়ে গেছে। কারণ, তাঁর এ

বর্ণনা যদি সঠিক হত, তাহলে তার বিপরীত কাজ তিনি করতেন না। তাঁর সেদিনে রোযা রাখা উক্ত বর্ণনাটিকে ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণ করেছে।

অথচ মাসআলাটি অন্যরূপ। হযরত আয়েশা (রাঃ) সে রোযা ফরয ভেবে রাখতেন না, রাখতেন সতর্কতার খাতিরে। নবী করীম (সঃ) এর বক্তব্য ও কাজ থেকে তিনি এটাই বুঝেছেন যে, রোযার ফরযিয়াত শুরু হবে মাস শেষ হলে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরের (রাঃ) ব্যাপারটিও তাই। তাঁরা রোযা রাখা সেদিন না জায়েয মনে করতেন না। এভাবে প্রশ্নের মীমাংসা হলে হাদীছ ও আছারগুলোর সমন্বয় সাধিত হতে পারে।

মুআম্মারের বর্ণনাও উক্ত মতটি সমর্থন করে। তিনি আইয়ুব থেকে, তিনি নাফে' থেকে ও তিনি ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) রমযানের চাঁদ সম্পর্কে বলেন— 'তোমরা তা দেখে রোযা রাখ ও তা দেখে রোযা ছাড়। আর যদি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ হয়, তা'হলে ত্রিশ দিনে মাস পূর্ণ কর।' তেমনি ইবনে আবু দাউদ নাফে' থেকে বর্ণনা করেন—যদি মেঘ থাকে তা'হলে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর। মালিক ও ওবায়দুল্লাহ নাফে' থেকে বর্ণনা করেন, 'যদি মেঘ থাকে তা'হলে অনুমানে ঠিক কর।' এ সব থেকে বুঝা যায় যে, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) ত্রিশ দিন পূর্ণ করাকে ওয়াজিব মনে না করে জায়েয মনে করেছেন। তাই তিনি যখন ত্রিশ দিনের দিন রোযা রেখেছেন, তখন তিনি সতর্কতা হেতু দু'টো বৈধ কাজের একটি অনুসরণ করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইবনে উমরের (রাঃ) মতান্তর ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন—'যে ব্যক্তি রমযানকে দু' একদিন এগিয়ে আনে, তার ব্যাপারে আমি আশ্চর্য বোধ করি। অথচ রসূল (সঃ) বলেছেন, রমযানের দু'একদিন আগেই রোযা রেখনা।' এ বক্তব্যে তিনি যেন ইবনে উমর (রাঃ) এর অনুসৃত রীতিকে অস্বীকার করছেন। মূলত এ দুই মর্যাদাবান সাহাবা দু'রীতির অনুসারী ছিলেন। একজন উদারতার (রুখসত) পক্ষপাতী ছিলেন, অপরজন কঠোরতার (আযীমত) অনুসারী ছিলেন। অন্যান্য মাসআলায়ও দু'জনের এ মতান্তর লক্ষ্যণীয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) শরীআতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরূপ কঠোর নীতি অনুসরণ করতেন যা অন্যান্য সাহাবাদের রীতির অনুকূল হত না। তিনি ওযূতে চোখের ভেতরের অংশও ধৌত করতেন। এমনকি তা করতে করতে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন। তেমনি মাথা মাসেহ করার বেলায় তিনি কানের জন্য নতুনভাবে পানি নিতেন। তিনি হাম্মামখানায় যেতে নিষেধ করতেন এবং নিজে হাম্মামখানায় যাবার পর গোসল করতেন। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাম্মাম খানায় যেতেন। হযরত ইবনে উমর (রাঃ) তায়াম্মুমে মুখের জন্য ও হাতের জন্য দু'বার পৃথকভাবে হাত মারতেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন, দু'টোর জন্য একবার হাত মারাই যথেষ্ট। তেমনি ইবনে উমর (রাঃ) স্ত্রী চুম্বনের পর ওযু করা জরুরী ভাবতেন এবং এরূপ ফতোয়াও দিতেন। এমনকি তিনি নিজ সন্তান চুম্বনের পর কুলী

করে নামায পড়তেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন, ওযু করে স্ত্রী চুম্বন কিংবা খোশবু গ্রহণকে আমি ক্ষতিকর মনে করিনা। ইবনে উমর (রাঃ) নির্দেশ দিতেন, যদি কোন নামাযে দাঁড়িয়ে কারো কাযা বাকীর কথা মনে পড়ে যায়, তা হলে নামায শেষ করে কাযা পড়ে আবার এ নামায পড়বে। মুসনাদে আবু ইয়ালীতে এটা মারফু বর্ণনা হিসেবে রয়েছে। মূলত এ বর্ণনা ইবনে উমর (রাঃ) এর ওপরই মাওকুফ। বায়হাকী বলেন—এটা ইবনে উমর (রাঃ) থেকে যদিও মারফু বর্ণনা হিসেবে এসেছে, তথাপি তা বিশুদ্ধ নয়। বরং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে ভিন্নরূপ মারফু বর্ণনা রয়েছে।

মোট কথা হযরত ইবনে উমর (রাঃ) কঠোরতা ও সতর্কতার রীতি অনুসরণ করে চলতেন। মুআম্মার আইয়ুব থেকে, তিনি নাফে' থেকে ও তিনি ইবনে উমর (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যদি তিনি ইমামের সাথে এক রাকআত পেতেন, তা'হলে পরে অন্য রাকআত পড়ে নিয়ে তিনি ভুলের সিজদা দিতেন। ইমাম যুহরী বলেন, এরূপ আর কেহ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

একজন মুসলমানের সাক্ষ্যই যথেষ্ট :

নবী করীম (সঃ) এর পবিত্র রীতি এ ব্যাপারে এই ছিল যে, একজন মুসলমানের সাক্ষ্য পেলেই তিনি সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন। তবে ঈদের বেলায় তিনি দু'জন মুসলমানের সাক্ষ্য পেলে ঈদ করার নির্দেশ দিতেন। ঈদের চাঁদের খবর না পেয়ে তিনি রোযা রাখার পরেও যদি দু'জন মুসলমান চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিতেন, তা' হলে নিজেও রোযা ভাঙতেন এবং অন্যান্যকেও ভাংগার নির্দেশ দিতেন। তবে ঈদের নামায তিনি পরদিন ঠিক ঈদের নামাযের সময়ে পড়তেন।

রসূল (সঃ) ইফতারে আদৌ বিলম্ব করতেন না এবং অপরকেও সময় হওয়ামাত্র তাড়াতাড়ি ইফতার করতে বলতেন। তিনি নিজেও নিয়মিত সেহরী খেতেন এবং অপরকেও খাবার জন্য উৎসাহিত করতেন। তেমনি তিনি নিজেও বিলম্বে সেহরী খেতেন এবং অপরকেও বিলম্বে সেহরী খেতে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। এটা উম্মতের ওপর তাঁর মেহেরবানীর নিদর্শন। কারণ, খালি পেটে মিষ্টি খাদ্যই বেশী আকর্ষণীয় হয়। আর তাতে উপকারও অনেক। বিশেষত দৃষ্টিশক্তি অনেক বাড়ে। মদীনার মিষ্টি খেজুর খাদ্য হিসেবেও উপাদেয়। শুকনো ও তাজা খেজুর সেখানে ফল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পানির উপকারিতা সম্পর্কে বলা যায় যে, রোযার কারণে কলজে শুকিয়ে যায়। তাই পানি নিয়ে তা তাজা করে নিলে খাদ্য-খাদক দ্বারা তা পূর্ণ সবলতা ফিরে পায়। তাই ক্ষুধার্তের জন্য নিয়ম হল, খেতে বসে আগে কিছু পানি খেয়ে নিবে। তারপর খানা খাবে। আত্মার নিরাময়-তার জন্য খেজুর খুবই উপাদেয়। আত্মা বিশেষজ্ঞদের এটা ভালভাবে জানা আছে।

ইফতারে ক্ষিপ্রতা ও সেহরীতে শৈথিল্য চাই ঃ

হযরত (সঃ) মাগরিবের নামাযের আগেই ইফতার করতেন। তাজা খেজুর পেলে তাজা খেজুর দিয়ে অন্যথায় শুকনো খেজুর দিয়েই তিনি ইফতার করতেন। তাও যদি না পেতেন তো পানি দিয়ে ইফতার করতেন। হযরত (সঃ) ইফতারের সময়ে নিম্ন দোআ পড়তেন ঃ

اللهم لك صمت و على رزقك افطرت فتقبل منا انك انت السميع العليم ০

"আয় আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছি আর তোমারই দেয়া রুযী দিয়ে ইফতার করলাম। এখন তুমি আমাদের রোযা কবুল কর। তুমি নিশ্চয়ই সব কিছু শোন ও সব ব্যাপার জান।"

তিনি এ দোআও পড়তেন ঃ

اللهم لك صمت و على رزقك افطرت -

"আয় আল্লাহ! তোমার জন্যই আমি রোযা রেখেছি আর তোমার রুযী দিয়েই ইফতার করলাম।"

আবু দাউদ হযরত মুআজ ইবনে যুহরা থেকে হযরত (সঃ) এর উপরোক্ত দোআ সম্পর্কিত বর্ণনাটি উধৃত করেন। এও বর্ণিত আছে যে, তিনি ইফতারের পর নিম্ন দোআ পড়তেন ঃ

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء الله تعالى

"পিপাসা চলে গেছে। রগ-রেশা তাজা হয়েছে। আল্লাহর মর্যীতে পুরস্কারও নির্ধারিত হয়েছে।"

হুসাইন ইবনে ওয়াকিদার হাদীছে আছে, হযরত মারওয়ান ইবনে সালিম মুকান্নি থেকে ও তিনি হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেন—ইফতারের সময়ে রোযাদারের দোআ বিফলে যায় না (ইবনে মাজাহ)।

সহীহ বর্ণনায় আছে, নবী করীম (সঃ) বলেন—যদি দিন গিয়ে রাতের কিছু সময় কেটে যায়, তাহলে রোযাদারের ইফতার হয়ে যায়। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, বাস্তবে না হলেও নিয়ম মাফিক হয়ে যায়। তা সে নিয়াত করুক আর নাই করুক। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হল এই যে, তখন ইফতারের ওয়াক্ত হয়ে যায়। যেমন বলা হয়, সকাল হয়েছে, সন্ধ্যা হয়েছে ইত্যাদি।

হযরত (সঃ) রোযাদারকে অশ্লীল কথা, রাগারাগি, গালাগালি, কিংবা পরচর্চা ইত্যাদি কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এও নির্দেশ দিতেন, গালিদাতাকে বলে দাও—'আমি রোযাদার।' হাদীছের প্রকাশ্য অর্থ এটাই। তাই একদল ব্যাখ্যাকার হাদীছটির এ অর্থ নিয়েছেন। অন্য দল বলেছেন—হাদীছটির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, গালি শুনে মনে মনে স্মরণ করবে যে, যেহেতু তুমি রোযাদার তাই এর জবাব দেয়া যাবেনা। অপর এক দল বলেন—ফরয রোযা হলে

মুখে বলবে আর নফল রোযা হলে মনে মনে বলবে। কারণ, ফরয রোযা সবার জানা ব্যাপার বলে তাতে রিয়ার ভয় থাকে না।

সফরে রোযা রাখা না রাখা ঃ

হযরত (সঃ) রোযার মাসে যখন সফর করতেন, তখন তিনি কখনও রোযা ভাংতেন এবং কখনও রাখতেন। তাই সাহাবায়ে কিরামও এ দু'রীতি অনুসরণ করতেন। যখন শত্রুর মোকাবেলায় দাঁড়াতেন, তখন তিনি সবাইকে রোযা ভাংতে নির্দেশ দিতেন। যুদ্ধের জন্য শক্তি সংরক্ষণই তার উদ্দেশ্য ছিল।

তাই যুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য রোযা ভংগ করা বৈধ। এ ব্যাপারে দু'টো মত রয়েছে। তবে সঠিক অভিমত এটাই। ইবনে তায়মিয়া (রঃ) এ মতই গ্রহণ করেছেন। তাই যখন ইসলামের মুজাহিদরা দামেশকের বাইরে গিয়ে শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হল, তখন তিনি তাদের জন্যে এ ফতোয়া দেন। এটা সুস্পষ্ট যে, সফরে রোযা ভাংগার যেখানে অনুমতি রয়েছে, সেখানে জিহাদের ময়দানে অনুমোদন দেয়া অধিকতর স্বাভাবিক ও উত্তম। সফরে রোযা ভংগ করা বৈধ হওয়াই জিহাদের জন্য তা বৈধ হওয়ার দলীল। কারণ, সফরের রোযা ভংগের প্রয়োজনের চাইতে জিহাদের জন্য রোযা ভংগের প্রয়োজনীয়তা অধিক। সফরে শক্তি সংরক্ষণের ব্যাপারটি শুধু মুসাফিরের ব্যক্তি স্বার্থে প্রয়োজন। পক্ষান্তরে জিহাদের জন্য শক্তি সংরক্ষণের ব্যাপারটি মিল্লাতের সামগ্রিক স্বার্থে প্রয়োজন। তেমনি সফরের কষ্টের চাইতে জিহাদের কষ্ট অনেক বেশী। এসব কারণে মুসাফিরের রোযা ভংগের চাইতে মুজাহিদের রোযা ভংগ অধিকতর যুক্তিসংগত ও কল্যাণবহ।

তা ছাড়া আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ -

"তোমরা শত্রুর মোকাবিলায় যথাসম্ভব শক্তি সংগ্রহ কর"

যুদ্ধ ক্ষেত্রে অন্যান্য শক্তির উপকরণের তুলনায় দৈহিক শক্তি সক্রিয় রাখার গুরুত্ব যথেষ্ট। রোযা না রাখাতেই তা হতে পারে। নবী করীম (সঃ) বর্শা নিক্ষেপকে শক্তির অন্যতম উপকরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তা কেবল খেয়ে দেয়ে তাজা থাকার ফলেই সম্ভব। একবার শত্রুর মোকাবিলার প্রাক্কালে রসূল (সঃ) সাহাবাদের নির্দেশ দিলেন—"তোমরা শত্রুর কাছাকাছি পেঁছে গেছ। এখন রোযা ছেড়ে দাও। তা হলে দৈহিক শক্তি অক্ষুন্ন থাকবে।" এ নির্দেশ মূলত ছিল অনুমোদন মূলক। তারপর যখন তারা রণাংগনের কাছে গিয়ে নামলেন, তখন সুস্পষ্ট নির্দেশ দিলেন—"কাল ভোরে তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে। রোযা না থাকলে তোমরা সতেজ থাকবে। তাই রোযা ছেড়ে দাও।"

Contents

যেহেতু এটা একটা যুদ্ধযাত্রার ব্যাপার, তাই তিনি যুদ্ধে শক্তি সঞ্চয়কে রোযা ভংগের কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। সফর যদিও রোযা ভংগের ক্ষেত্রে একটা কারণ, তথাপি জিহাদের সফরে তিনি জিহাদকেই রোযা ভংগের কারণ হিসেবে নির্দেশ করেছেন। ঈসা ইবনে ইউনুসের বর্ণনায় তা জানা যায়। তিনি শু'বা থেকে, তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেন যে, আমর ইবনে দীনার বলেন—আমি হযরত ইবনে উমরকে (রাঃ) বলতে শুনেছি, মক্কা বিজয়ের দিন রসূল (সঃ) সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, 'আজ যুদ্ধের দিন। তাই রোযা ভেংগে ফেল।' সাঈদ ইবনে রবী' শু'বা থেকে বর্ণনা করেন—যুদ্ধকেই রোযা ভংগের কারণ নির্দ্ধারিত করা হয়েছে।

জিহাদ ছাড়া যদি শুধু সফর হত, তা হলে রসূল (সঃ) বলতেন—"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সুযোগ দিয়েছেন রোযা না রাখার। এ সুযোগ যে নেবে সে ভালই করবে আর যে নেবেনা তারও কোন পাপ হবেনা।"

Contents

ষষ্ঠবিংশ পরিচ্ছেদ

রমযানে জিহাদ ও সফর

বদর ও মক্কা বিজয় রমযানের ঘটনা ঃ

জিহাদ উপলক্ষে রসূল (সঃ) কয়েকবার রমযানে সফর করেছেন। তার ভেতরে বদরের যুদ্ধ ও মক্কা বিজয় উল্লেখযোগ্য।

হযরত উমর ফারূক (রাঃ) বলেন—'আমরা রসূল (সঃ) এর সাথে রমযানে দু'টো যুদ্ধে অংশ নিয়েছি। তা হল বদর যুদ্ধ ও মক্কা বিজয়। এ দু'টো সফরেই আমরা রোযা ভংগ করেছি। দারে কুতনী প্রমুখ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন—'আমি রমযানে রসূল (সঃ) এর সাথে উমরার সফরে গিয়েছি' ইত্যাদি। এ হাদীছটি তাঁর থেকে ভুল বর্ণনা বৈ নয়। আসল ঘটনা যা বলা হল তাই। হয়ত তিনি হযরতের (সঃ) সফরের ব্যাপারে কোন বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী বর্ণনাকারীরা তা এলোমেলো করে ফেলেন। এভাবে হযরত ইবনে উমরের (রাঃ) একটি বর্ণনায়ও গোলমাল দেখা দিয়েছে। তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছিল যে, হযরত (সঃ) রজব মাসে উমরাহ করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) তা শুনে বললেন—আল্লাহ তা'আলা আবু আবদুর রহমানকে রহম করুন। নবী করীম (সঃ) যখন উমরা করেছেন, সেও সাথে ছিল। অথচ হুযুর (সঃ) কখনও রজবে উমরা করেন নি। তিনি সব উমরাই জিলকাদ মাসে করেছেন। রমযানেও তিনি কখনও উমরা করেন নি।

সফরের সীমা নির্ধারণ অনুচিত ঃ

হযরত (সঃ) সফরের এমন কোন সীমা নির্ধারণ করে যাননি, যার ভিত্তিতে রোযা রাখা বা না রাখা নির্ণীত হবে। তাঁর থেকে এ ব্যাপারে কোন সঠিক বর্ননা পাওয়া যায় না।

দাহিয়া ইবনে খলীফা কালবী তিন মাইলের সফরে রোযা ভেংগেছেন। যারা তাঁকে বলে রোযা রেখেছে, তারা মূলত রসূল (সঃ) এর সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ করেছেন।

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) সফর শুরু করলে জনবসতি পার হওয়ার আগেই রোযা ভাংগতেন এবং বলতেন, এটাই রসূল (সঃ) এর অনুসৃত সুন্নাত।

উবায়েদ ইবনে জুবায়ের বলেন—আমি আবু বাস্তারা গিফারী (রাঃ) এর সাথে রমযানে ফুস্তাত থেকে সফরে বের হলাম। একই নৌকায় আমরা যাচ্ছিলাম। তখনও লোকালয় আমরা অতিক্রম করিনি। তিনি দস্তরখানা বিছিয়ে বললেন—এস, খানা খাই। আমি আরয করলাম—

আপনি কি লোকালয় দেখছেন না? হযরত আবু বাস্তারা (রাঃ) বললেন—তুমি কি নবী করীম (সঃ) এর পবিত্র সুন্নাত বর্জন করতে চাও? (আবু দাউদ ও মুসনাদে আহমদ)

মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় আছে—আমি ফুস্তাত থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় যাবার জন্য আবু বাস্তারা (রাঃ) এর সাথে নৌকায় উঠলাম। যখন আমরা এক বন্দরের কাছাকাছি হলাম, তখন তিনি দস্তরখানা বিছিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন। আমি কাছে এলে তিনি আমাকেও খেতে বললেন। তখন ছিল রমযান মাস। আমি বললাম—হে আবু বাস্তারা! খোদার কসম! এখনও তো আমাদের এলাকা আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়নি। তিনি প্রশ্ন করলেন—তুমি কি রসুল (সঃ) এর সুন্নাত ছেড়ে দিতে চাও? আমি জবাব দিলাম—না। তিনি বললেন—তাহলে খানা খাও। বর্ণনাকারী আরও বলেন—তারপর আমরা যথাস্থানে না পৌঁছা পর্যন্ত রোযা ভেংগেই চললাম।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব বলেন—রমযানে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) এর সমীপে হাজির হলাম। তিনি সফরে বেরোচ্ছিলেন। তাঁর বাহন চলতে শুরু করেছে। তিনিও সফরের পোষাক পরিহিত ছিলেন। তখন তিনি খানা দিতে বললেন। আমি প্রশ্ন করলাম—এটাই কি সুন্নাত? তিনি জবাবে বললেন—এটাই সুন্নাত। তারপর তিনি বাহনে উঠলেন। ইমাম তিরমিজী (রঃ) বলেন—হাদীছটি হাসান। দারে কুতনীর বর্ণনায় আরও বলা হয়েছে—'খানা খেলেন। তখন সূর্য অস্তাচলে প্রায়।' সাহাবাদের এ সব কার্যকলাপ প্রমাণ করছে যে, রমযানে সফর শুরুর সাথে সাথেই ইফতার করে নেয়ার পূর্ণ অনুমোদন রয়েছে।

ফরয গোসলকারীর সুবিধা:

নবী করীম (সঃ) এর রীতি ছিল, তিনি ফরয গোসলের অবস্থায় সকাল পরিস্কার হওয়ার পর গোসল করতেন এবং সেই অবস্থায়ই রোযা রাখতেন। বিতর্কিত এক বর্ণনায় আছে, তিনি রোযা থেকে চুমুও খেতেন। বর্ণনাটি আবু দাউদ (রঃ) মিসদা ইবনে ইয়াহিয়া থেকে ও তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে নিয়েছেন বলে প্রকাশ। তাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) নাকি বলেছেন যে, নবী করীম (সঃ) রোযা থেকে তাঁকে চুমু খেতেন ও তাঁর জিহবা চুষতেন।

হাদীছটি যঈফ:

এ হাদীছ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। সা'দী বলেন—হাদীছটি ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ। কিছু লোক আবার হাদীছটি হাসান বলেছেন এবং বর্ণনাকারীকে নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী বলেছেন। সহীহ মুসলিমে ইমাম মুসলিম (রঃ) তার হাদীছ উধৃত করেছেন।

Contents

তা ছাড়া তার বর্ণনার সনদে মুহাম্মদ ইবনে দীনার ইবনে তাহী বসরীও রয়েছে। তার ব্যাপারেও প্রচুর মতভেদ রয়েছে। ইয়াহিয়া তাকে যঈফ বলেছেন। এক বর্ণনায় আছে, তার বর্ণনায় ক্ষতির আশংকা নেই। কিছু লোক আবার তাকে সত্যবাদী বলেছেন। ইবনে আদী বলেন—বর্ণনাটির 'তিনি জিহবা চুষতেন' অংশটি মুহাম্মদ ইবনে দীনার ছাড়া আর কেউ বলেন নি।

তা ছাড়া তার বর্ণনার সূত্রধারায় সা'দ ইবনে আওসও রয়েছে। সেও বিতর্কিত বর্ণনাকারী। ইয়াহিয়া বসরী তাকে যঈফ বলেছেন। কিছু লোক আবার তাকে নির্ভরযোগ্যও বলেছেন। ইবনে হাব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

মুসনাদে আহমদ ও ইবনে মাজায় নবী করীম (সঃ) এর মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী মায়মুনা (রাঃ) বর্ণনা করেন—নবী করীম (সঃ) কে এক রোযাদার ব্যক্তির স্ত্রীকে চুম্বন দান প্রসংগে প্রশ্ন করায় তিনি জানালেন—'উভয়ের রোযা ভংগ হয়েছে।' অবশ্য রসূল (সঃ) থেকে তাঁর বর্ণনা সঠিক নয়। বর্ণনার সনদে আবু ইয়াযীদ রয়েছে। দারে কুতনী বলেন—সে অপরিচিত ব্যক্তি। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন—আমি তার বর্ণনা গ্রহণ করি না। এ হাদীছটি 'মুনকার'। আবু ইয়াযীদ অজ্ঞাত ব্যক্তি। এ ক্ষেত্রে যুবক ও বৃদ্ধের ভেতরে তারতম্য সৃষ্টিরও কোন সঠিক বর্ণনা নেই।

এ ব্যাপারে সব চেয়ে উত্তম বর্ণনা আবু দাউদে মিলে। আবু দাউদ নসর ইবনে আলী থেকে, তিনি আহমদ জুবায়রী থেকে, তিনি ইসরাঈল থেকে, তিনি আ'রাজ থেকে ও তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রোযাদারের স্ত্রী চুম্বন ও তার সাথে নিছক জড়াজড়ি সম্পর্কে রসূল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাকে তাতে অনুমতি দেন। অপর এক ব্যক্তি সে ব্যাপারে জানতে চাইলে, তিনি তাকে তা করতে নিষেধ করেন। যাকে তিনি অনুমতি দেন সে বৃদ্ধ ছিল আর যাকে নিষেধ করেন সে ছিল যুবক। যদিও বুখারী ও মুসলিম সহ বিশুদ্ধ সংকলনের সবটাই ইসরাঈলের বর্ণনাকে দলীল হিসেবে ঠাই দিয়েছে, তথাপি এ হাদীছে ত্রুটি রয়েছে। তা হল তার ও আ'রাজের মাঝখানের রাবী হল হারিছ ইবনে উবায়েদ। তার বর্ণনা পরিত্যাজ্য।

ভুলে খেলে রোযা যায় না :

রসূল (সঃ) এর রীতি ছিল যে, রোযা রেখে কেউ ভুলে পানাহার করলে বলতেন, তাকে আর কাযা করতে হবে না। কারণ, তাকে আল্লাহ তা'আলা পানাহার করিয়েছেন। তাই তার রোযা ভংগ হবেনা। আসল কথা হল, এটা তার ইচ্ছাকৃত ব্যাপার নয় বলেই এ জন্য সে আল্লাহর কাছে পাকড়াও হবে না। এটা ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে খাওয়ার মত। মানুষ দায়ী হবে কেবল তার ইচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য।

পক্ষান্তরে সচেতনভাবে কোন কিছু খেলে, শিংগা লাগালে ও বমি করলে রোযা ভংগ হয়। কুরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য মতে স্ত্রী সহবাসেও রোযা ভংগ হয়। এ সব ব্যাপারে কোন মতভেদ

নেই। সুরমা ব্যবহারের ব্যাপারে হযরত (সঃ) থেকে কোন সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে তিনি রোযা রেখে মিসওয়াক করতেন। আহমদ (রঃ) তার থেকে প্রাপ্ত এক বর্ণনায় বলেন, তিনি রোযা রেখে মাথায় পানি দিতেন, কুলি করতেন ও নাকে পানি দিতেন। অবশ্য রোযাদারের জন্য নাকে বেশী পানি দেয়া নিষিদ্ধ। হযরত (সঃ) রোযার অবস্থায় শিংগা লাগাতেন না।

সহীহ বুখারীতে আছে, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ বলেন—শু'বা মনে করেন, হাকাম (রঃ) রোযায় হযরতের (সঃ) শিংগা লাগানোর ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি মাকসাম থেকে শুনেন নি। উক্ত বর্ণনাটি সাঈদ হাকাম থেকে, তিনি মাকসাম থেকে ও তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তাতে বলা হয়, নবী করীম (সঃ) রোযা ও ইহরামের অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন। শু'বা বলেন—বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ আনসারী হাদীছটিকে 'মুনকার' বলেছেন। মায়মুন ইবনে মিহরান প্রায় পনেরটি বর্ণনা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে প্রদান করেন। আছরাম বলেন—আমি আবু আব্দুল্লাহকে এ হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় তিনি 'যঈফ' বলেছেন।

যাকারিয়া ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি আতা ও তাউস থেকে এবং তাঁরা ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) ইহরামের অবস্থায় শিংগা টানিয়েছেন। তাঁরা অবশ্য তাঁর রোযা থাকার কথা বলেন নি।

হাম্বল (রঃ) বলেন—আমাকে আবু আব্দুল্লাহ, তাকে 'ওয়াকী', তাকে ইয়াসীন যিয়ারাত, তাকে এক ব্যক্তি ও তাকে আনাস (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (সঃ) এক রমযানে এ কথা বলে শিংগা লাগান যে, শিংগা যে লাগায় ও শিংগা যে টানে উভয়ের রোযা ভংগ হয়।

আবু আব্দুল্লাহ বলেন—আমার ধারণা মতে উক্ত এক ব্যক্তি হলেন, আবান ইবনে আবু আইয়াশ। তার থেকে দলীল নেয়া যায় না। আছরাম বলেন, আমি আবু আব্দুল্লাহকে বললাম ঃ মুহাম্মদ ইবনে মুআবিয়া নিশাপুরী আবু আওয়ানা থেকে, তিনি সওবী থেকে, তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'নবী করীম (সঃ) রোযা থেকে শিংগা লাগিয়েছেন।' এ কথা শুনে আবু আব্দুল্লাহ তা অস্বীকার করলেন। ইসহাক বলেন, এ বর্ণনাটি নবী করীম (সঃ) থেকে পাঁচ ভাবে এসেছে।

মোট কথা, এটা বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয় যে, নবী করীম (সঃ) রোযা থেকে কখনও শিংগা লাগিয়েছেন। এটাও প্রমাণিত নয় যে, তিনি দিনের শুরুতে বা শেষভাগে মিসওয়াক করতে নিষেধ করেছেন। পক্ষান্তরে এর বিপরীত কথাই প্রমানিত হয়। তাঁর থেকে এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, রোযার ভেতরে মিসওয়াকের ফযীলত সর্বাধিক। (ইবনে মাজার মুজালিদের হাদীছ দ্রষ্টব্য)। অবশ্য হাদীছটিতে দুর্বলতা আছে।

নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রোযা রেখে সুরমা ব্যবহার করতেন। এও বর্ণিত আছে যে, তিনি 'আছমাদ' সুরমা চোখে দিয়ে সাহাবায়ে কিরামের সামনে এসেছেন। তবে

বর্ণনাটি বিশুদ্ধ নয়। অবশ্য এ বর্ণনাটিও সঠিক নয় যে, তিনি রোযাদারকে 'আছমাদ' সুরমা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ (রঃ) বলেন– আমাকে ইয়াহিয়া ইবনে মুঈন বলেছেন যে, এ হাদীছটি 'মুনকার' শ্রেণীভুক্ত।

হযরতের (সঃ) রোযাঃ

নবী করীম (সঃ) রমযান মাস ছাড়া কোন মাসেই পুরো মাস রোযা রাখতেন না। যখন তিনি রোযা রাখতেন তা আর ভাংতেন না। তিনি রোযা ছাড়লে বুঝা যেত এখন আর রোযা রাখবেন না। রমযানের পর তিনি শাবান মাসেই বেশী রোযা রাখতেন। কিছু কিছু লোক তাই করেন। রজবে তিনি আদৌ রোযা রাখতেন না এবং সে মাসে রোযা রাখা মুস্তাহাবও ভাবতেন না। বরং সে মাসে তিনি রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন (ইবনে মাজাহ)।

হযরত (সঃ) বুধ-বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার ব্যাপারে বেশী যত্নবান ছিলেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—নবী করীম (সঃ) আবাসে কি প্রবাসে কখনও আইয়ামে বীয' (প্রতিমাসের সমুজ্জ্বল তিন দিন) এর রোযা ভাংতেন না (নাসায়ী)। তিনি সে রোযার জন্য সবাইকে উৎসাহ জোগাতেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন—রসূল (সঃ) প্রতি মাসের সমুজ্জ্বল তিন দিনের রোযা রাখতেন (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন—হযরত (সঃ) রোযা রাখার ব্যাপারে মাস বাছতেন না (মুসলিম)।

এ সব হাদীছ ও আছারে কোন বিরোধ নেই। এখন বাকী রইল তাঁর জিল হাজ্জের দশ রোযা রাখার প্রশ্নটি। সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন—হযরত (সঃ)কে আমি কখনও সেই দশদিন রোযা রাখতে দেখিনি (মুসলিম)।

হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন–নবী করীম (সঃ) চারটি জিনিস কখনও ছাড়তেন না। (১) আশুরার রোযা (২) জিল হাজ্জের দশ রোযা (৩) প্রতি মাসের তিন রোযা (৪) ফজরের দু'রাকআত সুন্নাত (মুসনাদে ইমাম আহমদ)।

ইমাম আহমদ (রঃ) কোন এক উম্মুল মু'মিনীন থেকে হযরতের (সঃ) জিলহাজ্জের নয় রোযা, আশুরার রোযা, মাসিক তিন রোযা কিংবা দুই রোযা ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখা সম্পর্কিত বর্ণনা উধৃত করেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি দুই বৃহস্পতিবারের রোযা রাখতেন।

এখন রইল শওয়ালের ছয় রোযার প্রশ্নটি। বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে জানা যায়, হযরত (সঃ) বলেছেন—'রমযানের পরেই শওয়ালের ছয় রোযা রাখা সারা বছর রোযা রাখার শামিল।'

অবশিষ্ট রইল আশুরার রোযার মাসআলা। বর্ণিত আছে যে, হযরত (সঃ) আশুরার রোযার প্রতি খুব বেশী খেয়াল রাখতেন।

Contents

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

●

আশুরার রোযা

হযরত (সঃ) মদীনায় এসে দেখতে পেলেন, ইয়াহুদীরা আশুরার রোযা রাখছে আর সে দিনটিকে খুব সম্মান দিচ্ছে। তিনি তাদের বললেন—মুসা (আঃ) এর ওপর তোমাদের চাইতে আমার অধিকার বেশী। তারপর তিনি আশুরার রোযা রাখলেন এবং সাহাবাদের নির্দেশ দিলেন রোযা রাখতে।

এ ঘটনাটি রমযানের রোযা ফরয হবার আগের ঘটনা। তাই যখন রমযানের রোযা ফরয হল, তখন তিনি আশুরার রোযা সম্পর্কে সাহাবাদের বললেন—ইচ্ছে হয় রেখ, ইচ্ছে না হলে রেখনা।

একদল লোক এ ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন। তারা বলেন, হযরত (সঃ) মদীনায় এলেন রবিউল আউয়াল মাসে। তাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) কি করে বললেন যে, হযরত (সঃ) মদীনায় এসে ইয়াহুদীদের আশুরার রোযা রাখতে দেখেছেন ?

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, সহীহদ্বয়ে বর্ণিত আছে, আশআছ ইবনে কায়েস হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে এলেন। তিনি তখন খানা খাচ্ছিলেন। তাই তিনি তাকে বললেন—এস, আবু মুহাম্মদ, খানা খেয়ে নাও। সে বলল—আজ কি আশুরার দিন নয় ? তিনি জবাব দিলেন—তুমি কি জান, আশুরার ব্যাপারটি কি ? সে আরয করল—আপনি বলে দিন। তিনি বললেন—রমযানের রোযা ফরয হবার আগে রসূলুল্লাহ (সঃ) আশুরার রোযা রাখতেন। তারপর যখন রমযান ফরয হল, তখন তিনি আশুরা ছেড়ে দিলেন।

তেমনি সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূল (সঃ) যখন আশুরার রোযা রাখলেন ও তা রাখার জন্য নির্দেশ দিলেন, তখন আরয করা হল—হে আল্লাহর রসূল, ইয়াহুদী ও নাসারারা সে দিনটিকে অত্যন্ত মর্যাদা দেয়। তখন রসূল (সঃ) বললেন—আগামী বছর এলে আমি ইনশআল্লাহ নয় তারিখেও রোযা রাখব। কিন্তু পরবর্তী বছরেই হযরতের (সঃ) ইন্তিকাল হল। এতে প্রমানিত হয় যে, আশুরার রোযা রাখা ও তার নির্দেশ প্রদান হযরতের ইন্তিকালের এক বছর আগের ঘটনা।

অথচ প্রথমোক্ত হাদীছে ছিল যে, এ ঘটনা হযরতের (সঃ) মদীনায় আসার প্রথম দিকের ঘটনা। তারপর ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, রমযানের রোযা ফরয হবার কারণে আশুরার

রোযা বর্জিত হয়েছে। এ বর্ণনাও হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) শেষোক্ত বর্ণনার পরিপন্থী। এটাও বলা মুশকিল যে, রসূল (সঃ) আশূরার রোযার ফরযিয়াত বর্জন করেছেন। কারণ, সহীহদ্বয়ে মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, আশূরার রোযা মূলত ফরয ছিল না। তিনি বলেন—আমি রসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি যে, 'আজ আশূরার দিন। আল্লাহ তা'আলা এ দিনে তোমাদের জন্য রোযা ফরয করেন নি। অবশ্য আমি রোযা রেখেছি। তোমাদের ইচ্ছে হলে থাকতে পার, ইচ্ছে না হলে থেকনা।' এটা সুস্পষ্ট যে, মুআবিয়া (রাঃ) এ বর্ণনাটি মক্কা বিজয়ের পরে শুনেছেন। কারণ, তিনি মক্কা বিজয়ের পরে মুসলমান হয়েছেন।

এ ব্যাপারে আরেকটি প্রশ্ন এই যে, সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন নবী করীম (সঃ) এর কাছে আরয করা হল, আশূরার দিনটি ইয়াহুদী ও নাসারার কাছে অত্যন্ত মর্যাদার দিন, তখন তিনি বললেন, আমি যদি বেঁচে থাকি তো আগামী বছর অবশ্যই নয় তারিখে রোযা রাখব। কিন্তু পরবর্তী বছর তিনি ইন্তিকাল করেন।

সহীহ মুসলিমে হাকাম ইবনুল হারাজ থেকে এও বর্ণিত আছে যে, 'আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর কাছে গেলাম। তিনি যমযম কূপের পাশে চাদর বিছিয়ে বসে ছিলেন। আমি আরয করলাম, আশূরার দিন সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বললেন—তুমি যখন মুহাররমের চাঁদ দেখবে, নয় তারিখ খেয়াল রাখবে। আর নয় তারিখ সকাল থেকে রোযা থাকবে। আমি আরয করলাম—রসূল (সঃ) কি এ ভাবে রোযা রাখতেন ? তিনি বললেন—হাঁ।

এ ব্যাপারে আরেকটি প্রশ্নও রয়েছে। তা এই যে, যদি ইসলামের শুরুতে এ রোযা ওয়াজিব বা ফরয হত, তা হলে তিনি তা তাদের কাযা করার কেন নির্দেশ দিতেন না যারা রাতে তার নিয়াত না করেই নিদ্রা গেল ? পক্ষান্তরে যদি ফরযই না হবে, তা হলে যারা সেদিন খানা খেল তাদের কেন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন ? মুসনাদ ও সুনানে কয়েক ভাবে এবর্ণনা এসেছে যে, যারা খানা খেয়েছিল তাদেরও তিনি অবশিষ্ট দিনটুকু রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। এ অবস্থা তো কেবল ফরয-ওয়াজিবের বেলায়ই ঘটতে পারে। তাই ইবনে মাসউদের কথা কি করে ঠিক হতে পারে যে, যখন রমযান ফরয হল তখন আশূরার ফরয চলে গেল। অন্তত তার মুস্তাহাব হওয়া তো বর্জিত হতে পারে না।

আরও একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) নয় তারিখে আশূরার রোযার কথা বলেছেন এবং বলেছেন, রসূল (সঃ) তাই করতেন। তার বর্ণনাটি এই—নবী করীম (সঃ) বলেছেন, আশূরার রোযা রাখ ও ইয়াহুদীদের বিরোধীতা কর। আর তা এভাবে কর যে, তোমরা তার একদিন আগে ও পরে রোযা রাখ (মুসনাদে আহমদ)। তিনি আবার নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আশূরার রোযা দশ তারিখে।

প্রথম প্রশ্নের জবাব ঃ

হযরত (সঃ) যখন মদীনায় এলেন, তখন ইয়াহুদীদের রোযা রাখতে দেখলেন। এর অর্থ এ নয় যে, তিনি যেদিন এলেন, সেদিনই তাদের রোযা রাখতে দেখেছেন। কারণ, তিনি রবিউল আউয়ালের দ্বিতীয় দশ দিনের মংগলবারে মদীনায় শুভাগমন করেন। পরদিন যখন তিনি এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তিনি প্রথম বারেই তা জানতে পেলেন। এর আগে মক্কায় তা তিনি জানতেন না। সেক্ষেত্রেও কথা থাকে যে, আহলে কিতাবরা চান্দ্রমাসের হিসেবে রোযা রাখলে এ প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু সৌরমাসের হিসেবে রোযা রাখলে এ প্রশ্ন আদৌ দেখা দেয় না। মুসা (আঃ) এর মুক্তির দিনটি মুহাররমের দশ তারিখ ছিল। ইয়াহুদীরা তার হিসাব রেখেছে সৌরমাস অনুসারে। হযরত (সঃ) মদীনায় এসেছেন রবিউল আউয়ালে। তা হল চান্দ্রমাস অনুসারে। এ কারণে স্বভাবতই এ তারতম্য সৃষ্টি হয়েছে। সৌরমাস অনু-সারে এ তারতম্য রোযার ও হজ্জের ক্ষেত্রেও দেখা দেয়। এভাবে প্রতিমাসের বিশেষ তারিখের ইবাদতের বেলায়ই দেখা দেয়। নবী করীম (সঃ) ইয়াহুদীদের বলেছেন, মুসা (আঃ) এর ওপর তোমাদের চেয়ে আমার অধিকার বেশী। তাই তাদের আগেই তাঁর স্মৃতি উদযাপনের ব্যাপারটি স্বাভাবিক। এটাই মূলত সঠিক দিন। কারণ, সৌরমাসের হিসেব অনুসরণ করতে গিয়ে ইয়াহুদীরা সঠিক তারিখ গোলমাল করে ফেলেছে। নাসারারা তাদের রোযার ব্যাপারে এ গোলমালই করে বসেছে। তারা বছরে একটি নির্দিষ্ট মওসুমকে রোযার জন্য নির্ধারণ করেছে। ফলে তাদের রোযা ঘুরে ফিরে বিভিন্ন মাসে হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব ঃ

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হল, জাহেলী যুগে কুরায়েশরা আশুরা পালন করত। সেদিন তারাও রোযা রাখত। নবী করীম (সঃ)ও রোযা রাখতেন। কুরায়েশরা সেদিনটিকে মর্যাদা দিত। সেদিন তারা কাবা ঘরে গিলাফ চড়াত। রোযা রেখে সে মর্যাদা পূর্ণত্বে পেঁাছাত। কুরায়েশরা চান্দ্রমাস হিসেবেই দশ তারিখে তা করত। তারপর হযরত (সঃ) মদীনায় এসে দেখলেন, ইয়াহুদীরাও তাই করছে। তারাও সেদিনের মর্যাদা দিয়ে রোযা রাখছে। তাই রসূল (সঃ) বললেন—মুসা (আঃ) এর ওপর তোমাদের চেয়ে আমার অধিকার বেশী। যেহেতু মুসা (আঃ) নিজেদের মুক্তি লাভের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সেদিন রোযা রেখেছেন, তখন আমরা ইয়াহুদীদের চেয়েও আল্লাহার সেই রসূলকে অনুসরণ করার অধিকার বেশী রাখি। কারণ, আমরা মুসা (আঃ) এর শরীআতকে আমাদের শরীআত মনে করি। অবশ্য যদি তা আমাদের শরীআতের পরিপন্থী না হয়।

যদি কেউ প্রশ্ন তোলে যে, হযরত মুসা (আঃ) সেদিন রোযা রেখেছিলেন তা তুমি কোথায় পেলে? জবাবে বলছি, সহীহদ্বয়ে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূল (সঃ) জানতে চাওয়ায় ইয়াহুদীরা

Contents

তাঁকে জানাল—এটা অত্যন্ত মর্যাদার দিন। এদিনে আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ) ও তাঁর জাতিকে মুক্তি দেন এবং ফিরাউন ও তার জাতিকে ডুবিয়ে মারেন। তাই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মূসা (আঃ) সে দিন রোযা রেখেছিলেন বলে আমরাও রোযা রাখছি। রসূল (সঃ) তা শুনে বললেন—'মূসা (আঃ) এর ওপর তোমাদের চেয়ে আমার অধিকার বেশী।' এই বলে তিনি নিজে রোযা রাখলেন এবং সাহাবাদেরও রোযা রাখতে নির্দেশ দিলেন। এ বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত (সঃ) ইয়াহুদীদের উক্ত বর্ণনার সত্যতা মেনে নিয়েছেন। তাই জানা গেল যে, মূসা (আঃ) সেদিন শোকরানা রোযা রেখেছিলেন। যদি হিজরত পূর্ব ঘটনার বর্ণনার সাথে এ বর্ণনা মিলানো হয়, তা হলে ব্যাপারটি অধিকতর জোরদার হয়। হযরত (সঃ) এমন কি আশূরার রোযার জন্য বিভিন্ন শহরে ঘোষক পাঠান। তারা এ ঘোষনা দিয়েছে যে, যারা খেয়েছে তারা অবশিষ্ট দিন রোযা রাখ। এতে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত (সঃ) এর ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ওয়াজিবের মর্যাদা দিয়েছে। পরে এর সবিস্তার আলোচনা আসছে।

তৃতীয় প্রশ্নের জবাব ঃ

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে, রমযানের রোযা ফরয হবার আগে হযরত (সঃ) আশূরার রোযা রাখতেন। কিন্তু রমযান ফরয হবার পর তিনি তা ছেড়েছেন। তার অর্থ এ নয় যে, তিনি একেবারেই তা বর্জন করেছেন। মূলত তার অর্থ হচ্ছে এই যে, রমযান ফরয হবার আগে তা ফরয ছিল আর তার পরে তার ফরযিয়াত বর্জিত হয়েছে। কিন্তু মুস্তাহাব হিসেবে তা বহাল রয়েছে। কারণ, নবী করীম (সঃ) এর ইন্তিকালের এক বছর আগে তাঁকে যখন আরয করা হল যে, ইয়াহুদী-নাসারারাও সেদিনটির খুব মর্যাদা দেয়, তখন তার জবাবে তিনি বললেন—আগামী বছর বেঁচে থাকলে আশূরা ছাড়া নয় তারিখেও রোযা রাখব। তিনি আরও বললেন—ইয়াহুদীদের সাথে পার্থক্য সৃষ্টি কর এবং তার এক দিন আগে ও পরে মিলিয়ে রোযা রাখ।

এটা সুনিশ্চিত যে, উক্ত ঘটনা রসূল (সঃ) এর শেষ জীবনের ঘটনা। প্রথম দিকে তো তিনি যে সব বিষয়ে ওহী পান নি, সে সব ব্যাপারে আহলে কিতাবদের সাথে মিল রেখে কাজ করা পসন্দ করতেন। তাই জানা গেল যে, আশূরার মুস্তাহাব হওয়া ঠিকই রয়েছে। এখন যারা আশূরার রোযার অপরিহার্যতা আর নেই বলে মনে করেন, তাদের এ ধারণা থেকে দুটি কথা জরুরী হয়ে দেখা দেয়। এক, তার মুস্তাহাব হওয়াই বাতিল হয়ে গেছে এবং তা এখন আর মুস্তাহাব নেই। অথবা তারা এর মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে অবহিত নন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হয়ত জানতেন না যে, ফরযিয়াত বাতিল হলেও মুস্তাহাব হিসেবে তা বহাল রয়েছে। অথচ এটা কল্পনাই করা যায় না। কারণ, নবী করীম (সঃ) তাঁর সাহাবাদের এ রোযা রাখতে উৎসাহিত করছেন এবং বলেছেন—আশূরার রোযা বিগত বছরের পাপের কাফফারা।

তাই সাহাবারা তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্ত এ রোযা রেখেছেন। তা ছাড়া হযরত (সঃ) থেকে এ রোযা নিষিদ্ধ বা মাকরূহ হওয়া সম্পর্কে কোন বর্ণনাই নেই। তাই এটা প্রমানিত হল যে, আশূরার রোযার ফরযিয়াত বাতিল হলেও ইস্তিহ্বাব বহাল রয়েছে।

চতুর্থ প্রশ্নের জবাব :

চতুর্থ প্রশ্ন এই যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন—যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে অবশ্যই নয় তারিখে রোযা রাখব। কিন্তু তার আগেই তিনি ইন্তিকাল করেছেন। অথচ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, রসূল (সঃ) নয় তারিখে রোযা রাখতেন। এ পরস্পর বিরোধী দু'টো বর্ণনাই ইবনে আব্বাসের (রাঃ)। মূলত বর্ণনা দু'টোয় কোন বিরোধ নেই। কারণ, নবী করীম (সঃ) আগেও নয় তারিখে রোযা রাখতেন এবং ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকলে রোযা রাখতেন। মানে, এক বর্ণনায় তাঁর বর্তমান কাজ ও অন্য বর্ণনায় তার ভবিষ্যৎ অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছে।

পঞ্চম প্রশ্নের জবাবের জন্য উপরোক্ত জবাবই যথেষ্ট।

ষষ্ঠ প্রশ্নের জবাব :

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, 'নয় তারিখ খেয়াল রাখ এবং সেদিন সকাল থেকে রোযা রাখ।' যে ব্যক্তি হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এর সব বর্ণনার ওপরে চোখ বুলাবে, তার জন্য এতে কোন সমস্যাই দেখা দেবে না। সেই ব্যক্তি অবশ্যই তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তৃতির স্বীকৃতি দানে বাধ্য হবে। কারণ, তিনি নয় তারিখকে 'আশূরার দিন' বলেন নি। কারণ, আশূরা যে দশ তারিখ তা প্রশ্নকারীর জানা আছে বলেই তিনি শুধু নয় তারিখ বলা যথেষ্ট ভেবেছেন। প্রশ্নকারীকে তিনি নয় তারিখে রোযা রাখার কথা বলে সংগে সংগেই জানিয়ে দিলেন—রসূল (সঃ) এটাই করতেন।

এখন দু'টো অবস্থা হতে পারে। এক, হযরত (সঃ) এটাই করতেন। তা হলে তো আর কোন সমস্যাই থাকে না। দুই, হযরত (সঃ) যেহেতু তা করার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, তাই ইবনে আব্বাস (রাঃ) সেটাকে তাঁর কৃত কাজ বলেই ধরে নিয়েছেন। তাঁর অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন—আশূরার একদিন আগে ও পরে রোযা রাখ। অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন—রসূল (সঃ) আমাদিগকে দশই মুহাররাম আশূরার রোযা রাখতে বলেছেন। এ সব হাদীছ ও আছার তিনিই বর্ণনা করেছেন এবং সেগুলো পরস্পরের সহায়ক ও সমর্থক।

আশুরার রোযার তিনটি স্তর :

১। আশূরার রোযার পূর্ণাংগ রূপ হল আগে ও পরের দু'দিন মিলিয়ে মোট তিন দিন রোযা রাখা।

২। অধিকাংশ হাদীছের আলোকে নয় ও দশ তারিখে রোযা রাখা।

৩। শুধু দশ তারিখে রোযা রাখা।

অবশ্য শুধু নয় তারিখে রোযা রাখার মতও রয়েছে। তবে তা হাদীছ না বুঝার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। তারা হাদীছের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। শরীআতের দৃষ্টি-কোন থেকেও তা অবাস্তব। আল্লাহই সঠিক সিদ্ধান্তে পেঁছার তাওফীক দেবার একমাত্র মালিক।

আরাফাত দিবসের রোযা ঃ

নবী করীম (সঃ) এর রীতি এটাই ছিল যে, ইয়াওমে আরাফায় তিনি আরাফাতের মাঠে রোযা রাখতেন না। সহীহদ্বয় থেকে এটাই প্রমাণিত হয়েছে।

আহলে সুনানে রসূল (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি সেদিন রোযা রাখতে নিষেধ করে-ছেন। অবশ্য মুসলিমে বর্ণিত আছে, রসূল (সঃ) বলেছেন—সেদিনের রোযা অতীত ও ভাবী বছর গুলোর জন্য কাফফারা হয়ে থাকে।

আরাফাত দিবসে রোযা না রাখার কয়েকটি কারণ বলা হয়েছে। এক, দোআ ও ইবাদতের জন্য শক্তি সঞ্চয় করা। দুই, সফরে ফরয রোযাও ভংগ করা উত্তম। তিন, তা ছিল জুমআর দিন। হযরত (সঃ) শুধুমাত্র জুমআর দিনে রোযা রাখা নিষিদ্ধ বলেছেন। যদিও সেদিন রোযা রাখলে তা জুমআর রোযা না হয়ে আরাফতের রোযা হত, তথাপি রসূল (সঃ) তা ভংগ করে শুধু শুক্রবারে রোযা রাখার অবৈধতার ওপর জোর দিলেন।

আমাদের শায়েখ ইবনে তায়মিয়ার ভিন্নমত রয়েছে। তা হচ্ছে এই যে, এ দিনটি আরা-ফায় অবস্থানকারীদের জন্য ঈদের দিনের মত। এ ঈদ শুধু আরাফাতের লোকদের জনাই, দুনিয়ার অন্য কারো জন্য নয়। তিনি বলেন—আহলে সুনানে উধৃত বর্ণনায় দেখা যায়, নবী করীম (সঃ) বলেছেন—আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও মিনায় অবস্থানের ক'দিন আমাদের মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন। এটা তো জানা কথা যে, আরাফার দিনের সেই শ্রেষ্ঠতম সমাবেশ শুধু সেখানে অবস্থানকারীদের জন্য ঈদের দিন হয়ে দাঁড়ায়।

হযরতের রোযার দিনগুলি ঃ

বর্ণিত আছে, হযরত (সঃ) শনি ও রোববারে বেশীর ভাগ রোযা রাখতেন। এ দ্বারা ইয়াহুদী ও নাসারাদের সাথে পার্থক্য সৃষ্টিই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। মুসনাদ ও সুনানে নাসায়ীতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মুক্তি প্রাপ্ত দাস কুরায়েব বর্ণনা করেন ঃ আমাকে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আরও ক'জন সাহাবা হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এর কাছে পাঠালেন এ কথা জানার জন্য যে, রসূল (সঃ) কোন কোন দিন রোযা রাখতেন। তিনি বলেছেন ঃ হযরত (সঃ) শনি ও রোববারে সাধারণত রোযা রাখতেন এবং বলতেন—মুশরিকদের এ দু'দিন উৎসবের দিন বলেই তার সাথে পার্থক্য সৃষ্টি করা আমি পসন্দ করি।

অবশ্য এ হাদীছটি সংশয়পূর্ণ। কারণ, এটা মুহাম্মদ ইবনে উমর ইবনে আলী ইবনে আবু তালিবের বর্ণনাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তার কোন কোন হাদীছ অস্বীকৃত হয়েছে। আবদুল হক তাঁর 'আহকাম' গ্রন্থে ইবনে জারীজের হাদীছ সম্পর্কে বলেছেন—তিনি আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে ও তিনি তার চাচা ফযল ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, 'নবী করীম (সঃ) আমাদের বাড়ীতে হযরত আব্বাস (রাঃ) এর সাথে দেখা করেন।' কিন্তু বর্ণনাটির সনদ দুর্বল। ইবনে কাত্তান বলেন : এর বর্ণনা পদ্ধতিটি দুর্বল। মুহাম্মদ ইবনে উমর বলেন—বর্ণনাটি অপরিজ্ঞাত। পক্ষান্তরে তিনি উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে শনি ও রোববারে হযরত (সঃ) এর রোযা না রাখা সম্পর্কিত বর্ণনা প্রদান করেছেন। তিনি আরও বলেন—আবদুল হক এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ বলেই চুপ করে গেছেন এবং আর কোন মন্তব্য করেন নি। কারণ, মুহাম্মদ ইবনে উমর অখ্যাত ব্যক্তি এবং তার ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে উমরের অবস্থা জানা যায় না।

তবে আমার ধারণামতে বর্ণনাটি 'হাসান'।

ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ (রঃ) আবদুল্লাহ ইবনে বাশার সালমী থেকে, তিনি তার দুধ ভাই হাম্মাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন—ফরয রোযা ছাড়া শনিবারে রোযা রেখ না। যদি তোমার কাছে খাবার কিছু না থাকে তো আংগুরের একটি দানা খেয়ে নাও কিংবা গাছের একটি ডাল চিবিয়ে নাও।

এ হাদীছ সম্পর্কে বিভিন্ন মত দেখা দিয়েছে। মালিক (রঃ) বলেন—হাদীছটি মিথ্যা। এ কথা দ্বারা তিনি আবদুল্লাহ ইবনে বাশারের হাদীছ বুঝিয়েছেন (আবু দাউদ)।

তিরমিজী (রঃ) বলেন—হাদীছটি হাসান। আবু দাউদ (রঃ) বলেন—হাদীছটি বাতিল হয়েছে। নাসায়ী (রঃ) বলেন—হাদীছটি মুযতারাব (অস্পষ্ট)।

একদল আলিম মনে করেন, এ হাদীছ ও উম্মে সালমা (রাঃ) এর হাদীছের ভেতরে কোন বিরোধ নেই। কারণ, রোযা নিষিদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে শুধু সেদিনে রোযা রাখা। আবু দাউদও এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনিও বলেছেন, শুধু শনিবারে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে রোযা রাখার হাদীছের অর্থ হচ্ছে রোববার সহ রোযা রাখা। তিনি বলেন—তার উদাহরণ হচ্ছে এই যে, রসূল (সঃ) শুধু শুক্রবারে রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তার আগে পরে রোযা রাখা হলে তা রাখতে আপত্তি করেন নি। এতে এ আপত্তি দূর হয় যে, শুক্রবারের সম্মানে রোযা রাখা হচ্ছে এবং আহলে কিতাবের মত দিন বিশেষকে সম্মান দেখানো হচ্ছে। তেমনি যদি তিনি শুধু আশুরার (দশ তারিখের) একটি রোযা রাখতে বলতেন, তা হলেও আহলে কিতাবের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হত। তাই তিনি মুহাররামের নয়, দশ, এগার এ তিনদিন রোযা রাখতে বলেছেন। ফলে নির্দিষ্ট দশ তারিখকে সম্মান দেখানো হয়নি।

Contents

সওমে দাহ্‌র নিষিদ্ধকরণ :

নবী করীম (সঃ) ক্রমাগত রোযা রাখতেন না। তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি সব সময় রোযা রাখে, সে না রোযা রাখল, না রোযা ভাঙল।

এ থেকে তিনি নিষিদ্ধ দিনের রোযা রাখার কথা বুঝান নি। এটা বলেছেন তিনি বছর ঠিকা রোযা রাখা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে, নিষিদ্ধ দিনে রোযা রাখার প্রশ্নে বলেন নি। তাঁর জবাব ছিল—না সে ব্যক্তি রোযা রাখল, না ভাংল। কারণ, বছর ঠিকা রোযা রাখা ও ভাংগার তারতম্য থাকে না। তাতে না ছাওয়াব আছে, না রোযার কোন স্বাদ থাকে। তা ছাড়া যে ব্যক্তি বছর ঠিকা রোযা রাখে সে মুস্তাহাব ও হারাম একাকার করে। কারণ, মুস্তাহাব রোযার দিনগুলোয় তো মুস্তাহাব আদায় হয়। কিন্তু নিষিদ্ধ দিনগুলোয় সে হারাম কাজে জড়িত হয়। সুতরাং তাদের বেলায় রসূলে (সঃ) এর উক্তি 'না রোযা রাখে, না রোযা ভাংগে' প্রযোজ্য নয়। এ জবাব তো বৈধ দিনে এক নাগাড়ে রোযা রাখার ব্যাপারে দেয়া হয়েছে।

হারাম দিবসগুলো শরীআতে গণ্য নয়। কারণ, তাতে রোযা রাখার প্রশ্নই আসে না। তাই সাহাবাদেরও সে ব্যাপারে নতুন করে জানতে চাওয়ার প্রশ্ন আসে না। কারণ, হারাম দিনগুলোর যে রোযা হারাম, তা যে কবুল হবার কথাই ওঠেনা তা তাদের সবারই জানা কথা। তা ছাড়া যদি সাহাবারা তা নাও জানতেন, তথাপি নবী করীম (সঃ) হারাম দিনগুলোয় রোযা রাখার প্রশ্নে এ জবাব দিতেন না যে, 'সে না রোযা রাখল, না ভাংল।'

এটাই ঠিক যে, নবী করীম (সঃ) এর রীতি ছিল ভেংগে ভেংগে রোযা রাখা, এক নাগাড়ে রোযা রাখা নয়। তাই বছর ঠিকা রোযা রাখা থেকে ভেংগে ভেংগে রাখাই উত্তম ও আল্লাহর অধিকতর পসন্দনীয় কাজ। পরন্তু বছরঠিকা রোযা মাকরূহ। যদি তা মাকরূহ না হত তা হলে তিনটি সম্ভাবনা দেখা দিত।

এক, ভেংগে ভেংগে রোযা রাখার চেয়ে তা উত্তম ও আল্লাহর কাছে অধিকতর পসন্দনীয় কাজ হত। কারণ, এতে রোযাও বেশী রাখা হয়। অথচ হাদীছের আলোকে তার বিপরীত দেখা যায়। কারণ, আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাউদের (আঃ) রোযার পদ্ধতি বেশী পসন্দীয়। তিনিও ভেংগে ভেংগে রোযা রাখতেন।

দুই, ভেংগে ভেংগে রোযা রাখা ও বছরঠিকা রোযা রাখার মর্যাদা সমান হত। অথচ এটা স্বাভাবিক বুদ্ধিতেই অসম্ভব। কারণ, বেশী রোযা ও কম রোযার মর্যাদা এক হতে পারে না।

তিন, বছর ঠিকা রোযা রাখা মুস্তাহাবও নয়, মাকরূহও নয়—মুবাহ। এটাও হতে পারে না। কারণ, তা হলে তা ইবাদতের মর্যাদাই পায় না। যে কোন ইবাদত হয় বৈধতার নির্দেশ হবে, নয় তো অবৈধতার নির্দেশ হবে। আর সে নির্দেশ পালনই ইবাদত। যে ব্যাপারে বৈধ কি অবৈধ কোন নির্দেশই পালন করতে হয় না তা ইবাদত বলে গণ্য নয়।

একটি প্রশ্নের জবাব ঃ

যদি বলা হয়, রসূল (সঃ) বলেছেন—যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখে শওয়ালের ছয় রোযা রাখল, সে যেন বছরঠিকা রোযা রাখল। তেমনি অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন—যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখল, সে যেন সারাবছর রোযা রাখল। এতে বুঝা যায় যে, বছর ঠিকা রোযা অন্য ধরনের রোযা থেকে উত্তম। তার ছাওয়াব এত বেশী যে, রসূল (সঃ) সেটাকে উপমা হিসেবে পেশ করেছেন।

জবাবে বলা যায়, পরিমাপ বুঝাবার জন্য কোন ব্যাপারের উল্লেখ করা হলে তার বৈধতা জরুরী হয়ে যায় না। মুস্তাহাব ভাবা তো দূরের কথা। উপমা দিয়ে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, তা মুস্তাহাব হলে যে পরিমাণ ছাওয়াব পাওয়া যেত এতে তা পাওয়া যাবে।

হাদীছের বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় যে, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখাকে তিনি এ হিসেবে পুরো বছরের রোযার সাথে তুলনা দিয়েছেন যে, তাতে বছরে ছত্রিশ রোযা হয় এবং এক নেকীতে দশ ছাওয়াব হিসেবে তিনশ ষাট দিন রোযার ছাওয়াব হয়। এটাই সঠিক মর্ম। কারণ 'সাওমুদ দাহ্‌র' (বছরঠিকা রোযা) একেবারেই হারাম।

এভাবে রমযানের সাথে মিলিয়ে শওয়ালের ছয় রোযা রাখলে ছত্রিত রোযা হয় এবং তা দশ গুণ করলে বছরঠিকা (তিনশ ষাট) রোযার ছাওয়াব মিলবে। এ হাদীছ প্রসংগে নবী করীম (সঃ) এ আয়াত পড়েন ঃ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

"যে ব্যক্তি একটি পুণ্য করল, সে তার দশগুণ ছাওয়াব পাবে।"

বলা বাহুল্য, বছরের পুরো তিনশ ষাট দিন রোযা রাখা সর্ব সম্মতভাবে অবৈধ। এ ধরনের অবৈধ বা অসম্ভব কিছু দিয়ে কখনও কখনও উদাহরণ দেয়া হয়। এ উপমা শুধুমাত্র আনুমানিক হয়ে থাকে। যেমন এক ব্যক্তির জিহাদ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে রসূল (সঃ) বললেন—'একটি লোক জিহাদের ময়দানে দাঁড়াল, অথচ উদাসীনও হলনা, এমন কি হতে পারে? তেমনি কেউ রোযা রাখল, অথচ ভাংল না?' মূলত এগুলো স্বভাবতই অসম্ভব। ঠিক তেমনি শরীআতের দৃষ্টিতে বছরের পুরো তিনশ ষাট দিন রোযা রাখা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা দিয়ে ছাওয়াবের পরিমাপ বুঝাবার জন্য উদাহরণ নেয়া হয়েছে। তিনি এটা এ জন্য করেছেন যে, ব্যাপারটা যেন সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। আল্লাহ তা'আলার কাছে হযরত দাউদ (আঃ) এর রাতজাগা ইবাদত ছিল প্রিয় ইবাদত। তা ছিল সকল রাতের ইবাদতের চেয়ে উত্তম ইবাদত। এভাবে রসূল (সঃ) এক উদাহরণে বলেছেন, যে ব্যক্তি ইশা ও ফজর জামাআতের সাথে আদায় করল সে যেন সারারাতই ইবাদত করল।

যদি বলা হয় যে, হযরত আবু মুসা আশআরী (রাঃ) হযরত (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন—'যে ব্যক্তি বছরঠিকা রোযা রাখল, তার জন্য জাহান্নাম এরূপ সংকীর্ণ হল'—এই বলে হযরত (সঃ) হাতের মুঠি বন্ধ করলেন (মুসনাদে আহমদ)।

জবাবে বলা যায় যে, এ হাদীছের ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক ব্যাখ্যায় এও বলা হয়েছে যে, জাহান্নাম তাকে আকড়ে ধরে সংকুচিত হবে। কারণ, সে নিজের ওপর নিজের কষ্ট-দায়ক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল। তার ওপর সে নবী করীম (সঃ) এর পবিত্র সুন্নাত থেকে ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছিল। তা ছাড়া তার বিশ্বাস ছিল, দাউদ (আঃ) এর রোযার পদ্ধতির চেয়ে বছর-ঠিকা রোযা উত্তম।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় অবশ্য বলা হয়েছে যে, তার ওপর থেকে জাহান্নাম সংকুচিত করে নেয়া হবে। অর্থাৎ জাহান্নামে তার ঠাই হবে না। এ ব্যাখ্যাকারদের উক্ত ব্যাখ্যাগ্রহণের যুক্তি এই যে, বছরঠিকা রোযাদার নিজের ষড়রিপুকে যেহেতু আল্লাহর ভয়ে সর্বদা সংকুচিত করে রেখেছে, তাই আল্লাহ তা'আলা তাহার ব্যাপারেও জাহান্নামকেও সংকুচিত করবেন। তাই জাহান্নামে তার ঠাই মিলবেনা। কারণ, জাহান্নামের সব পথই সে বন্ধ করে দিয়েছিল।

অনশনের ক্ষেত্রে রোযা উত্তম ঃ

রসূল (সঃ) ঘরে এসে জিজ্ঞেস করতেন—তোমাদের কাছে খাবার মত কিছু আছে কি ? যদি না সূচক জবাব হত তা হলে তিনি বলতেন—'আজ আমার রোযা চলবে।' সে অনুসারে তিনি সে দিনে নফল রোযা রাখতেন। কখনও এমন হত যে, হযরত (সঃ) নফল রোযার নিয়্যত করে বসেছেন, এমন সময়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) খবর দিতেন যে, তাঁর কাছে অমুক বস্তু পাকানো আছে। তখন তিনি রোযা ভাংতেন। পয়লা বর্ণনাটি সহীহ মুসলিমের ও দ্বিতীয় বর্ণনাটি নাসায়ীর।

এখন রইল, সুনানে বর্ণিত হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনাটি। তিনি বলেন—আমি ও হাফসা রোযা রেখেছিলাম। আমাদের সামনে খানা নিয়ে আসা হল। আমাদের ইচ্ছে হল, দু'জনে খেয়ে নিলাম। যখন নবী করীম (সঃ) এলেন, তখন আগেই হাফসা তাঁর কাছে গিয়ে আরয করল ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমরা দু'জন রোযা ছিলাম। আমাদের সামনে খাবার আনা হল। মন চাইল বলে আমরা খেয়ে নিলাম। হযরত (সঃ) বললেন, তার বদলে অন্য দিন কাযা করে নিও।

এ হাদীছটি ত্রুটিযুক্ত। তিরমিজী (রঃ) বলেন, হাদীছটি মালিক ইবনে আনাস, মুআম্মার, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, যিয়াদ ইবনে সা'দ প্রমুখ হাদীছের হাফিজরা যুহরী থেকে ও তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করেন। এতে উরওয়ার সনদের উল্লেখ নেই। এটাই বেশী শুদ্ধ। আবু দাউদ ও নাসায়ী (রঃ) শরীক থেকে, তিনি উরওয়ার গোলাম যুমায়ের থেকে ও তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে 'মাওসুল' হিসেবে বর্ণনা করেন।

নাসায়ী (রঃ) বলেন, যুমায়ের অখ্যাত ব্যক্তি। বুখারী (রঃ) বলেন, উরুয়া থেকে যুমায়েরের ও যুমায়ের থেকে শরীকের বর্ণনা শোনার ব্যাপারটি সুপরিজ্ঞাত নয় বিধায় তা দলীল হতে পারে না। পরন্তু নবী করীম (সঃ) যখন রোযা রাখতেন এবং কোন এলাকায় যেতেন, তখন রোযা পুরো করতেন, ভাংতেন না। যেমন তিনি উম্মে সলীম (রাঃ) এর কাছে রোযা রেখে গেলে তিনি তাঁকে খেজুর ও ঘি খেতে দেন। হযরত (সঃ) বললেন—ঘিয়ের ভান্ডারে ঘি রেখে দাও আর খেজুরের বরতন ফিরিয়ে নাও। কারণ, আমি রোযাদার।

উম্মে সলীম (রাঃ) হযরতের (সঃ) কাছে তাঁর পরিবারের লোকের মর্যাদা রাখতেন। তা ছাড়া বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি বলেছেন—'রোযার অবস্থায় তোমাদের কাছে যদি কেউ খাবার আনে তা হলে বলে দিবে আমি রোযাদার।'

ইবনে মাজাহ (রঃ), তিরমিজী (রঃ) ও বায়হাকী (রঃ) হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে এক মারফু হাদীছ বর্ণনা করেন। তাতে তিনি বর্ণনা করেন—'যে ব্যক্তি কোথাও মেহমান হয়ে যায়, সে যেন কখনও মেযবানের অনুমতি ছাড়া রোযা না রাখে।'

তিরমিজী (রঃ) হাদীছটিকে 'মুনকার' বলেছেন। তিনি বলেন—হিশাম ইবনে উরুয়া থেকে কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন বলে আমার জানা নেই।

শুক্রবারে রোযা রাখা নিষিদ্ধ ঃ

নবী করীম (সঃ) কথায় ও কাজে সুস্পষ্টত শুক্রবারে রোযা রাখা অপসন্দ করতেন। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ), জুয়ায়রিয়া বিন্তে হারিছ (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত জুনাদা ইযদী (রাঃ) প্রমুখের বর্ণিত সুস্পষ্ট হাদীছে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, শুধু শুক্রবারে রোযা রাখা নিষিদ্ধ। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে ঃ হযরত (সঃ) জুমআর দিন মিম্বরে বসে এমনভাবে পানি পান করেছিলেন যেন তিনি যে রোযা নন তা সবাই দেখতে পায়।

তিনি রোযা না রাখার কারণ হিসেবে বলেছেন—শুক্রবার ঈদের দিন। ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে এ হাদীছ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেছেন ঃ জুমআর দিন ঈদের দিন। তাই তোমরা ঈদের দিনকে রোযার দিন বানিও না। হাঁ, তার আগে কিংবা পরে রোযা রেখে নিলে রাখতে পার।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন—'আমি রসূলকে (সঃ) শুক্রবারে কখনও রোযা ছাড়া দেখিনি।' এ বর্ণনাটি আহলে সুনানে উধৃত হয়েছে। এর জবাবে বলব, যদি বর্ণনাটি বিশুদ্ধ হয় তা হলে মেনে নিচ্ছি। সেক্ষেত্রে হাদীছটির ব্যাখ্যা হবে এই যে, রসূল (সঃ) তার আগে ও পরে রোযা রাখতেন। পক্ষান্তরে যদি তা বিশুদ্ধ না হয় তা হলে তো কথাই নেই। কারণ, তিরমিজী (রঃ) বলেন—হাদীছটি গরীব।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ

●

হযরতের (সঃ) সাঈ

ইবনে হাযমের ভ্রান্তি ঃ

ইবনে হাযম বলেন—'নবী করীম (সঃ) উটে চড়ে সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাত চক্কর দেন। তিনটিতে দৌড়েছেন ও চারটিতে স্বাভাবিক গতিতে চলেছেন।' মূলত এগুলো তার কল্পনা প্রসূত কথা এবং সম্পূর্ণ ভুল কথা। কারণ, একমাত্র তিনি ছাড়া আর কেউ এরূপ কথা শোনান নি। নবী করীম (সঃ) থেকেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

আসলে সেটা ছিল তাঁর কা'বা ঘরের তাওয়াফ। তাই আবূ মুহাম্মদ ভুল করে সেটাকে সাফা মারওয়ার সাঈ বলে চালিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তার থেকে আরও আশ্চর্য বর্ণনা পাওয়া যায় সহীহ্ বুখারীতে। তাতে তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর সনদে বর্ণনা করেন ঃ 'নবী করীম (সঃ) যখন মক্কা শরীফ এলেন, তখন তিনি (কাবাঘর) তাওয়াফ করলেন। পয়লা তিনি হাজরে আস-ওয়াদে চুমু খেলেন। তারপর দৌড়ে দৌড়ে তিন তাওয়াফ করলেন। এবং চার তাওয়াফ ধীরে ধীরে করলেন। কিবলার তাওয়াফ শেষ করে তিনি মাকামে ইব্রাহীমে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন। নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে সাফা মারওয়ায় গেলেন এবং সাত চক্কর লাগালেন।' এ হাদীছের পরবর্তী অংশটুকু শুরুতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে হাযম মন্তব্য করেন, সাফা-মারওয়ার সাঈর পদ্ধতি আমরা কুরআনে পাইনি বটে, কিন্তু বর্তমান পদ্ধতিটি সর্বসম্মত। এ হচ্ছে তাঁর ভাষা।

আমি (ইবনে কাইয়েম) বলছি, সাত চক্করের সাঈ যে সর্বসম্মত ব্যাপার তাতে সন্দেহ নেই। তবে পয়লা তিন চক্করে দৌড়ানোর ব্যাপারটি আমাদের যদ্দুর জানা আছে তাতে তিনি ছাড়া কেউ বলেনওনি, বর্ণনাও করেন নি। আমার শায়েখকে (ইবনে তায়মিয়া) এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন—এটা তার ভ্রান্তি। সে (ইবনে হাযম) হজ্ব করেনি। এটা এরূপ ভুল যেমন কেউ বলল, হযরত (সঃ) চৌদ্দবার সাঈ করেছেন। অর্থাৎ আসা ও যাওয়াকে এক এক সাঈ মনে করে বসল। অথচ এটা ভুল। নবী করীম (সঃ) থেকে এরূপ কথা কেউ বর্ণনা করেন নি। পূর্বসূরী ইমামদেরও কেউ এরূপ বলেন নি। যদি কোন উত্তরসূরী এরূপ কথা বলে কোন পূর্বসূরীর বরাত দেয় তাও ভুল। এ বক্তব্য নবী করীম (সঃ) সম্পর্কিত সর্বসম্মত এ মতটিও বাতিল করে দেয় যে, তিনি মারওয়ায় এসে সাঈ শেষ করেছেন। যদি যাওয়া ও আসাকে দু'সাঈ ধরা হয়, তা হলে সাফায় এসে সাঈ শেষ হয়। অথচ নবী করীম (সঃ) যখন মারওয়ার কাছে পেঁছলেন,

তখন তার ওপরে চড়লেন ও কিবলামুখী হয়ে 'আল্লাহু আকবার লাইলাহা ইল্লাল্লাহু' বললেন। তারপর সাফায় যেভাবে করেছেন, এখানেও সেভাবে করলেন। মারওয়ায় সাঈ যখন তিনি শেষ করলেন, তখন যাদের কাছে কুরবানীর পশু ছিল না, তাদের ইহরাম ছেড়ে দিতে বললেন। তা সে কিরান হজ্জের নিয়্যত করে থাক কিংবা মুফরাদ হজ্জের। তা ছাড়া যারা স্ত্রীর সাহচর্যে ছিল, সুগন্ধী লাগিয়েছিল ও সেলাই করা কাপড় পরেছিল, তাদেরও তিনি ইহরাম ছাড়ার নির্দেশ দিলেন। তাদের তিনি 'ইয়াওমুত তারবিয়া' পর্যন্ত এভাবেই থাকতে বললেন।

হযরতের (সঃ) যেহেতু কুরবানীর পশু ছিল, তাই তিনি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় রইলেন এবং বললেন—আমি যদি অতীতকে ভবিষ্যতের জন্য না রাখতাম, তা হলে কুরবানী করতাম না এবং এটাকে উমরায় পরিণত করতাম।

হযরত (সঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইহরাম ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটা একেবারেই ভুল বর্ণনা। এ ব্যাপারে আমি ওপরেই বলে এসেছি। এখানেই তিনি মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার ও চুল ছোট করার লোকদের জন্য একবার দোআ করেছিলেন। তা ছাড়া এখানেই সুরাকা ইবনে মালিককে হযরত (সঃ) যখন ইহরাম ছাড়ার নির্দেশ দিলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন—এ নির্দেশ কি এবারের জন্য, না স্থায়ী নির্দেশ? হযরত (সঃ) জবাব দিলেন—এটা স্থায়ী নির্দেশ।

হযরত আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), আলী (রাঃ), তালহা (রাঃ) ও যুবায়ের (রাঃ) কুরবানীর পশু এনেছিলেন বলে ইহরাম ত্যাগ করেন নি। উম্মুল মু'মিনীনগণ যেহেতু কিরান হজ্জ করছিলেন, তাই ইহরাম ছেড়ে দিলেন। কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) তা পারেন নি। তাঁর মাসিক চলার কারণে তিনি যথা অবস্থায় চলতে লাগলেন। হযরত ফাতিমা (রাঃ)ও কুরবানীর পশু না থাকার কারণে ইহরাম বর্জন করেন। হযরত আলীর (রাঃ) কুরবানীর পশু ছিল বলে তিনি ইহরাম খুলেন নি।

হযরত (সঃ) যতদিন মক্কা ও তার আশে পাশে সদলবলে ছিলেন। 'ইয়াওমুত তারবিয়া' অর্থাৎ রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধ এ চারদিন এখানেই কাটিয়েছেন এবং কসর নামায পড়েছেন। তারপর বৃহস্পতিবার চাশত নামাযের ওয়াক্তে তিনি সবাইকে নিয়ে মিনায় গেলেন। যারা ইহরাম ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারা তখন আবার এখান থেকে ইহরাম বেঁধে নিলেন। বরং এটাই বলা চলে যে, মক্কাকে পেছনে রেখে তারা ইহরাম বেঁধেছেন। মিনায় পৌঁছে তিনি জুহর ও আসর নামায পড়লেন এবং সেখানেই রাত কাটালেন। সেটা ছিল জুমআর রাত।

সকালেই তিনি আরাফাতের দিকে রওনা হলেন। তিনি যে পথে চললেন তা বর্তমান পথের ডানদিকে ছিল। তাঁর সাহাবাদের এক দল 'তালবিয়া' ও অপর দল 'তাকবীর' বলছিলেন। তিনি

Contents

কোন দলকেই কিছু বলেন নি। উমরা নামক এক বস্তীর কাছে তাবু ফেলার নির্দেশ দিলেন। বর্তমানে সে বস্তীর চিহ্নমাত্র নেই। তা ছিল আরাফাতের পূর্বভাগে অবস্থিত। সূর্য যখন অস্তোম্মুখ হল, তখন তিনি সেখান থেকে যাত্রা করলেন। তাঁর বাহন এগিয়ে চলল। অবশেষে আরাফাত ময়দানের মধ্যভাগে গিয়ে তিনি অবস্থান নিলেন। এখানে এসে তিনি বাহনে থেকেই এক সুমহান ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। সে ভাষণে তিনি ইসলামের রীতি নীতি গুলোকে সুস্পষ্ট করে দিলেন, শির্ক ও জাহেলিয়াতের বিলুপ্তি ঘোষণা করলেন, সার্বজনীন নিষিদ্ধ কাজ গুলো যথা জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিরোধী সর্ববিধ কার্যকলাপ চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন, জাহেলি যুগের সকল কুসংস্কার বাতিল ঘোষণা করলেন, নারী-পুরুষের পারস্পরিক অধিকার ও মর্যাদা সুস্পষ্ট করে দিয়ে নারীর সাথে সুসম্পর্ক রাখতে ও তাদের যথাযথ প্রাপ্য আদায়ের নির্দেশ দিলেন, সাথে সাথে তাদের অন্যায়-অনাচার থেকে ফিরিয়ে রাখার অধিকার দিলেন পুরুষদেরকে, উম্মতকে তিনি আল্লাহর কিতাব শক্ত করে আকড়ে থাকার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন—যদ্দিন তারা আল্লাহর কিতাব হুবহু অনুসরণ করে চলবে, তদ্দিন তারা পথভ্রষ্ট হবে না।

ভাষণের শেষভাগে তিনি বললেন—তোমাদের কাছে আমার কথা জিজ্ঞেস করা হবে, তখন তোমরা কি জবাব দেবে? সাহাবায়ে কিরাম সমস্বরে বললেন—আমরা সাক্ষ্য দেব যে, আপনি আমাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়েছেন ও আমাদের প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করেছেন। এ জবাব শুনে তিনি তিনবার আকাশের দিকে হাত তুললেন এবং বললেন—হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন।

অতপর তিনি নির্দেশ দিলেন, যারা উপস্থিত রয়েছ তারা অনুপস্থিত লোকদের কাছে আমার কথাগুলো পৌঁছে দিও।

ইবনে হাযম (রঃ) বলেন—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জননী উম্মে ফযল বিন্তে হারছ হিলালী হযরতের (সঃ) সামনে এক পেয়ালা দুধ পেশ করলেন। তিনি সবার সামনে তা পান করলেন। তখনও তিনি উটে বসা ছিলেন। ভাষণ শেষ করে তিনি হযরত বিলাল (রাঃ) কে আজান দিতে বললেন। অতপর নামাযের ইকামত হল।

অবশ্য এই শেষাংশটুকু ইবনে হাযমের কাল্পনিক কথা। কারণ, দুধের ব্যাপারটি তার পরের ঘটনা। এ ঘটনা আরাফাতে অবস্থানকালীন পরবর্তী সময়ের ঘটনা।

সহীহদ্বয়ে সুস্পষ্টভাবে হযরত মায়মুনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আরাফাতে অবস্থান কালে মুসলমানরা রোযার কষ্টের ব্যাপারটি হযরতের (সঃ) কাছে পেশ করল। তখন উম্মে ফযল (রাঃ) এক পেয়ালা দুধ পাঠালেন। হযরত (সঃ) অবস্থান স্থলে দন্ডায়মান ছিলেন। সবাই দেখছিল যে, তিনি দুধ পান করছেন। এক বর্ণনায় আছে, তিনি আরাফাতের ময়দানে

দাঁড়ানো ছিলেন। সেটা খুতবার জায়গা ছিল না। কারণ, তিনি অবস্থান স্থলে খুতবা দেন নি। হযরত (সঃ) নামিরায় অবতরণ করেন এবং আরাফাতের ময়দানে খুতবা দান করেন। খুতবার পর তিনি আরাফাতে অবস্থান গ্রহণ করেন। খুতবা তিনি একবারই দিয়েছেন, দু'বার দেন নি। খুতবা শেষ করে তিনি হযরত বিলালকে আজান দিতে বলেন এবং সালাত কায়েম করেন।

হযরত (সঃ) সেখানে জুহর নামায পড়েন এবং দু'রাকআত পড়েন। নামাযে তিনি নীরবে কিরাআত পড়েন। যেহেতু তা ছিল শুক্রবার, তাই তিনি বললেন—মুসাফিরের জন্য জুমআ জরুরী নয়। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে দু'রাকআত কসর নামায পড়লেন। তার সাথে মক্কাবাসীও ছিলেন। তারাও কসর ও দু'ওয়াক্ত একত্রে পড়লেন। তাদের তিনি পূর্ণ নামায পড়তে বলেন নি। এমনকি তাদের দু'ওয়াক্ত আলাদা করেও পড়তে বলেন নি। যে ব্যক্তি বলে যে, হযরত (সঃ) বলেছেন, 'তোমরা নামায পূর্ণ কর, আমি মুসাফির' সে সুস্পষ্টত ভুল বলেছে। এটা নিকৃষ্ট পর্যায়ের কল্পনা মাত্র। এ কথাটি তো তিনি মক্কা বিজয়ের দিন বলেছিলেন। মক্কাবাসী তখন যার যার ঘরেই অবস্থান করছিল। এ কারণেই উলামায়ে কিরামের এ ফতোয়াই ঠিক যে, মক্কাবাসীও আরাফাতে কসর ও দু'ওয়াক্ত একত্রে পড়বে। নবী করীম (সঃ) এর সাথে তারা এটাই করেছিল।

কসরের সফরের দূরত্বের পরিমাপ ঃ

এখানে এ ব্যাপারটিও সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, কসরের সফরের দূরত্বের কোন নির্ধারিত পরিমাপ নেই। এমন কি কতদিনের সফর তাও নির্ধারিত নয়। কসর নামাযের কারণ আল্লাহ্ পাক একটিই নির্ধারণ করেছেন। তা হচ্ছে সফর। রসূলের (সঃ) সুন্নাতও তাই বলে। মুলহিদরা যেসব মতামত দাঁড় করিয়েছে, এখানে সে সবের কোন ঠাঁই নেই।

হযরত (সঃ) যখন নামায থেকে অবসর হলেন, তখন বাহনে উঠে মাওকাফে গেলেন। তিনি পাহাড়ের পাদদেশে পাথুরে জায়গায় অবস্থান নেন। সেখানে কিবলামুখী হয়ে বাহনে অবস্থান নিলেন। মাশাত পাহাড় তাঁর সামনে ছিল। তারপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত দোআ করতে থাকেন। দোআর সময়ে তিনি সবিনয়ে কান্নাকাটি করেন। সবাইকে তিনি আরাফাতের মধ্যস্থল থেকে উঠে যেতে বললেন এবং বললেন, আরাফাতে অবস্থানের জন্য এটাই নির্দিষ্ট স্থান নয়। সমগ্র আরাফাত এলাকাই অবস্থানের স্থান। সবাইকে বললেন, তারা যেন নিজ নিজ মাশআরে অবস্থান করেন। কারণ, এটা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এর উত্তরাধিকার।

এখানেই নজদের কিছু লোক হযরতের (সঃ) সাথে দেখা করেন। তারা তাঁর কাছে হজ্জ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আরাফাতের দিনটিই হজ্জের দিন। তাই যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের আগে এখানে পেঁছিল, সে হজ্জ পেয়ে গেল। তিন দিন 'আইয়ামে তাশরীক'। তবে তা যদি কেউ দু'দিন আগ-পিছ করে তাতে কোন পাপ নেই।

দোআর সময়ে হযরত (সঃ) সীনা পর্যন্ত হাত উঠাতেন। প্রার্থনার হাত বাড়াবার সময় তিনি বললেন—ইয়াওমে আরাফার দোআ সব দোআ থেকে উত্তম। 'ওকূফ' এ তিনি যে সব দোআ পড়তেন তার একটি হল এই ঃ

اللهم لك الحمد كالذى نقول وخيرا مما نقول . اللهم لك صلواتى ونسكى ومحياى ومماتى واليك مآبى ولك ربى تراثى اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الامر اللهم انى اعوذ بك من شر ما يجئ به الريح (ترمذى)

"আয় আল্লাহ! আমাদের বাকশক্তি যত উত্তম প্রশংসার ক্ষমতা রাখে তা সব কিছুই তোমার জন্য। আয় আল্লাহ! আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ, আমার সবই তোমার জন্য। তোমার কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন। হে আমার প্রতিপালক! তুমিই আমার উত্তরাধিকার। হে আল্লাহ! আমি কবর আজাব থেকে, মনের কুপ্রবণতা থেকে এবং বিক্ষিপ্ত কার্যাবলী থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! বায়ু মন্ডলীর সর্ববিধ আপদ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।"

হযরত (সঃ) থেকে এ দোআও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اللهم انك تسمع كلامى وترى مكانى وتعلم سرى وعلانيتى ولا يخفى عليك شئ من امرى انا البائس الفقير المستغيث المستجير والوجل المشفق المقر المعترف بذنوبى اسألك مسئلة المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم انفه لك اللهم لا تجعلنى بدعائك رب شقيا وكن بى رؤفا رحيما يا خير المسئولين ويا خير المعطين (طبرانى)

"আয় আল্লাহ! তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ এবং আমার জায়গাও দেখতে পাচ্ছ। আমার গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তুমি জান। তোমার কাছে আমার কোন কিছুই গোপন নেই। আমি নিঃস্ব, ভিখারী, ফরিয়াদী, ও আশ্রয়প্রার্থী। আমি সন্ত্রস্ত ও পযুদস্ত এবং নিজ অপরাধের স্বীকৃতিদাতা ও ঘোষণাকারী। আমি তোমার কাছে মিসকীনের মত হাত পেতেছি। আমি এক লাঞ্ছিত পাপীর মত তোমার কাছে সকাতরে কাকুতি মিনতি করছি। আর আমি আপাদমস্তক যন্ত্রণাকাতর সেই সন্ত্রস্তের সকরুণ কন্ঠে তোমাকে ডাকছি, যার গর্দান তোমার কাছে আনত, যার চোখ তোমার জন্য অশ্রু সজল এবং যার দেহ অবসন্ন হয়ে গেছে ও যার নাক তোমার জন্য ধূলি ধূসরিত হয়েছে। হে আল্লাহ! হে আমার প্রতিপালক! আমাকে

দোআর ক্ষেত্রে হতভাগ্য করো না। হে সর্বোত্তম প্রার্থনাস্থল! হে শ্রেষ্ঠতম দাতা! আমার জন্য দয়ালু ও মেহেরবান হয়ে যাও।”

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আমর ইবনে শুআয়েবের এক হাদীছ উধবৃত করেন। তিনি তার পিতা থেকে ও তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আরাফার দিনে নবী করীম (সঃ) বেশীর ভাগ এ দোআ পড়তেন :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ○

“আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই। তিনি একক ও অংশীহীন। সমগ্র রাজ্য তাঁর আর সকল প্রশংসাও তাঁর। তাঁর হাতেই সকল কল্যাণ এবং তিনি সব কিছুর ওপরে ক্ষমতাবান।”

ইমাম বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সঃ) বলেন—আরাফাতের দিন আমার ও অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামের দোআ হল এই :

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير- اللهم اجعل في قلبي نورا وفي صدري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر- اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في الليل وشر ما يلج في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر-

“আল্লাহ ছাড়া কেউ প্রভু নেই। তিনি এক ও অংশীহীন। সমগ্র রাজ্য তাঁর। সব প্রশংসাও তাঁর। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমার অন্তর আলোকময় কর। আমার বক্ষপটে নূর সৃষ্টি কর। আমার কানে ও চোখে নূরের রোশনী দান কর। হে আল্লাহ! আমার হৃদয় প্রসারিত কর। আমার কাজ সহজ কর। আমার মনের ধোকা ও দুশ্চিন্তা থেকে এবং কবর আজাব থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই। আর আল্লাহ! রাতে আক্রমণকারী ও দিনে আক্রমণকারী সকল ক্ষতিকর বস্তু থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই। হে আল্লাহ! বায়ুমন্ডল সৃষ্ট ও যুগের হাওয়া সৃষ্ট সকল অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।”

এ সব দোআর সনদ অবশ্য দুর্বল।

এখানেই এ সময় নিম্ন আয়াত অবতীর্ণ হয় :

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ لَكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا-

"আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম। আর তোমাদের ওপর আমার নিআমত পূর্ণ করে দিলাম। আর তোমাদের জন্য একমাত্র ইসলামকেই সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মনোনীত করলাম।"

এখানেই এক ব্যক্তি তার বাহন থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায়। তখন সে ইহরামের অবস্থায় ছিল। নবী করীম (সঃ) তাকে তার ইহরামের কাপড় দিয়েই কাফন দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং তাতে সুগন্ধী লাগাতে নিষেধ করলেন। তাকে বরই পাতা ভেজানো পানি দিয়ে গোসল করাতে বলেছেন। তার পা ও মাথা ঢাকতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন—আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন এ অবস্থায়ই তাকে উঠাবেন এবং সে তখন 'তালবিয়াহ' পড়তে থাকবে।

এ ঘটনা থেকে বারটি মাসআলা সৃষ্টি হয়েছে।

১। নবী করীম (সঃ) এর সুস্পষ্ট নির্দেশক্রমে মৃতের জন্য গোসল ওয়াজিব হল।

২। মানুষ মারা গেলে অপবিত্র হয়ে যায় না। যদি মারা গেলে নাপাক হত, তা হলে গোসলের কারণে নাপাকীর সংযোজন হত। কারণ, প্রাণীর অপবিত্রতা মৌলিক নাপাকী হয়ে থাকে। তা গোসলে দূর হয় না। সুতরাং যারা মৃতকে অপবিত্র বলে, তাদের গোসল দ্বারা পবিত্র করার যুক্তি বাতিল হয়ে যায়। যদি বলা হয়, গোসলে পবিত্র হবেনা, তা হলে গোসলের ফলে মৃতের কাফন, এমন কি গোসলদাতাও অপবিত্র হয়ে যাবে।

৩। মৃতের গোসলের জন্য শরীআত সম্মত ব্যবস্থা হল বরই পাতা ভেজানো পানি—শুধু পানি নয়। নবী করীম (সঃ) তিনটি ক্ষেত্রেই বরই পাতা ভেজানো পানি দিয়ে মৃতের গোসল সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। এক তো এখানে। দ্বিতীয়বার সাহেবযাদার গোসলের ক্ষেত্রে। তৃতীয়বার মাসিক অবস্থায় মৃতা এক নারীর ক্ষেত্রে। বরই পাতা দিয়ে গোসলের ব্যাপারে ইমাম আহমদের দু'টো বক্তব্য রয়েছে।

৪। পানি সিদ্ধ করলে পানির পবিত্রতা নষ্ট হয় না। অধিকাংশের মাজহাব এটাই। আহমদ (রঃ) এর উভয় বক্তব্য থেকে এটাই বেশী প্রতিভাত হয়। যদিও তাঁর উত্তরসূরীরা তাঁর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন।

৫। মুহরিমের জন্য গোসল বৈধ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও মাসুর ইবনে মাহযামা (রাঃ) এর ভেতর এ নিয়ে বহাছও হয়েছে। তখন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) এ মীমাংসা প্রদান করেন যে, নবী করীম (সঃ) মুহরিমকে গোসল দিয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, ফরয গোসলের অবস্থায় হলে তিনি গোসলের নির্দেশ দিতেন। ইমাম মালিক (রঃ) এটা না পসন্দ করেছেন যে, তার মাথা পানিতে ডুবিয়ে নিতে হবে। কারণ, এটাও এক ধরণের কুসংস্কার। কিন্তু, বিশুদ্ধ মত এটাই যে, তাতে কোন দোষ নেই। কারণ, হযরত উমর (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) সেরূপ করেছেন।

৬। মুহরিমকে বরই পাতা ভেজানো পানি দিয়ে গোসল করানো নিষিদ্ধ নয়। এ ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদের (রঃ)এক অভিমত অনুসারে তা মুবাহ। ইমাম মালিক ও আবু হানীফা (রঃ) তা নিষিদ্ধ বলেছেন। ইমাম আহমদের অপর অভিমত অনুসারে তা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। তাঁর ছেলে সালেহ এ মতটি উধৃত করেন। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূল সেভাবে মৃতের ময়লা-গন্ধ দূর করতে চেয়েছেন। তা ছাড়া সব ধরনের বরই পাতা সুগন্ধীও নয়।

৭। মীরাছ ও ঋণ উভয়ের ওপরে কাফনের প্রাধান্য হবে। কারণ, রসূল (সঃ) মুহরিমের কাফনের নির্দেশ দানের আগে কর্য ও মীরাছের প্রশ্ন তুলেন নি। যদি এর বিপরীত ব্যাপার হত তো রসূল (সঃ) তা অবশ্যই বলতেন। জীবদ্দশায়ও যেভাবে কার্যের ওপরে আবরু ঢাকার পোষাকটুকু প্রাধান্য পায়, মরণেও তেমনি কর্য ও মীরাছের ওপরে কাফনের প্রাধান্য থাকবে। অধিকাংশের মত তাই।

৮। মৃতের জন্য দু'কাপড়ের কাফনই যথেষ্ট। তা হবে তহবন্দ ও চাদর। অধিকাংশের মত এটাই। কাজী আবু ইয়ালী বলেন—সাধ্য থাকতে তিন কাপড়ের কম করা বৈধ নয়। যদি দু'কাপড়েই যথেষ্ট হত তা হলে যারা ইয়াতীম রেখে যায়, তাদের জন্য তিন কাপড়ের কাফন অবৈধ হত। কিন্তু বিশুদ্ধ হাদীছ তার বিপরীত বলে।

৯। মুহরিম খোশবু ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ, নবী করীম (সঃ) সেই মৃত মুহরিমকে খোশবু লাগাতে নিষেধ করেছেন এবং সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাকে তালবিয়া পড়ার অবস্থায় কিয়ামতে উঠানো হবে। মুহরিম যে খোশবু লাগাবেনা, তার ভিত্তিই হল এ হাদীছ। এখন থাকে ঘ্রাণ নেয়ার প্রশ্নটি। সেটাকে যারা হারাম বলে তারা নেহাৎ অনুমানের ভিত্তিতে বলে। কারণ, নিষেধের আওতায় ঘ্রাণ আসে না। এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে এবং তা মেনে চলা জরুরী। হাঁ, মূল বস্তুর হারাম হওয়ার ফলে আনুসঙ্গিক উপকরণ হারাম হওয়া না হওয়া নিয়ে কথা হতে পারে। কারণ, খোশবুর ঘ্রাণ নিতে গেলেই তা শরীরে ও কাপড়ে লাগাবার প্রবণতা দেখা দেয়। যেমন অচেনা নারীর দিকে তাকানো হারাম। কারণ, তার ফলে হয়ত কোন হারাম কাজের প্রবণতা জাগতে পারে। কিন্তু, যে ঘ্রাণ কোন ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছাড়াই এসে নাকে পেঁাছে যায় কিংবা ইচ্ছা করেই ঘ্রাণ নেয় যেন কেনার সময়ে ভাল খোশবু কিনতে পারে, তা হলে তা নিষিদ্ধ নয়। মুহরিমের জন্য নাক বন্ধ করে চলা ওয়াজিব নয়। পয়লা অবস্থাটা যেন হঠাৎ কোন আজনবী নারীর দিকে নজর পরে যাওয়া। দ্বিতীয় অবস্থাটি যেন তার পরিচিতির জন্য এক নজর দেখা যা অবৈধ নয়। খোশবুর ঘ্রাণ নেয়াকে যারা মুবাহ বলেন, তারা মুহরিমকেও ইহরামের আগে ভালভাবে টেকসই খোশবু লাগিয়ে নিতে বলেন।

আবু হানীফা (রঃ) এর অনুসারীরা এ মতের ওপরেই জোর দেন। আবু ইউসুফের 'জামিউল ফিকহি' গ্রন্থে তিনি বলেন—এতে কোন দোষ নেই যদি মুহরিম তার ইহরাম বাঁধার আগে লাগানো খোশবু থেকে ঘ্রাণ নেয়। 'আল মুফীদ' প্রণেতা বলেন—ইহরামের আগের লাগানো খোশবু যদি ইহরামের সময়ে ঘ্রাণ দিয়ে মুহরিমের কষ্ট কিছুটা লাঘব করে, তা হলে সেটা হবে যেন রোযার প্রাক্কালে সেহরী খেয়ে নিয়ে সারা দিনের ক্ষুৎপিপাসার কিছুটা লাঘব ঘটানো। অবশ্য কাপড়ে খোশবুর প্রশ্নটি এর বাইরে। ফকীহদের ভেতরে এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে যে, ঠিক খোশবু লাগানোর মতই খোশবুর ঘ্রাণকে তাতে স্থায়িত্ব দানও কি নিষিদ্ধ, না তা বৈধ ?

এ ব্যাপারে দু'টো মত রয়েছে। অধিকাংশ আলিম হযরতের (সঃ) অনুসৃত পদ্ধতি অনুসারে তা বৈধ মনে করেন। যেমন সহীহ হাদীছে আছে, 'নবী করীম (সঃ) ইহরামের আগে খোশবু লাগাতেন। তারপরও তাঁর দাড়ী মুবারক ও মাথায় খোশবুর ঘ্রাণ থাকত।' এক ভাষ্যে আছে যে, তাঁকে তালবিয়া পড়া এবস্থায়ই সেরূপ দেখা গেছে। এ হাদীছ সেই ভুল ব্যাখ্যার অবসান ঘটায় যাতে বলা হয়েছে যে, 'এ ঘটনা ছিল ইহরামের আগের এবং তার গোসলের সাথে সাথে খোশবুর ঘ্রাণ দূর হয়ে যায়।' একটি ভাষ্য তো এরূপ যে, 'নবী করীম (সঃ) যখন ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করতেন, তখন সম্ভাব্য সব চাইতে ভাল খোশবু লাগিয়ে নিতেন। কেউ কেউ বলেন—'এ ব্যাপারটি হযরতের (সঃ) জন্য নির্দিষ্ট ছিল, অন্যের জন্য নয়।' কিন্তু নির্দিষ্ট হবার ব্যাপারে দলীল থাকা চাই তো ? তা ছাড়া আবু দাউদে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনা রয়েছে। তাতে তিনি বলেন—'আমরা ইহরামের অবস্থায় মিশক লাগাতাম।'

১০। মুহরিম মাথা ঢাকতে পারবে না। এর তিনটি অবস্থা। একটি অবস্থা সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় অবস্থা সর্বসম্মতভাবে বৈধ। তৃতীয় অবস্থায় মতভেদ রয়েছে।

প্রথম অবস্থা হল মাথায় জড়িয়ে থাকা বস্তু। যেমন পাগড়ী, কাবা ইত্যাদি। দ্বিতীয় অবস্থা হল মাথার ওপর থাকা বস্তু। যেমন তাবু, ঘর, গাছ ইত্যাদি। নবী করীম (সঃ) থেকে প্রমাণিত আছে যে, নামিরায় তিনি মুহরিম থাকা অবস্থায় তাঁর জন্য তাবু টানানো হয়েছে। অবশ্য মালিক (রঃ) মুহরিমের জন্য গাছে কাপড় টানিয়ে ছায়ায় মাথা গোঁজা অবৈধ বলেছেন। কিন্তু অধিকাংশ ইমাম ভিন্নমত পোষণ করেন। ইমাম মালিকের সহচররা মুহরিমের জন্য বাহনের ছায়ায় মাথা গুঁজে চলাও নিষিদ্ধ বলেছেন। তৃতীয় অবস্থা হল বাহন কিংবা হাওদাজের আশ্রয়ে মাথা গোঁজা। এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে। শাফেঈ (রঃ) ও আবু হানীফা (রঃ) বৈধ বলেছেন। দ্বিতীয় মত অনুসারে তা নিষিদ্ধ। কেউ যদি তা করে তা হলে ফেদিয়া দিতে হবে। এটি হল ইমাম মালিকের (রঃ) মাজহাব। তৃতীয় মত হল এই, যদি কেউ তা করে তা হলে ফেদিয়া দিতে হবে না। এ তিনটি বর্ণনাই ইমাম আহমদ (রঃ) থেকে পাওয়া গেছে।

১১। মুহরিমের মুখ ঢাকা নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারেও মতভেদ দেখা দিয়েছে। শাফেঈ (রঃ) তা মুবাহ বলেন। ইমাম আহমদের (রঃ) এক বর্ণনায়ও সেটাকে মুবাহ বলা হয়েছে। ইমাম মালিক ও ইমাম আবু হানীফা (রঃ) তা নিষিদ্ধ বলেছেন। ইমাম আহমদের অপর বর্ণনায় মুখ ঢাকা নিষিদ্ধ বলা হয়েছে। যে ছ'জন সাহাবা সে কাজকে মুবাহ বলেছেন তারা হলেন, হযরত উছমান (রাঃ), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ), যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ), যুবায়ের (রাঃ), মুহাম্মদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) ও জাবির (রাঃ)।

১২। মৃত্যুর পরেও ইহরামের অবস্থায় মুহরিমকে বহাল রাখতে হবে। কারণ, মৃত্যু ইহরামের অবসান ঘটায় না। এটা হযরত উছমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর মাজহাব। ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম ইসহাক (রঃ) এ মাজহাবেরই সমর্থক। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আওযাঈ (রঃ) বলেন—মৃত্যুর সাথে সাথে ইহরামের অবসান ঘটে। তাই ইহরাম মুক্ত মৃতের সৎকার যেভাবে হবে, তার সৎকারও সেভাবে হবে। কারণ, নবী করীম (সঃ) বলেছেন—তোমাদের কারো যখন মৃত্যু ঘটে, তখন তিনটি ব্যাপার ছাড়া তার সব কিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁরা এও বলেন—আরাফাতের মৃত মুহরিমের ঘটনাটি প্রমাণ করেনা যে, মৃতের সাথে ইহরামের সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি। কারণ, সে ব্যাপারটি ছিল হযরত (সঃ) এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ ঘটনা। এটা ঠিক সম্রাট নাজ্জাশীর গায়েবানা জানাযার মত। তাও ছিল হযরত (সঃ) এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ ঘটনা।

অধিকাংশ আলিম বলেন—বিশিষ্টকরণ ব্যাপারটি মূল মাসআলার পরিপন্থী বিধায় তা গ্রহণযোগ্য হবে না। উক্ত হাদীছে রসূল (সঃ) এর বক্তব্য 'তাকে তালবিয়া পড়ার অবস্থায় উঠানো হবে' মূলত ইহরাম বহাল রাখার কারণের প্রতি ইংগিত দান করছে। যদি এটা তাঁর বিশেষ ব্যাপার হত তা হলে তিনি তার কারণ বলতে যেতেন না।

যদি বলা হয়, এরূপ দুর্বল ও অসম্পূর্ণ কারণ কোন দলীল হতে পারেনা, তা হলে বলা যায় যে, উহুদের শহীদদের ব্যাপারে এরূপ নজীর রয়েছে। সেখানেও হযরত (সঃ) বলেন—তাদের যখম নিসৃত রক্তাক্ত কাপড়ে যথা অবস্থায় কাফন দাও। কারণ, কিয়ামতে তাদের খুন রাংগা অবস্থায় মিশকের ঘ্রাণযুক্ত করে উঠানো হবে। সে ব্যাপারটি যেরূপ হযরত (সঃ) এর বিশেষ ব্যাপার ছিল না, এটাও তেমনি তাঁর বিশেষ ব্যাপার নয়।

ঠিক একই ভাবে এখানেও হযরত (সঃ) মুহরিমকে দু'কাপড়ে যথা অবস্থায় কাফন দিতে বলেছেন। আরও বলেছেন, 'কারণ, তাকে কিয়ামতে তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে।' তোমরা তো কেউ এ কথা বলছনা যে, সেই শহীদদের ব্যাপারটি উহুদের শহীদদের বিশেষ ব্যাপার। বরং সেটাকে তোমরা সব শহীদের বেলায় প্রযোজ্য বলছ। অথচ সেখানেও কারণটি ছিল সম্ভাবনা ভিত্তিক কারণ।

Contents

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হযরতের (সঃ) বিদায় হজ্জ

যখন সূর্যাস্ত গেল ও হলুদ রংও বিলুপ্ত হল এবং সূর্যাস্তের ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকল না, তখন তিনি আরাফাত থেকে যাত্রা করলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদকে তিনি বাহনের পেছনে বসিয়ে নিলেন। তিনি চুপচাপ চলছিলেন। উটের লাগাম এমনভাবে টেনে নিয়েছিলেন যে, তার মুখ চুটের কাছাকাছি এসে গেল। তিনি তখন বলছিলেন—'হে জনতা! আস্তে চল। কারণ, ক্ষিপ্রতায় পুণ্য নেই।'

তিনি আযেমীনের পথ ধরে চলছিলেন। আরাফাতে প্রবেশকালে তিনি যুবের পথ দিয়ে ঢুকেছিলেন। ঈদের নামাযের ব্যাপারেও হযরতের (সঃ) রীতি এটাই ছিল যে, তিনি এক পথ দিয়ে যেতেন ও অন্য পথ দিয়ে আসতেন। তার রহস্যগুলো হযরতের (সঃ) ঈদের নামায পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে।

তাঁর চলা তখন না ক্ষিপ্র ছিল, না খুব ধীর। যখন প্রশস্ত ময়দান দেখতেন, তখন কিছুটা দ্রুত চলতেন এবং যখন কোন টিলার কাছে পেঁছতেন, তখন উটের লাগাম শিথিল করতেন যেন উট সহজে টিলায় চড়তে পারে। সমগ্র পথে তিনি 'তালবিয়া' পড়ছিলেন।

পথে একবার নেমে তিনি পেশাব করে সংক্ষেপে ওযু করে নেন। হযরত উসামা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন—হে আল্লাহর রসূল! এখন কি নামায? রসূল (সঃ) জবাবে বললেন—নামায সামনে এগিয়ে পড়ব। তারপর তিনি আবার চলতে লাগলেন। এমনকি মুযদালিফায় পেঁছে গেলেন এবং নামাযের জন্য আবার ওযু করলেন। তারপর তিনি আজানের নির্দেশ দিলেন। অবশেষে ইকামতের সাথে নামায শুরু করলেন। তখনও উটের সামান নামানো হয়নি এবং উটগুলোও যথাস্থানে বসানো হয় নি। সবাই তাড়াতাড়ি সামান নামিয়ে নামাযে শরীক হলেন। এক নামায পড়ে তিনি আজান ছাড়াই শুধু ইকামত দ্বারা দ্বিতীয় নামায পড়লেন। দু'নামাযের মাঝে অন্য কোন নামায পড়েন নি।

এও বর্ণিত আছে যে, তিনি দু'নামায দু'আজান ও দু'ইকামতে পড়েছেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি আজান ছাড়াই দু'ইকামতে দু'নামায পড়েছেন। অবশ্য বিশুদ্ধ মত এটাই যে, তিনি এক আজান ও দু'ইকামতে দু'নামায পড়েছেন। আরাফাতের মাঠেও তিনি তাই করেছেন।

তারপর তিনি ফজর পর্যন্ত নিদ্রা গেলেন। সে রাত তিনি জেগে কাটান নি। ঈদের রাতগুলোয়ও তিনি জেগে কাটিয়েছেন বলে কোন বিশুদ্ধ বর্ণনায় দেখা যায় না।

তিনি তাঁর বিবিদের দুর্বলতার কারণে অনুমতি দিলেন ফজরের আগেই মিনার দিকে এগোবার জন্যে। তখন সবেমাত্র চাঁদ অস্ত গিয়েছিল। তাঁদের এও নির্দেশ দিলেন, সূর্যোদয়ের আগে যেন তারা কংকর না মারে।—সহীহ তিরমিজী।

খুল্লাল বলেন—আমাকে আলী ইবনে হারব, তাকে হারুণ ইবনে ইম্রান, তাকে সুলায়মান ইবনে আবু দাউদ ও তাকে হিশাম ইবনে উরুয়া তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন—মুযদালিফার রাতে নবী করীম (সঃ) তাঁর পরিবারবর্গের যাদের আগে পাঠালেন, তাদের ভেতর আমিই প্রথম ছিলাম। আমি রাতে এসেই কংকর মেরেছি। তারপর মক্কা চলে গেছি। মক্কায় আমি ফজর পড়ে আবার মিনায় ফিরে এসেছি।

আমি (ইবনে কাইয়েম) বলছি, উক্ত হাদীছের অন্যতম রাবী সুলায়মান ইবনে দাউদ মূলত দামেশকী খাওলানী। কেহ কেহ বলেন—সে ইবনে দাউদ। আবু যার'আ আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেন—সে এক জযীরাবাসী ছিল। এ ছাড়া তার আর কোন পরিচয় নেই। উছমান ইবনে সাঈদ তাকে 'যঈফ' বলেছেন। আমি বলছি, সহীহদ্বয়ে উধৃত কাসিম ইবনে মুহাম্মদের বর্ণনাও উক্ত বর্ণনাটিকে বাতিল করে দিয়েছে। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সওদা (রাঃ) হযরতের (সঃ) কাছে মুযদালিফার রাতে আরয করলেন তাঁকে যেন মানুষের ভীড়ের আগেই মিনায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। কারণ, তিনি খুব দুর্বল ছিলেন। হযরত (সঃ) তাঁকে অনুমতি দেয়ায় তিনি চলে গেলেন এবং আমরা থেকে গেলাম। আমরা সেখানে ফজর পর্যন্ত ছিলাম এবং সকালে হযরতের (সঃ) সাথে যাত্রা করলাম। কিন্তু আমার মন চাচ্ছিল আমিও সওদার মত অনুমতি নিয়ে আগে যাই। তা হলে বেশ আরামে যেতে পারতাম।

হাদীছ থেকে জানা যায় যে, হযরত সাওদা (রাঃ) ছাড়া অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীনরাও হযরতের (সঃ) সাথে ছিলেন। এখন যদি বলা হয় যে, দারে কুতনী (রঃ) প্রমুখ হযরত আয়েশা (রাঃ) এর যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার জবাব কি হবে? তাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (সঃ) তাঁর পবিত্র বিবিগণকে ইজতিমার রাতে একত্রে বেরিয়ে কংকর মারার নির্দেশ দিয়েছেন। তা করে তারা সকালে আস্তানায় ফিরে আসতেন।' হযরত আয়েশা (রাঃ) আমরণ এ নিয়ম পালন করে গেছেন।

জবাবে বলব, উক্ত হাদীছের অন্যতম রাবী মুহাম্মদ ইবনে হামীদকে একাধিক ইমাম মিথ্যাবাদী বলে তার বর্ণিত হাদীছ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তা ছাড়া সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হাদীছও তা বাতিল করছে। তাতে তো হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেছেন—'আমার ইচ্ছে ছিল সওদার মত আমিও যদি আগে অনুমতি নিয়ে যেতাম।'

যদি বলা হয়, এ জবাব তো হল। কিন্তু, সহীহ মুসলিমে হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) এর বর্ণনার কি জবাব হবে? তাতে তিনি বলেছেন যে, 'নবী করীম (সঃ) তাদের এক এক দলের

সাথে পাঠিয়েছেন।' তা ছাড়া সহীহদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) সে রাতে তাঁর পরিবারবর্গের দুর্বল লোকদের আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের ভেতর ইবনে আব্বাসও (রাঃ) ছিলেন। পরন্তু এও প্রমাণিত আছে যে, হযরত সওদা (রাঃ) কে আগে পাঠিয়েছেন। এও প্রমাণিত আছে যে, তিনি অন্যান্য স্ত্রীদের যেতে দেন নি এবং তাঁর সাথেই তারা গেছেন। যদি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ) এর হাদীছ সঠিক হয়, তা হলে তিনিও দুর্বল পরিবার পরিজনদের অন্যতম ছিলেন।

যদি প্রশ্ন তোলা হয় যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে হাদীছ ইমাম আহমদ (রঃ) উধৃত করেছেন তার জবাব কি হবে? তাতে তিনি বলেছেন—'নবী করীম (সঃ) কুরবানীর দিন তাঁর পরিবারের লোকের সাথে তাকেও মিনায় পাঠিয়েছেন এবং তিনি ফজরের সাথে সাথে কংকর মেরেছেন।' তার জবাব এই যে, আমরা তার অপর বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেব। ইমাম আহমদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিজী (রঃ) তা উধৃত করেন। সহীহ হাদীছে বলা হয়েছে, নবী করীম (সঃ) তাঁর পরিবারের দুর্বল সদস্যদের আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, সূর্য না ওঠা পর্যন্ত কংকর মারবে না। তাদের আগেই কংকর মারার কোন অজুহাত ছিল না। এখন কথা হল যে, আগেই নারীদের তিনি পাঠাবার পর তারা ভীড়ের ভয়ে সূর্যোদয়ের আগেই কংকর মেরে নিয়েছেন।

কয়েকটি মাসআলা:

উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রুগ্ন কিংবা বৃদ্ধ হলে কিংবা অনুরূপ কোন ওজর থাকলে সূর্যোদয়ের আগেও কংকর মারা বৈধ। তাও যদি মানুষের ভীড়ের ভয় থাকে। তবে সবল সুস্থদের জন্য বৈধ নয়। এ প্রশ্নে তিনটি মাজহাব সৃষ্টি হয়েছে। এক, অর্ধ রাতের পর কংকর মারা দুর্বল, সবল সবার জন্য সাধারণ ভাবেই বৈধ। এ মাজহাব হল ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদের (রঃ)। দুই, শুধুমাত্র সূর্যোদয়ের পরেই কংকর মারা বৈধ। এ মাজহাব ইমাম আবু হানীফার (রঃ)। তিন, সবলদের জন্য কেবল সূর্যোদয়ের পরে বৈধ। এটা একদল আলিমের মত। হাদীছের ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, চাঁদ ডোবার পরেই আগে যাবার পদক্ষেপ নিতে পারে। অর্ধ রাতের শর্ত লাগানোর কোন দলীল নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

কুরবানী ও আকবরী হজ্জ:

কুরবানীর দিন যখন ফজরের ওয়াক্ত হল, ওয়াক্তের আগে নয়, বরং শুরুতেই তিনি আজান ও ইকামাতের সাথে নামায পড়লেন। এটাই ছিল একাধারে কুরবানী ও আকবরী হজ্জের দিন। এ দিনেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাঁদের অসন্তোষের কথা সুস্পষ্ট-ভাবে ঘোষণা করেন।

তারপর তিনি বাহনে চড়লেন। এমন কি তিনি 'মাশআরে হারাম' এর কাছে নিজ অবস্থানে পেঁছলেন। এখানে পেঁছে তিনি কিবলামুখী হলেন এবং তাকবীর, তাহলীল, দোআ ও কান্না কাটায় মশগুল হলেন। এমন কি দিন বেশ উজ্জ্বল হয়ে গেল। এ ঘটনাটি সুর্যোদয়ের সময়ের ব্যাপার। এখানে আরুক ইবনে মাযরাস তাঈ আরয করলেন—হে আল্লাহর রসুল! আমি তয় পাহাড়ের পাদদেশ থেকে এসেছি এবং আমার বাহন আমিই চালিয়েছি। ফলে নিজে খুব পরিশ্রান্ত হয়েছি। আল্লাহর কসম! আমি প্রত্যেকটি পাহাড়ে অবস্থান নিয়েছি। আমার কি হজ্ব হয়েছে? রসুল (সঃ) বললেন—যে ব্যক্তি আমাদের এ নামাযে উপস্থিত হয়েছে এবং আমাদের সাথে আমাদের বিদায় হওয়া পর্যন্ত অবস্থান নিয়েছে, তার হজ্ব পুর্ণ হয়েছে (অথচ তিনি আরাফাতের অবস্থান পুর্বেই সম্পন্ন করে এসেছেন)। ইমাম তিরমিজী এ হাদীছটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

এ হাদীছ থেকে কিছু লোক দলীল নিয়েছেন যে. আরাফার মত মুযদালিফায় অবস্থান নেয়াও হজের অন্যতম রুকন। এটা হল দু'সাহাবার মাজহাব। তারা হলেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাঃ)। আর তা অনুসরণ করেছেন ইব্রাহীম নাখঈ, শা'বী, আলকামা, হাসান বসরী, আওযাঈ, হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান, দাউদ জাহেরী, আবু উবায়দুল কাসিম ইবনে সালাম (রঃ)। তেমনি মুহাম্মদ ইবনে জারীর ও ইবনে খুযায়মা (রঃ)ও এ মাজহাবের অনুসারী। ইমাম শাফেঈর তিনমতের একটিও অনুরূপ।

হযরত (সঃ) মুযদালিফার নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নেন এবং সবাইকে জানিয়ে দেন যে, সমগ্র মুযদালিফা এলাকাই অবস্থান স্থল। অতপর তিনি মুযদালিফা থেকে ফযল ইবনে আব্বাসকে নিজের পেছনে বসিয়ে রওনা হলেন। সমগ্র পথে তিনি 'তালবিয়া' পড়ছিলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) অন্যান্য কুরায়েশদের কাফেলার সাথে পদব্রজে চলছিলেন। এ পথেই হযরত (সঃ) ইবনে আব্বাস (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন তাঁর জন্যে সাতটি কংকর তুলে নিতে। সেগুলো সে রাতে পাহাড় থেকে খুঁড়ে খুঁড়ে জোগার করা হয় নি। অজ্ঞ লোকেরাই কেবল এরূপ ধারণা করে থাকে। তিনি তা রাতেও সংগ্রহ করেন নি। বরং ইবনে আব্বাস (রাঃ) পথিমধ্যে পাথরের স্তুপ থেকে সাতটি কংকর তুলে নিয়েছেন। হযরত (সঃ) সেগুলো হাতে নিয়ে নাড়া চাড়া করছিলেন এবং দেখাচ্ছিলেন যে, এ ভাবে কংকর মারবে। তখনই তিনি বললেন—ধর্মের কাজে বাড়াবাড়ি করোনা। কারণ, তোমাদের আগে যারা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।

সে পথেই বণু খাসআমের এক সুন্দরী তরুণী হযরতের (সঃ) কাছে হাজির হল। সে তার বাপের তরফ থেকে হজ্ব করা সম্পর্কে জানতে চাইল। তার বাপ বৃদ্ধ ছিল এবং বাহনে তার চড়ার মত শক্তি ছিল না। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন তার বাবার পক্ষ থেকে হজ্ব করার জন্য। ফযল ইবনে আব্বাস সেই তরুণীটিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন এবং তরুণীটিও ফযল ইবনে

আব্বাসকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। তখন হযরত (সঃ) তাঁর হাত মুবারক ফযল ইবনে আব্বাসের মুখমন্ডলে রাখলেন এবং তার মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন।

তা ছাড়া এ পথেই অপর এক ব্যক্তি তার মায়ের ব্যাপারে আরয করল যে, সে অতি বৃদ্ধা ও বাহনে চড়তে অক্ষম এবং বাহনের সাথে বেঁধে নিতে গেলে সে আত্মহত্যা করবে। হযরত (সঃ) বললেন—তোমার মায়ের যদি ঋণ থাকত তা হলে তুমি তা আদায় করতে? সে জবাব দিল—হাঁ, তা আদায় করতাম। হযরত (সঃ) বললেন—তা হলে তোমার তরফ থেকে হজ্ব আদায় কর।

হযরত (সঃ) যখন 'ওয়াদীয়ে মুহাসসারে' এলেন তখন উটের গতি ক্ষিপ্র করে দিলেন। যেখানে আল্লাহর দুশমনের ওপর গযব নাযিল হয়েছে, সেখানে তাঁর রীতি ছিল ক্ষিপ্রতার সাথে চলা। এখানে 'আসহাবে ফীল' এর ওপর গযব নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে সূরা ফীলে তা বর্ণনা করেছেন। ওয়াদীয়ে মুহাসারকে এ জন্য 'অবরুদ্ধ ময়দান' বলা হয় যে, সেখানে গজারোহী বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে ধ্বংস করা হয়েছিল। আর তা হল মিনা ও মুযদালিফার মধ্যস্থলে অবস্থিত সীমা রেখায়। তা আরাফাত ও হারামের মধ্যবর্তী সীমা-রেখা নয়। হারামের আওতাধীন দু'টো মাশআরের মাঝে একটি 'হদ' রয়েছে। সেটা কোন মাশআরেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। মিনা হারামের অন্তর্ভুক্ত এবং অন্যতম মাশআর। ওয়াদীয়ে মুহাসসার হারামের অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু মাশআর নয়। মুযদালিফা হারামের অন্তর্ভুক্ত এবং মাশআরও। আরাফা হারামও, মাশআরও।

নবী করীম (সঃ) দু'রাস্তার মধ্যবর্তী রাস্তা ধরে চললেন। সে পথ হুজরায় গিয়ে শেষ হয়েছে। এ পথেই তিনি মিনায় পেঁছলেন। সংগে সংগে তিনি জামারায়ে আকাবায় গেলেন এবং ময়দানের নিম্নভাগে অবস্থান নিলেন। তার বা'ম দিকে কা'বা শরীফ ও ডানদিকে মিনা ছিল। আর সামনে ছিল জামারা। তিনি বাহনে বসা ছিলেন। সূর্যোদয়ের পরে তিনি এক এক করে কংকর নিক্ষেপ করেন এবং প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সময়ে তিনি তাকবীর বলেন। তখন তিনি তালবিয়া শেষ করেছেন। অবশ্য কংকর মারার জন্যে আসার পথে তিনি তালবিয়া বলেছেন। তখন তার সাথে ছিল বিলাল (রাঃ) ও উসামা (রাঃ)। একজন উটের রশি ধরে ছিলেন, অপরজন হযরত (সঃ) কে গরম থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ছায়া প্রদান করছিলেন। এ ঘটনা দ্বারা মুহরিমের জন্য বাহন ইত্যাদির ছায়া নেয়ার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অবশ্য শর্ত হল এ হাদীছটির বিশুদ্ধতা ও যদি এ ঘটনা কুরবানীর দিন ঘটে থাকে। তবে কুরবানীর পর ঘটে থাকলে বৈধতা প্রমাণিত হবে না। এ হাদীছ থেকে এটা স্পষ্ট নয় যে, ঠিক কখন এ ঘটনাটি ঘটেছে।

Contents

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

●

বিদায়ী ভাষণ

তারপর তিনি মিনায় ফিরে এলেন এবং এক গুরুত্বপূর্ণ সালংকার ভাষণ প্রদান করলেন। ভাষণে তিনি কুরবানীর দিনের মর্যাদা ও মর্তবা এবং আল্লাহ পাকের কাছে এ দিনটির গুরুত্ব সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করলেন। তিনি সকল নগরীর ওপর মক্কা শরীফের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার কথা ঘোষণা করলেন। তেমনি তিনি কুরআনের অনুশাসন পরিচালকদের নির্দেশ শোনা ও মানার জন্য ফরমান জারী করলেন।

অতপর তিনি সবাইকে তাঁর থেকে কুরবানীর রীতি-নীতি শিখে নেয়ার কথা বললেন। তিনি বললেন, হয়ত এ বছরের পর আমি আর হজ্জ করতে পারব না। এই বলে তিনি সকলকে হজ্বের রীতি-নীতি শিক্ষা দিলেন। তারপর মুহাজির ও আনসারদের নিজ নিজ জায়গায় ঠাঁই দিলেন। সকলকে লক্ষ্য করে তিনি নির্দেশ দিলেন, তারা যেন তাঁর অবর্তমানে কুফরী অনুসরণ না করে ও একে অপরকে হত্যা না করে। তিনি তার তরফ থেকে মুবাল্লিগ নিয়োগ করলেন এবং বললেন, কিছু লোক এমন থাকে যাদের কাছে মানুষ সমস্যার সমাধান চায়। তারা সাধারণ শ্রোতাদের থেকে অধিক জ্ঞানী হয়ে থাকে।

তিনি তাঁর ভাষণে আরও বলেন—সাবধান! কেউ যেন নিজেই নিজের ওপর অত্যাচার না করে। তিনি মুহাজিরদের কিবলার ডান দিকে ও আনসারদের কিবলার বাম দিকে ঠাঁই দিলেন। অবশিষ্টরা তাদের আশে পাশে অবস্থান নিল। আল্লাহ পাক (ভাষণ শোনার জন্য) সবার শ্রবণশক্তি বাড়িয়ে দিলেন। এমনকি মিনাবাসী পর্যন্ত যার যার ঘরে বসে হযরতের (সঃ) ভাষণ শুনছিল।

ভাষণে তিনি আরও বলেন, তোমরা নিজ প্রভুর ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে, রমযানের রোযা রাখবে, আর যখন তোমাদের (কুরআন সুন্নাহ মুতাবেক) নির্দেশ দেয়া হবে, তখন তা মেনে চলবে। এভাবেই তোমরা নিজ প্রভুর জান্নাতে প্রবেশ করবে। এই বলে তিনি সকলকে বিদায়ী সম্ভাষণ জানালেন। ভাষণের পর সবাই বলাবলি শুরু করল, এটাই হযরতের বিদায় হজ্ব। এখানেই এক ব্যক্তি জানতে চাইল, কংকর মারার আগে কি সে মাথা কামিয়ে নেবে, না কুরবানী করে নেবে? হযরত (সঃ) জবাব দিলেন—কোনটাতেই ক্ষতি নেই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন: সেদিন আমি লক্ষ্য করেছি যে, নবী করীম (সঃ) এর কাছে যে যা জিজ্ঞেস করেছে, সকলকে বলেছেন—করে নাও, কোন ক্ষতি নেই।

অতপর হযরত (সঃ) মিনার কুরবানীর জায়গায় হাযির হলেন এবং তেষট্টিটি উট কুরবানী করলেন। তিনি দাঁড়িয়ে উটের বাম পা বেঁধে জবাই করছিলেন। তিনি নিজেই ষাটটি উট জবাই করলেন। তারপর হযরত আলীকে (রাঃ) নির্দেশ দিলেন বাকী ক'টি জবাইয়ের জন্য। তারপর তিনি আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিলেন উটগুলোর চামড়া ও গোশত দরিদ্রদের ভেতর বিলিয়ে দেয়ার জন্য। তিনি এও নির্দেশ দিলেন যে, কশাইকে গোশত বানানোর বিনিময়ে যেন গোশত না দেয়া হয়।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে, হযরতের (সঃ) কুরবানীর খুতবা সম্পর্কে সহীহদ্বয়ে হযরত বুকরা (রাঃ) এর বর্ণিত হাদীছের জবাব কি হবে? তাতে তিনি বলেছেন, ভাষণ শেষে তিনি দু'টো মোটা তাজা ভেড়ার দিকে অগ্রসর হলেন ও সে দু'টো জবাই করলেন। তারপর তিনি বকরীর পালের দিকে গেলেন এবং তা আমাদের মাঝে বন্টন করে দিলেন। (মুসলিম)

তার জবাব এই যে, ভেড়া জবাইর ব্যাপারটি মক্কা শরীফের। অবশ্য হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনা অনুসারে ভেড়া জবাই করা হয় মদীনায়। বলা হয় যে, এ ব্যাপারে দু'টো পদ্ধতি রয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, হযরত (সঃ) মদীনায় দু'টো অতি চমৎকার শিংওয়ালা ভেড়া জবাই করেন এবং ঈদের নামায পড়ে দুম্বার দিকে যান। মুলত হযরত আনাস (রাঃ) মক্কায় হযরতের (সঃ) উট কুরবানী ও মদীনায় ভেড়া কুরবানীর পার্থক্যটি বলে দিয়েছেন। তিনি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ দু'টো সম্পূর্ণ পৃথক ঘটনা। এ থেকে এও জানা গেল যে, হযরতের (সঃ) মিনায় কুরবানীর বর্ণনাকারীরা সবাই উটের কথাই বলেছেন। এ উট হযরত (সঃ) কুরবানীর জন্যই নিয়ে এসেছিলেন। মিনায় বকরী কুরবানীর চেয়ে উট কুরবানী উত্তম।

●

একবিংশ পরিচ্ছেদ

●

হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) হজ্জ

হযরত (সঃ) যখন সরফ নামক স্থানে পেঁছিলেন, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) মাসিকগ্রস্তা হন। তিনি হজ্জের সাথে উমরারও নিয়্যত করেছিলেন। তিনি রসূল (সঃ) এর কাছে কাঁদতে কাঁদতে এলেন। রসূল (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন—কাঁদছ কেন ? মাসিক এসে গেছে ? তিনি জবাব দিলেন—হাঁ, তাই হয়েছে। হযরত (সঃ) বললেন—(তাতে কাঁদার কি আছে ?) এ তো আদম কন্যাদের জন্য আল্লাহর লিখিত বিধান। হাজীরা যা কিছু করে তা সবই তুমি কর। শুধু আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করবে না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উলামায়ে কিরামের ভেতরে এ কথা নিয়ে বহাছ হল যে, তাঁর সে হজ্জ কি তামাত্তু হজ্জ ছিল, না ইফরাদ হজ্জ ? যদি তিনি তামাত্তুর নিয়্যত করে থাকেন তো পরে কি উমরার ইচ্ছা বর্জন করে ইফরাদের নিয়্যত করেছিলেন ? হজ্জের পর কি উমরা করে কাযিন হয়েছেন ? তানঈম থেকে তিনি যদি দ্বিতীয়বার উমরার নিয়্যত করে থাকেন, তা হলে তা কি তার জন্য ওয়াজিব ছিল ?

হযরত আয়েশার (রাঃ) এ ঘটনা নিয়ে ফকীহরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। বিশেষত কোন নারী যখন উমরার জন্যে ইহরাম বাঁধে ও পরে মাসিক দেখা দেয় এবং ভাল না হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে না পারে, তখন কি সে উমরার ইহরাম ছেড়ে দেবে এবং ইফরাদ হজ্জের নিয়্যত করবে ? না হজ্জ ও উমরা দু'টোই সম্পন্ন করে কাযিন হবে ?

কুফী ফকীহ ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও তাঁর সহচররা পয়লা মত গ্রহণ করেছেন। হিজাযের ফকীহ ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (রঃ) দ্বিতীয় মত গ্রহণ করেছেন।

'তানঈম' থেকে হযরত আয়েশা (রাঃ) যে আবার উমরার নিয়্যত করে অগ্রসর হলেন, তা নিয়ে চারটি মত দাঁড়িয়ে গেছে।

এক—তানঈম থেকে আবার উমরার নিয়্যতের ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত একটা ব্যাপার। তা না হলে হজ্জ ও উমরা করে সাঈ-তাওয়াফ থেকে তিনি অবসর নেন। তিনি তামাত্তু হজ্জের নিয়্যত করেছিলেন। হজ্জের ভেতরে তিনি উমরাও শামিল করে নিয়ে কিরান হজ্জই সম্পন্ন করেছেন।

এ মতটি বিশুদ্ধ হাদীছ ও অভিমত ভিত্তিক বলে এর বিরুদ্ধে কোন দলীল থাকতে পারে না। ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদের (রঃ) মাসলাক এটাই।

Contents

দুই—হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) যখন মাসিক দেখা দিল, তখন হযরত (সঃ) তাকে উপদেশ দিলেন, উমরা ছেড়ে দাও এবং ইফরাদ হজ্বের নিয়্যত কর। যখন তিনি হজ্ব শেষ করে ইহরাম ছাড়লেন, তখন হযরত (সঃ) নির্দেশ দিলেন, কাযা উমরার নিয়্যত কর এবং তা আদায় কর। (যে উমরার জন্য তিনি ইহরাম বেঁধেছিলেন তারই কাযা উমরা)। এটি ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও তাঁর সহচরদের মাসলাক। এ মত অনুসারে সে উমরা হযরত আয়েশার (রাঃ) জন্য ওয়াজিব ছিল। কারণ, তিনি তার নিয়্যত করেছিলেন। তাই তা আদায় করা জরুরী ছিল।

তিন—তিনি যখন কারিন হজ্ব করলেন, তখন দ্বিতীয়বার উমরার প্রয়োজন থাকল না। ইমাম আহমদের (রঃ) দু'টি মতের এটি অন্যতম।

চার—হযরত আয়েশা (রাঃ) ইফরাদ হজ্বের নিয়্যত করেছিলেন। তাঁকে 'তাওয়াফে কদুম' করতে এ জন্য নিষেধ করা হল যে, তিনি মাসিকগ্রস্তা হয়েছিলেন। এ মাসলাক হল মালিকী ফকীহ কাযী ইসমাঈল ইবনে ইসহাক প্রমুখের। এ মতটি সব চাইতে দুর্বল।

●

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

হুযরতের অন্তিম হজ্জ

ইফরাদ বনাম তামাত্তু ও কিরান ঃ

এখন আবার আমরা হযরত (সঃ) এর বিদায় হজ্জ প্রসংগে আসছি। 'সারফ' থেকে যাত্রা করার পর মক্কায় তিনি সাহাবাদের বললেন—যাদের কাছে কুরবানীর পশু নেই, তারা শুধু উমরাহ করবে এবং ইহরাম খুলে ফেলবে। আর যাদের কাছে কুরবানীর পশু রয়েছে তারা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকবে।

এ সময়ে সুরাকা ইবনে মালিক প্রশ্ন করলেন—এ নির্দেশ কি এ বছরের জন্য, না সব সময়ের জন্য? হযরত (সঃ) জবাব দিলেন—সব সময়ের জন্য। এখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত উমরাও হজ্জের অন্তর্ভুক্ত হল।

চৌদ্দ জন সাহাবী এ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁরা হলেন—উম্মুল মু'মেনিন হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ফাতিমা যুহরা (রাঃ), হযরত আসমা বিন্তে আবু বকর (রাঃ), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), বারাআ ইবনে আযিব (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ), আনাস ইবনে মালিক (রাঃ), আবু মুসা আশআরী (রাঃ), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), সিবরা ইবনে মা'বাদ আল জুহনী (রাঃ), সুরাকা ইবনে মালিক (রাঃ)। সহীহদ্বয় ও অন্যান্য সহীহ ও মুসনাদ সংকলনেও এ হাদীছ উধৃত হয়েছে।

সহীহ বুখারীতে ইবনে যিহাক থেকে বর্ণিত আছে—আমি আতার খিদমতে হাজির হলাম। তাঁর কাছে আমি এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, আমাকে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ হযরতের (সঃ) সাথে কুরবানীর পশু ছিল। এক দল লোক ইফরাদ হজ্জের নিয়্যাত করেছিল। তিনি তাদের তামাত্তু হজ্জ করতে বললেন। তারা আরয করল—আমরা তো ইফরাদ হজ্জের নিয়্যাত করেছি। এখন কি করে তামাত্তু হজ্জ করব? তিনি বললেন—'আমি যা বলি তাই কর। আমার সাথে যদি কুরবানী পশু না থাকত, তা হলে আমিও সেটাই করতাম যা তোমাদের করতে বলছি। কিন্তু এখন তা ততক্ষণ সম্ভব না, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরবানীর পশু-গুলো জায়গামত না পৌঁছে যায়। আমি কেবল তখনই ইহরাম খুলতে পারি।' অতপর তারা তাই করল।

সহীহ মুসলিমে হযরত হাফসার (রাঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম (সঃ) তাঁর পবিত্র বিবিদের নির্দেশ দিলেন—তোমরা ইহরাম ছেড়ে দাও। হযরত হাফসা (রাঃ) বলেন ঃ আমি

তখন প্রশ্ন করলাম—আপনি তা করছেন না কেন ? তিনি জবাব দিলেন—আমি কুরবানীর পশু যথাস্থানে পাঠিয়েছি। যতক্ষণ তা কুরবানী না দেব, ততক্ষণ আমি ইহরাম খুলতে পারি না।

সহীহ মুসলিমে হযরত আসমা বিন্তে আবু বকর (রাঃ) এর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেন—আমরা (বিদায় হজ্বে) ইহরাম বেঁধে বেরিয়েছি। রসূল (সঃ) এ প্রসংগে বললেন—যাদের কাছে কুরবানীর পশু রয়েছে তারা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকবে, আর যাদের কাছে তা নেই তারা ইহরাম খুলে ফেলবে। তাই আমি ইহরাম ছেড়ে দিলাম।

মোটকথা এ ব্যাপারটি হযরত (সঃ) থেকে বর্ণিত বহু রিওয়ায়েত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সেগুলোর বর্ণনাকারী হলেন সাহাবায়ে কিরাম ও বড় বড় তাবেঈ। আর সে সব বর্ণনা সংশয়াতীত ও সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাসযোগ্য। কারো পক্ষেই তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এ মাজহাব আহলে বায়তের। এ মাজহাব হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আবু মুসা আশআরীর (রাঃ)। এ মাজহাব আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) ও তাঁর অনুসারীদের। এ মাজহাব আহলে হাদীছদের। এ মাজহাব বসরার কাযী আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আমবারীর।

কিন্তু আহলে জাহির ও সে সব হাদীছের ব্যাপারে দ্বিমত পোষণকারীরা এ মাজহাব মেনে নেয়ার বিরুদ্ধে কয়েকটি অজুহাত পেশ করেন।

এক—সে সব হাদীছ মানসুখ (বাতিল) হয়ে গেছে।

দুই—সে হাদীছগুলো শুধু সাহাবায়ে কিরামদের বেলায় প্রযোজ্য। সাহাবা ভিন্ন অন্য লোকদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

তিন—এর বিপরীত নির্দেশের দ্বারা এ হাদীছগুলো বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

উক্ত হাদীছগুলোর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত আপত্তিগুলো তুলে ধরা হল। এখন আমরা এক এক করে সেগুলোর জবাব দেব।

প্রথম জবাব ঃ

যারা হাদীছগুলোকে মানসুখ মনে করেন তারা বলেন যে, আবু দাউদ বলেন ঃ আমাকে ফারাবী, তাকে আবান ইবনে আবু হাশিম, তাকে আবু বকর ইবনে হিফস, তাঁকে ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রাঃ) যখন খলীফা হন, তখন তিনি ঘোষণা করেন—হে জনতা! রসূল (সঃ) আমাদের জন্য 'মুতা' বৈধ করেছিলেন। তারপর তিনি তা আমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

বাযযার বলেন—এ হাদীছটি সূত্র ও ভাষ্য দু'দিক থেকেই অন্তঃসারশূন্য। সূত্র তো আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। ভাষ্যও ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। 'মুতা' অর্থ এখানে নারীর সাথে মুতা,

Contents

তামাত্ত, হজ্ব নয়। নারীর সাথে মুতার সম্পর্ক স্থাপন নিঃসন্দেহে প্রথমে হালাল ছিল ও পরে হারাম করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে হযরত উমর (রাঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে এ বর্ণনা পাওয়া যায় যে, তিনি বলেছেন— আমি হজ্বের সাথে অবশ্যই তামাত্ত, করে থাকি।

দ্বিতীয় জবাব ঃ

তামাত্ত, ও কিরান হজ্ব যে সাহাবাদের জন্য প্রযোজ্য তার সপক্ষে এ দলীল পেশ করা হয় যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের হুমায়দী, সুফিয়ান, ইয়াহিয়া ইবনে সাঈদ ও মিরকার মাধ্যমে আবু জার (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন ঃ "রসুল (সঃ) এর তরফ থেকে তামাত্ত, হজ্বের অনুমতি আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।"

ওয়াকী' মুসা ইবনে উবায়েদ ও ইয়াকুব ইবনে যায়েদের বরাত দিয়ে আবু জার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন ঃ "আমাদের পরে হজ্বকে উমরার সাথে মিলানো কারো জন্যে বৈধ নয়। এটা আমাদের আসহাবে রসুলদের জন্য একটি বিশেষ অনুমোদন ছিল।"

হযরত আবু জারের (রাঃ) সাথে ইয়াযীদ ইবনে শরীকের এক প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে আব্দুর রহমান আল আসাদী, মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, আসমাদ ইবনে ফযল, ইউসুফ ইবনে মুসা ও বাযযার বর্ণনা করেন ঃ

"ইয়াযীদ ইবনে শরীক প্রশ্ন করলেন—আপনি তো রসুল (সঃ) এর সাথে ছিলেন। বলুন তো, তিনি কিভাবে তামাত্ত, হজ্ব করলেন ?

আবু জার (রাঃ) জবাব দিলেন—'তোমাদের তা দিয়ে কি দরকার ? এটা তো শুধু আমাদের জন্য একটি বিশেষ অনুমোদন ছিল।'

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু জার (রাঃ) বর্ণনা করেন—'তামাত্ত, হজ্ব আসহাবে রসুলদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।'

এ হাদীছের অপর ভাষ্য এরূপ ঃ দু'টো তামাত্ত, আমাদের ছাড়া কারো জন্য বৈধ নয়। এক, তামাত্তুয়ে হজ্ব ও তামাত্তুয়ে নিসা।

এ ধরনের বর্ণনা সুনানে আবু দাউদ ও নাসায়ী প্রভৃতিতে বিদ্যমান। মোট কথা তামাত্ত, ও কিরান হজ্বের বিরোধীরা এ ধরনের সব দলীল পেশ করেছেন আর দাবী করেছেন যে, তা আসহাবে রসুলদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু এ সব আছারের একটিও বিশুদ্ধ নয় এবং সবগুলোই বাতিল বলে গণ্য।

উক্ত আছারগুলোর অন্যতম বর্ণনাকারী মিরকার বর্ণনা গ্রহণ করা হয় না। তা ছাড়া সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ হাদীছের মোকাবিলায় দুর্বল ও অশুদ্ধ আছার কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। পরন্তু

সাধারণ বিধানকে দুর্বল কিংবা বিনা দলীলে বাতিল কিংবা নির্দিষ্ট করা যায় না। কারণ, যে কোন বিধানের সাধারণভাবে প্রযোজ্য হওয়াই মৌলিক দাবী।

বিলাল ইবনে হারিছের হাদীছও সম্পূর্ণ ভুল। নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীছের ওপর তার প্রাধান্যের প্রশ্নই অবান্তর। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) জীবনভর এ খেয়ালের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়েছেন এবং এর অনুসারীদের সাথে বাহাছ করেছেন। তা ছাড়া বড় বড় সাহাবায়ে কিরাম জীবনভর উক্ত মতের বিপরীত কাজ করে গেছেন। অর্থাৎ তামাত্তু হজ্ব করেছেন। এ বিপুল সংখ্যক সাহাবায়ে কিরামের কেউই বললেন না যে তামাত্তু হজ্ব শুধু আমাদের জন্য নির্দিষ্ট কিংবা এটা আমাদের জন্য একটি বিশেষ অনুমোদন। বরং তাঁরা এটাকে সাধারণ বিধান ও সকল মুসলমানের জন্য সমানে পাল্য বলে ঘোষণা করেছেন।

নির্দিষ্টকরণের হাদীছ সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রঃ) বলেন—আল্লাহ তা'আলা আবু জার (রাঃ) কে রহম করুন। তামাত্তু হজ্বের অনুমতি তো আল্লাহ তাঁর কিতাবেই দিয়েছেন।

এখন রইল হযরত উছমান (রাঃ) এর বক্তব্য। তিনি বলেন—'তামাত্তু হজ্ব শুধু সাহাবাদের জন্য ছিল, অন্যদের জন্য নয়।' এ ব্যাপারেও ওপরের জবাবগুলোই যথেষ্ট।

তা ছাড়া হযরত উছমান (রাঃ) ও হযরত আবু জার (রাঃ) এর হাদীছ দু'টো তিন ভাবে প্রযুক্ত হতে পারে।

এক—শুধু সাহাবাদের জন্য বৈধ ও অন্যদের জন্য অবৈধ হওয়া। তামাত্তু যারা হারাম ভাবেন তারা হাদীছের এ অর্থই নিয়েছেন।

দুই—শুধু সাহাবাদের জন্য তা ওয়াজিব ছিল, অন্যদের জন্য নয়। আমাদের শায়েখ ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রঃ) বলেন—সাহাবাদের জন্য তামাত্তু হজ্ব ফরয ছিল। কারণ, রসুল (সঃ) তাদের সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু গোটা উম্মতের জন্য বৈধ ও মুস্তাহাব মাত্র। কিয়ামত পর্যন্ত এ বিধান এভাবেই চলবে। তবে ইবনে আব্বাস (রাঃ) গোটা উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত তা ওয়াজিব বলেছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক ইফরাদ ও কিরান হজ্বের নিয়্যতকারীর যার কাছে কুরবানীর পশু নেই তার জন্য ফরয হল ইহরাম ছেড়ে দেয়া।

তিন—কুরবানীর পশু না নিয়ে ইফরাদ কি কিরান হজ্ব শুরু করা সাহাবায়ে কিরাম ছাড়া অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। অবশ্য এ প্রয়োগটি সহীহ ও সুপ্রমাণিত হাদীছের পরিপন্থী বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়।

এখন রইল সহীহ মুসলিমে উধৃত হযরত আবু জার (রাঃ) এর বর্ণনাটি। 'হজ্বের ভেতর তামাত্তু করা সাহাবাদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল' তাঁর এ বক্তব্যটি যদি তামাত্তুর শাব্দিক অর্থে ধরা হয়, তা হলে সে ব্যাপারে দুনিয়ার সব মুসলমানই একমত। কিন্তু যদি তার পারিভাষিক অর্থ নেয়া হয় তা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।

হযরত উছমান (রাঃ) ও হযরত আবু জার (রাঃ) এর হাদীছের চাইতেও বিশুদ্ধ হাদীছ বুখারীতে ইমরান ইবনে হিসীন (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন ঃ "আমরা রসূল (সঃ) এর সাথে তামাত্তু হজ্জ করেছি। ইত্যবসরে কিরান হজ্জের আয়াত নাযিল হল।"

সহীহ মুসলিমে সুস্পষ্টত বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর কিতাবে তামাত্তুর আয়াত নাযিল হয়েছে অর্থাৎ তামাত্তু হজ্জের আয়াত। রসূল (সঃ) আমাদের তা করার নির্দেশ দেন। তারপর তা বাতিল করার কোন আয়াত নাযিল হয়নি এবং রসূল (সঃ)ও আমাদের তা করতে নিষেধ করেন নি। এ অবস্থায়ই তিনি ইন্তিকাল করেন। এর পরেও যদি কেউ (হযরত উমর (রাঃ)) নিজের মত মতে কিছু বলে তো যা ইচ্ছে বলুক।

ইবনে উমর ও ইবনে আব্বাসের জবাব ঃ

একবার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) এর কাছে প্রশ্ন করা হল—'আপনার আব্বা তো তামাত্তু নিষিদ্ধ করেছেন।' ইবনে উমর (রাঃ) জবাব দিলেন ঃ 'রসূলুল্লাহর (সঃ) কথার চাইতে কি আমার বাপের কথা বেশী অনুসরণ যোগ্য হতে পারে ?'

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) মতের বিরুদ্ধে তাঁর কাছে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর বক্তব্য তুলে ধরায় তিনি তার জবাবে বললেন—'আমার ভয় হয়, তোমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ শুরু হয়ে যায় নাকি ! আমি বলছি, রসূল (সঃ) এ কথা বলেছেন আর তোমরা বলছ, আবু বকর ও উমর অন্য কথা বলেছেন !

এই হচ্ছে কিন্তু সাহাবাদের জবাব। তাঁরা এ জবাব দেননি যে, উছমান (রাঃ) ও আবু জার (রাঃ) তোমাদের চাইতে রসূল (সঃ) এর কথা ও কাজ সম্পর্কে বেশী ওয়াকিফহাল ছিলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও ইবনে উমর (রাঃ) সাধারণত বলতেন—আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) আমাদের চেয়ে রসূল (সঃ) এর ব্যাপার অনেক বেশী জানতেন। কিন্তু তাদের সে জানার সপক্ষে রসূল (সঃ) এর কথা ও কাজ থেকে দলীল পেশ না করা পর্যন্ত কোন সাহাবা বা তাবেঈ নিশ্চিন্ত হতে পারে না। মা'সুম (নিষ্পাপ) ব্যক্তিত্বের বক্তব্যের ওপরে গায়ের মা'সুম (সম্পাপ) ব্যক্তিদের বক্তব্যের প্রাধান্য হতে পারে না। অথচ মা'সুম ব্যক্তিত্বের বক্তব্যে জানা যায়, তামাত্তু হজ্জ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে।

এ মতের সমর্থনে রয়েছেন হযরত আলী (রাঃ), সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), আবু মুসা আশআরী (রাঃ), সাঈদ ইবনুল মুসাইয়ের (রাঃ) ও অধিকাংশ তাবেঈন। এতে বুঝা যায়, তামাত্তু বাতিলের ব্যাপারটি মুষ্টিমেয় সাহাবার ব্যক্তিগত রায় ছিল। রসূল (সঃ) থেকে এর সমর্থনে কোন মারফু হাদীছ নেই।

উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন তামাত্তু নিষিদ্ধ করলেন, তখন আবু মুসা আশআরী (রাঃ) বললেন—হে আমীরুল মু'মিনীন ! কুরবানী ও ইবাদতে আপনি একটা নতুন কথা চালু

করলেন ? আবু মূসা আশআরী (রাঃ) এভাবে হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পূর্ণ খিলাফত কালে ও উমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফতকালের প্রথম দিকে এ ফতোয়া দিয়েই চললেন। এমন কি উমর (রাঃ) তাঁকে তা করতে নিষেধও করেছেন। কিন্তু, এটা প্রমাণিত সত্য যে, তাঁর মতে উমর (রাঃ) কুরবানী ও ইবাদতে নতুন কথা চালু করেছেন। সাথে সাথে এটাও বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত যে, পরবর্তীকালে খলীফা তাঁর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছেন।

এখন থাকে মানসুখ করার বিপরীত নির্দেশের হাদীছগুলো। সেক্ষেত্রে এ ব্যাপারে যে সব হাদীছ পেশ করা হয়, তার ভেতর একটি হাদীছ হযরত উমর (রাঃ) থেকে আবুল আসওয়াদ বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাযম তাকে 'মুনকার' রাবী বলেছেন। তাই তার বর্ণনা নেয়া কি করে জায়েয হতে পারে ? তেমনি হযরত আসমা (রাঃ) এর মুক্তদাস আব্দুল্লাহর বর্ণিত হাদীছটি। তাতে আসমা বিন্তে আবু বকর (রাঃ) বলেন—'আমি, আমার বোন আয়েশা (রাঃ), যুবায়ের (রাঃ) ও অমুক অমুক বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণের পর ইহরাম ছেড়ে দিয়েছি। তারপর রাতে আবার ইহরাম বেঁধেছি।' কিন্তু এ হাদীছটি দু'টি কারণে বাতিল। একটি কারণ এই যে, সব বর্ণনাকারী এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রথমবারে মক্কা ঢুকেই উমরায় করেন নি। তাই হজ্বের পরে 'তানঈমে' গিয়ে উমরার নিয়্যত করে এসেছেন এবং উমরা করেছেন। এ বর্ণনার রাবীগণ অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। যেমন আবুল আসওয়াদ, ইবনে আব্দুল মুলায়কা, কাসিম ইবনে মুহাম্মদ, উরুয়া, তাউস ও মুজাহিদ।

বাতিলের দ্বিতীয় কারণ হল এই, তাতে বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণের পর ইহরাম খুলে ফেলার কথা বলা হয়েছে। অথচ জাবির (রাঃ), আনাস ইবনে মালিক (রাঃ), আয়েশা (রাঃ) ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনা এটাই বলছে যে, মক্কায় প্রবেশের দিনই ইহরাম ছাড়া হয়েছে।

এক্ষণে আমরা আবার হযরত (সঃ) এর হজ্বের আলোচানায় ফিরে আসছি। হযরত (সঃ) জী-তুয়ায় এসে অবতরণ করলেন। আজকাল তা আবাদ যাহির নামে খ্যাত। এখানে তিনি রাত কাটালেন। ফজর নামাযের পর তিনি গোসল করেন এবং মক্কার দিকে সওয়ারী চালালেন। মক্কায় যখন তিনি প্রবেশ করেন তখন বেলা বেশ চড়ে গেছে। তিবরানী বর্ণনা করেন—হযরত (সঃ) বাবে বণু আব্দে মানাফ দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। আজকাল তা বাবে আবু শায়বা নামে অভিহিত।

হযরতের তাওয়াফ :

তিবরানী বর্ণনা করেন—হযরতের (সঃ) দৃষ্টি যখন কা'বার ওপর পড়ল, তখন তিনি এ দোআ পড়লেন :

اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة -

"আয় আল্লাহ! তোমার এ ঘরের সম্মান, মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব বাড়িয়ে দাও।"

অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়, হযরত (সঃ) তখন হাত উঠিয়ে তাকবীর বলছিলেন ও এ দোআ পড়ছিলেন ঃ

اللهم انت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام زد هذا بيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجه او اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا ○

'আয় আল্লাহ! তোমার নাম শান্তি। আর তোমা থেকেই শান্তি আসে। হে আমাদের প্রতিপালক! শান্তির সাথে আমাদের বাঁচিয়ে রাখ। হে আল্লাহ! এ ঘরের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব সম্মান ও গুরুত্ব বাড়িয়ে দাও। এ ঘরে যে হজ্ব করে কিংবা উমরা করে, তারও সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুর্গী বাড়িয়ে দাও।"

যখন তিনি মসজিদে এলেন, তখন কা'বার দিকে এগোলেন। মসজিদে তিনি তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়েন নি। কারণ, মসজিদুল হারামের তাহিয়্যাত হল তাওয়াফ। হাজরে আসওয়াদে এসে তিনি চুমু দিলেন। কিন্তু তার জন্য না তিনি রুকনে ইয়ামানীর দিকে ফিরলেন, না হাত উঠালেন, না এ কথা বললেন যে, আমি তাওয়াফের নিয়্যাত করছি। তিনি তাওয়াফের জন্য নামাযের মত তাকবীর বলে শুরু করলেন না। তা কেবল অজ্ঞ ও জাহিলরাই করে থাকে। এটা বিদআত ও মুনকার। তিনি হাজরে আসওয়াদের দিকে গোটা দেহও ফিরান নি; বরং সেটার দিকে একটু ফিরে দেখলেন। ডান দিক থেকে তিনি তাওয়াফ শুরু করলেন। কা'বা তাঁর ডান পাশে ছিল। কা'বার দুয়ারে দাঁড়িয়ে তিনি কোন দোআও পড়লেন না। মীযাবের নীচে দাঁড়িয়েও তিনি তা করলেন না। যখন তিনি হাজরে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানীর মাঝখানে পেঁৗছলেন, তখন বললেন ঃ

ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار -

"আয় আল্লাহ! আমাদিগকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান কর ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।"

হযরত (সঃ) তাওয়াফের পয়লা তিন চক্কর ক্ষিপ্রগতিতে চললেন। কিন্তু ছোট ছোট কদমে চললেন। চাদর গায়ে ছিল। তা বগলের নীচ থেকে উঠিয়ে কাঁধে ফেলে নিয়েছিলেন। যখন হাজরে আসওয়াদের সামনে আসতেন, তখন সেদিকে ইশারা করতেন এবং হাতের লাঠি দিয়ে সেটাকে স্পর্শ করতেন। তারপর সেই লাঠিটি চুমিয়ে সামনে এগিয়ে যেতেন। লাঠিটির মাথা বাঁধানো ছিল।

এও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি রুকনে ইয়ামানী ছুঁয়েছেন। কিন্তু তাতে চুমু খেলেন না। এমন কি সেটা ছুঁয়ে হাতেও চুমু খেলেন না। দারে কুতনীতে ইবনে আব্বাসের (সঃ) বর্ণনা উধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন—নবী করীম (সঃ) রুকনে ইয়ামানীতে (হাজরে আসওয়াদ) চুমু খেতেন এবং তাতে তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল স্থাপন করতেন। এ রিওয়ায়েতের এক রাবী হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে হুরমুয। ইমাম আহমদ (রঃ) তাকে সঠিক হাদীছ বর্ণনাকারী বলেছেন। কিন্তু কিছু লোক তাকে যঈফ বলেছে। এখানে 'রুকনে ইয়ামানী' বলতে হাজরে আসওয়াদ বুঝানো হয়েছে।

তিবরানী উত্তম সনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত (সঃ) যখন রুকনে ইয়ামানী স্পর্শ করতেন, তখন বলতেন ঃ

بسم الله والله اكبر

আর যখন হাজরে আসওয়াদের কাছে আসতেন তখন বলতেন ঃ

الله اكبر

মাকামে ইব্রাহীমে দরূদ পাঠ ঃ

কা'বা ঘরের তাওয়াফ সেরে তিনি মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে এলেন এবং এ আয়াত পড়লেন ঃ

واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى

অর্থাৎ মাকামে ইব্রাহীমকে তোমরা জায়নামায বানাও। তারপর তিনি সেখানে দু'রাকাআত নামায পড়লেন। তাতে তিনি সূরা ফাতিহার সাথে সূরা ইখলাস পড়লেন। নামাযের পর তিনি হাজরে আসওয়াদের দিকে গেলেন এবং সেটাকে আবার স্পর্শ করলেন। তারপর তিনি সাফা পাহাড়ে তাশরীফ নিলেন। সেখানে পেঁছে তিনি এ আয়াত পড়লেন ঃ

ان الصفا والمروة من شعائر الله

"নিশ্চয় সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শন।"

আয়াতটি তিনি সম্পূর্ণ পড়লে। তারপর বললেন ঃ

ابدا بما بدا الله

"আল্লাহ পাক যা থেকে শুরু করেছেন আমিও তা থেকে শুরু করছি।"

নাসায়ীর ভাষ্যে বলা হয়েছে ঃ

ابدا على الامر

"যেভাবে হুকুম হয়েছে সেভাবে শুরু করছি।"

তারপর তিনি সাফা পাহাড়ে চড়লেন। এমন কি আল্লাহর ঘর তাঁর দৃষ্টিগোচর হল। তখন তিনি আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ব ঘোষণা করলেন ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ○ لا اله وحده وحده انجز وعده ونصره وهزم الاحزاب وحده ○

"আল্লাহ্ ছাড়া মা'বূদ নেই। তিনি একক ও লাশারীক। সমগ্র রাজ্য তাঁর আর প্রশংসাও সম্পূর্ণ তাঁর। সব কিছুর ওপর তিনিই ক্ষমতাবান। একক খোদা ছাড়া আর কোন প্রভু নেই। তিনি তাঁর মদদ ও ওয়াদা পূর্ণ করেছেন। তিনি একাই সব দল পর্যুদস্ত করেছেন।"

অতপর তিনি দোআ করেন এবং তাতে উপরোক্ত দোআ তিনবার পড়েন। তারপর তিনি পায়ে হেটে মারওয়া আসেন। 'বাতনে ওয়াদী' তে পৌঁছে তিনি 'সাঈ' করতে থাকেন।

সহীহ মুসলিমে আবু তুফায়েল বর্ণনা করেন—আমি ইবনে আব্বাসকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম—সাফা-মারওয়ার সাঈ কি বাহনে চড়ে করা সুন্নাত ? আপনার গোত্রের লোক তো সেটা-কেই সুন্নাত মনে করেন। তিনি বললেন—তারা ঠিকই বলে, আবার ভুলও বলে। আমি জিজ্ঞেস করলাম—কিরূপে ঠিক ও ভুল বলেন ? তিনি বললেন—মানুষের এত ভীড় ছিল যে, চলাই মুশকিল ছিল। রসূল (সঃ) কাউকে হটিয়ে চলাও পসন্দ করতেন না। অগত্যা তিনি বাহনে আশ্রয় নেন। মূলত পায়ে হেটে সাঈ করাই উত্তম।

তাওয়াফে কুদুম ঃ

হযরতের (সঃ) তাওয়াফে কুদূম নিয়েও মতভেদ দেখা দিয়েছে। তিনি কি পায়ে হেটে তাওয়াফ করেছেন, না বাহনে চড়ে ?

সহীহ মুসলিমে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন—বিদায় হজ্জে রসূল (সঃ) উটে চড়ে তাও-য়াফ করেছেন এবং উটে বসেই তিনি রুকন স্পর্শ করেছেন। কারণ, মানুষ ঠেলে চলা তিনি পসন্দ করতেন না।

সুনানে আবু দাউদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন—নবী করীম (সঃ) অসুস্থ ছিলেন বলে বাহনে থেকেই তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। রুকনের কাছে গিয়ে তিনি লাঠি দ্বারা তা স্পর্শ করেন। তাওয়াফ শেষ করে তিনি উট বসিয়ে গিয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন। আবু তুফা-য়েলের বর্ণনায় আছে—যে লাঠি দিয়ে তিনি রুকন স্পর্শ করলেন, তাতে তিনি চুমু খেয়েছেন।

মুসলিমের সূত্রে বায়হাকী যে বর্ণনা নিয়েছেন, তাতে উটের কথা নেই। হয়ত সেটা তাও-য়াফে কুদূমের ব্যাপার নয়, বরং তাওয়াফে ইকামার ঘটনা।

Contents

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

ই'তিকাফ

আত্মিক রোগের একমাত্র দাওয়াই ঃ

আত্মার সংস্কার, সুস্থিরতা ও খোদা প্রাপ্তির পথ অর্জিত হতে পারে আল্লাহর ওপরে পূর্ণ মাত্রায় নির্ভরতার মাধ্যমে। খোদার প্রতি আকর্ষণের তীব্রতাই মানসিক অস্বস্তি দূর করার একমাত্র উপকরণ। কারণ, সেই আকর্ষণই সর্ববিধ আত্মিক ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক। মূলত খানা-পিনার আধিক্য, অপ্রয়োজনীয় মেলামেশা, গলপ-গুজব ও অতিরিক্ত ঘুম মানুষের অন্তরের বিক্ষিপ্ততা ও অস্থিরতার পরিপূর্ণ সহায়ক। এগুলো আল্লাহর পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় ও অন্তরের দুর্বলতা ও জটিলতা সৃষ্টি করে।

এ সব কারণেই মহান দয়ালু আল্লাহপাক রোযা ফরয করেছেন যেন খানা-পিনার বাড়াবাড়ি হ্রাস পায় এবং অন্তর থেকে কামনা-বাসনার দৌরাত্ম্য বিলুপ্ত হয়। এগুলোই আল্লাহর পথে চলার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়। বান্দার ইহ ও পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণের স্বার্থেই এ সব ইবাদত ফরয করা হয়েছে।

ঠিক একই কারণে শরীআতে ই'তিকাফের বিধান রাখা হয়েছে। এর ফলে মানুষের অন্তর আপনা থেকেই আল্লাহর দিকে নিবিষ্ট হয়। মানব জীবনের আসল উদ্দেশ্যও তাই। ই'তিকাফ মানুষকে খোদা-নির্ভর করে ও পার্থিব ঝঞ্ঝাট মুক্ত করে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল করে। ফলে অন্তর দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার প্রভাব থেকে মুক্ত ও স্বস্তিপূর্ণ থাকে। তাতে আল্লাহর মহব্বত অন্তরে ঠাঁই নেয়ার পরিবেশ পায় এবং আল্লাহর চিন্তাভাবনাই অন্তর জুড়ে বসে। তখন একটাই ভাবনা থাকে, কি করে খোদার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা যায়। মানব প্রীতি তখন খোদা-প্রীতিতে রূপান্তরিত হয়। তাই খোদাও তার সাথে এ প্রতিশ্রুতি দেন যে, কবরের নিঃসংগ জীবনে যখন কোন বন্ধুরই সহযোগীতা মিলবেনা, তখন তিনিই তার বন্ধু হবেন।

ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্য এটাই। যেহেতু রোযার সাথে ই'তিকাফ হলে এ উদ্দেশ্য সহজে হাসিল হয়, তাই ই'তিকাফকে রমযানের শেষ ভাগে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কারণ, রোযার অবশিষ্ট দিনগুলোর চেয়ে সে দিনগুলো উত্তম।

রোযা ছাড়া ই'তিকাফ অর্থহীন ঃ

হযরত (সঃ) কোনদিন রোযা ছাড়া ই'তেকাফ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন—রোযা ছাড়া ই'তেকাফ হয়ই না।

Contents

আল্লাহ্ তা'আলাও রোযার সাথেই ই'তিকাফের উল্লেখ করেছেন। তাই রসূলে করীম (সঃ) সর্বদা রোযার সাথেই ই'তিকাফ করতেন। পূর্বসূরীদের অধিকাংশের অভিমত এটাই যে, ই'তিকাফের জন্য রোযা শর্ত। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া এ মতকেই প্রাধান্য দেন।

এখন প্রশ্ন রইল ইতিকাফে কথা না বলার প্রশ্নটি। তবে এটা ঠিক যে, আখিরাতের কল্যাণ নেই এমন কথা বলা উম্মতের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেমন রাত জেগে গল্প-গুজব ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার ব্যাধির দাওয়াই হিসেবে রাত জেগে ইবাদতের উত্তম ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। পরিণামের দিক দিয়েও তা অনেক উত্তম। রাত জেগে ইবাদত ভারসাম্যপূর্ণ জাগরণ। তাতে দৈহিক ও মানসিক শক্তি সঞ্চয় হয়। পক্ষান্তরে বান্দার ব্যক্তিগত কাজকর্মেরও ক্ষতি হয় না। আধ্যাত্মিক সাধকদের ভিত্তিই হল এ চারটি কাজ। রসূলে করীম (সঃ) এর সুন্নাত অনুসরণ করে চলার যার সৌভাগ্য হয় তার চেয়ে ভাগ্যবান আর কে হতে পারে? তবে যারা এ ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে কিংবা অত্যন্ত হাল্কাভাবে করে তাদের পথ পরিহার করা উচিত।

রসূলে করীম (সঃ) এর রোযা, ই'তিকাফ, বাকবর্জন ও রাতজাগা ইবাদতের কথা বলা হল। এখন আমি ই'তিকাফে হযরত (সঃ) এর অনুসৃত রীতি সম্পর্কে বলছি। তিনি রমযানের শেষ দশ দিনে ইবাদত করতেন। এমন কি আমৃত্যু তিনি এ রীতিই অনুসরণ করেছেন। একবার তিনি রমযানে ই'তিকাফ করতে পারেন নি। তাই শাওয়াল মাসে তার কাযা আদায় করেছেন। একবার তিনি রমযানের পয়লা দশদিনে ই'তিকাফ করেন। তারপর মাঝের দশদিনে করলেন। তারপর শেষ দশদিনে করলেন। এভাবে তিনি লায়লাতুল কদরের সন্ধান চালাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি জানতে পেলেন যে, তা শেষ দশ দিনেই রয়েছে। তাই তিনি শেষ দশ দিনেই ই'তিকাফ নির্দিষ্ট করে নিলেন এবং ইন্তিকাল পর্যন্ত এ নীতিই অনুসরণ করেছেন।

ই'তিকাফের জন্য তিনি তাবু টানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেমতে তার জন্যে মসজিদে তাবু টানিয়ে দেয়া হত। সেখানে তিনি তার পরম করুণাময় প্রভুর সাথে একান্তে একাত্ম হতেন। যখন তিনি ই'তিকাফের ইচ্ছা করতেন, ফজর পড়েই তাবু টানানোর নির্দেশ দিতেন। সেমতে তাবু টানানো হত। তারপর তিনি তাঁর পবিত্র বিবিদের ই'তিকাফের নির্দেশ দিতেন। তাদের জন্যও তাবু টানানো হত। তিনি সেগুলো দেখে নিজ তাবুতে ঠাঁই নিতেন।

এমনও ঘটেছে যে, তিনি রমযানে ই'তিকাফ ছেড়ে দিয়েছেন। তারপর শওয়ালের পয়লা দশ দিনে ই'তিকাফ করেছেন। প্রতি বছর তিনি দশদিন ই'তিকাফে বসতেন। ইন্তিকালের বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেন। প্রতি বছর একবার জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর সাথে এসে কুরআন মজীদ পুনরাবৃত্তি করতেন। ইন্তিকালের বছর তিনি এসে হযরতের সাথে দু'বার কুরআন মজীদ পুনরাবৃত্তি করেন। হযরত (সঃ)ও তাঁকে প্রতিবার কুরআন মজীদ শুনাতেন। সেবারে তিনি দু'বার শুনিয়েছেন।

ই'তিকাফের সময়ে তিনি একাই তাবুতে ঢুকতেন। তখন বিশেষ মানবিক প্রয়োজন ছাড়া তিনি ঘরে যেতেন না। মসজিদ থেকেই তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকার হুজরার দিকে মাথা এগিয়ে দিতেন। তিনি তখন তাঁর মাথা ধুয়ে চিরুণী করে দিতেন। কখনও আয়েশা (রাঃ) মাসিকগ্রস্তা থেকেও তা করতেন। অন্যান্য উম্মুল মু'মিনীনগণও এসে তাঁর সাথে দেখা করতেন। তাঁরা চলে যাবার সময়ে তিনি দাঁড়িয়ে তাঁদের বিদায় দিতেন। তাঁরা রাতেই আসতেন। ইতি-কাফের অবস্থায় তিনি তাঁদের চুমু খেতেন না, সংগও নিতেন না।

তিনি যখন ইতিকাফে বসতেন, তখন তাঁর বিছানা বিছিয়ে দেয়া হত এবং ই'তিকাফের জায়গায়ই বিছানা রাখা হত। প্রয়োজনে তিনি যখন বেরোতেন এবং কোন রোগী সামনে পড়ত, তা হলে তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতেন না, ফুঁও দিতেন না। একবার তিনি তুর্কী কুববায় ই'তিকাফ করেন ও তাতে চাটাই বিছিয়ে নেন। এ সব কিছু তিনি এ জন্য করতেন যেন ই'তিকাফের উদ্দেশ্য সফল হয়। আজকালকার মূর্খরা যেভাবে দশজনের জায়গা একজনে নিয়ে তাতে ই'তিকাফ করে আর শাসকরা মজলিস বসিয়ে সারা দুনিয়ার আলোচনা চালায়, তিনি তা করতেন না। এটা একটা আলাদা ঢঙ। পক্ষান্তরে নবী করীম (সঃ) এর ই'তিকাফের রঙই ছিল আলাদা।

Contents

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

হযরতের হজ্জ ও উমরা

হযরতের উমরা ঃ

নবী করীম (সঃ) হিজরতের পর চারবার উমরা করেন। তার সবগুলো জিলকা'দা মাসে করেন।

তাঁর পয়লা উমরা হল হুদায়বিয়ার উমরা। ষষ্ঠ হিজরীতে তিনি তা আদায় করেন। মুশরিকরা কা'বা ঘরের কাছে তাঁকে কুরবানী করতে বাধা দেন। তাই তিনি ও সাহাবায়ে কিরাম মাথা কামিয়ে ইহরাম খুলে ফেলেন এবং মদীনায় ফিরে আসেন।

পরবর্তী বছরে তিনি 'কাযিয়া উমরা' করেন। নবী করীম (সঃ) সেখানে তিনদিন ছিলেন। উমরা সম্পন্ন করে ফিরে আসেন। এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, এটা কি তিনি নয়া উমরা করেছেন, না আগের বছরের অসম্পূর্ণ উমরার কাযা করেছেন ? এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের দু'টি মত রয়েছে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এর এক মত হল যে, এটা তাঁর কাযা উমরা ছিল। ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মাজহাবও তাই। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন—এটা কাযা উমরা ছিলনা, ছিল নতুন উমরা।

যারা কাযা উমরা বলেন, তাদের দলীল হল যে, এ উমরা কাযা উমরা নামেই অভিহিত। নামের সাথে বস্তুর অবশ্যই সংযোগ রয়েছে। তাদের বিরোধীরা বলেন, এখানে 'কাযা' শব্দ মাকাযা অর্থে এসেছে। মানে সে উমরায় মক্কাবাসিদের বিরুদ্ধে ফায়সালা হয়েছে। এ কারণে তার নাম 'কাযিয়া উমরা' হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, কা'বা পর্যন্ত যাদের যেতে দেয়া হয়নি, তাদের সংখ্যা চৌদ্দশ ছিল। কাযিয়া উমরায় তাঁদের সবাই আসেন নি। যদি কাযা উমরা হত তা হলে তাদের কেউ অবশিষ্ট থাকতেন না। তাই এটাই অধিকতর বিশুদ্ধ মাজহাব। কারণ, নবী করীম (সঃ) এর সাথে গেলবারে যারা এসেছিলেন তাদেরও তিনি বলেননি যে, তোমরা কাযা উমরা আদায় কর।

তৃতীয় উমরা করেন তিনি হজ্জের সাথে। এ হজ্জ অন্তত দশাধিক দলীলের ভিত্তিতে কিরান হজ্জ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ এ নিয়ে পরে সবিস্তারে আলোচনা করব।

চতুর্থ উমরা তিনি জু'রানা থেকে গিয়ে করেছেন। যখন তিনি হুনায়নে তাশরীফ নিলেন, সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে জু'রানা থেকে গিয়ে উমরা আদায় করেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—নবী করীম (সঃ) চার উমরা করেন এবং হজ্জের সাথে কৃতটি ছাড়া সবগুলোই জিলকা'দা মাসে করেন। এক, হুদায়-বিয়ার সন্ধির সময়ের উমরা। দুই, পরবর্তী বছরের জিলকাদা মাসের উমরা। তিন, হুনা-য়নের গনীমাতের মাল বন্টনকালে জু'রানা থেকে গিয়ে আদায়কৃত উমরা। চার, হজ্জের সাথে কৃত উমরা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন—'নবী করীম (সঃ) চার উমরা করেন এবং একটি রজব মাসে করেন।' এটা অবশ্য তাঁর ধারণা মাত্র। হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন তাঁর এ কথা জানতে পেলেন, তখন বললেন—আল্লাহ তা'আলা আবু আব্দুর রহমানকে রহম করুন। নবী করীম (সঃ) যখনই উমরা করেছেন, তখন সেও তাঁর সংগে ছিল। অথচ হুযুর (সঃ) কখনও রজব মাসে উমরা করেন নি।

দারে কুতনীতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে একটি বর্ণনা উধৃত হয়েছে। তাতে তিনি বলেন—হযরতের (সঃ) সাথে আমিও রমযান মাসে উমরা করতে গিয়েছি। তিনি রোযা রাখেননি, আমি রেখেছি। তিনি কসর নামায পড়েছেন, আমি পুরো নামায পড়েছি। তারপর আমি আরয করেছি—আপনার ওপর আমার মা-বাপ কুরবান হোক, আপনি রোযা রাখলেন না, আমি রাখলাম আর আপনি কসর নামায পড়লেন, আমি পূর্ণ নামায পড়লাম। হযরত (সঃ) বললেন হে আয়েশা! তুমি ভালই করেছ।

এ হাদীছটি ভুল! কারণ, রসূল (সঃ) কখনও রমযানে উমরা আদায় করেন নি। তা ছাড়া হযরতের (সঃ) উমরার সংখ্যা সুস্পষ্ট রয়েছে। আমি বলছি, হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ) ওপর আল্লাহ তা'আলা রহম করুন। হযরত (সঃ) কখনও রমযানে উমরা করেন নি। হযরত আয়েশা (রাঃ)ও বলেন—নবী করীম (সঃ) শুধু জিলকা'দা মাসে উমরা করেছেন (ইবনে মাজাহ)।

এ ব্যাপারে কোন মতভেদও নেই। হযরতের (সঃ) উমরা চারটি ছিল। যদি তিনি রজবেও উমরা করতেন তাহলে তার উমরার সংখ্যা পাঁচে দাঁড়াত। তারপর যদি রমযানেও তিনি উমরা করতেন, তা হলে তাঁর ছয় উমরা হত। যদি বলা হয় যে, তিনি সবক'টি রজবে কিংবা রমযানে করেছেন, তা অবাস্তব হবে। কারণ, হযরত আনাস (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত (সঃ) সবক'টি উমরা জিলকা'দা মাসে করেছেন। সুনানে আবু দাউদে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে—'নবী করীম (সঃ) শওয়াল মাসে উমরা করে-ছেন।' তা যদি সহীহ হয় তাহলে তা হবে জু'রানা থেকে গিয়ে কৃত উমরা। শওয়াল মাসে তিনি সেখানে তাশরীফ নেন। আসল কথা এই যে, তিনি সেখানে জিলকা'দা মাসে ইহরাম বাঁধেন।

হযরত (সঃ) জীবনভর একটি উমরাও মক্কার বাইরে গিয়ে করেন নি। অথচ আজকাল সাধারণত লোকজন তাই করে। হযরত (সঃ) সারা জীবন মক্কায় ঢোকার পর উমরা করেছেন। ওহী নাযিলের পর হযরত (সঃ) তের বছর মক্কায় ছিলেন। কিন্তু কোন বর্ণনাই এমন পাওয়া যায় না যে, সেই দীর্ঘ কালের ভেতরে তিনি কখনও মক্কার বাইরে গিয়ে উমরা করেছেন। তিনি যে উমরা করেছেন ও যে উমরা তাঁর ওপর শরীআত নির্ধারণ করেছে, তা মক্কার ভেতরে থেকে উমরা করা। এ নয় যে, মক্কার বাইরে গিয়ে উমরার নিয়্যত করে তারপর মক্কায় এসে উমরা করা। হযরত (সঃ) এর গোটা জীবনের উমরা সেটাই সাক্ষ্য দেয়।

হজ্জের মাসে উমরা উত্তম :

রসূল (সঃ) হিজরতের পর মক্কায় পাঁচবার এসেছেন। প্রথম বার হুদায়বিয়া পর্যন্ত পেঁাছেন। কিন্তু তাঁকে শহরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় নি। অবশিষ্ট চারবার তিনি মীকাত থেকে ইহরাম বেঁধে নিয়েছিলেন। হুদায়বিয়ার ঘটনার সময়ে তিনি জুল হালীফা থেকে ইহরাম বেঁধেছেন। দ্বিতীয়বারে তিনি উমরার পর মক্কায় তিন দিন থেকে তারপর ফিরে যান। তৃতীয়বার মক্কা বিজয় উপলক্ষে রমযান মাসে বিনা ইহরামে মক্কায় প্রবেশ করেন। সেখান থেকে হুনায়েনে যান। তার-পর জু'রানা থেকে নিয়্যত করে মক্কায় প্রবেশ করেন। এ উমরা তিনি রাতে সম্পন্ন করেন এবং রাতেই তিনি ফিরে যান। মক্কাবাসিরা আজকাল যেভাবে মক্কা থেকে জু'রানা গিয়ে উমরার নিয়্যত করেন, তিনি তা করেন নি। হযরত (সঃ) মক্কায় প্রবেশ কালে ইহরাম বেঁধে নিয়েছেন এবং রাতে উমরা শেষ করে জু'রানা ফিরে যান। তিনি সেখানেই রাত কাটিয়ে সকালে সরফ ঘাটি থেকে বেরিয়ে শারে আমে আসেন। এ কারণেই অনেকে সে উমরার ব্যাপারে অজ্ঞতার শিকার হয়েছেন।

হযরতের সব উমরাই হজ্জের মাসে হয়েছে। মুশরিকরা হজ্জের মাসে উমরা মাকরূহ ভাবত। তারা মনে করত, সেটা বড়ই পাপের কাজ। রসূল (সঃ) এর এ রীতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জের মাসে উমরা করা উত্তম।

রসূল (সঃ) বছরে একবার উমরা করেছেন এবং কোন বছরই দু'বার করেন নি। কিছু লোকের ধারণা, তিনি বছরে দু'বারও উমরা করেছেন। তার দলীল হিসেবে তারা সুনানে আবু দাউদের হাদীছ পেশ করেন। তাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, 'হযরত (সঃ) দু'টি উমরা করেছেন। একটি জিলকা'দে ও একটি শাওয়ালে।' এতে মনে হয়, তিনি একই বছরে দু'টি উমরা করেছেন। কিন্তু হাদীছটি নিছক ধারণা প্রসূত। কারণ, এ ধরনের ঘটনা কখনই ঘটে নি।

তথাপি এ প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মালিক (রঃ) বলেন— আমার খেয়ালে বছরে একাধিক উমরা করা মাকরূহ। কিন্তু তাঁর সহচর মাতরাফ ও ইবনুল মাওয়াষ বলেন—বছরে একাধিক উমরা করায় কোন ক্ষতি নেই। ইবনুল মাওয়াযের বক্তব্য হচ্ছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) একই মাসে দু' উমরা করেছেন। তাই আমি বুঝিনা যে, কেউ যদি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য তা করে, তবে তাকে কেন বাধা দেয়া হবে? অথচ তা নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে কোন বর্ণনাই নেই। অধিকাংশের মাজহাব এটাই।

অবশ্য হযরত আবু হানীফা (রঃ) পাঁচ দিন উমরা অবৈধ বলেছেন। এক, ইয়াওমে আরাফার দিন। দুই, ইয়াওমে নহর বা কুরবানীর দিন। তিন, আইয়ামে তাশরীকের তিন দিন। ইমাম আবু ইউসুফের (রঃ) মতে শুধু আরাফার দিন ও কুরবানীর দিন উমরা অবৈধ। শাফেঈ মাজহাবের অনুসারীগণ বলেন, মিনায় কংকর মারার জন্য যারা রাত কাটাবে, তাদের জন্যে আইয়ামে তাশরীকে উমরা করা উচিত নয়।

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত (সঃ) বছরে একবার উমরা করতেন। হযরত (সঃ) বলেছেন—'এক উমরা পরবর্তী উমরা পর্যন্ত সময়ের (পাপের) কাফফারা।'

হজ্জ কখন ফরয হল ?

এ কথা সর্বসম্মত যে, হযরত (সঃ) হিজরতের পর মদীনা থেকে এসে বিদায় হজ্জ ছাড়া আর কোন হজ্জ করেন নি। এতেও কোন মতভেদ নেই যে, এ ঘটনা দশম হিজরীর।

তিরমিজীতে উদ্ধৃত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) এর বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হযরত (সঃ) তিন হজ্জ করেছেন। হিজরতের আগে দু'টি ও হিজরতের পরে উমরাসহ একটি। ইমাম তিরমিজী (রঃ) বলেন—সুফিয়ানের দৃষ্টিতে হাদীছটি গরীব। তিনি বলেন—আমি ইমাম বুখারীর (রঃ) কাছে এ হাদীছের ব্যাপারে প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, আমার এটা জানা নেই। অপর এক বর্ণনা মতে তিনি এ হাদীছটিকে ত্রুটিমুক্ত মনে করেন না।

হজ্জ ফরযের আয়াত নাযিলের সাথে সাথে কালবিলম্ব না করে নবী করীম (সঃ) হজ্জের জন্য প্রস্তুত হলেন। নবম কি দশম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। অষ্টম হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর নিম্ন আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"আর আল্লাহর জন্য হজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর।"

অবশ্য এ আয়াতে হজ্জ ফরয হয় নি। এতে শুধু হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। এ বক্তব্যের মর্ম দ্বারা হজ্জ ফরয হওয়া বুঝায় না।

Contents

রস্‌ল (সঃ) যখন হজ্ব করার সিদ্ধান্ত নিলেন আর সবাই জানতে পেল যে, তিনি হজ্বে যাচ্ছেন, তখন অন্য সবাইও প্রস্তুতি শ্‌রু করলেন। হযরতের (সঃ) পবিত্র সাহচর্যে হজ্ব সম্পাদনই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। মদীনার আশে পাশের লোকও যখন তা টের পেল তখন তারাও দলে দলে সে উদ্দেশ্যে আসা শ্‌রু করল। পথে পথেও লোক দলে দলে তাঁর কাফেলায় শামিল হল। আগে পিছে ডাইনে ও বামে যতদ্‌র নজর যেত, শ্‌ধ্‌ লোক আর লোকই দেখা যেত।

মদীনা থেকে তিনি জ্‌হরের পর রওনা হলেন। সেটা ছিল জিলকা'দ মাস। জ্‌হরের চার রাকআত পড়ে তিনি সবার সামনে ভাষণ রাখলেন। তাদের তিনি ইহরাম ও অন্যান্য ওয়াজিব ও স্‌ন্নাতগ্‌লো শিক্ষা দিলেন। ইবনে হাযম বলেন—সেদিন ছিল ব্‌হস্পতিবার। কিন্তু এ কথাটি ঠিক নয়। তিনি শনিবার দিন হজের জন্য মদীনা থেকে রওনা হন।

মোট কথা, তিনি সেদিন মদীনায় জ্‌হরের চার রাকআত নামায পড়েন। তারপর মাথায় তেল দিলেন, পোষাক বদলালেন, চাদর জড়ালেন এবং জ্‌হর ও আসরের মাঝামাঝি সময়ে রওনা হয়ে গেলেন। জ্‌ল হালীফায় গিয়ে তাব্‌ ফেললেন। এখানে তিনি দ্‌'রাকআত আসর পড়লেন। এখানেই রাত কাটালেন। এখানে তিনি প্‌রো পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন। অর্থাৎ আসর, মাগরিব, ইশা, ফজর ও জ্‌হর।

উম্ম্‌ল ম্‌'মিনীনদের সবাই তাঁর সাথে ছিলেন। এক এক করে তিনি সবার কাছে গেলেন। ইহরাম বাঁধার জন্য গোসল করলেন। এটা ফরয গোসল ছিল না। ইবনে হাযম ফরয গোসল ছাড়া অন্য গোসলের উল্লেখ করেন নি। এটা হয় তিনি ভুলে করেন নি কিংবা প্রমাণের অভাবে করেন নি।

জ্‌হরের দ্‌'রাকআত কসর পড়ার পর তিনি বসে বসে 'তাহলীল' পড়েছেন। ইহরামের জন্য তিনি আলাদা দ্‌'রাকআত নামায পড়েছেন বলে কোন বর্ণনা তাঁর থেকে পাওয়া যায় না।

আমাদের দাবী হল, হযরতের (সঃ) এ হজ্ব কিরান হজ্ব ছিল। আমাদের এ দাবীর সমর্থনে বিশটি হাদীছ আমার কাছে রয়েছে। মোট কথা, সে সব হাদীছের একটি হল সহীহ ম্‌সলিমে বর্ণিত কুতায়বার হাদীছ। তিনি লায়েছ থেকে, তিনি নাফে' থেকে ও তিনি ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—হযরত (সঃ) হজের সাথে উমরা মিলিয়ে নিয়েছেন এবং হজ্ব ও উমরার জন্য একই তাওয়াফ করেছেন। তেমনি সহীহ ম্‌সলিমে বর্ণিত ইমরান ইবনে হিসীনের হাদীছটি। তাতে বলা হয়েছে—রস্‌ল (সঃ) হজ্ব ও উমরা একত্রে করেছেন। কারণ, তিনি জানতেন যে, এটাই তাঁর আখেরী হজ্ব।

হযরতের (সঃ) হজ্ব কি তামাত্ত্‌ ছিল, না কিরান? সহীহদ্বয়ে সাঈদ ইবনে ম্‌সাইয়েব থেকে বর্ণিত আছে যে, আসফান নামক স্থানে হযরত উছমান (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) একত্র হন। উছমান (রাঃ) হজ্ব ও উমরা একত্র করতে নিষেধ করছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) বললেন—যে

কাজ রসূল (সঃ) করেছেন, আপনি তা নিষেধ করছেন? উছমান (রাঃ) বললেন—আপনার ও কথা এখন রেখে দিন। আলী (রাঃ) বললেন—'আমি আপনাকে কি করে এরূপ কথা বলতে দিতে পারি? এটা তো হতে পারে না।' হযরত উছমান (রাঃ) তাঁর এ দৃঢ়তা দেখে হজ্ব ও উমরা একত্র করলেন (অর্থাৎ তামাত্তু হজ্ব করলেন)।

এ তো গেল সহীহ মুসলিমের ভাষ্য। সহীহ বুখারীর ভাষ্য হল এই, আলী (রাঃ) ও উছমান (রাঃ) যখন আসফানে একত্রিত হলেন, দু'জনের ভেতর তখন মতান্তর দেখা দিল তামাত্তু হজ্ব নিয়ে। আলী (রাঃ) বললেন—'আপনার এ কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূল (সঃ) যে কাজ করে গেছেন তা থেকে লোকদের ফিরিয়ে রাখা।' তারপর বাদানুবাদ যখন বেড়ে যাচ্ছিল, তখন উছমান (রাঃ) তার কথা মেনে নিলেন।

বুখারী শরীফেই হাকাম ইবনে মারওয়ান থেকে বর্ণিত আছে যে, উছমান (রাঃ) যখন তামাত্তু হজ্ব নিষিদ্ধ করতে চাইলেন অর্থাৎ হজ্ব ও উমরা একত্র করতে নিষেধ করছিলেন, তখন দেখতে পেলাম, আলী (রাঃ) হজ্ব ও উমরা একত্র করলেন এবং উ'চু কন্ঠে বললেন—হজ্ব ও উমরা লাব্বায়েক। তারপর বললেন—কারো বলার কারণে আমি রসূলুল্লাহর (সঃ) সুন্নাত বর্জন করতে পারি না।

বুখারীর এ ভাষ্য যেসব ব্যাপারের ওপর আলোকপাত করে তা হচ্ছে এই:

এক, হজ্ব ও উমরা একত্র করাকে এ সাহাবাদ্বয় তামাত্তু নাম দিতেন।

দুই, হযরত (সঃ) থেকে কিরান অথবা তামাত্তু প্রমাণিত হয়।

তিন, উছমান (রাঃ)ও তামাত্তু হজ্বকে রসূলের (সঃ) কাজ বলে মেনে নেন। যদি তা হযরতের (সঃ) কাজ না হত তা হলে তিনি আলী (রাঃ) এর কথা মানতেন না, বরং সাফ অস্বীকার করতেন। তিনি তো সুন্নাতে রসূলের অনুসরণ করে হজ্ব ও উমরা একত্র করলেন।

চার, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তামাত্তু হজ্বের সুন্নাত মানসুখ হয়নি।

তামাত্তুই কিরান:

এভাবে সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত (সঃ) চারটি উমরা করেছেন। শেষ উমরা তিনি হজ্বের সাথে মিলিয়ে করেছেন। এটা বিদায় হজ্বের ঘটনা।

এ ব্যাপারে সব হাদীছের বর্ণনাই প্রায় এক। মতপার্থক্য যা আছে তা খুবই সামান্য। সাহাবায়ে কিরাম থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, হযরত (সঃ) তামাত্তু হজ্ব করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম তামাত্তু হজ্ব বলে কিরান হজ্বকে বুঝাতেন।

বুখারী ও মুসলিমে মাতরাফ হযরত ইমরান ইবনে হিসীনের হাদীছ বর্ণনা করেন। তাতে তিনি বলেন: রসূল (সঃ) হজ্ব ও উমরা একত্রে করেছেন এবং এ কাজ তিনি ইন্তেকাল পর্যন্ত

নিষিদ্ধ করেন নি। তা ছাড়া কুরআনেও এমন কোন আয়াত নেই যা থেকে তা নাজায়েয প্রমাণিত হয়।

ইমরান ইবনে হিসীনের অপর এক বর্ণনায় তিনি বলেন—রসূল (সঃ) তামাত্তু হজ্জ করেছেন এবং আমরাও তাঁর সাথে দু'টো মিলিয়ে করেছি।

ইমরান (রাঃ) এক মর্যাদাবান পূর্বসূরী ছিলেন। তিনি খবর দিলেন যে, হযরত (সঃ) তামাত্তু হজ্জ করেছেন। মানে, হজ্জ ও উমরা তিনি একত্রে করেছেন। সাহাবাদের পরিভাষায় কিরানই তামাত্তু। খুলাফায়ে রাশেদীনের সবাই এটা মেনে নিয়েছেন। ইমরান বিশুদ্ধতম সনদে বর্ণনা করেন যে, হযরত (সঃ) হজ্জ ও উমরা মিলিয়ে কিরান হজ্জ করেছেন। অন্যত্র তিনি এটাকে তামাত্তু হজ্জ বলেছেন। এভাবে উনিশ জন সাহাবী বলেছেন—আমরা নবী করীম (সঃ) কে হজ্জ ও উমরা আদায়ের সময় তালবিয়া পড়তে দেখেছি।

হযরতের তালবিয়া :

জুহর নামাযের পরে হযরত (সঃ) জোরে জোরে নিম্নরূপ তালবিয়া পড়লেন :

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ٥

"ওগো পরোয়ারদেগার! আমি হাযির হয়েছি; আমি হাযির হয়েছি, তোমার কোন শরীক নেই, আমি হাযির হয়েছি, নিশ্চয় সব প্রশংসা ও নিআমত তোমারই আর হুকুম ও হুকুমাতও সব তোমার, তোমার কোন জুড়ি নেই।"

তিনি অত্যন্ত জোরে জোরে এ তালবিয়া পড়েছেন। সব সাহাবাই তা শুনেছেন। তিনি আল্লাহ পাকের ফরমান মোতাবেক তাদেরও জোরে জোরে পড়তে বলেন।

এ হজ্জের সফর তিনি উটে চড়ে করেছেন, অন্য কোন রূপ বাহনে নয়। তাই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে যে, মুহরিমের জন্য অন্য কোন বাহনে চড়া ঠিক নয়। এ ব্যাপারেও মতভেদ দেখা দিয়েছে। একটি হল বৈধতার মত। ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রঃ) এর মাজহাব এটাই। ইমাম মালিকের মাজহাবে তা অবৈধ।

হজ্জ সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা :

হজ্জের এ সফরকালে জুল হালীফায় হযরত আবু বকরের (রাঃ) স্ত্রী আসমা বিন্তে আমীসের সন্তান হয়। এ সন্তানই মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর। রসূল (সঃ) হযরত আসমা (রাঃ) কে নির্দেশ দিলেন গোসল করে ইহরাম বেঁধে হজ্জের সফর অব্যাহত রাখতে। এ ঘটনা থেকে তিনটি মাসআলা প্রকাশ পায় :

Contents

এক, মুহরিমের জন্যও গোসল বৈধ।

দুই, মুহরিম নারী মাসিকগ্রস্তা হয়েও গোসল করতে পারবে।

তিন, মাসিকগ্রস্তা নারীরও ইহরাম বাঁধা বৈধ।

মুহরিম বৈধ শিকারের গোশত খেতে পারে :

তারপর হযরত (সঃ) তালবিয়ার সাথে সফর অব্যাহত রাখলেন। এ কাফেলা যখন রওহা নামক স্থানে পেঁাছল, তখন তিনি একটা বন্যগাধা দেখতে পেলেন। হযরত (সঃ) সাহাবাদের বললেন, 'ওটা ধরতে যেয়ো না। হয়ত ওটার মালিক এসে যাবে।' ইত্যবসরে সেটার মালিক হাযির হয়ে বলল : হে আল্লাহর রসূল ! এ বন্যগাধাটি কবুল করুন।

রসূল (সঃ) তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলায় তিনি তা জবাই করে সবার ভেতরে বন্টন করলেন। এ ঘটনা থেকে নিম্ন মাসআলাগুলো সৃষ্টি হল :

এক, মুহরিম বৈধ শিকারের গোশত খেতে পারে। শর্ত হল গায়ের মুহরিম তা শিকার করে পেশ করবে এবং তা তার নিজের জন্য শিকার করা হবে না।

দুই, কাউকে কিছু 'হেবা' করার জন্য বিশেষ শব্দ ব্যবহার জরুরী নয়, বরং যে কোন শব্দে তার অর্থ প্রকাশ পেলেই হবে।

তিন, গোশত ও হাড় মিলানো গোশতও আন্দাজ করে ভাগ করা যেতে পারে।

চার, শিকারীর শিকারে কারো অপত্তি না আসলে সে শিকার করা বস্তুর মালিক হয়ে যায়।

পাঁচ, বন্যগাধার গোশত হালাল।

ছয়, বন্টন কাজের দায়িত্ব অপরকেও দেয়া যেতে পারে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

●

কুরবানী

উট-গরুর মাসআলা

একটি গরু বা উট ক'জনের তরফ থেকে কুরবানী দেয়া যাবে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এক অভিমতে সাত জনের তরফ থেকে দেয়া যায়। ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর মাজহাব এটাই। ইমাম ইসহাকের মতে দশ জনের পক্ষ থেকে দেয়া যাবে।

রসূল (সঃ) গণীমত বন্টন করতে গিয়ে একটি উট দশজনের ভেতরে ভাগ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তিনি উম্মুল মু'মিনীনদের তরফ থেকে একটি উট কুরবানী দিয়েছেন। তাঁরা ছিলেন ন'জন।

হযরত সুফিয়ান আবু যুবায়ের থেকে ও তিনি জাবির থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত জাবির (রাঃ) রসূলুল্লাহর (সঃ) সাথে হজ্জে গিয়ে দশজনে মিলে একটি উট কুরবানী করেছেন। এ হাদীছটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুসারে যদিও বিশুদ্ধ, তথাপি তিনি এ হাদীছটি উধৃত করেন নি। তিনি যে হাদীছটি উধৃত করেছেন তাতে বলা হয়েছে ঃ

'আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে ছিলাম। হজ্জে তিনি তাহলীল বলিয়াছেন। আমাদের সাথে নারী ও শিশুরা ছিল। আমরা যখন মক্কায় পেঁছলাম তখন পবিত্র কা'বা ঘর তাওয়াফ করলাম এবং সাফা মারোয়ায় সাঈ করলাম। তখন রসূল (সঃ) আমাদের নির্দেশ দিলেন উট ও গরু ভাগে কুরবানী করতে এবং বললেন—আমাদের সাতজনের জন্যে একটি উটই যথেষ্ট হবে।

মুসনাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ "আমরা নবী করীম (সঃ) এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। কুরবানীর সময় এল। তখন এক গরুতে আমরা সাতজন, ও এক উটে দশজন শরীক হলাম।" (নাসায়ী ও তিরমিজী)। হাদীছটি 'হাসান গরীব।'

সহীহদ্বয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ "হুদায়বিয়ার বছর আমরা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাথে এক একটি উট সাতজনে ও এক একটি গরু সাতজনে মিলে কুরবানী দিয়েছি।

হযরত হুজায়ফা (রাঃ) বলেন—রসূল (সঃ) তাঁর হজ্জের সময়ে এক গরুতে সাতজনকে অংশীদার করেছেন (মুসনাদে আহমদ)।

উপরোক্ত হাদীছগুলোর সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, সাত ভাগের হাদীছ অধিক ও অধিকতর বিশুদ্ধ। তাই সেগুলোই অনুসরণ করতে হবে। অথবা বলা যায়, গণীমতের ব্যাপারে একটি উটকে দশটি বকরীর সমান ধরা হবে। কিন্তু কুরবানীর ক্ষেত্রে একটি উট সাতজনের

জন্যই বৈধ হবে। কারণ, পয়লা ক্ষেত্রে কাঁটায় কাঁটায় ভাগ হবে ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আনুমানিক ভাগই যথেষ্ট হবে। অথবা এও বলা যায়, স্থান কাল হিসেবে এ তারতম্য সৃষ্টি হবে। কোথাও এক উট দশ বকরীর সমান হয়, কোথাও সাত বকরীর সমান হয়। তাই যেখানে যেভাবে হয় সে ভাবেই ভাগ হবে।

আবু মুহাম্মদ বলেন—হযরত (সঃ) উম্মুল মু'মিনীনদের তরফ থেকে সদকা হিসেবে এক গরু ও কুরবানী হিসেবে এক গরু জবাই করেন। আর নিজের তরফ থেকে কুরবানীর জন্যে দু'দুম্বা ও সদকা হিসেবে তেষট্টিটি দুম্বা জবাই করেন।

নবী করীম (সঃ) বলেন—সমগ্র মিনাই কুরবানীস্থল। আর মক্কার ময়দান যেমন রাস্তাও, তেমনি কুরবানীস্থলও।

এ বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় যে, কুরবানী শুধু মিনার সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়। বরং মক্কার ময়দানের যেখানেই কুরবানী করা হোক তা জায়েয হবে। যেমন হযরত (সঃ) আরাফাতে অবস্থান নিয়ে বলেন—যদিও আমি এস্থলে অবস্থান করছি, তথাপি সমগ্র আরাফাতই অবস্থানস্থল। মুযদালিফায়ও তিনি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নিয়ে বললেন—যদিও আমি এখানে অবস্থান নিয়েছি, তথাপি গোটা মুযদালিফাই অবস্থানস্থল।

নবী করীম (সঃ)কে জিজ্ঞেস করা হল, মিনায় আপনার জন্য কোন সুবিধাজনক তাবু টানিয়ে দেয়া হবে কি যাতে করে আপনি গরম থেকে বাঁচতে পারেন? হযরত (সঃ) জবাব দিলেন—না। মিনা তো যারা যেখানে যখন পেঁছিবে, তাদের সেখানে থাকার জায়গা।

এ হাদীছ থেকে জানা যায় যে, মিনায় সব মুসলমানের সমান অধিকার এবং যে আগে যেখানে পেঁছে সেখানের সে বেশী হকদার। অবশ্য সে যতক্ষণ তা ছেড়ে না যায়। কারণ, কেউ কোন জায়গার মালিক হয়ে যায় না।

কুরবানীর পর মাথা মুণ্ডানো ঃ

হযরত (সঃ) যখন কুরবানী সম্পন্ন করলেন, তখন নাপিত ডাকলেন এবং মাথা মুন্ডন করলেন। হাজ্জাম (নাপিত) মুআম্মার ইবনে আব্দুল্লাহ ক্ষুর নিয়ে হযরতের মাথার কাছে দাঁড়ালেন। হযরত (সঃ) তার দিকে তাকিয়ে বললেন—হে মুআম্মার! আল্লাহর রসূল তার কর্ণমূল তোমার অধিকারে ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ তোমার হাতে অস্ত্র রয়েছে। মুআম্মার জবাব দিল—হে আল্লাহর রসূল! নিঃসন্দেহে এটা আমার জন্য আল্লাহর এক বিশেষ নিআমত। রসূল (সঃ) বললেন—হাঁ, তাই।

ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে ও ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ বুখারীতে বর্ণনাটি উধৃত করেন। কেউ কেউ মনে করেন, হযরতের (সঃ) হাজ্জাম ছিল সেদিন মুআম্মার ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে হাঞ্জালা ইবনে আওফ।

তারপর তিনি হাজ্জামকে বললেন—মাথা মুন্ডন কর। এই বলে তিনি তার ডান দিকে ইংগিত করলেন। যখন তার মুন্ডন কার্য সম্পন্ন হল, তখন তিনি তাঁর আশপাশের লোকদের ভেতর চুলগুলো বন্টন করলেন। অতপর হাজ্জামকে ইশারা করলেন। তখন সে বাম দিকের চুল কামিয়ে দিল। তখন হযরত (সঃ) জিজ্ঞেস করলেন—আবু তালহা এখানে আছে ? সে এগিয়ে এলে ওই চুলগুলো তাকে দিলেন। সহীহ মুসলিমের ভাষ্য এরূপ।

সহীহ বুখারীতে হযরত ইবনে সিরীন (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—'নবী করীম (সঃ) যখন মাথা মুন্ডালেন, তখন তাঁর কেশ মুবারক সর্বাগ্রে আবু তালহা লাভ করেন।'

এ বর্ণনাটি মুসলিমের বর্ণনার পরিপন্থী নয়। এও হতে পারে যে, আবু তালহাও অন্যান্যের সাথে ডানদিকের কেশ লাভ করেছিলেন। এখন বামদিকেরগুলো বিশেষভাবে পেলেন। কিন্তু ইমাম মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে এও বর্ণনা করেন যে, যখন নবী করীম (সঃ) জামারায় কংকর মারলেন এবং কুরবানীর পশু জবাই করলেন ও মাথা মুন্ডন করলেন, তখন হাজ্জামকে প্রথম ডানদিক এগিয়ে দিয়েছিলেন। হাজ্জাম যখন ডানদিকের কেশ মুন্ডন সম্পন্ন করল, তখন তিনি আবু তালহা আনসারীকে ডেকে সেগুলো তাকেই দান করেন। তারপর হাজ্জামের দিকে বামদিক এগিয়ে দিলেন এবং বললেন—মুন্ডন কর। সে যখন তা মুন্ডন সম্পন্ন করল, তখন তিনি আবু তালহাকে ডেকে বললেন—এগুলো অন্যান্যের ভেতর বন্টন করে দাও।

পয়লা বর্ণনায় দেখা যায়, আবু তালহা বামদিকের কেশ লাভ করেন। অথচ দ্বিতীয় বর্ণনা অনুসারে তিনি ডানদিকের কেশ লাভ করেন। হাফিজ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহিদ মাকদাস বলেন—মুসলিম (রঃ) হিফস ইবনে গিয়াছ ও আবদুল আলা ইবনে আবদুল আলা থেকে, তারা হিশাম ইবনে হাসান থেকে, তিনি মুহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে ও তিনি নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন—হযরত (সঃ) তাঁকে বামদিকের কেশ প্রদান করেন। ইমাম মুসলিম সুফিয়ান ইবনে আয়নিয়া থেকে ও তিনি হিফস ইবনে হাসান থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত (সঃ) আবু তালহাকে ডানদিকের কেশ প্রদান করেন। ইবনে আওন ইবনে সিরীন থেকে যে বর্ণনা প্রদান করেন, তা সুফিয়ানের বর্ণনার সহায়ক।

আমি বলছি, ইবনে আওনের বর্ণনা বুখারীর বর্ণনার সমার্থক। তাতে বলা হয়, কেশ মুবারক হাসিলের ব্যাপারে আবু তালহা অগ্রাধিকার পেয়েছে এবং তাকে তা নির্দিষ্টভাবে প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা বলেন, আবু তালহা নির্দিষ্টভাবে বামদিকের কেশ লাভ করেছেন, তা তারা এ জন্য বলেছেন যে, নবী করীম (সঃ) এর দান করার রীতি এটাই ছিল যে, প্রথমে সাধারণভাবে দান করে পরে বিশেষ ভাবে কাউকে কিছু দান করতেন। অধিকাংশ বর্ণনার তাৎপর্যও তাই।

ইমাম আহমদ মুহাম্মদ ইবনে যায়েদের হাদীছ উধৃত করেন। তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরতের (সঃ) সাথে মিনায় কুরবানীর সময়ে উপস্থিত ছিলেন। রসূল (সঃ) যখন কুরবানীর গোশ্‌ত বন্টন করছিলেন, তখন কুরায়েশদের এক ব্যক্তি তার ভাগ পায়নি, তার এক সাথীও পেলনা। অতপর নবী করীম (সঃ) কাপড় পেতে মাথা মুন্ডন করলেন এবং তাকে কেশ মুবারক দান করলেন। সে তা থেকে কিছু অংশ অন্যান্যের ভেতরে বন্টন করল। তারপর হযরত (সঃ) নখ কাটলেন। সেগুলো তিনি সেই ব্যক্তির সাথীটিকে দিলেন। সে ব্যক্তি বলেছে—আমার কাছে হযরতের (সঃ) মেহেদী রঙে রাঙানো কেশ মুবারক মওজুদ আছে।

হযরত (সঃ) মাথা মুন্ডনকারীদের জন্য তিনবার ও চুল ছোট করার লোকদের জন্য একবার দোআ করেন। তাই প্রায় সব সাহাবাই মাথা মুন্ডন করেন। কিছু সংখ্যক সাহাবামাত্র চুল ছাঁটিয়ে ছিলেন।

এ ব্যাপারটি আল্লাহ্ পাকের নিম্ন বাণীর বাস্তবায়ন বটে ঃ

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ◎

"অবশ্যই তোমরা মসজিদুল হারামে ইনশাআল্লাহ্ কেশ মুন্ডিত ও কেশ ছাটা অবস্থায় প্রবেশ করবে।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন—আমি নবী করীম (সঃ)কে ইহরামের জন্য ইহরামের আগে ও হালাল হবার আগে খোশবু লাগিয়ে দিয়েছি। এ কথা প্রমাণ করে যে, মাথা মুন্ডনও নুসুকের অন্তর্ভুক্ত।

তাওয়াফে ইফাযা ঃ

হযরত (সঃ) জুহরের আগে বাহনে উঠে মক্কায় পেঁছিলেন এবং তাওয়াফে ইফাযা সম্পন্ন করলেন। এটাই তাঁর তাওয়াফে যিয়ারত ছিল। এটাই প্রথম তাওয়াফ। এর আগে তিনি কোন তাওয়াফ করেন নি। এ প্রশ্নে তিনটি মত সৃষ্টি হয়েছে।

একদলের ধারণা, তিনি দু'তাওয়াফ করেছেন। একটি হল তাওয়াফে কুদুম ও অপরটি ইফাযা।

দ্বিতীয় দলের ধারণা, তিনি যেহেতু কিরান হজ্জ করেছেন, তাই এ তাওয়াফের সাথে সাঈও করেছেন।

তৃতীয় দলের ধারণা এই যে, তিনি সে দিন তাওয়াফ করেননি এবং রাত পর্যন্ত তা বিলম্বিত করেছেন।

এ ব্যাপারে আমি ভ্রান্তি নিরসন করতে চাই এবং সঠিক অবস্থাটি তুলে ধরতে চাই। আল্লাহই তাওফীক দেবার মালিক।

আছরাম বলেন—আমি আবু আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম যে, তামাত্তু হজ্বকারী ফিরে এসে কয় তাওয়াফ করবে? তিনি বললেন—হজ্বের জন্য তাওয়াফ ও সাঈ করবে এবং যিয়ারতের জন্য আবার তাওয়াফ করবে।

শায়েখ (রঃ) বলেন—কারিন ও মুফরিদ যদি কুরবানীর দিনের আগে মক্কা পৌছেতে না পারে এবং যদি তারা তাওয়াফে কুদুমও না করে থাকে, তখন উভয়ের জন্য উক্ত ব্যবস্থাই রয়েছে। কারণ, সে তাওয়াফে কদুম ও তাওয়াফে যিয়ারত দু'টোই একসংগে শুরু করছে।

ইমাম আহমদ (রঃ) এ ব্যাপারে হাদীছ উধৃত করেছেন। তিনি হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীছ দলিল হিসেবে পেশ করেছেন। হযরত আয়েশা (রঃ)বলেন—যারা কা'বা ঘর ও সাফা-মারওয়ার উমরার নিয়্যত করেছিল, তারা তাওয়াফ করে ইহরাম খুলল। তারপর মিনা থেকে ফিরে এসে হজ্বের জন্য আবার তাওয়াফ করল। পক্ষান্তরে যারা হজ্ব ও উমরা একত্রে আদায় করেছে, তারা একবারই তাওয়াফ করেছে।

ইমাম আহমদ (রঃ) এ হাদীছ থেকে এটাই বুঝেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) এর তাওয়াফ ছিল হজ্বের জন্য এবং সেটা তাওয়াফে কদুম ছিল। তাই তিনি বলেন—যেহেতু তাওয়াফে কদুম শরীআত নির্ধারিত, তাই তাওয়াফে যিয়ারতের কারণে তা নিষ্প্রয়োজন হয়ে যাবে না। সেটা যেন মসজিদে ঢুকে ফরয পড়ার আগের তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায।

খারকী (রঃ) তাঁর 'মুখতাসার' গ্রন্থে লিখেছেন - যদি তামাত্তু হজ্ব কারী হয়, তা হলে তার উচিত কা'বা ঘর সাতবার প্রদক্ষিণ করা। উমরার জন্য যেভাবে সে করেছে, তেমনি হজ্বের জন্যও করবে। তারপর ফিরে এসে আবার যিয়ারতের নিয়্যতে তাওয়াফ করবে। এটাই আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

"আর তাদের উচিত প্রাচীনতম ঘর (কা'বা) তাওয়াফ করা।"

উপরোক্ত আলোচনার ভেতরে জটিলতা রয়েছে। কারণ, হযরত আয়েশা (রাঃ) কারিন ও মুতামাত্তির ভেতরে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেছেন—"কিরান হজ্বকারীরা মিনা থেকে ফিরে এসে এক তাওয়াফ করেছেন। আর যারা উমরার ইচ্ছা করে রেখেছিল, তারা মিনা থেকে ফিরে এসে হজ্বের নিয়্যতে আবার তাওয়াফ করেছেন।" এটা নিশ্চয়ই তাওয়াফে যিয়া-রত ছাড়া অন্য এক তাওয়াফ। কারণ, তাওয়াফে যিয়ারতে কারিন ও মুতামাত্তি উভয়ে অংশীদার।

তাই এ দু'দলে কোন তারতম্য নেই। শায়েখ আবু মুহাম্মদ (রঃ) মুতামাত্তিঈনদের ব্যাপারে হযরত আয়েশার (রাঃ) বক্তব্যে দেখতে পেলেন যে, তিনি মিনা থেকে ফিরে এসে একবার তাওয়াফ করেছেন। তাই শায়েখ (রঃ) বলেছেন—তাঁর বক্তব্যে এমন কথা পাওয়া যায় না, যাতে জানা যায় যে, তিনি দু'তাওয়াফ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর আপত্তি ঠিকই আছে। কিন্তু তথাপি সমস্যা মিটছে না। একদল তো বলছেন যে, এখানে উরুয়া বা তার ছেলে হিশামের তরফ থেকে কথা সংযোজিত হয়েছে। হাদীছের ভেতরে তাদের কারো কথা এমন ভাবে ঢুকে পড়েছে যে, তা আলাদা করা যাচ্ছে না।

যদি বর্ণনাটি বিশুদ্ধ ও সঠিক হয়, তা হলে বড় জোর বলা যায়, হাদীছটি মুরসাল। তাতেও সমস্যা দূর হয় না। কারণ, সঠিক মত এটাই যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) কারিন ও মুতামাত্তির ভেতরে যে তাওয়াফের দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন, সেটাকে সাফা ও মারওয়ার মধ্যকার তাওয়াফ ধরা যেতে পারে। সেটা কা'বা ঘরের তাওয়াফ ছিল না। এ পথেই সব সমস্যার সমাধান হতে পারে। উম্মুল মু'মিনীন কিরানওয়ালাদের ব্যাপারে বলেছেন, তারা সাফা ও মারওয়ায় একবার তাওয়াফ করেছেন। কুরবানীর দিন তারা দ্বিতীয়বার তাওয়াফ করেন নি। এটাই ঠিক কথা। তারপর তামাত্তুওয়ালাদের ব্যাপারে তিনি বলেন—তারা মিনা থেকে ফিরে সাফা মারওয়ার মাঝে হজ্জের জন্য দ্বিতীয় তাওয়াফ করেন। পয়লা তাওয়াফ ছিল উমরার তাওয়াফ। অধিকাংশ আলিমের মত এটাই। তা ছাড়া হাদীছের এ তাৎপর্য তাঁর বর্ণিত অপর হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়। সে হাদীছে তিনি রসূল (সঃ) এর বক্তব্য উধৃত করেছেন। তাতে তিনি বলেন: "তোমার হজ্জ ও উমরার জন্যে কা'বা ঘরের তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার সাঈ যথেষ্ট হবে।"

হযরত আয়েশা (রাঃ) কারিনওয়ালী ছিলেন। তা ছাড়া এ ব্যাখ্যা অধিকাংশ আলিমের মতের অনুকূল। তবে এ ক্ষেত্রে হযরত জাবিরের হাদীছ সমস্যার সৃষ্টি করে। সহীহ মুসলিমে তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে—"নবী করীম (সঃ) ও তাঁর সাহাবারা সাফা ও মারওয়ার ভেতর একবারই তাওয়াফ করেন।" আগে যে বলা হয়েছে, তামাত্তুওয়ালাদের জন্য এক সাঈ যথেষ্ট, এ হাদীছ তার সমর্থন জোগায়। এর সমর্থনে ইমাম আহমদ (রঃ) থেকেও একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে তার পুত্র আবদুল্লাহ প্রমুখেরও বক্তব্য রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত আয়েশা (রাঃ) যা প্রমাণ করলেন, জাবির (রাঃ) তা অস্বীকার করলেন। প্রমাণকারী স্বভাবতই অস্বীকারকারীর চেয়ে অগ্রাধিকার পায়। অথবা এ ভাবে বলা যায় যে, হযরত জাবিরের হাদীছের তাৎপর্য হবে এই—'যে ব্যক্তি নবী করীম (সঃ) এর সাথে কিরান হজ্জ করেছে এবং আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ), তালহা (রাঃ) প্রমুখের মত কুরবানীর পশু নিয়ে গেছে ও বাম দিকে চলেছে, সে একবারই সাঈ করেছে। তাই তা সব সাহাবার ব্যাপার নয়। অথবা হযরত আয়েশার

(রাঃ) হাদীছটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলা হবে। অর্থাৎ তার ভেতরে হিশামের কথা সংযোজিত হয়েছে। উম্মুল মু'মিনীনের হাদীছের ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম এ তিনটি পথ বেছে নিয়েছেন।

শাফেঈ (রঃ) এর সহচরগণ বলেন—তামাত্তুওয়ালা হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর ও মিনার দিকে যাবার আগে তাওয়াফ করবে ও কদুমের সাঈ করবে। আমি জানিনা, এর সপক্ষে কোন বাণী রয়েছে কিনা। আবু মুহাম্মদ বলেন—না নবী করীম (সঃ) এরূপ করেছেন আর না তিনি তা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, না কেউ এরূপ কথা বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—মক্কাবাসির জন্য হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর মিনা হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তাদের কা'বা ঘরের তাওয়াফ কিংবা সাফা-মারওয়ার সাঈ জরুরী মনে করি না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর বক্তব্যের ওপরেই অধিকাংশ আলিম যথা ইমাম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আহমদ (রঃ) ও ইমাম ইসহাক (রঃ) প্রমুখের ফতোয়া প্রদত্ত হয়ে থাকে। এ মাজহাব যারা পসন্দ করেছেন, তাদের বক্তব্য এই যে, মক্কাবাসী যখন ইহরাম বেঁধে নেয়, তখন বহিরাগতের মতই হয়ে যায়। তাদের যুক্তি হলো—পয়লা তাওয়াফ ছিল উমরার। তাওয়াফে কদুম বাকী ছিল। তা যখন করা হয়নি, তখন হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর তাদের জন্য তা করা মুস্তাহাব।

বর্ণনা দু'টোর কোনটি যঈফ ও দুর্বল নয়। কারণ, হযরত (সঃ) যখন উমরার তাওয়াফ করেন তখন তিনি কারিন ছিলেন। তাঁর সে তাওয়াফের কারণে তাওয়াফে কদুম নিষ্প্রয়োজন হয়ে গেছে। যেমন কেউ যদি মসজিদে ঢুকে দেখে জামাআত দাঁড়িয়ে গেছে, তখন তার জন্য জামাআতে শরীক হওয়াই তাহিয়্যাতুল মসজিদের স্থলাভিষিক্ত হবে। তার জন্য আর তাহিয়্যাতুল মসজিদের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। তেমনি সাহাবায়ে কিরাম যখন নবী করীম (সঃ) এর সাথে হজ্জের ইহরাম বাঁধলেন, তখন তারা তারপর আর তাওয়াফ করেন নি। অথচ তাদের বেশীর-ভাগ তামাত্তু হজ্জকারী ছিলেন।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) থেকে হাসান বর্ণনা করেন—যদি তিনি তারবিয়ার দিন সূর্য হেলার আগে ইহরাম বাঁধতেন, তাহলে তাওয়াফ ও কুদুমে সাঈ করে নিতেন। আর যদি সূর্য হেলার পরে ইহরাম বাঁধতেন, তা হলে তাওয়াফ করতেন না। তিনি এ দু'টো সময়ের ভেতর পার্থক্য সৃষ্টি করতেন। যেহেতু সূর্য হেলার পরেই তিনি সোজা-সুজি মিনায় চলে যেতেন, তাই অন্য কোন আমলে মশগুল হতেন না। হাঁ, যদি সূর্য হেলার আগে ইহরাম বেঁধে নিতেন তো সেগুলো করতেন। মূলত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও অধিকাংশ ইমামের মাজহাবই বিশুদ্ধ ও সঠিক এবং তা সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত কাজের পরিপোষক। আল্লাহ তা'আলাই তাওফীক দেবার মালিক।

তাওয়াফের সময় ঃ

ইমাম বায়হাকী বলেন—এ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলোর ভেতরে নাফে'র হাদীছটি সঠিক। তিনি ইবনে উমর (রাঃ) থেকে হাদীছটি বর্ণনা করেন। হযরত জাবির ও হযরত আবু সালমার আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছও বিশুদ্ধ। তা হচ্ছে এই, হযরত (সঃ) দিনে তাওয়াফ করেছেন।

আমি বলছি—তাওয়াফের নামকরণে গোলমাল হয়ে গেছে। কারণ, নবী করীম (সঃ) বিদায়ী তাওয়াফ রাত পর্যন্ত বিলম্বিত করেছেন। সহীহদ্বয়ে তা হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন—আমরা নবী করীম (সঃ) এর সাথে বের হলাম। যখন আমরা মুহাসসাবে পেঁছিলাম, তখন তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রাঃ) কে ডেকে বললেন—'তোমার বোনকে নিয়ে হারাম শরীফে তাওয়াফ সম্পন্ন করে মুহাসসাবে ফিরে এস।' এভাবে আল্লাহ তা'আলা উমরা পুরা করে দিলেন। আমরা মাঝরাতে তাওয়াফ করেছি। তারপর আমরা মুহাসসাবে ফিরেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—'তোমরা উভয় কাজ সেরে এসেছ? আমরা বললাম —জী হাঁ।

তারপর নবী করীম (সঃ) সবাইকে রওনা করতে বললেন। তিনি কা'বা ঘরের কাছ দিয়ে গেলেন এবং তার তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন। অতপর তিনি মদীনার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। তাই এ তাওয়াফ তিনি মাঝরাতের পরেই করেছেন। আবু যুবায়েরের এ বর্ণনা ভুল যে, হযরতের (সঃ) এটা তাওয়াফে যিয়ারত। নবী (সঃ) এ তাওয়াফে কিংবা বিদায়ী তাওয়াফে 'রমল' করেন নি। তিনি মূলত এটা তাওয়াফে কদুম করেছেন।

যমযমের পানি পান ঃ

তাওয়াফের পর সবাই যেখানে পানি পান করছিল, তিনিও সেখানে (যমযম কূপে) গেলেন। তিনি বললেন—'মানুষের ভীড়ের ভয় না হলে আমিও পানির জন্যে নামতাম ও তোমাদের সাথে পানি পান করতাম।' তখন তারা তাঁকে পানির পাত্র দিল। তিনি দাঁড়িয়েই পানি পান করলেন। বলা হয়, হযরত (সঃ) এর কাজ দ্বারা দাড়িয়ে পানি পানের নিষেধাজ্ঞা বাতিল হয়ে গেছে। একদল আবার বলেন—দাঁড়িয়ে পানি পান করার নিষেধাজ্ঞা যে ঐচ্ছিক, এ থেকে তা সুস্পষ্ট হয়ে গেল। মানে, না করা ভাল, করলে দোষ নেই। অবশ্য একদল বলেন—হযরতের (সঃ) এ কাজ ছিল ঠেকা কাজ। মানুষের ভীড়ে বসার উপায় ছিলনা বলেই তিনি দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন। এটাই সঠিক মত।

এ তাওয়াফ কি তিনি উটে চড়ে করেছেন, না পায়ে হেটে? সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ হযরত (সঃ) বিদায় হজ্জে বাহনে চড়ে কা'বা ঘর তাওয়াফ

করেন এবং তিনি তাঁর লাঠি মুবারক দ্বারা হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের কাজ সম্পন্ন করেন। (আর তা এমনভাবে করেন) যেন সবাই কাজটা দেখতে পায় ও (মাসআলা) জিজ্ঞেস করতে পারে। কারণ, সবাই তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

সহীহ মুসলিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ বিদায় হজ্বে নবী করীম (সঃ) উটে চড়ে তাওয়াফ করেন এবং তিনি তাঁর লাঠি মুবারক দ্বারা হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের কাজ সম্পন্ন করেন। এটা বিদায়ী তাওয়াফ ছিল না। কারণ, এ তাওয়াফ রাতে করা হয়। আর এটা পয়লা তাওয়াফও (কদুমে) ছিল না। এক কারণ হল, তাওয়াফে কদুমে সহীহ বর্ণনামতে 'রমল' (ক্ষিপ্রচলা) ছিল। অথচ এটা কেউ বলছেনা যে, বাহন তাঁকে নিয়ে রমল করেছে।

উমর ইবনে শারীব (রাঃ) বলেনঃ আমি রসূল (সঃ) এর সাথে তাওয়াফ করেছি। তাঁর কদম মুবারক ভূমিসংলগ্ন ছিল। এমন কি তিনি সেই অবস্থায় একদল লোকের কাছে উপস্থিত হলেন। তার তাৎপর্য এই যে, তিনি যখন সাহাবাদের সাথে তাওয়াফ করছিলেন, তখন তাঁর কদম মুবারক ভূমিসংলগ্ন ছিল না। অবশ্য বাহনে তাওয়াফ দ্বারা মাকামে ইব্রাহীমে দু'রাকআত নামায পড়া অস্বীকৃত হয় না। সে নামায তিনি কিভাবে পড়েছেন এর আগে বর্ণিত হাদীছে তা জানা গেছে।

মিনায় প্রত্যাবর্তন:

সেদিন হযরত (সঃ) জুহর নামায কোথায় পড়েছেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সহীহ-দ্বয়ে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছেঃ "নবী করীম (সঃ) কুরবানীর দিন মক্কায় গেলেন। তারপর আবার ফিরে এসে মিনায় জুহর নামায পড়লেন।"

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) মক্কায় জুহর নামায পড়েছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) ও ঠিক এরূপ বর্ণনা প্রদান করেন।

এ দু'ধরনের বর্ণনার কোনটি প্রাধান্য পাবে তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। আবু মুহাম্মদ হাযম বলেন—হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হযরত জাবিরের বর্ণনাই উত্তম। একদল তাঁর এ মতের সমর্থক। কয়েকভাবে এ বর্ণনাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

এক, এটি দু'জনের বর্ণনা। তাই একজনের বর্ণনার চেয়ে তা উত্তম।

দুই, হযরত আয়েশা (রাঃ) অন্যান্যের তুলনায় হযরতের বেশী সান্নিধ্য পেয়েছেন। তাই তিনি তাঁর ব্যাপারে বেশী ওয়াকিফহাল।

তিন, নবী করীম (সঃ) এর হজ্বের ব্যাপারে হযরত জাবিরের হাদীছ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব চেয়ে পরিপূর্ণ। এমনকি তিনি এ ঘটনাটি এমনভাবে মনে রেখেছেন ও খেয়াল করেছেন যে, ছোট খাট ব্যাপার পর্যন্ত বাদ যায় নি। পরন্তু হজ্বের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, এমন

দু'টো ব্যাপারও তিনি মনে রেখেছেন। অর্থাৎ আরাফাতে সমাবেশের রাতে রাস্তায় হুযুর (সঃ) এর ইস্তিনযার জন্য অবতরণ ও হাল্কা ধরনের ওযু করে নেয়ার ব্যাপার দু'টো। যে লোক এত খুঁটিনাটি ব্যাপার খেয়াল করে মনে রেখেছে, সে অবশ্যই হযরতের (সঃ) নামায কখন কোথায় হয়েছে তাও সঠিভাবে খেয়াল করে মনে রেখেছে।

অপরদল কয়েকটি কারণে হযরত ইবনে উমরের বর্ণনাকে প্রাধান্য দেন।

এক, নবী করীম (সঃ) যদি মক্কায় জুহর নামায পড়তেন, তা হলে সাহাবায়ে কিরাম একা কিংবা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মিনায় নামায পড়তেন না। অথচ এরূপ বর্ণনা তো কেউই করেন নি। তাদের তো ওয়াজিব ছিল হযরতের (সঃ) মনোনীত ইমামের পেছনে জামাআত করে নামায পড়া। কেউ তো একথাও বলেন নি যে, হযরত (সঃ) (মিনায়) নামায পড়াবার জন্য অমুককে ইমাম মনোনীত করেছিলেন এবং তিনি সবাইকে নামায পড়িয়েছেন।

দুই, হযরত (সঃ) যদি মক্কায়ই জুহর পড়ে থাকেন, তা হলে তাঁর পেছনে মক্কার কিছু না কিছু মুকীম লোকও নামায পড়েছেন। তা হলে তিনি নিশ্চয়ই তাদের নামায পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ এ ধরনের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। এও জানা যায়না যে, তিনি সালাম ফিরাবার পর তারা দাঁড়িয়ে নামায পূর্ণ করেছেন। যখন এ ধরনের কোন বর্ণনাই নেই তো জানা গেল যে, তিনি তখন মক্কায় নামায পড়েন নি।

তিন, হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এর হাদীছটি সহীহদ্বয়ে বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে হযরত জাবিরের হাদীছটি শুধু মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। তাই হযরত ইবনে উমরের (রাঃ) হাদীছটি অধিকতর বিশুদ্ধ। পরন্তু এ হাদীছের রাবীরাও অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও মেধাবী। হাতিম ইবনে ইসমাঈলের মোকাবেলায় উবাইদুল্লাহর ও নাফে'র তুলনায় জা'ফরের কি গুরুত্ব রয়েছে?

চার, তাওয়াফের ঘটনা বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত আয়েশা (রাঃ) এর বর্ণনা অস্পষ্ট (মুযতারাব)। কারণ, এ ব্যাপারে তাঁর থেকে তিন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক, হযরত (সঃ) দিনে তাওয়াফ করেছেন। দুই, তিনি রাত পর্যন্ত তাওয়াফ বিলম্বিত করেছেন। তিন, দিনের শেষ ভাগে রওয়ানা হন। তা ছাড়া তাঁর বর্ণনায় ইফাযার ও নামাযের সময় সুনির্দিষ্ট নয়। পক্ষান্তরে ইবনে উমর (রাঃ) এর বর্ণনায় তা সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পাঁচ, হযরত আয়েশার (রাঃ) বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি যে, হযরত (সঃ) মক্কায় জুহর পড়েছেন। কারণ তাঁর বর্ণনার ভাষা এই: "নবী করীম (সঃ) দিনের শেষভাগে রওয়ানা হলেন এবং তিনি জুহর নামায পড়ে নিয়েছিলেন। তারপর তিনি মিনায় ফিরে এলেন এবং আইয়ামে তাশরীকের রাতগুলো সেখানে কাটান। এমন কি যখন সূর্য হেলে যেত, তখন তিনি প্রতি জামারায় সাতটি কংকর মারতেন।" এতে দেখা যায় যে, তাঁর বর্ণনায় হযরত (সঃ) মক্কায় জুহর পড়েন একথা বলা হয় নি। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) এর

বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত (সঃ) মিনা থেকে মক্কায় গেলেন এবং মিনায় ফিরে এসে জুহর নামায পড়লেন। শেষ কথা এই যে, যে হাদীছের ওপর হাদীছবেত্তারা একমত, সে হাদীছের মোকাবেলায় যে হাদীছকে প্রামাণ্য বলতে তাদের মতভেদ রয়েছে তার কি গুরুত্ব থাকতে পারে ?

আর সেদিন হযরত আয়েশা (রাঃ) এক তাওয়াফ ও এক সাঈ করেন এবং তাঁর হজ্বের জন্য এক তাওয়াফ ও এক সাঈ যথেষ্ট ছিল। তা ছাড়া হযরত সফিয়া (রাঃ) যখন তাওয়াফ সম্পন্ন করেন, তখন তাঁর মাসিক দেখা দেয়। তাই এ তাওয়াফই তাঁর বিদায়ী তাওয়াফের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। ফলে তিনি বিদায়ী তাওয়াফ করেন নি। এ থেকে নারীদের হজ্বের ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) এর নির্ধারিত রীতি জানা গেল। তা এই যে, যদি কিরান হজ্বে কোন নারী বিদায়ী তাওয়াফের আগে মাসিকগ্রস্তা হয়, তা হলে তার জন্য এক তাওয়াফ ও এক সাঈ যথেষ্ট হবে। যদি ইফাযা তাওয়াফের পরে মাসিকগ্রস্তা হয়, তা হলে উক্ত তাওয়াফই তার বিদায়ী তাওয়াফের জন্য যথেষ্ট হবে।

কংকর নিক্ষেপ ঃ

হযরত (সঃ) মিনায় রাত কাটালেন। সকাল হলে তিনি সূর্য হেলা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। সূর্য হেলার পর তিনি জামারার দিকে পায়ে হেটে এগোলেন। জামারায়ে উলা থেকে শুরু করলেন, যা ছিল মসজিদে খায়েফের কাছাকাছি। সেখানে তিনি এক এক করে সাতটি কংকর মারলেন। প্রতিটি কংকর মারার সময় তিনি আল্লাহু আকবার বললেন। তারপর তিনি জামারার সামনে এগিয়ে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে সূরা বাকারা পড়লেন এবং দীর্ঘ দোআয় নিমগ্ন হলেন। অতপর তিনি মধ্যবর্তী জামারায় গেলেন। তারপর প্রান্তর সংলগ্ন বাম দিকের ভূখণ্ডে এসে কিবলামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে আগের মতই দীর্ঘ মুনাজাত করলেন।

তারপর তৃতীয় জামারায় গেলেন। এ জামারাকে উকুহ বলা হয়। তিনি প্রান্তরের মাঝখানে জামারার সামনা সামনি দাঁড়ালেন। কা'বাকে বামে ও মিনাকে ডাইনে রেখে দাঁড়ালেন। সেটায়ও তিনি সাতটি কংকর মারলেন। জাহিলদের মত তিনি তার ওপরের অংশে মারেন নি। সেটাকে ডাইনে রেখেও তা করেন নি। কংকর মারার সময়ে তিনি কিবলামুখী হয়ে নিয়েছেন। কয়েকজন ফকীহ এ কথাই বলেছেন।

তিনি যখন কংকর মারা শেষ করলেন, সংগে সংগে ফিরে এলেন। সেখানে মোটেও বিলম্ব করলেন না। একটি মত এই যে, তিনি পাহাড়ের পাদদেশে জায়গার সংকীর্ণতার জন্য বিলম্ব করেন নি। সঠিক মত এই যে, উক্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত তার দোআ-কালাম সেখানে ইবাদত ছিল। কিন্তু তা সমাপ্তির পর সেখানের দোআ-কালাম ইবাদত নয় বিধায় তা

উত্তমও নয়। তাঁর নামাযেও এ রীতি অনুসৃত হত। নামাযের ভেতরেই তিনি দোআ-কালাম যা কিছু সম্পন্ন করতেন। নামাযের পর তিনি বসে দোআ করেছেন বলে তাঁর থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। যারা নামাযের পরে মুনাজাতের কথা বর্ণনা করেছে, তারা ভুল বর্ণনা করেছে। এটাও ভুল কথা যে, তিনি সালাম ফিরিয়ে মুনাজাত করেছেন। এ বর্ণনার বিশুদ্ধতা সংশয়াতীত নয়।

মোট কথা, হযরতের (সঃ) অধিকাংশ দোআ এবং তিনি যা হযরত আবু বকর (রাঃ) কে শিখিয়ে ছিলেন তা নামাযের ভেতরের দোআ। কিন্তু হযরত মাআজ ইবনে জাবালের (রাঃ) হাদীছে আছে—প্রতি নামাযের শেষে অবশ্যই এ দোআ পড়বে ঃ

اللهم اعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك -

"হে আল্লাহ! তোমার জিকর, শোকর ও উত্তম ইবাদতের জন্যে আমাকে মদদ কর।"

এখানেও নামাযের শেষে বলতে নামাযের শেষভাগে বুঝানো হয়েছে। যেমন প্রান্তরের শেষে বলতে প্রান্তরের শেষভাগে বুঝায়। কখনও অবশ্য নামাযের শেষে বলতে সালামের পরের কথা বুঝানো হয়েছে। যেমন হযরত (সঃ) বলেছেন, প্রতি নামাযের শেষে তাসবীহ-তাহলীল পড়বে (হাদীছ)।

আমার মনে হয় হামেশা একটা খটকা লেগে রয়েছে যে, হযরতের (সঃ) কংকর মারার কাজটি কি জুহরের আগে হয়েছে, না পরে? সম্ভবত তিনি নামাযের আগেই কংকর মারতেন। তারপর ফিরে এসে নামায পড়তেন। কারণ, জাবির (রাঃ) প্রমুখ বলেন—সূর্য হেলার পরই হযরত (সঃ) কংকর মারতেন। তা ছাড়া মিনায় ক'দিন কংকর মারার সময়টা সেরূপই যেরূপ কুরবানীর দিন সূর্যোদয়ের ব্যাপারটি। কুরবানীর দিন যখন কংকর মারার সময় এসে যেত, তখন তিনি তার ওপরে কোন ইবাদতকেই অগ্রাধিকার দিতেন না। তিরমিজী (রঃ) ও ইবনে মাজা (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—সূর্য যখন ঢলে পড়ত, তখন রসূল (সঃ) কংকর মারতেন। ইবনে মাজা (রঃ) এও বর্ণনা করেন যে, কংকর মারা শেষ করে তিনি জুহর পড়তেন। তিরমিজী (রঃ) হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন। কিন্তু তিরমিজীর সনদে হাজ্জ ইবনে আরতাত ও ইবনে মাজার সনদে ইব্রাহীম ইবনে উছমান ইবনে শায়বা রয়েছে। তাদের বর্ণনা দলীল হয় না। অথচ এ ব্যাপারে এ ছাড়া আর অন্য কোন বর্ণনা নেই।

ইমাম আহমদ (রঃ) বর্ণনা করেন—কুরবানীর সময় রসূল (সঃ) বাহনে চড়ে কংকর মারতেন। তবে সেখানে যাওয়া-আসা করতেন পায়ে হেটে।

দোআর স্থান ঃ

এক—সাফা, দুই—মারওয়া, তিন—আরাফাত, চার—মুসদালিয়া, পাঁচ—জামারায়ে উলার কাছে ও ছয়—জামারায়ে ছানিয়ার কাছে।

Contents

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ

●

হযরতের দ্বিতীয় ভাষণ

হযরতের (সঃ) কুরবানীর দিনের ভাষণ আগেই এসে গেছে। আইয়্যামে তাশরীকের মাঝের দিন তিনি দ্বিতীয় ভাষণ দেন। সূরাআ বিন্তে বিনহান (রাঃ) এর বর্ণনাতেও ভাষণটি আইয়্যামে তাশরীকের দ্বিতীয় দিনেই প্রদত্ত হয়। তিনি বলেন যে, আমি রসূল (সঃ) কে বলতে শুনেছি ঃ "তোমরা কি জান আজ কোন দিন ?" বর্ণনাকারী বলেন—'তোমাদের পরিভাষায় সেটা ইয়াওমুর রুউস।'

সাহাবায়ে কিরাম জবাব দিলেন—আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল (সঃ) তা ভাল জানেন।

হযরত (সঃ) বললেন—এটা আইয়্যামে তাশরীকের মাঝের দিন।

তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন—তোমরা কি জান এটা কোন শহর ?

সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন—আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল তা ভাল জানেন।

রসূল (সঃ) বললেন—এ হচ্ছে মাশআরুল হারাম।

তারপর তিনি বললেন—হয়ত তোমাদের সাথে আমার এখানে আর কখনও দেখা হবে না। মনে রেখ, তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের সম্মান, তোমাদের জন্য এরূপ পবিত্র যেরূপ পবিত্র এ শহরের আজকের এ দিনটি। এমনকি তোমাদের প্রভুর সাথে যতদিন না মিলবে (ততদিন এ কথা স্মরণ রাখবে)। তারপর তিনি তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জবাবদিহী করবেন। সাবধান ! নিকটবর্তীরা দূরবর্তীদের কাছে এ কথা পৌঁছে দিও। সাবধান ! আমি কি আমার কথা পৌঁছে দেইনি ?"

বর্ণনাকারী বলেন—আমরা মদীনায় ফিরে আসার কিছু দিন পর হযরত (সঃ) ইন্তিকাল করেন। —আবু দাউদ

ইয়াওমুর রুউসের সর্বসম্মত তাৎপর্য হল কুরবানীর দ্বিতীয় দিন।

সূরা ফাতহের অবতরণ ঃ

ইমাম বায়হাকী (রঃ) মূসা ইবনে উবায়দা রাবজী থেকে একটি হাদীছ উধৃত করেন। মূসা ইবনে উবায়দা সাদাকা ইবনে ইয়াসার থেকে ও তিনি হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, "রসূল (সঃ) এর ওপর আইয়্যামে তাশরীকের মাঝের দিন সূরা 'ইজা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়ালফাতহু 'নাযিল হয়েছে। তাই জানা গেল যে, এটাই তাঁর বিদায় হজ্জ। সেমতে হযরত (সঃ)

তাঁর বাহন চালককে রওনার নির্দেশ দিলেন। সে প্রস্তুত হল। সব লোক একত্র হলে তিনি ভাষণ দিলেন (পূর্বোল্লেখিত ভাষণ)।"

নবী করীম (সঃ) দু'দিনেই কংকর মেরে শেষ করেন নি; বরং আইয়ামে তাশরীকের তৃতীয় দিনে কংকর মারা পূর্ণ করেন। বুধবার জুহর নামায পড়ে তিনি মুহাসসাবের দিকে তাশরীফ নিলেন। সেটা ছিল এক মরু প্রান্তর। খায়ফে বণী কিনানার কাছাকাছি তা অবস্থিত। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন, আবু রাফে' (রাঃ) তাঁর জন্য তাবু টানিয়ে রেখেছে। যদিও তিনি তাকে এ নির্দেশ দেননি, তথাপি আল্লাহর তরফ থেকেই এ কাজ করার সে তাওফীক পেল। হযরত (সঃ) এখানে জুহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামায পড়লেন। তার কিছুক্ষণ পর তিনি শুয়ে পড়লেন। সেখান থেকে তিনি মক্কায় তাশরীফ নিলেন। রাতে সেহরীর সময়ে তিনি বিদায়ী তাওয়াফ করলেন। এ তাওয়াফে তিনি 'রমল' করেন নি। তারপর তিনি আবার মুহাসসাবে ফিরে না এসে মদীনায় চলে গেলেন।

মুহাসসাবে অবস্থানের ব্যাপারে পূর্বসুরীদের ভেতরে মতানৈক্য রয়েছে। সেখানে অবস্থান কি সুন্নাত, না ঘটনাচক্রে রসূল (সঃ) সেখানে অবস্থান করেছিলেন? একদল বলেন—এটাও হজের সুন্নাতের অন্যতম। কারণ, সহীহয়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে: 'রসূল (সঃ) যখন মিনা থেকে যাওয়া মনস্থ করলেন, তখন বললেন—আমরা আগামী-কাল ইনশাআল্লাহ খায়ফে বণী কিনানায় অবস্থান নেব, যেখানে কাফিররা কুফরীর ওপর শপথ গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ সেই মুহাসসাবে।

ঘটনাটি ছিল এই, কুরায়েশ ও বণু কিনানা মিলে বণু হাশিম ও বণু মুত্তালিবের বিরুদ্ধে শপথ নিল যে, না তাদের সাথে শাদী-বিয়ে করবে, না অন্য কোনরূপে সম্পর্ক রাখবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা হযরত (সঃ) কে তাদের হাতে সোপর্দ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ শপথ বহাল থাকবে। তাই নবী করীম (সঃ) সেখানে ইসলামের একটি নিদর্শন রেখে যেতে চাইলেন। কারণ, সেখানে কাফিররা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে কুফরী ও শির্কের সপক্ষে শপথ গ্রহণ করেছিল। যেমন হযরত (সঃ) বলেছিলেন, লাত ও উযযার জায়গায় তায়েফের মসজিদ তৈরী হোক।

সহীহ মুসলিমে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে: নবী করীম (সঃ), আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) এখানে অবস্থান নিতেন। ইমাম মুসলিম (রঃ) তার থেকে আরও এক বর্ণনা উধৃত করেন। তাতে বলা হয়, ইবনে উমর (রাঃ) মুহাসসাবে অবস্থানকে সুন্নাত মনে করতেন। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন—হযরত ইবনে উমর (রাঃ) সেখানে জুহর, আসর, মাগরিব ও ইশা পড়তেন এবং সেখানেই শুয়ে যেতেন। তারপর বলতেন—রসূল (সঃ) এরূপ করেছেন।

Contents

তিনটি বিতর্কিত মাসআলা :

এক—হযরত (সঃ) হজ্জের সময়ে কি কা'বা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন ?

দুই— তিনি কি বিদায়ী তাওয়াফের পর মুলতাযিমে দন্ডায়মান হয়েছিলেন ?

তিন—বিদায়ী রাত শেষে ফজর নামায কি তিনি মক্কায় পড়েছিলেন, না বাইরে পড়েছেন ?

পয়লা মাসআলার ব্যাপারে বেশ কিছু ফিকাহবিদের ধারণা যে, তিনি হজ্জের সফরে কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। তাই তারা হজ্জের সময়ে কা'বাঘরে প্রবেশ করাকে হজ্জের অন্যতম সুন্নাত বলে মনে করেন। অথচ হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, নবী করীম (সঃ) না হজ্জে, না উমরায় কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছেন। শুধু মক্কা বিজয়ের বছর কা'বা ঘরে প্রবেশ করেন।

সহীহদ্বয়ে হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন—মক্কা বিজয়ের বছর নবী করীম (সঃ) উসামার (রাঃ) উটে চড়লেন এবং কা'বার সামনে উট বসালেন। তারপর উছমান ইবনে তালহাকে চাবি নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। সে চাবি নিয়ে এলে দরজা খোলা হল। তখন হযরত (সঃ), উসামা, বিলাল ও উছমান ইবনে তালহা ভেতরে ঢুকলেন এবং কিছুক্ষণের জন্য দরজা বন্ধ করা হল। তারপর যখন খোলা হল, আবদুল্লাহ বলেন, তখন আমি সর্বাগ্রে সেখানে পেঁছলাম এবং বিলালকে দরজায় দাঁড়ানো দেখলাম। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (সঃ) ঘরের কোন জায়গায় নামায পড়েছেন ? সে বলল—সামনের দুস্তম্ভের মাঝে। বর্ণনাকারী বলেন—আমি এ কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম যে, তিনি ক'রাকআত নামায পড়েছেন।

দ্বিতীয় মাসআলার ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত (সঃ) এর মুলতাযিমে দাঁড়ানোর ঘটনাও মক্কা বিজয়ের দিন ঘটেছিল।

সুনানে আবু দাউদে আবদুর রহমান ইবনে আবু সাফওয়ান থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন—রসুল (সঃ) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন আমি গেলাম। নবী করীম (সঃ) ও সাহাবাদের কা'বার বাইরে দেখতে পেলাম। তিনি কা'বার দরজা থেকে হাতিম পর্যন্ত রুকনে চুমু খাচ্ছিলেন। সাহাবারা কাবার দেয়ালে মুখমন্ডল রেখে দন্ডায়মান ছিল। তাঁদের মাঝখানে রসুল (সঃ) ছিলেন।

আবু দাউদ আমর ইবনে শুআয়ের থেকে, তিনি তার পিতা থেকে ও তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা প্রসংগে বলেন—আমি হযরত আবদুল্লাহর সাথে তাওয়াফ করলাম। যখন আমরা কা'বার পেছন দিকে পেঁছলাম তখন আমি বললাম—আপনি 'তাউজু' পড়বেন না ? তিনি সংগে সংগে বললেন—'নাউজু বিল্লাহে মিনান্নার' (আমরা জাহান্নামের আগুন থেকে পানা চাই)। তারপর তিনি অগ্রসর হলেন। এমন কি হাজরে আসওয়াদে চুমু খেলেন। তারপর বাব ও রুকনের

মাঝখানে দাঁড়ালেন। তার নিজ বুক, কপাল হাত ও ডানা অত্যন্ত প্রসারিত করে (দেয়ালের সাথে) রাখলেন এবং বললেন—আমি রসূল (সঃ) কে এরূপ করতে দেখেছি।

এ ক্ষেত্রে একটা সম্ভাবনা এও রয়েছে যে, তিনি হয়ত তা বিদায় হজ্জে করেছেন কিংবা অন্য কোন সময়ে এ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু মুজাহিদ ও শাফেঈ (রঃ) বলেন—তাওয়াফে বিদার পর মুলতাযিমে দাঁড়ানো ও দোআ করা মুস্তাহাব। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) দরজা ও রুকনের মাঝখানে ইলতিযাম করে দোআ করতেন এবং বলতেন—এ দুটোর মাঝে যে ব্যক্তি ইলতিযাম করে আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তা প্রদান করেন।

তৃতীয় মাসআলাটি হল, বিদায়ী তাওয়াফের পর রসূলে (সঃ) ফজরের নামায কোথায় পড়েছেন? সহীহদ্বয়ে হযরত উম্মে মুসলিমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: আমি নবী করীম (সঃ) এর কাছে আরয করলাম—আমার কষ্ট হচ্ছে। তিনি বললেন—সবার পেছনে থেকে সওয়ারীতে বসে তাওয়াফ কর। আমি তাই করলাম। নবী করীম (সঃ) তখন কা'বার এক অংশে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন এবং 'ওয়াততূরে ওয়া কিতাবিম মাস্তুরে' তিলাওয়াত করছিলেন।

এ বর্ণনা থেকে যেমন ফজর নামায বুঝা যেতে পারে, তেমনি অন্য নামাযও হতে পারে। এও হতে পারে যে, এ ঘটনা বিদায়ী বা অন্য কোন তাওয়াফে ঘটেছে। আমি এ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছি। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে, "রসূলে করীম (সঃ) যখন চলে যেতে মনস্থ করলেন, উম্মে সালমা (রাঃ) তখনও কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে পারেন নি। অথচ তিনিও যাবার মনস্থ করলেন। তখন রসূল (সঃ) তাকে বললেন—ফজরের নামায যখন শুরু হয়েছে এবং সবাই নামায পড়ছে, এখন তুমি উটে চড়ে তাওয়াফ করে নাও। তিনি সেটাই করলেন এবং নামায না পড়েই সবার সাথে চললেন।"

যদি এটা কুরবানীর দিন হয়ে থাকে, তা হলে নিঃসন্দেহে এটা বিদায়ী তাওয়াফ ছিল। তাই জানা গেল যে, হযরত (সঃ) সেদিন ফজরের নামায কা'বার কাছেই পড়েছেন এবং উম্মে সালমা (রাঃ) তাঁকে সূরা 'ওয়াত তূর' তিলাওয়াত করতে শুনেছেন।

●

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

●

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

শিশুর হজ্জ ঃ

হযরত (সঃ) যখন রওহায় পেঁাছলেন, তখন একজন আরোহীর দেখা পেলেন। সে প্রশ্ন করল—এরা কারা ? জবাবে বলা হল—এরা মুসলমান। তারপর প্রশ্ন করল—ইনি কে ? জবাবে বলা হল—ইনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

তখন এক মহিলা একটি শিশু তাঁর সামনে হাজির করে প্রশ্ন করল—এর কি হজ্জ হবে ? রসূল (সঃ) জবাব দিলেন—হাঁ। তুমি তার ছাওয়াব পাবে।

হযরত (সঃ) যখন জুল হালীফায় পেঁাছলেন তো সেখানেই রাত কাটালেন। যখন তিনি মদীনা দেখতে পেলেন, তখন তিনবার তাকবীর বললেন এবং এ দোআ পড়েলেন ঃ

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير آئبون تائبون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب -

"আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তিনি একক ও লা-শারীক। সব রাজ্যই তাঁর। প্রশংসাও সব তাঁর। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, ইবাদতগার, সিজদাকারী ও নিজ প্রভুর প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা বাস্তবায়িত করেছেন, নিজ বান্দাদের মদদ করেছেন ও একাই সব দল পযু'দস্ত করেছেন।"

তারপর তিনি দিনের বেলায় মুআররাসের পথ ধরে মদীনায় প্রবেশ করেন। যাবার সময়ে শাজারার (গাছপালা) পথ ধরে গিয়েছিলেন।

'রসূল (সঃ) হজ্জে যাবার সময়ে সবাইকে বলেছিলেন যে, 'রমযানে উমরা করা হজ্জের সমান।' এটা সুস্টষ্টত ইবনে হাযমের কল্পনা মাত্র। কারণ, একথা তিনি বলেছেন হজ্জ সম্পন্ন করে মদীনায় ফিরে এসে। তিনি উম্মে সিনান আনসারিয়াকে এসে প্রশ্ন করলেন—আমাদের সাথে হজ্জে যেতে তোমার কি অসুবিধে ছিল ? সে আরয করল—আমাদের কাছে শুধু দুটি উট ছিল। আমার ছেলে ও তার বাবা এক উটে চড়ে হজ্জ করেছে। আমাদের জন্য একটি উট রেখে গেছে। সেটা দিয়ে আমরা পানি সংগ্রহ করি। তখন তিনি বললেন—'রমযান এলে উমরা করে নিও।

Contents

কারণ রমযানে উমরা করা তোমার হজ্জের জন্য যথেষ্ট হবে।' (অর্থাৎ হযরত (সঃ) এর সাথে হজ্জ করার সমান ছাওয়াব পাবে)। (সহীহ্ মুসলিম)

তেমনি কথা তিনি মদীনায় ফিরে উম্মে মা'কালকেও বলেছেন। আবু দাউদ (রঃ) ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে ও তিনি উম্মে মা'কাল থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—রসূল (সঃ) যখন বিদায় হজ্জ করেন, তখন আমাদের কাছে একটি উট ছিল। সেটা আবু মা'কাল আল্লাহর রাস্তায় ছেড়ে দিয়েছিল। কারণ, আমাদের এলাকায় রোগ দেখা দিয়েছিল। তাতে আবু মা'কাল ইন্তিকাল করল। ইত্যবসরে নবী করীম (সঃ) রওনা হয়ে গেলেন।

তারপর যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন সে হাজির হল। তাকে রসূল (সঃ) প্রশ্ন করলেন—আমাদের সাথে হজ্জে যেতে তোমার কি অসুবিধে ছিল ? সে আরয করল—আমরা খুবই ইচ্ছুক ছিলাম যেতে। কিন্তু আবু মা'কাল তখন মারা গেল। আমাদের একটি মাত্র উট ছিল। তা সে আল্লাহর রাস্তার উৎসর্গের জন্য অসিয়ত করে গেছে। তখন হযরত (সঃ) বললেন ঃ তুমি সে উটে চড়ে কেন চলে এলেনা ? কারণ, হজ্জও আল্লাহর রাস্তার ইবাদত। এখন যখন আমার সাথে হজ্জ করা তোমার হলনা, তখন রমযানে উমরা করে নাও। কারণ, তাও নিশ্চিতভাবে হজ্জ।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সদকা-কুরবানী-আকীকা

সূরা আনআমে যে আট ধরনের জোড় বাঁধা পশুর উল্লেখ রয়েছে এসব কাজে শুধু সেগুলোই চলবে। এ ছাড়া অন্য কোন ধরনের সদকা, কুরবানী বা আকীকার বর্ণনা হযরত (সঃ) থেকে বর্ণিত হয় নি। কুরআনের চার আয়াত থেকে তা নেয়া হয়েছে।

এক—আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জীব হালাল করেছেন।"

দুই—তিনি অন্যত্র বলেন ঃ

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۔

"আর তারা নির্দিষ্ট দিনগুলোয় চতুষ্পদ জীব হতে আল্লাহ তা'আলা তাদের যে রিযিক দিয়েছেন তার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে।"

তিনি আরও বলেন ঃ

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝

"আর পশুদের মধ্য হইতে তোমাদের ভারবাহী ও সওয়ারী রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের যে রিযিক দান করেছেন তা থেকে খাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

চার—আল্লাহ পাক আরও বলেন :

هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ

এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, যে সব কুরবানীর পশু কা'বায় পেঁছে থাকে তা সেই আট শ্রেণীর থেকে হয়ে থাকে। এটাই হযরত আলী (রাঃ) এর ব্যাখ্যা।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের ও তাঁর ইবাদতের জন্য এগুলো জবাই করা হয়। তার ধরণ তিনটি। এক, সদকা। দুই, কুরবানী। তিন, আকীকা।

হযরত (সঃ) উট ও বকরী কুরবানী দিয়েছেন এবং উম্মুল মু'মিনীনদের তরফ থেকে গরু কুরবানী করেছেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর বাড়ীতে উমরায় ও হজ্জে পশু কুরবানী করেছেন। তাঁর রীতি এই ছিল যে, বকরীর গলায় মালা পরাতেন, কিন্তু তা চিহ্নিত করতেন না। মুকীম অবস্থায় তিনি কোন হালাল জিনিসকে হারাম করতেন না। যখন তিনি কুরবানীর জন্য উট নিতেন, তখন তাতে মালা জড়াতেন, চিহ্ন দিতেন ও দাগ দিতেন। সেটার ডান দিকের রান কিছুটা চিরে দিতেন যার ফলে রক্ত বেরোত।

ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন—চিহ্নিত করার কাজটি ডানদিকেই হয় এবং নবী করীম (সঃ) তাই করেছেন। কুরবানীর পশু যারা নিতেন, তাদের তিনি অন্য সওয়ারী না থাকলে প্রয়োজনে তাতে সওয়ার হতে অনুমতি দিতেন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন—পশুর বাচ্চার খাওয়ার পর যে দুধ বাঁচে, তা মানুষের জন্য পান করার অনুমতি রয়েছে।

নবী করীম (সঃ) এর সুন্নাত এটাই ছিল যে, তিনি উটের বাম পা বেঁধে তিন পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে উট জবাই করতেন। জবাই করার সময়ে তিনি 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলতেন। কুরবানীর পশু তিনি নিজের হাতেই জবাই করতেন। অনেক সময়ে এ কাজ তিনি অন্যকে দিয়ে করাতেন। যেমন তিনি তাঁর একশ পশু কুরবানী করতে গিয়ে কিছু পশু কুরবানীর কাজ হযরত আলী (রাঃ) কে সোপর্দ করেন। যখন তিনি বকরী কুরবানী করতেন, তখন নিজের পা বকরীর ওপর চেপে ধরে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে কুরবানী করতেন।

আগেই বলা হয়েছে, হযরত (সঃ) মিনায় কুরবানী করেছেন এবং বলেছেন, মক্কার সব জায়গাই কুরবানীর স্থল। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলতেন—'উটের কুরবানীস্থল মক্কায়। কিন্তু মক্কাকে রক্তপাত থেকে মুক্ত ও পবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। তবে মিনাও মক্কার অংশ।' ইবনে আব্বাস (রাঃ) মক্কায় কুরবানী করতেন।

নবী করীম (সঃ) তাঁর উম্মতদের কুরবানী ও সদকার গোশত খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন এবং তা হাদিয়া-তোহফা দেবারও অনুমতি দিয়েছেন। তবে তা তিন দিনের বেশী জমিয়ে রাখতে

নিষেধ করেছেন। অবশ্য নিষেধের বছরটিতে মানুষ বড় অভাব অনটনে ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, অভাবীদের উপকার হোক।

আবু দাউদ (রঃ) জুবায়ের ইবনে নুফায়ের থেকে ও তিনি ছাওবান থেকে বর্ণনা করেন: 'রসূল (সঃ) কুরবানী করলেন। তারপর বললেন—হে ছাওবান! আমাদের জন্য একটি বকরী তৈরী করে নাও। তারপর আমি মদীনায় প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত তাঁকে সেই বকরীর গোশতই খেতে দিয়েছি।' ইমাম মুসলিমও এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তার ভাষ্য এরূপ: 'রসূলুল্লাহ (সঃ) বিদায় হজ্জে ছাওবানকে বলেন—এ গোশতগুলো তৈরী করে দাও। ছাওবান বলেন—আমি তা ঠিকঠাক করে নিলাম। হযরত (সঃ) মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত তা থেকেই খাচ্ছিলেন। অনেক সময়ে তিনি কুরবানীর গোশত বন্টন করেছেন। তারপর বলেছেন—'যার ইচ্ছে হয় বন্টন করবে, না হয় নিজে নিয়ে নেবে।' এ থেকে বিক্রির অবৈধতা বুঝা যায়। তবে তা অস্পষ্ট।

কংকর মারার পর কুরবানী:

নবী করীম (সঃ) এর সুন্নাত ছিল এই যে, উমরার কুরবানীর পশু মারওয়ার কাছে ও কিরান হজ্জের কুরবানীর পশু মিনায় জবাই করতেন।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ)ও তাই করতেন।

নবী করীম (সঃ) ইহরাম না ছেড়ে পশু জবাই করেননি এবং কুরবানীর দিনের আগেও পশু জবাই করেন নি। এমনকি কোন সাহাবাও তা করেন নি। তিনি সর্বদা সূর্যোদয়ের পর কংকর মেরে কুরবানী করতেন। তিনি কুরবানীর দিনে পর্যায়ক্রমে চারটি কাজ করতেন:

পয়লা কংকর মারতেন। তারপর কুরবানী করতেন। তারপর মাথা মুন্ডাতেন।, তারপর তাওয়াফ করতেন।

সূর্যোদয়ের আগে কুরবানী করা নিশ্চয় তাঁর সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ। তাঁর নির্দেশ হচ্ছে, কুরবানীর দিন এলে সূর্যোদয়ের পরই কুরবানী করতে হবে।

কুরবানী কখনও বাদ দেয়া যাবেনা:

হযরত (সঃ) দু'টি ভেড়া কুরবানী করতেন। ঈদের নামায পড়ে তিনি তা জবাই করতেন। তিনি বলেন—যে ব্যক্তি নামাযের আগে কুরবাণী করল, সে কুরবানীই করল না; বরং সে পরিবার-বর্গের গোশত খাওয়ার ব্যবস্থা করল। হযরতের (সঃ) সুন্নাতের এটাই তাৎপর্য। ঈদের নামাযের ওয়াক্ত বা খুৎবার কোন গুরুত্ব নেই। তবে নামায আদায় হতে হবে। আমরা আল্লাহর যে দ্বীনের অনুসারী তা এটাই।

হযরত (সঃ) বলেছেন—তরুণ ও তাজা দেখে ভেড়া জবাই করবে।' তা দু'বছরের হতে হবে।

তিনি আরও বলেন—আইয়্যামে তাশরীকের যে কোন দিন জবাই করা চলবে। অবশ্য এ হাদীছটি ছিন্ন সূত্রের (মুনকাতা)।

গোশত তিন দিনের বেশী জমা রাখা যাবে না :

কুরবানীর গোশত তিন দিনের বেশী রাখা যাবে না। তবে তার এ অর্থ নয় যে, শুধু কুরবাণীর তিন দিন জমা রখা যাবে। বরং যে দিন জবাই হবে সে দিন থেকে তিন দিন। যদি সে তৃতীয় দিন কুরবানী করে তা হলে জবাইর সময় থেকে পরবর্তী তিন দিন সে তা জমা রাখতে পারবে। যারা গোশত জমা রাখার জন্য নির্দিষ্টভাবে তিন দিনের সীমারেখা নির্ধারণ করেন, তারা কুরবানীর তিন দিনের কথাই বলেন।

কুরবানীর দিনগুলো :

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) বলেন—ঈদুল আজহার দিনের পরেও তিন দিন কুরবানী করা যায়।

বসরাবাসীর ইমাম হযরত হাসান (রঃ) ও মক্কাবাসীর ইমাম আতা ইবনে আবু রুবাহ (রঃ), সিরিয়াবাসীর ইমাম আওযাঈ (রঃ) ও আহলে হাদীছ ফকীহদের ইমাম শাফেঈ (রঃ) এর মাজহাব এটাই। ইবনে মানজারের (রঃ) মাসলাও তাই। যেহেতু সে তিন দিন মিনা, রমী ও তাশরীকের দিন বলে নির্দিষ্ট, তাই সে তিন দিনে রোযা রাখা হারাম।

রসূল (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে : সকল মিনা কুরবানীর জায়গা ও আইয়্যামে তাশরীকের সব কটি দিন পশু জবাইয়ের দিন।

জুবায়ের ইবনে মুতআমের এ বর্ণনার সূত্র ছিন্ন। তবে উছামা ইবনে যায়েদ আতা থেকে ও তিনি হযরত জাবির (রাঃ) থেকে এটি বর্ণনা করেন। ইয়াকূব ইবনে সুফিয়ান বলেন—মদীনাবাসির দৃষ্টিতে উছামা ইবনে যায়েদ নির্ভরশীল ও সংশয়মুক্ত বর্ণনাকারী।

এ ব্যাপারে চারটি মত সৃষ্টি হয়েছে। একটি তো বলা হল।

দুই, কুরবানীর দিন ও পরের দু'দিন। এ মাজহাব ইমাম আহমদ ও ইমাম আবু হানীফার (রঃ)। ইমাম আহমদ বলেন—বেশ ক'জন সাহাবারই মত এটা। আছরাম ইবনে উমর (রাঃ) ও ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে অনুরূপ অভিমত উধৃত করেন।

তিন, কুরবাণীর দিন মাত্র একটা। এ মতটি ইবনে সিরীনের। যেহেতু ঈদুয্যুহা বলতে কুরবানীর দিনকেই বুঝায় এবং অন্য দিনকে বুঝায়না, তাই তা অন্য দিনে হতে পারে না। যেমন ঈদুল ফিতর বলতেও একটি মাত্র দিনকে বুঝায়, এও তেমনি।

সাঈদ ইবনে জুবায়ের ও জাবির ইবনে যায়েদের বক্তব্য হল এই যে, মিনায় তিন দিন ও অন্যত্র একদিন হবে। কারণ, মিনায় রমী, হলক, তাওয়াফ ইত্যাকার ইবাদত রয়েছে। তাই অন্য স্থানের মোকাবেলায় এখানে তিন দিন হওয়া উচিত।

নবী করীম (সঃ) এর রীতি এই যে, কেউ যদি কুরবানীর নিয়্যত করে থাকে এবং দশ তারিখ এসে যায়, তা হলে মাথা মুন্ডন ইত্যাদি কাজ করবে না। সহীহ মুসলিমে নবী করীম (সঃ) থেকে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। দারে কুতনী (রঃ) বলেন, আমার কাছে সহীহ এটাই যে, বর্ণনাটি উম্মে সালমার (রাঃ) ওপর 'মাওকূফ' রয়েছে।

নবী করীম (সঃ) এর সুন্নাত এটাই যে, কুরবানীর পশু হবে উত্তম, সুন্দর ও সর্ববিধ ত্রুটি-মুক্ত। তিনি কান কাটা ও অর্ধেক শিং ভাংগা পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, চোখ ও শিং দেখে নেবে। অর্থাৎ জানোয়ার নিঃখুঁত ও সুস্থ হতে হবে। খুঁতওয়ালা অসুস্থ জানোয়ার দিয়ে কুরবানী দিতে তিনি নিষেধ করেছেন। বিশেষত মুকাবিলা অর্থাৎ কানের অগ্রভাগ কাটা, মুদাবিরা অর্থাৎ কানের পেছনভাগ কাটা, শুরাকা অর্থাৎ কান ফাড়া ও খুরাকা অর্থাৎ কান ছেদা পশু দিয়ে কুরবানী চলবেনা। (আবু দাউদ)

হযরত (সঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, চার ধরনের পশু দিয়ে কুরবানী হবে না। কানী অর্থাৎ যার ত্রুটি সুস্পষ্ট; বিমার অর্থাৎ যার রোগ প্রকাশ্য; লেংড়া অর্থাৎ যা সুস্পষ্ট খুঁড়িয়ে চলে; ভগ্ন অর্থাৎ যাতে মগজ অবশিষ্ট নেই ও দুর্বল অর্থাৎ অতিমাত্রায় দুর্বলতার জন্য যার চলার শক্তি রহিত হয়েছে।

এও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) মুসফারা, মুস্তাসালা, নুজাকা, মাশীআ ও কিসরার কুরবানী নিষিদ্ধ করেছেন। মুসফারা অর্থাৎ এতখানিক কান কাটা যে সুড়ঙ্গ দেখা যায়; মুস্তাসালা অর্থাৎ যার শিং না হবার মত সামান্য মাত্র; নুজাকা অর্থাৎ যার চোখ একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে; মাশীআ অর্থাৎ দুর্বলতার কারণে যা হালের পেছনে চলতে অক্ষম এবং কিসরা অর্থাৎ যার কোন অংশ ভেংগে গেছে।

ঈদগায় কুরবানী :

আবু দাউদে হযরত জাবির থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈদুল আযহার দিন হযরত (সঃ) এর সাথে ছিলেন। যখন তিনি খুতবা শেষ করলেন, মিম্বর থেকে নামলেন এবং একটি ভেড়া নিয়ে আসা হল। তিনি সেখানে নিজ হাতে সেটা জবাই করলেন এবং 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বললেন। তারপর তিনি বললেন—এ কুরবানী আমার ও আমার যে সব উম্মত কুরবানী দেয়নি তাদের পক্ষ—থেকে।

সহীহদ্বয়ে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সঃ) ঈদগায় কুরবানীর পশু জবাই করতেন।

আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত (সঃ) কুরবানীর দিন দু'শিংওয়ালা দু'টো খুব সুন্দর ভেড়া জবাই করেন। যখন তিনি সে দু'টো শোয়ালেন, তখন এ দোআ পড়লেন :

انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا
وما انا من المشرکین - ان صلواتی ونسکی ومحیای ومماتی
لله رب العالمین لا شریك له وبذلك امرت وانا اول المسلمین
اللهم منك ولك من محمد وامته والله اکبر -

"নিশ্চয় আমি সেই সত্তার দিকে একাগ্রচিত্তে মুখ করলাম যিনি নভমন্ডল ও ভুমন্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আমি আংশীবাদী নই। নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ একমাত্র নিখিল সৃষ্টির প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কেউ শরীক নেহ। এ কাজেই আমি আদিষ্ট ও আমি সর্বাগ্রে মুসলমান। হে আল্লাহ! তোমারই পশু তোমারই জন্য মুহাম্মদ ও তার উম্মতের পক্ষে—আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

এ দোআ পড়েই তিনি জবাই করলেন এবং সবাইকে বললেন—পশু ঠিকভাবে ও ভাল-ভাবে জবাই কর (অর্থাৎ ধারালো অস্ত্রে দ্রুত পুরোপুরি জবাই কর)। তিনি আরও বললেন—আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর ওপরেই সদয় হওয়া অপরিহার্য করেছেন।

নবী করীম (সঃ) এর পবিত্র সুন্নাত ছিল এই, এক বকরী একজনের জন্য ও তার পরিবার বর্গের জন্য, তা তাদের সংখ্যা যতই হোক। যেমন, হযরত আতা ইবনে ইয়াসার বলেন—আমি আবু আইয়ুব আনসারীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম যে, নবী করীম (সঃ) এর সময়ে কুরবানী কিভাবে হত ?

তিনি জবাব দিলেন—কেউ যদি তার ও তার পরিবার বর্গের তরফ থেকে একটি বকরী কুরবানী দেয়, তা হলে সেও তা খাবে, অপরকেও খাওয়াবে (তিরমিজী-হাসান সহীহ)।

(সমাপ্ত)

Contents

● ক'টি উল্লেখযোগ্য মুদ্রণ প্রমাদের সংশোধনী ●

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদের পূর্ণ শিরোনাম হবে :
"মুহাম্মদ (সঃ) ও উম্মতে মুহাম্মদীর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যা।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের বাদ পড়া শিরোনামটি হবে :
"শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের আরও কয়েকটি উদাহরণ।"

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রিংশ পরিচ্ছেদের পরবর্তী পাঁচটি পরিচ্ছেদে 'বিংশ' স্থলে 'ত্রিংশ' পড়তে হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দু'টি 'অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ'-এর দ্বিতীয়টি 'ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ' হবে।